জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান পরিচিতি

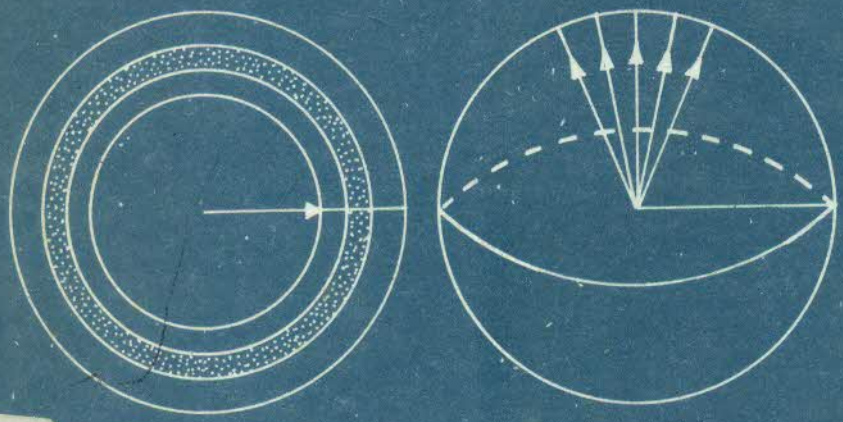

ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক ও বিকশিত শাখা হলো জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান যা এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। এ গ্রন্থের বিষয়সূচি এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে বোধগম্য একটি ধারণা পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে আটটি অধ্যায় রয়েছে। এখানে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব, মহাবিশ্বের কাঠামো : সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব সম্পর্কে পরিচিতিমূলক আলোচনা : বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বাবলি, মহাবিস্ফোরণ বা বিগ-ব্যাং মডেল, কোয়ান্টাম সৃষ্টিতত্ত্ব : ছায়াপথ এবং ছায়াপথস্তবকের গঠন, তাদের ভৌত কাঠামো ও ভর নির্ণয়, মহাবিশ্ব ব্যাপক কাঠামোর উদ্ভব, রেডিও ছায়াপথ, কোয়েসার : আকাশগঙ্গা ছায়াপথ ও তার বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা : নক্ষত্রের গঠন, দূরত্ব, উৎপত্তি ও বিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে। এছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের সম্প্রতিকতম বস্তু ম্যাগনেটার, এক্সক্লিয়ার, ব্ল্যাকহোল ইত্যাদি সম্পর্কে বাংলায় এই প্রথমবারের মতো আলোচনা করা হয়েছে। নিউট্রন তারা এবং কৃষ্ণবিবর ও ওয়ার্মহোল সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। মহাবিশ্বের ভবিতব্য সম্পর্কেও এখানে আলোচিত হয়েছে। বলা হচ্ছে, একুশ শতকে মানুষের মনন ও চিন্তার জগতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা। একুশ শতকের মানুষের তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের হালের খবর জানা প্রয়োজন। আধুনিক বাঙালি পাঠককে মহাকাশ বিষয়ে সাম্প্রতিকতম তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করাই বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান পরিচিতি

(An Introduction to Astrophysics)

BANSDOC Library
Dhaka

জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান পরিচিতি

(An Introduction to Astrophysics)

ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী
প্রভাষক
তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

বাংলা একাডেমী ঢাকা

NSDOC Library
Accession No. 17069
Date 10.6.04

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪০৬
ফেব্রুয়ারি ২০০০

বাএ (১৯৯৯-২০০০ পাঠ্যপুস্তক : ভৌ ও প্র ৯) ৪০১০

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগ
ভৌ ও প্র ১৯৯

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ফরিদা জামান

মূল্য : ১২০.০০

JYOTIRPADARTHABIJNAN PARICHITI (An Introduction to Astrophysics) by Farseem Mannan Mohammedy, Lecturer, Bangladesh University of Engineering & Technology, Dhaka. Published by Gholam Moyenuddin, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition : February 2000. Price : Taka 120.00 Only.

ISBN 984-07-4019-9

BANSDOC Library
Dhaka

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক
তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী
প্রফেসর এ. এম. হারুন-অর-রশীদকে

ভূমিকা

জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক একটি শাখা। মহাজাগতিক বস্তুসমূহের ভৌত প্রকৃতি, রাসায়নিক ও ভৌত গঠন, বিকিরণ, তাপমাত্রা, গতীয় ধর্মাবলি, ঔজ্জ্বল্য, উৎপত্তি ও বিবর্তন ইত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। পদার্থবিজ্ঞান, কণা পদার্থবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, বর্ণালিবিজ্ঞান, রসায়ন এমনকি জীববিজ্ঞানও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এভাবেই আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের একটি বিকশিত শাখা হিসেবে। বিজ্ঞান হিসেবে এটি সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণনির্ভর। মহাকাশে স্থাপিত হাবল মহাশূন্য দূরবিন এবং বিভিন্ন স্যাটেলাইট থেকে প্রতিনিয়ত প্রভূত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে এবং এই তথ্য সংশ্লিষ্ট তত্ত্বের সংশোধন ও পরিমার্জনে কাজে লাগছে। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের সাথে কণা পদার্থবিজ্ঞানের যে গাঁটছড়া, গত কয়েক দশকে বাঁধতে দেখা গেছে তার সাফল্য অসাধারণ। এর ফলেই জন্ম নিয়েছে অ্যাস্ট্রপার্টিকল ফিজিক্স—জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের আরেকটি নবতর উর্বর ক্ষেত্র। মহাকাশের অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান পাওয়া গেছে এই অ্যাস্ট্রপার্টিকল ফিজিক্স থেকে। বিশেষ করে মহাবিশ্বের প্রাথমিক মুহূর্তের সঠিক বর্ণনায় এই শাখাটি অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান গ্রন্থেই তা প্রমূর্ত হয়েছে।

জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান পরিচিতি জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহী এবং শৌখিন জ্যোতির্বিদদের জন্য, পাশাপাশি বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী এবং বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে সহায়ক-গ্রন্থ হিসেবে কাজে লাগবে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত বিভাগের স্নাতক সম্মান শেষ বর্ষের এবং স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের জন্য এটি একটি মূল্যবান ও জরুরি সহায়ক-গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ গ্রন্থে অগাণিতিক বর্ণনাধর্মী আলোচনাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য ধরা হয়েছে, তবে গণিত-অংশটি পুরোপুরি বর্জিত হয়নি। গত কয়েক বছরে দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এমন অনেকেই আছেন যাঁরা জানতে চান দূর মহাকাশে কখন কি ঘটছে। কিভাবে নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু হয়? পালসার কি? ব্ল্যাক-হোল বা কৃষ্ণবিবর কি? ওয়ার্মহোল কি? ছায়াপথ কিভাবে জন্ম নিলো? মহাবিশ্বের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে, এর অন্তিম নিয়তিই বা কি হতে পারে? কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে বাংলায় এ বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো বইই নেই। বহু পূর্বে প্রফেসর আব্দুল জব্বারের খগোল পরিচয় প্রকাশিত হয় (তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৫)। বইটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ যথেষ্ট সহজ এবং বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। বইটির আর কোনো সংস্করণ বের হয়নি। তাই দীর্ঘদিন যাবৎ এ বিষয়ে একটা শূন্যতা বিরাজ করছে। বর্তমান

গ্রন্থে এই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের জন্য বইটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য — এই দাবি সসংকোচে করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, মাখের নীতির তাৎপর্য, সৃষ্টিতত্ত্বের নীতি বা কসমোলজিকাল প্রিন্সিপল-এর উপর দীর্ঘ আলোচনা এবং টেন্সর অ্যানালিসিসের আলোকে আইনস্টাইনের ক্ষেত্র-সমীকরণের সম্পূর্ণ নির্ধারণ এখানে উহ্য রাখা হয়েছে কিছুটা গ্রন্থের কলেবরের কথা ভেবে, কিছুটা জটিলতা এড়াতে। তবে এটা নিঃসন্দেহ যে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের সম্পূর্ণ আলোচনায় এ বিষয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনা নেহায়েতই জরুরি। তবে এ গ্রন্থে এমন অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে যা ইতোপূর্বে বাংলায় করা হয়নি। যেমন ছায়াপথ এবং ছায়াপথস্তবকদের নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যা বাংলায় এর আগে আর কোথাও এতোটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। কৃষ্ণবিবর এবং তার অনিবার্য সঙ্গী ক্ষুদ্রবিবর নিয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে (অনুচ্ছেদ ৬.১৩) মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থের বিষয়সূচি এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে বোধগম্য একটি ধারণা পাওয়া যায়। প্রথম অধ্যায়ে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের গুরুত্ব, অবদান, সাফল্য এবং আধুনিক বিশ্বচিত্রের পরিচিতিসহ মহাবিশ্বের কাঠামো সম্পর্কে পরিচিতিমূলক আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনায় সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব অপরিহার্য। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আধা-টেকনিক্যাল আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ্বসৃষ্টির বিভিন্ন তত্ত্বাবলি, মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাঙ মডেল এবং তার তিনটি প্রমাণ, স্ফীতির তত্ত্ব, কোয়ান্টাম সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ৩.১৩-এ বিশ্বসৃষ্টির প্রথম তিন মিনিটের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে এই অধ্যায়েটিই সর্বাধিক গণিতসমৃদ্ধ। তবে এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত গণিত বোঝার জন্য সাধারণ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সমাধান পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। চতুর্থ অধ্যায়ে ছায়াপথ এবং ছায়াপথস্তবক, তাদের গঠন, ভর নির্ণয়, ভৌত কাঠামো এবং মহাবিশ্বে ব্যাপক কাঠামোর উদ্ভব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া রেডিও ছায়াপথ এবং কোয়েসারদের নিয়ে এখানে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে নক্ষত্র নিয়ে। নক্ষত্রের দূরত্ব, শক্তি উৎস, বিষমতা, উৎপত্তি ও বিবর্তন এখানে আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম বস্তু ম্যাগনেটার, এসজিআর, জিআরবি ইত্যাদি নিয়ে বাংলায় এই প্রথমবারের মতো আলোচিত হয়েছে। এছাড়া নিউট্রন তারা এবং কৃষ্ণবিবর সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। সপ্তম অধ্যায়ে মহাবিশ্বের ভবিতব্য আলোচিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়টি কিছুটা দার্শনিক এবং ততোধিক সাহিত্যিক একটি অধ্যায়। পরিশিষ্ট ১ ও ২-এ বস্তুকণিকা, তাদের মৌলিক গঠন, কোয়ার্ক মডেল, পরম একীভূত তত্ত্ব, স্ট্রিং তত্ত্ব ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পর এ দুটি পরিশিষ্ট

পড়ে নিলে ভাল হয়। এ গ্রন্থের সর্বত্র মহাবিশ্বের বয়স অন্তত বারো বিলিয়ন বছর হিসেবে ধর্তব্য এবং তারা ও নক্ষত্র, ছায়াপথ ও গ্যালাক্সি, বিশ্ব ও মহাবিশ্ব সমার্থক হিসেবে বিবেচ্য।

বাংলায় জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের উপর মাত্র গুটিকয়েক বই আছে। প্রফেসর হারুন-অর-রশীদ ও মোঃ নূরুল ইসলাম রচিত *সাধারণ আপেক্ষিকতা ও বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব* প্রসঙ্গত এ রকম একটি বই। বর্তমান গ্রন্থটিকে আসলে উক্ত গ্রন্থটির একটি সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে প্রথম গ্রন্থটি গাণিতিক দিক দিয়ে যতোখানি সম্পূর্ণতা পেয়েছে, বর্তমান গ্রন্থটি বিষয়বৈচিত্রের দিক দিয়ে ততোখানি ব্যাপকতা পেয়েছে, আশা করি। বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব বা কসমোলজি বিষয়ে পিব্‌লসের লেখা *Principles of Physical Cosmology* একটি অবশ্যপাঠ্য এবং যেকোনো অর্থে সম্পূর্ণ একটি বই। বর্তমান গ্রন্থের সর্বত্র প্রয়োজনমতো এই বইটির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ভাইনবার্গের লেখা *Gravitation and Cosmology* ও একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। অন্যদিকে কৃষ্ণবিবর এবং নিউট্রন তারা ইত্যাদি বিষয়ে শাপিরো ও টিউকোল্‌স্কির লেখা *Black Holes, White Dwarfs and Neutron Stars—The Physics of Compact Objects* বইটিকে প্রামাণ্য ধরা হয়েছে। অগ্রসর সাধারণ পাঠক বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের উপর হকিং-এর লেখা বিশ্বনন্দিত *A Brief History of Time*, ভাইনবার্গের ক্লাসিক বই *The First Three Minutes*, জন গ্রিবিন রচিত *In Search of Big Bang*-এর নবতর সংস্করণ, নারলিকারের লেখা *The Structure of the Universe* এবং কিপ থর্নের লেখা অসাধারণ মনোগ্রাফ *Black Holes and Time Warps* গ্রন্থগুলো দেখতে পারেন। এ গ্রন্থে উদ্ধৃত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের কিংবা সাধারণভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যেকোনো শব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতির জন্যে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত আমার লেখা *জ্যোতির্বিজ্ঞান শব্দকোষ* দেখা যেতে পারে। এছাড়া প্রয়োজনীয় রেফারেন্স, যেখানে প্রয়োজন সেখানে, ফুটনোটে দেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃত গ্রন্থাবলির একটি পূর্ণ তালিকা 'গ্রন্থপঞ্জি'তে দেওয়া হয়েছে, লেখকের নাম ও বন্ধনীস্থ সাল দেখে সেখান থেকে বইটির নাম জেনে নেওয়া যাবে। যেমন পিব্‌লসের উপরিউক্ত বইটি সর্বত্র Peebles (1993) হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া (প্রথম ও অষ্টম অধ্যায় বাদে) প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে 'বইপত্র' শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ-সহায়িকা দেওয়া হয়েছে। যাঁরা অধিকতর তত্ত্ব-তথ্য জানতে চান এটা তাঁদের সাহায্য করবে। 'পরিশিষ্ট-৬'এ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেওয়া হলো। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা এ থেকে উপকৃত হবেন।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সাম্প্রতিক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, রিভিউ প্রবন্ধ ইত্যাদি বেশ দুর্লভ। তথাপি এ গ্রন্থে যথাসম্ভব সাম্প্রতিক তথ্য সংযোজিত হয়েছে। একাজে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন—কেউ পরামর্শ দিয়ে, কেউ উৎসাহ দিয়ে, কেউ বা প্রয়োজনীয় বই দিয়ে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ব্যান্সডক লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ, আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজের সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক এডুকেশনাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইনফরমেশন (সেস্টি) কর্তৃপক্ষ, ন্যাসা ও জে.পি.এল এবং সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকানসহ

ইন্টারনেটের অন্যান্য ওয়েব-সাইট, বুয়েটের সত্যেন বোস ক্লাব এবং বুয়েট সাহিত্য সংসদ প্রয়োজনীয় সহায়তা করে উপকৃত করেছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ড. এ. এম. হারুন-অর-রশীদ বিভিন্ন সময়ে পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশ পড়ে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। এই গ্রন্থের পেছনে তাঁর অবদান ধন্যবাদের ঊর্ধ্বে। বাংলা একাডেমীর শ্রদ্ধেয় সুব্রত বড়ুয়া এবং অগ্রজপ্রতিম অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি ঋণী। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ করার যে নিরন্তর তাগিদ অপরেশদা দিয়ে এসেছেন তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। অষ্টম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কবি ও সাহিত্যতাত্ত্বিক প্রিয়বন্ধু আরশাদ উল আকাশ মনি অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ অধ্যায়ের অনেক বাক্য-সংগঠনে রয়েছে তার উপলব্ধির মৌলিকতার প্রত্যক্ষ ছোঁয়া। এজন্য তাকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ। সবশেষে এ বইটি প্রকাশ করার জন্য ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

সভ্যতার প্রথম ক্ষণ থেকে মানুষ জ্ঞানার্জনের যে বীজ বপন করেছে তারই ফসল আজ আমরা উপভোগ করছি। মহাকাশের অপার রহস্যের সমাধানে জ্যোতির্ঃপদার্থবিজ্ঞান সবেমাত্র পদযাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু জ্ঞানের পথে এই মহাযাত্রার কোনো শেষ নেই। এ এক অনন্তযাত্রা। তাই এই থার্ড মিলেনিয়ামের গোড়ায় মহাজাগতিক যাত্রার যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সেটা মানুষের মনন-চিন্তন-জ্ঞান ও মনীষার প্রতি এক প্রত্যায়িত চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এমনই পরিপেক্ষিতে অনন্ত রহস্যের মুখোমুখি আধুনিক বাঙালি পাঠককে তাদের অজস্র জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষায় এই বইটি সামান্য হলেও সাহায্য করবে এটাই আমার আশা।

ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : **বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব এবং মহাবিশ্বের কাঠামো** ১-৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : **সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের ভূমিকা** ৯-২৯

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি ; ২.২ বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ; ২.৩ সাধারণ সহভেদিতা ; ২.৪ সমতুল্যতার নীতি ; ২.৫ আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব ; ২.৬ সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ।

তৃতীয় অধ্যায় : **সৃষ্টির মাহেন্দ্র ক্ষণে** ৩০-১০০

৩.১ প্রারম্ভিক ; ৩.২ বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বসমূহ ; ৩.৩ প্রসারমান বিশ্ব ; ৩.৪ বিশ্বের বয়স ; ৩.৫ অলবার্সের হেঁয়ালি ; ৩.৬ মাইক্রোতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ ; ৩.৭ আদিম কেন্দ্রীন সংশ্লেষণ ; ৩.৮ পদার্থ-প্রতিপদার্থ অপ্রতিসাম্য ; ৩.৯ স্ফীতিশীল বিশ্বচিত্র ; ৩.১০ সৃষ্টির মাহেন্দ্র ক্ষণে ; ৩.১১ বিকল্প অনুকল্প ; ৩.১২ কোয়ান্টাম সৃষ্টিতত্ত্ব ; ৩.১৩ মহাজাগতিক ধ্রুব-পদ ও তার প্রভাব।

চতুর্থ অধ্যায় : **অনন্ত ছায়াপথরাজি** ১০১-১৬৩

৪.১ প্রারম্ভিক ; ৪.২ ছায়াপথ বনাম নীহারিকা ; ৪.৩ আমাদের নিকটবর্তী ছায়াপথসমূহ ; ৪.৪ ছায়াপথের শ্রেণীবিভাগ ; ৪.৫ ছায়াপথের সাধারণ ধর্ম ; ৪.৬ ছায়াপথের কাঠামো ও তার ধর্ম ; ৪.৭ ছায়াপথের ভর ও দূরত্ব নির্ণয় ; ৪.৮ সক্রিয় ছায়াপথ কেন্দ্রীন ; ৪.৯ রেডিও ছায়াপথ ; ৪.১০ 'দূরান্তের দীপ্তি' কোয়েসার ; ৪.১১ ছায়াপথ স্তবক ; ৪.১২ মহাবিশ্বে ব্যাপক কাঠামোর উদ্ভব।

পঞ্চম অধ্যায় : **আকাশগঙ্গা ছায়াপথ** ১৬৪-১৭৮

৫.১ প্রারম্ভিক ; ৫.২ ছায়াপথের ভৌত কাঠামো ; ৫.৩ ছায়াপথের ভৌত ধর্মাবলি ; ৫.৪ ছায়াপথে নক্ষত্রের গতি ; ৫.৫ ছায়াপথের সদস্যসমূহ ; ৫.৬ ছায়াপথের উদ্ভব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : **নক্ষত্রের গর্ভ থেকে** ১৭৯-২৫৫

৬.১ প্রারম্ভিক ; ৬.২ নক্ষত্র কি ; ৬.৩ নক্ষত্রগর্ভ ; ৬.৪ নক্ষত্রের দূরত্ব ও উজ্জ্বলতা ; ৬.৫ জোড়াতারা ; ৬.৬ বিষমতারা ; ৬.৭ নবতারা ; ৬.৮ বর্ণিল তারাবর্ণালি ; ৬.৯ নক্ষত্রের জন্ম ; ৬.১০ তেজোময় নক্ষত্রের শক্তির উৎস ; ৬.১১ নক্ষত্রের অন্তিম নিয়তি ; ৬.১২ নক্ষত্রের অন্তিম দশা ; ৬.১৩ কৃষ্ণবিবর ; ৬.১৪ নক্ষত্র ও আমরা।

সপ্তম অধ্যায় : **বিশ্বের অন্তিম নিয়তি** ২৫৬-২৭৬

৭.১ প্রারম্ভিক ; ৭.২ বিশ্বের নিয়তি ও স্থানের জ্যামিতি ; ৭.৩ বিশ্বের সম্ভাব্য নিয়তি ; ৭.৪ বিশ্বের নিয়তি নির্ধারণ ; ৭.৫ অদৃশ্য বস্তু।

অষ্টম অধ্যায় : **বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের সৌন্দর্য** ২৭৭-২৮২

পরিশিষ্ট ২৮৩-৩০৯

প-১ বস্তুকণার গভীরে ; প-২ পরম ঐক্যের সন্ধানে ; প-৩ জ্যোতিষ্পদার্থবিজ্ঞানের ধ্রুবরাশিসমূহ ; প-৪ সৌরজগতের তথ্যাবলি, প-৫ বিশটি উজ্জ্বল তারার সারণি ; প-৬ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা

গ্রন্থপঞ্জি ৩১০-৩১৬

নির্ঘণ্ট ৩১৭-৩১৯

প্রথম অধ্যায়

বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব এবং মহাবিশ্বের কাঠামো

ন তাব সুপিতুং হোতি রত্তি নক্খত্তমালিনী।
পটিজগ্গিতুমেবেসা রত্তি হোতি বিজানতা॥
অর্থ : নক্ষত্রমালিনী রাত্রি কিছুতেই ঘুমিয়ে কাটাবার
নয়, যিনি জ্ঞানবান এই রাত্রি তাঁর জেগে থাকবার।

—পালি সাহিত্য

The time will come when diligent research over long periods will bring to light things which now lie hidden. A single lifetime, even though entirely devoted to the sky, would not be enough for the investigation of so vast a subject... And so this knowledge will be unfolded only through long successive ages. There will come a time when our descendants will be amazed that we did not know things that are so plain to them... Many discoveries are reserved for ages still to come, when memory of us will have been effaced. Our universe is a sorry little affair unless it has in it something for every age to investigate... Nature does not reveal her mysteries once and for all.

SENECA, Natural Questions
Book 7, 1st century

আধুনিক বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞাত ভৌতবিধিগুলির সাহায্যে ব্যাপক এবং ব্যাপকতর পটভূমিতে মহাবিশ্বের কাঠামোকে ব্যাখ্যা করা। বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে তাত্ত্বিক আলোচনার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের চমকপ্রদ পর্যবেক্ষণ এবং নতুনতর তথ্যের আবিষ্কার। জ্যোতির্বিজ্ঞান আমাদের দূর থেকে মহাবিশ্বকে দেখতে শেখায় ; কিভাবে এ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ছেঁকে নিতে হয় তার প্রণালি শেখায়। এই প্রণালি-পদ্ধতি অবশ্যই ভৌতবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে আহরণ করা হয়েছে। নাক্ষত্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে শুরু করে কণা পদার্থবিজ্ঞান পর্যন্ত সর্বত্রই এই প্রণালি অনুসৃত হয় এবং তার ফলাফল

আশ্চর্যজনক ও বে সকল [illegible] অবাক লাগে, ল্যাবরেটরিতে আমরা যেসব সাধারণ ভৌত বিক্রিয়া [illegible] করে থাকি, সেগুলিই বা অন্য [illegible] কি করে [illegible]

সূর্য আর কত [illegible] জানতে চেয়েছে মহাবিশ্বের কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, এটি কেন [illegible] কি এর নিয়তি, এটি সসীম না অসীম [illegible] বিশ্ব আসলে কি? এই সকলের উত্তরের [illegible] আজকের বিশ্বতত্ত্ব (Cosmology)। বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার মিথ (myth), পৌরাণিক টাবলেটে, পুঁথিতে গল্পে [illegible] আমরা এসব চিরন্তন প্রশ্নের [illegible] দেখা। বিভিন্ন ধর্মীয় [illegible] এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বতত্ত্ব [illegible] সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রথাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের এই চিরন্তন কৌতূহলের একটি সুসংগত, যুক্তিগ্রাহ্য এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াস পেয়েছে। ডঃ [illegible] মোতাবেক এই সেদিন [illegible] অসীমের সন্ধানে [illegible] দেওয়া যায়, "[illegible] সূর্যের মত [illegible] ও তাদের ফলে জ্ঞানের উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে করিতে [illegible] হইতেছে। সে জানে যে তাহার জানিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তথাপি সে [illegible] ঘটনা ও নিদর্শনাদি দেখিয়া তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সচেষ্ট। সে [illegible] মানুষের সম্মুখে ধরিয়া [illegible]-বিহীন [illegible] হইতে পারণত [illegible] হইতে [illegible] অন্ধকারে জ্যোতিষ্কের স্থিরহস্য আলোচনা করিতেছে।"[১]

সম্প্রতি প্রাপ্ত [illegible] বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত প্রসারিত হচ্ছে অর্থাৎ ছায়াপথসমূহ পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই মহাজাগতিক প্রসারণের শুরু হয়েছে বহু আগে। [illegible] ১৯ বিলিয়ন বছর, ঘটে যাওয়া এক মহাবিস্ফোরণ থেকে। [illegible] এই [illegible] বন্ধ হয়ে শুরু হবে সঙ্কোচন। [illegible] এবং বিশ্ব এক সময়ে, পুনরায় একটি বিন্দুতে মিলিত হবে। অথবা এমনও হতে পারে যে বিশ্ব অনন্তকাল ধরে প্রসারিত হতে থাকবে। (বিশ্বের সম্ভাব্য নিয়তি সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)। এই মূল সমস্যাই বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয়। তবে বলে রাখা ভালো, এসব সমস্যা খুব একটা সহজ নয় এবং একেকজন এদের উত্তর দেওয়াও সম্ভব নয়। বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে কোনো একটি প্রতিপাদ্যকে বোঝা করতে হলে আনুষঙ্গিক অনাবিষ্কৃত বহু বিষয়ও জানতে হয়। কাজেই এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে অধিকতর অসমাধিত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। এটিই তরুণ বিজ্ঞানীদের সামনে সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ। The more you know, the less you know. এ কথা [illegible] উক্তি [illegible] মানুষের মধ্যে। কিন্তু এটি স্বীকার না করে উপায় নেই যে [illegible] বিশ্বতত্ত্বে যে আকস্মিক উন্নতি হয়েছে তা বিস্ময়কর। প্রায়োগিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মহাশূন্যে হাবল দূরবীন সংস্থাপিত

১ [illegible]

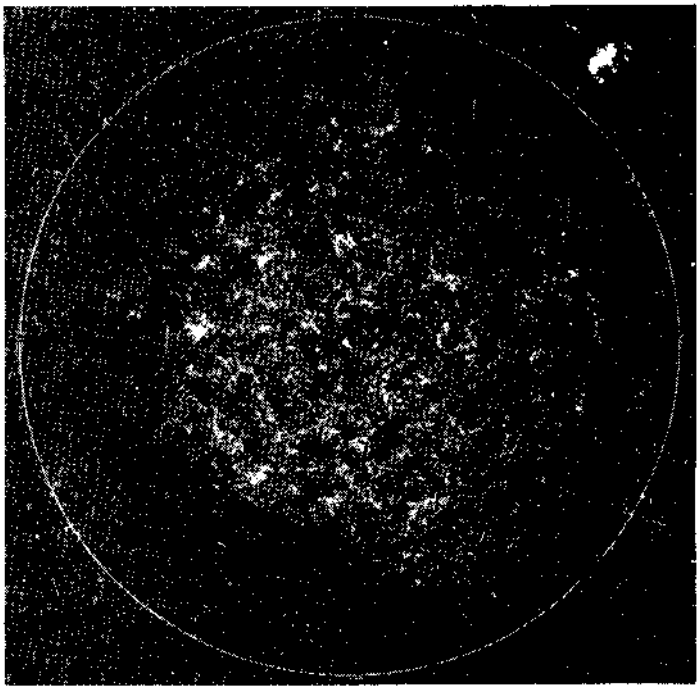

চিত্র ১.১ : মহাবিশ্বের নীহারিকা : [illegible]

মহাবিশ্বের কাঠামো (structure) বলতে [illegible] বোঝায়। [illegible] মহাবিশ্বের কাঠামো [illegible] বিশ্বের কাঠামোর বিভিন্নতার জন্য দায়ী [illegible]। প্রতিটি বিশ্বের সামগ্রিক উপাদান, বিশ্বসৃষ্টির [illegible] বিশ্বের কথা চিন্তা করা হয় [illegible] স্কেলে (large scale) সমসত্ত্ব ও দিক-নিরপেক্ষ (isotropic)। অর্থাৎ বিশ্বের দিক থেকে বিশ্বকে একইরকম দেখাবে। কাজেই এখানে দিকগুলির কোনো বিশেষ অবস্থান নেই। আবার বিশ্বকে [illegible] দিকই নিজেই সমান গুরুত্বের কেন্দ্রস্থল বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু এক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব দিক-নিরপেক্ষ [illegible] পর্যায়ে নিরপেক্ষ সমমাত্রা, দূরত্ব [illegible] উৎস [illegible] বস্তু এবং [illegible] দৃশ্যমান জ্যোতিষ্ক বস্তু, দূরত্বে [illegible] ছায়াপথসমূহের সংখ্যা গণনা। এসবের সাথে

দেয় যে ব্যাপক পটভূমিতে বিশ্ব দিকনিরপেক্ষ। এসব সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে মনে হতে পারে যে, হয় আমরা কোনো গোলকীয়ভাবে প্রতিসম (spherically symmetric) বিশ্বের একটি বিশেষ কেন্দ্রীয় অবস্থানে অবস্থান করছি ; নতুবা একটি সুষম দিকনিরপেক্ষ বিশ্বে আমাদের বাস যেখানে দর্শকের কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই ; প্রথম বিশ্বচিত্রটি সুপ্রাচীন এবং টলেমীর হাতে তা পরিপক্বতা পায়। তাছাড়া বিশ্বের অন্য যেকোনো ছায়াপথের বাসিন্দাই এরকমটি ভাবতে পারেন। তাই দ্বিতীয় বিশ্বচিত্রটিই গ্রহণযোগ্য। এখানে মানুষ তার কেন্দ্রীয় চরিত্রটি হারিয়ে ফেলে ; এখানে সে অনেকটাই যেন ব্রাত্য। আধুনিক বিশ্বচিত্রে হাবল বিধি কার্যকর—ছায়াপথসমূহ দূরত্বের অনুপাতে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিস্ফোরণের পর বিশ্বের প্রসারণের ফলে এর তাপমাত্রা কমে যায় এবং বর্তমানে তা সেন্টিমিটার সাবমিলিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে প্রাপ্ত পটভূমি বিকিরণ হিসেবে বিরাজ করছে। এই বিশ্বচিত্রে সাধারণ আপেক্ষিকতা যোগ করলে বিশ্বে বিরাজমান হাল্কা মৌলের অনুপাত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যা পর্যবেক্ষণসম্মত। তদ্ভিন্ন বিশ্বের বয়স সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

আধুনিক বিশ্বচিত্রের প্রধান ভিত্তিগুলো হলো :

১. ব্যাপক পটভূমিতে বিশ্বে ভর সুষমভাবে বণ্টিত। এই সুষম ভর বণ্টনের বিক্ষোভের (fluctuation) পরিমাণ অতি সামান্য এবং হাবল দৈর্ঘ্যের (~4000 মেগাপারসেক) সমতুল আয়তনে এই মান দাঁড়ায় : $\delta M/_M < 10^{-4}$; হাবল দৈর্ঘ্যের এক শতাংশে এই মান বেড়ে দাঁড়ায় : $\delta M/_M \sim 1$।

২. বিশ্ব প্রসারমান। দুটি কণিকার মধ্যকার গড়দূরত্ব যদি l হয় তবে এই দূরত্বের বৃদ্ধির হার : $\frac{dl}{dt} = H_0 l$। H_0 হলো হাবল ধ্রুবকের বর্তমান মান যা আসলে সময়-নির্ভর একটি রাশি। হাবল দৈর্ঘ্যের মান হলো : $L_H = \frac{c}{H_0} \sim 4000$ মেগাপারসেক। এই দৈর্ঘ্যে অপসরণ গতিবেগের মান বেড়ে আলোর বেগের সমতুল হয়ে যায়।

৩. প্রসারমান বিশ্বের গতীয় ধর্মাবলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব থেকে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী স্থানীয় ভৌতবিধিসমূহ বিশ্বের সর্বত্র প্রযোজ্য।

৪. বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে এমন এক উষ্ণ, ঘন অবস্থা থেকে যেখানে কৃষ্ণবস্তুর তাপীয় বিকিরণই (thermal blackbody radiation) প্রাধান্য বিস্তার করে।

বিশ্বজগতে বস্তুনিচয় ব্যাপক পটভূমিতে সুষমভাবে বণ্টিত এবং বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে এই ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক হাবল দৈর্ঘ্যের সমান ব্যাসের কোনো গোলাকার জানালা (spherical window) থেকে দেখলে গড়ে বিশ্বকে দিকনিরপেক্ষ দেখায় (~১% সূক্ষ্মতায়)—পটভূমি এক্স-রশ্মির বিকিরণের দিকনিরপেক্ষতা এই সত্যেরই জ্বলন্ত ইঙ্গিত। বিশ্ব সৃষ্টির প্রমাণ মডেলে দেখা যায়, বিশ্বের পদার্থনিচয়কে হাবল দৈর্ঘ্যের স্কেলে প্রতি 10^5 ভাগে ১ ভাগ সূক্ষ্মতায় সবদিকে সমভাবে বণ্টিত হতে হয়। ফলে পটভূমি বিকিরণের ফলে সৃষ্ট মহাকর্ষীয়

বিভব বৈষম্যের (gravitational potential perturbation) পর্যবেক্ষিত মান $\delta T/T \sim 10^{-5}$; তাত্ত্বিকভাবে নির্ধারণ করা যায়। $60\ h^{-1}$ Mpc ব্যাসের কোনো গোলাকার জানালা থেকে দেখলে ভর-বিক্ষোভের আর.এম.এস. মান (rms mass-fluctuation) দাঁড়ায় $\delta M/M \sim 0.3$। আরো বলা যায় যে, $60\ h^{-1}$ Mpc স্কেলে বা অধিকতর দূরত্বে ভর-বণ্টনে সৃষ্ট কোনো বিক্ষোভ আসলে পরস্পর অসম্পর্কিত (anticorrelated)।

কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান কিংবা সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের মতো বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বেও গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান সমভাবে প্রয়োগযোগ্য। আজকাল বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন প্রমিত প্রসারমান বিশ্বচিত্রের বিভিন্ন প্যারামিটারের মান সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করতে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, আইনস্টাইন ডি সিটার মডেলে ব্যবহৃত প্যারামিটারগুলির মান (সমীকরণ ৩.২.২৪ এর বক্রতা ও মহাজাগতিক ধ্রুবক সংক্রান্ত প্যারামিটার) খুবই ক্ষুদ্র। এই সমীকরণগুলি আইনস্টাইনের ক্ষেত্র-সমীকরণের সবচেয়ে সহজ, সুষম ও দিক-নিরপেক্ষ সমাধান— যদিও এটি প্রমাণ মডেলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই মডেল বিশ্বের গড় ঘনত্ব, বয়স এবং প্রসারণের বর্তমান মান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম। কিন্তু এই মডেল-কথিত মানসমূহ পর্যবেক্ষণসম্মত নয়, কারণ পর্যবেক্ষণ থেকেও এদের সুনির্দিষ্ট মান বলা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় উদাহরণ হলো, স্ফীতিশীল বিশ্বের ধারণা। বিশ্বের বর্তমান প্রসারণের পূর্বে কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা এই স্ফীতির সাহায্যে দাঁড় করানো যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্ফীতির ধারণাকে সত্যায়িত করার বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মতো যথেষ্ট কোনো উপাত্ত আমাদের হাতে নেই।

আধুনিক বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে গাণিতিক বিশ্লেষণ এবং উচ্চতর বিশ্লেষণী গণিত গভীর প্রভাব রেখেছে। আমরা আগেই বলেছি, বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বের জ্যামিতি ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের সাহায্যে। সাধারণ আপেক্ষিকতার সমতুল্যতার নীতি বলছে যে স্থানীয় ভৌতবিধিসমূহ সকল স্থানে ও সকল সময়ে প্রয়োগযোগ্য। কাজেই ল্যাবরেটরিতে যেসব আইন প্রয়োগযোগ্য, আমরা ধরে নিচ্ছি একই আইন দূর দূরান্তের ছায়াপথ ছায়াপথপুঞ্জের জন্য প্রযোজ্য। প্রশ্ন হতে পারে, আমাদের এই ধারণাটি কি আদৌ যুক্তিযুক্ত? হ্যাঁ, এই ধারণাটির সপক্ষে যথেষ্ট জোরালো কারণ আছে। সাধারণ আপেক্ষিকতার পরিপন্থী কোনো ভৌত প্রতিভাসের এখন পর্যন্ত কোনো সাক্ষাৎ মেলেনি; এবং এখন পর্যন্ত সাধারণ আপেক্ষিকতার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পর্যবেক্ষণের সাথে একই সুরে কথা বলছে। রেডিও, দৃশ্যমান এবং এক্স রে তরঙ্গদৈর্ঘ্যে এবং অন্যান্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যেও দেখা গেছে দূরবর্তী নক্ষত্র-ছায়াপথ-আন্তঃনক্ষত্রিক গ্যাস স্থানীয় ভৌত আইনই মেনে চলে। পার্থিব ল্যাবরেটরিতে ফ্লুইড ও প্লাজমা যে গতিবিজ্ঞান মেনে চলে, দূরবর্তী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রেও একই গতিবিজ্ঞান কাজ করছে। বলে রাখা ভালো, বিশ্বের জন্মলগ্নে যে ব্যতিক্রমী বিন্দুর (point of singularity) অস্তিত্ব আছে[২] সেখানে সাধারণ আপেক্ষিকতা আর খাটে না। তখন প্রয়োজন পড়ে একসেট নতুন

২. পেনরোজ ও হকিং-এর উপপাদ্য অনুযায়ী যা অবশ্যম্ভাবী; যদি আমাদের বিশ্ব পদার্থপূর্ণ হয় এবং সাধারণ আপেক্ষিকতা সত্য হয়। দ্রষ্টব্য অনুচ্ছেদ ৩.২।

[illegible] তিনটি বলের [illegible] সূর্যের ও সবল [illegible] Holy Grail of Physics [illegible] এখানে একটি সুপরিচিত সমস্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। [illegible] সমস্যা দেখা গেছে, [illegible] দশমিক স্তরের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট পার্থক্য। [illegible] দশমিক স্তরের তুলনায় [illegible] মহাকর্ষীয় ভরের কোনো স্তরেই নয়, এমনকি [illegible] শক্তিশালী হাবল টেলিস্কোপেও [illegible] বিদ্যুৎ চৌম্বক [illegible] বর্ণালির [illegible] বয়ে চলেছে [illegible] কারণে নতুন এক ধরনের ভরের প্রস্তাব করা হয়েছে যাকে কেবলই মহাকর্ষীয় মিথস্ক্রিয়া [illegible] Dark Matter [illegible] বস্তু বা [illegible] পরমপ্রতিসম (supersymmetric) [illegible] সমূহ [illegible]। সাম্প্রতিক এভাবে আধুনিক কণা পদার্থবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এটি নিঃসন্দেহে একদিকে বিশ্বসৃষ্টিতাত্ত্বিক এবং অন্যদিকে কণা পদার্থবিদদের জন্যে এক নতুন [illegible] করবে।

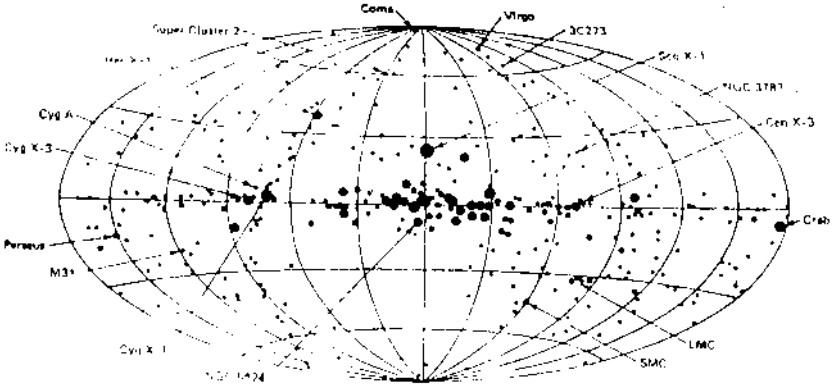

চিত্র ১.২ [illegible] রশ্মির উৎসগুলোকে [illegible] স্থানাঙ্কে [illegible] হয়েছে [illegible] ছায়াপথীয় কেন্দ্রটি [illegible] [illegible] বরাবর [illegible] উৎসগুলোর [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]।

আধুনিক বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্ব প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। প্রথমত, [illegible] সৃষ্টির পরবর্তী [illegible] যে অতিসামান্য অবশেষ পর্যবেক্ষণ করেছি সেটা কি

সামগ্রিক বিশ্বকে তার সম্পূর্ণ বিশালতায় মাধুর্যে-রহস্যে সৌন্দর্যে-তত্ত্বে তথ্যে বুঝবার জন্যে যথেষ্ট? দ্বিতীয়ত, যেহেতু বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি অসমাহিত প্রশ্নের সমাহার লক্ষ্য করা যায়, তাই আমরা কি দাবি করতে পারি যে আমরা বিশ্বকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পেরেছি?

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে দৃশ্যমান আলোর সেই পর্যবেক্ষণ যেটা করেছি তা সব দ্বিমাত্রিক প্রতিকৃতি থেকেই করা। অর্থাৎ ফটোগ্রাফিক প্লেটে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যে ছবি ফুটে ওঠে সেটাকে ভিত্তি করে আমরা পর্যবেক্ষণ করি। এই দুই মাত্রার সাথে যোগ হয় সময়ের মাত্রা। ফলে সার্বিকভাবে আমাদের পর্যবেক্ষিত বিশ্বচিত্র (১.১) মাত্রিক[১] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব (১.১) মাত্রিক। মহাবিশ্বের খ বস্তুসমূহের গভীরতাও যে আছে তা আমরা অগ্রাহ্য করি, কারণ কেবল সূর্য ব্যতীত আর কোনো নক্ষত্রের (ছায়াপথ তো দূরের বিষয়) ত্রিমাত্রিক প্রতিকৃতি গঠন সম্ভব হয়নি। কাজেই কেবল পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলা কতোখানি যুক্তিযুক্ত তা প্রশ্নের বিষয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অতীত আলোকশঙ্কুর পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্ররূপ গঠন করতে হলে আমাদেরকে অতীত সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য জানতে হবে যা প্রায় অসম্ভব। এখানেই পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতা। আসলে কেবল পর্যবেক্ষণনির্ভর তথ্য থেকে একটি সম্পূর্ণ বোধগম্য চিত্ররূপ খাড়া করা যায় না –অন্তত বিজ্ঞানের একটি বিকশিত শাখার জন্য তো নয়ই। বিজ্ঞানের ইতিহাসে কখনোই সর্বাংশে কেবল পর্যবেক্ষণ থেকে সামান্যীকরণের মাধ্যমে তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করা হয়নি। যেমন পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য থেকে কখনোই কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান এবং তার প্রত্যক্ষ ফল কঠিনাবস্থার পদার্থবিজ্ঞান (Solid State Physics) সম্ভব হতো না। বিশেষ করে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে অপারেটর ও স্টেট ভেক্টরদের নীতিগতভাবে কখনোই দেখা সম্ভব নয়। এরা কি কেবলই গাণিতিক হিসাবের সুবিধার্থে তৈরি, নাকি এদের কোনো ভৌত বাস্তবতা আছে তা নিয়ে এখনো সন্দেহের নিরসন ঘটেনি। যাহোক এটি স্পষ্ট যে শুধু পর্যবেক্ষণকে নির্ভর করে কোনো সত্যিকার বিজ্ঞান গড়ে ওঠে না, যদি না তার একটি বৌদ্ধিক ভিত্তি থাকে। বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব আজ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ, পূর্ণবিকশিত শাখা এবং এ ধরনের বিকশিত কাঠামোতে বিস্ময়কর ঘটনা কিঞ্চিৎ কমই ঘটে এবং সেটাই কাম্য। বারবার ভৌত বিধিসমূহের কাঠামো পরিবর্তন করা যায় না।

বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে আছে অনেক উন্মুক্ত সমস্যা। এমন হতে পারে যে পুরো ভৌত কাঠামোর কোনো গুরুত্বপূর্ণ, ছোট্ট অথচ প্রয়োজনীয় উপাদান আমরা আজও হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। অথবা আমাদের প্রচলিত ধারণায় ত্রুটি রয়ে গেছে কোথাও; ফলশ্রুতিতে তত্ত্ব মিলছে না

১. আমাদের সমস্ত পর্যবেক্ষণের উপাত্ত (১.১) মাত্রিক নল-লাইটকোনের এবং এর মধ্যের সময় সদৃশ বা টাইমলাইক ভিতরের মধ্যে অবস্থিত। কারণ দৃশ্যমান, রেডিও কিংবা এক্স রে সবই এই পরিসরে প্রাপ্তব্য।

পর্যবেক্ষণের সাথে। অবশ্য এ ধরনের সমস্যা সাধারণভাবে বিজ্ঞানের প্রায় সব সক্রিয় শাখাতেই রয়ে গেছে। উন্মুক্ত প্রশ্নের সংখ্যা বেশি বলেই তার যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহের তেমন কোনো কারণই নেই। কারণ প্রমিত বিশ্বচিত্র এখন পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম এবং এর চেয়ে ভালো কোনো বিশ্বচিত্র আমাদের জানা নেই। তবে আমাদের সবসময়েই যুক্তিমনা হতে হবে। নিত্যনতুন ধারণা আসবেই এবং প্রমাণ মডেলে সংশোধনও আনতে হবে। এটিই বিজ্ঞানের রীতি, বিজ্ঞানের সৌন্দর্য, বিজ্ঞানের সৌজন্যবোধ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ছায়াপথ এবং তাদের স্তবক ঠিক কিভাবে তৈরি তা সুনির্দিষ্টভাবে আমরা জানি না। কয়েকটি প্রস্তাবিত মডেল রয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব সুবিধা-অসুবিধা। একইরকম সমস্যা আছে লুকানো ভর নিয়ে। আশা করা যায়, আগামী পঞ্চাশ বছরে গবেষকরা এসব বিষয়ে অন্তর্ভেদী সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন। প্রমাণ তত্ত্বের আরেকটি অসম্পূর্ণতা রয়েছে। সেটি হলো 'প্রসারণের আগে কি ছিল?'—এ ধরনের প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য উত্তরদানে অপারগতা। বিশ্বের আদি ব্যতিক্রমী বিন্দুতে সব জ্ঞাত ভৌতবিধিগুলি ভেঙে পড়ে। এর একটা সহজ কারণ হচ্ছে : মহাবিস্ফোরণের 'আগে কি ঘটেছিল' তার সম্পর্কে কোনো তথ্যই এটি দিতে পারে না। স্মর্তব্য যে, তত্ত্ব অসম্পূর্ণ হলেও সম্পূর্ণ ভুল হয়ে যায় না। বর্তমান বিশ্বচিত্রই এখন পর্যন্ত একমাত্র মডেল যা আমাদেরকে একটা মোটামুটি চমৎকার এবং প্রকৃত ভৌতপ্রতিভাসের যথেষ্ট কাছাকাছি একটি চিত্ররূপ দিতে সক্ষম। সেটাই আজকের সার্থকতা ; বিজ্ঞানের সার্থকতা ; মানব-মনীষার পরাকাষ্ঠা ! তাই প্রার্থনা এই যে, কবিগুরুর অনুসরণে বিস্ময়যাত্রী হয়ে অসীমকালে মহাবিশ্ব-ভ্রমণকারীর মহাসঙ্গীত হোক :

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের ভূমিকা

The most incomprehensible thing about the Universe is that it is comprehensible.

Albert Einstein

From my point of view one cannot arrive, by way of theory, at any at least somewhat reliable results in the field of Cosmology, if one makes no use of the principle of General Relativity.

Albert Einstein

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি

১৯০৭ সাল থেকে আইনস্টাইন মহাকর্ষের জন্য একটি নতুন আইনের সন্ধান শুরু করেন যখন *Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik* এর বার্ষিক সংখ্যায় বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের উপর তাঁকে একটি রিভিউ লিখতে বলা হয়। আইনস্টাইন বুঝেছিলেন যে জড়কাঠামোর শক্তিশালী ভিত্তি সত্ত্বেও তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের একটি বড়ো দুর্বলতা হলো ত্বরিত প্রসঙ্গ–কাঠামো সম্পর্কে এটি কিছু বলতে অক্ষম। এটি মহাকর্ষকে অন্তর্ভুক্ত করে না। ঠিক এসময়ে ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসের কোনো একদিন যখন আইনস্টাইন বার্নে তার পেটেন্ট অফিসে অলসভাবে বসেছিলেন, ঠিক তখনই তাঁর মাথায় একটি আকস্মিক চিন্তার উদয় হলো : অবাধে পতনশীল বস্তু কোনো রকম ওজন অনুভব করে না। এই চিন্তনটি ছিল সমগ্র সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের প্রথম বীজ। পরবর্তীতে একে তিনি "আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দরতম চিন্তা" বলে অভিহিত করেছেন। পরবর্তী দিনগুলিতে তিনি এই ধারণাটিকে নিয়ে গভীরতর চিন্তায় মেতে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন : অবাধে পতনশীল বস্তুর প্রসঙ্গ–কাঠামো এবং অভিকর্ষ–মুক্ত বিশ্বের কোনো প্রসঙ্গ–কাঠামো 'সমতুল'. এ ধরনের প্রসঙ্গ–কাঠামোর পদার্থবিজ্ঞান হলো বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের পদার্থবিজ্ঞান। এই ধারণাটি পরে মহীরুহ আকার ধারণ করে 'সমতুল্যতার নীতি' তে উন্নীত হয়। আসলে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের দুটি প্রধান শর্তের একটি হলো 'সমতুল্যতার নীতি' অন্যটি 'সহভেদিতার নীতি'। এ দুটোই পরে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সমতুল্যতার নীতি আবিষ্কারের কিছুদিন পরই আইনস্টাইন আর একটি নতুন ধারণা প্রবর্তন করেন

[illegible] কোনো বস্তুর [illegible] মহাকর্ষীয় [illegible] বস্তুর [illegible] মধ্যে সময় বক্রীভূত হতে [illegible] মহাকর্ষীয় সময় সম্প্রসারণ (gravitational time-dilation) [illegible]

চিত্র ২.১ [illegible]

[illegible] ধারণা দিতে পারে। [illegible] মহাকর্ষীয় সময় সম্প্রসারণ [illegible]

১. [illegible]

২. [illegible]

নিয়ে চিন্তায় মেতে উঠলেন। পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ করতে পারেননি। তাঁকে বিরক্ত আইনস্টাইন মহাকর্ষ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি ভুলে গিয়ে পরমাণুর জগৎ নিয়ে মেতে উঠলেন। অবশ্য এ সংক্রান্ত সমস্যাতে তাঁকে পরে তাঁর তেজস্ক্রিয় পুরস্কার পেতে সাহায্য করেছিল। ইতোমধ্যে তিনি সুইস পেটেন্ট অফিসের কেরানির চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন এবং প্রাগে অধ্যাপনার কাজে পদোন্নতিতে নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯১১ সালের মাঝামাঝি থেকে তিনি পুনরায় মহাকর্ষ নিয়ে মেতে উঠলেন এবং তার অবেক্ষণের ফল পাওয়া গেল ১৯১৫ সালের নভেম্বরে। অবশেষে মহাকর্ষের একটি সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হলো।

১৯১১ থেকে আইনস্টাইন মহাকর্ষীয় জোয়ার বলের (tidal gravitational forces) প্রকৃতি নিয়ে জোর গবেষণা শুরু করেন। প্রতিটি ভারি বস্তুই এই জোয়ার-বল প্রয়োগ করে। যখন কোনো দর্শক অনেক ওপর থেকে পৃথিবীর দিকে অবাধে পতনশীল হয় তখন সে কোনো অভিকর্ষ অনুভব করে না বটে, তবে কিছু পার্শ্বপ্রভাব অনুভব করে। যেমন দর্শকের পা যেহেতু মাথার তুলনায় পৃথিবীর নিকটতর, কাজেই পৃথিবীর অভিকর্ষ দর্শকের পায়ে অধিকতর জোরে আকর্ষণ করে। তাছাড়া যেহেতু অভিকর্ষ কাজ করে পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর, কাজেই দর্শকের ডানপার্শ্ব ও বামপার্শ্ব যথাক্রমে বাম ও ডানদিকে সংকোচন-চাপ অনুভব করবে। ২.২ চিত্রে এসব স্পষ্ট দেখানো হয়েছে। মোটের উপর দর্শকের উপর উল্লম্ব টান (vertical stretches) এবং পার্শ্ব সংকোচন (lateral squeeze) ক্রিয়া করে। এটাই মহাকর্ষীয় জোয়ার বল। আসলে এই জোয়ার বলের উদ্ভব হয় দর্শকের বিভিন্ন অঙ্গ (বা অংশ)-এর উপর অভিকর্ষের অসমান আকর্ষণের দরুন উদ্ভূত লব্ধিবলের জন্য। ঠিক একইভাবে চাঁদ ও সূর্যের অসমান আকর্ষণের দরুন উদ্ভূত লব্ধিবল পৃথিবীতে জোয়ার ভাটার সৃষ্টি করে। লক্ষণীয় যে, আইনস্টাইনের সমতুল্যতার নীতিতে জোয়ার-বল অনুপস্থিত। এর কারণ হলো : যদি প্রসঙ্গ-কাঠামো যথেষ্ট ছোট হয়, যাতে কাঠামোর বিভিন্ন অংশের উপর প্রযুক্ত মহাকর্ষ বল মোটের উপর একই থাকে, তবে কোনো জোয়ার-বলের উদ্ভব হয় না। কিন্তু যদি এমন হয় যে, প্রসঙ্গ কাঠামো এতোটাই বড় যে এর বিভিন্ন অংশের উপর অভিকর্ষ অসমানভাবে প্রযুক্ত হয় তবে একটি সুনির্দিষ্ট জোয়ার বল প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ প্রসঙ্গ কাঠামোসমূহ অভিকর্ষ-মুক্ত স্থানে ততোক্ষণ পর্যন্ত সমতুল থাকে যতোক্ষণ এদের আকৃতি এমন হয় যে এরা জোয়ার-বল অনুভব করে না ; কিন্তু যথেষ্ট বড় প্রসঙ্গ-কাঠামোর জন্যে জোয়ার-বল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই জোয়ার-বলের প্রকৃতি অনুসন্ধান থেকেই আইনস্টাইন তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছান। নিউটনীয় তত্ত্বে জোয়ার-বলের সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় : অভিকর্ষের

অনুযায়ী সকল প্রসঙ্গ-কাঠামো সমান। কোনো একটি কাঠামোকে অপরটির তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া যাবে না।

[illegible]

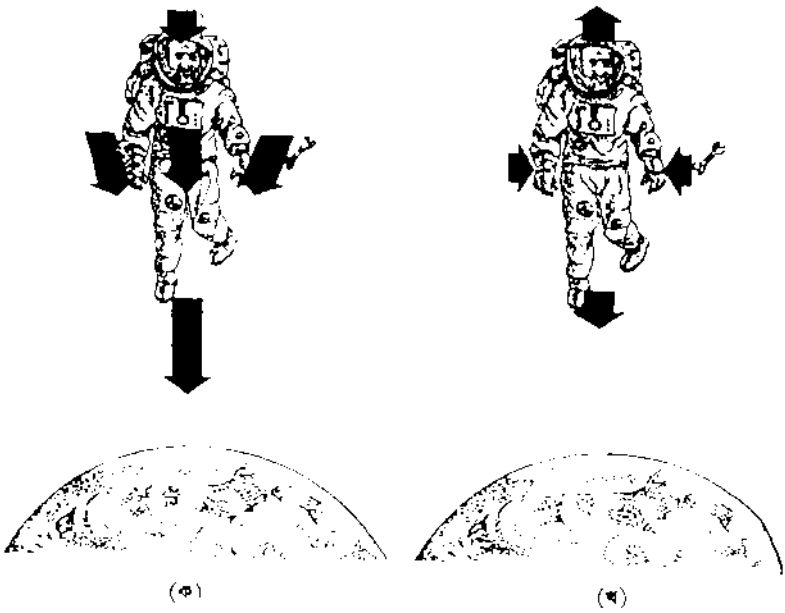
(ক)
(খ)

[illegible]

অনেক সূত্র পান, তিনি আইনস্টাইনকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে আইনস্টাইন যে বক্ররৈখিক স্থানকালের জ্যামিতিক বিবরণ চান তার জন্য প্রয়োজনীয় গাণিতিক সূত্রগুলো বার্নার্ড রিমান (Bernard Riemann) ১৮৬০ সালে, ১৮৬০ সালে গ্রেগরিও রিচি এবং তাঁর ছাত্র তুলিও লেভি চিভিটা ১৮৯০ সালে করে গেছেন। এঁরা এই গাণিতিক পদ্ধতিটির নাম দিয়েছিলেন 'অ্যাবসলিউট ডিফারেন্সিয়াল জিওমেট্রি'। ১৯১৫ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত এর নাম ছিল 'টেন্সর অ্যানালিসিস', এবং ষাটের দশকের পর এর আধুনিকতম সংস্করণ হলো 'ডিফারেন্সিয়াল জিওমেট্রি'। গ্রসম্যান অবশ্য আইনস্টাইনকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে এই ডিফারেন্সিয়াল জিওমেট্রি ব্যাপারটা এতোটাই ঘটমটে যে পদার্থবিজ্ঞানীদের এটা নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়। গ্রসম্যান ও আইনস্টাইন ১৯১২ এর শরৎ পার করে পুরো শীতকালটাই ব্যয় করলেন (তাঁদের কাছে নতুন) এই গণিতের পেছনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা এমন কোনো সমীকরণ নির্ধারণ করতে পারলেন না যা আইনস্টাইনের চিরকাম্য সাধারণ সহভেদিতাকে সমর্থন করে। ঐ বছরই অক্টোবরের শেষের দিকে আর্নল্ড সমারফেল্ডকে (Arnold Sommerfeld) লেখা এক চিঠিতে আইনস্টাইন বলছেন "...কিন্তু এটা নিশ্চিত যে আমার সারা জীবনেও আমি এতো কষ্ট করিনি ...। এই সমস্যার তুলনায় আপেক্ষিক তার মূলতত্ত্ব [বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব] তো ছেলেখেলা মাত্র।" শীতের শেষের দিকে গ্রসম্যান ও আইনস্টাইন তাঁদের অসম্পূর্ণ তত্ত্ব প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করলেন, যদিও তখনো আইনস্টাইন আশা ত্যাগ করেননি।

১৯১৪ সালে আইনস্টাইন ETH ছেড়ে বার্লিনে প্রফেসরের পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৫ সালের জুন মাসে আইনস্টাইন ডেভিড হিলবার্টের আমন্ত্রণে এক সপ্তাহের জন্য গটিংগেন গমন করেন। এখানে তিনি বেশ কয়েকটি বক্তৃতাও প্রদান করেন। হিলবার্ট সম্পর্কে আইনস্টাইনের উক্তি "... হিলবার্টের ব্যাপারে আমি সত্যিই মুগ্ধ।" এরপর তিনি আবার বার্লিন ফিরে আসেন। এখানে এসে তিনি গ্রসম্যান আইনস্টাইন তত্ত্বে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি খুঁজে পান। তিনি দেখতে পেলেন যে তাঁদের সমীকরণ সাধারণ সহভেদিতা (অর্থাৎ যেকোনো প্রসঙ্গ-কাঠামোয় মহাকর্ষের প্রকৃতি অভিন্ন থাকবে) তো প্রকাশই করে না বরং বুধগ্রহের অনুসূরবিন্দুর অগ্রগমনের (perihelion shift of Mercury) একটি ভুল মান প্রদান করে। অবশেষে ১১ই নভেম্বর তিনি তাঁদের যৌথ তত্ত্বের একটি সংশোধিত রূপ প্রকাশ করেন। এই নতুন রূপটি বুধগ্রহের অনুসূরবিন্দুর অগ্রগমনের সঠিক মান প্রদান করে এবং দেখায় যে সূর্যের ঠিক কিনার দিয়ে গমনকারী নক্ষত্রের আলো ১.৭ সেকেন্ড পরিমাণ বিচ্যুত হয়। যদিও তখনো তাঁর সমীকরণ সাধারণভাবে সহভেদী নয়, তথাপি তিনি ১৮ই নভেম্বর বার্লিনের 'প্রুশিয়ান একাডেমী অব সায়েন্সেজ'-এ এই সংশোধিত রূপটি প্রকাশ করেন। পরবর্তী সপ্তাহে আইনস্টাইন আবারো বসলেন তাঁদের সমীকরণ নিয়ে। অবশেষে তাঁরা একটি ভুল খুঁজে পাবার পর তিনি পেলেন তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত তত্ত্ব। জন্ম নিলো সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব। যে তত্ত্ব তার সাধারণ সহভেদিতা এবং সমতুল্যতার নীতি অন্তর্ভুক্ত করে; যে নীতি মহাকর্ষীয় সময় সংকোচনের ব্যাখ্যা দেয় এবং যে নীতি অনুযায়ী মহাকর্ষ স্থানীয়ভাবে জোয়ার-বলের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ বছরই ২৫শে নভেম্বর প্রুশিয়ান

এর তুলনায় আইনস্টাইন তাঁর সম্পূর্ণ তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। এবং অনুভূতিকে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে আইনস্টাইন যারপরনাই অসুবিধায় হয়েছিলেন। পরবর্তীতে সমারফেল্ড ও পল এরেনফেস্টকে লেখা চিঠিতে তাঁর অন্তর্গত উদ্বেগ ব্যক্ত করেছিলেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯১৫ সালের শুরুতে গটিঙ্গেনের ডেভিড হিলবার্ট আইনস্টাইনের অনুরূপ একটি ক্ষেত্র সমীকরণ নির্ধারণ করেছিলেন। হিলবার্ট ব্যবহৃত অনুসৃত পদ্ধতিকে নির্ধারণ আইনস্টাইনের trial and error থেকে ভিন্ন অধিক তর সঙ্গত ও যৌক্তিক ভাবে সম্পূর্ণ। গটিঙ্গেন রয়েল একাডেমী অব সায়েন্সেসে ২০শে নভেম্বর, ১৯১৫ ও হিলবার্ট তাঁর সমীকরণ নির্ধারণ প্রকাশ করেন। হিলবার্টের পদ্ধতির গাণিতিক উৎকর্ষ সত্ত্বেও তাঁর সমীকরণটির নামকরণ করা হয় আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণ। কারণ এর পূর্বে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ভিন্ন আইনস্টাইনের সমতুল দেশ, সময়ের সহাবস্থিতা এবং বক্র স্থানকালের ধারণা। মাঝ বর্ষে তাঁর হিলবার্টের অবদান এবং ১৯০৭ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত মহাকর্ষের সাধারণতত্ত্ব প্রণয়নের জন্য চিন্তা ভাবনা যে অসাধারণ বিপুল সংগঠিত হয়েছিল তার বিশদ বর্ণনার জন্য দেখুন ডি. মেহরা রচিত 'আইনস্টাইন, হিলবার্ট এন্ড দ্য থিওরি অব গ্রাভিটেশন' (in Mehra 1973) দেখা যেতে পারে

২.২ বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা থেকেই সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের জন্ম। বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব জড় প্রসঙ্গ কাঠামোকে বড় বেশি গুরুত্ব দেয়। যে প্রসঙ্গ কাঠামোয় পদার্থবিজ্ঞানের বিধিসমূহ একই থাকে তারাই জড় প্রসঙ্গ-কাঠামো। এ ধরনের প্রসঙ্গ-কাঠামো পরস্পরের সাপেক্ষে সমবেগসম্পন্ন (ত্বরণ শূন্য) হয়ে থাকে। নিউটনের সময় থেকেই এই জড় প্রসঙ্গ কাঠামোর প্রচলন হয়েছে। কারণ সকল জড় প্রসঙ্গ-কাঠামোই (inertial reference system) নিউটনীয় গতিসূত্রসমূহ অপরিবর্তিত থাকে। বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রবর্তনের পরে এক প্রসঙ্গ-কাঠামো থেকে অন্য প্রসঙ্গ-কাঠামোয় যেতে হলে গ্যালিলীয় রূপান্তর ব্যবহার করা হতো। দুটি জড় প্রসঙ্গ-কাঠামো K ও K' বিবেচনা করা যাক যেখানে K' কাঠামো K এর সাপেক্ষে x অক্ষ বরাবর v বেগে গতিশীল। তবে K ও K' কাঠামোর সম্পর্ক হবে :

$$
\begin{aligned}
x' &= x - vt \\
y' &= y \\
z' &= z \\
t' &= t
\end{aligned}
\qquad (২.২.১)
$$

এই রূপান্তর আইনের বৈশিষ্ট্য হলো সময় এখানে পরম ধ্রুবক। কিন্তু বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বে দুটি জড় কাঠামোর ভেতর রূপান্তর করা হয় লোরেন্স রূপান্তর আইনের সাহায্যে যেখানে K ও K' কাঠামোর মধ্যে সম্পর্ক হলো :

$$
\begin{aligned}
x^{0'} &= \gamma(x^0 - \beta x^1) \\
x^{1'} &= \gamma(x^1 - \beta x^0) \quad \text{বিশেষ লোরেন্স রূপান্তর} \qquad (২.২.২) \\
x^2 &= x^2 \\
x^{3'} &= x^3
\end{aligned}
$$

এখানে $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ এবং $\beta = v/c$। পচলিত স্থানাঙ্কে লিখলে $x^0 = ct$, $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$। যদি এর পরিবেগ আলোর তুলনায় অতি নগণ্য হয় (অর্থাৎ $v/c \ll 1$ হয়) তবে সমীকরণ ২.২.২ সমীকরণ ২.২.১-এ পর্যবসিত হয়। সমীকরণ (২.২.২) এ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে 'সময়' একটি আপেক্ষিক রাশি। এই রাশি জড়-কাঠামোর (গতির) উপর নির্ভরশীল। এভাবে ত্রিমাত্রিক স্থানের সাথে সময়কে জুড়ে দিয়ে চতুর্মাত্রিক স্থানকাল নিরবিচ্ছিন্ন (space time continuum) কথা কল্পনা করা হলো। হেরম্যান মিনকোওস্কির ভাষায় :

> *"The views of space and time...have sprung from the soil of experimental physics, and therein lies their strength. They are radical. Henceforth, space by itself, and time by itself, are doomed to fade away into mere shadows, and only a kind of union of the two will preserve an independent reality."*

বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের চতুর্মাত্রিক স্থানের জ্যামিতির প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় মিনকোওস্কির জ্যামিতি থেকে। আমাদের জগৎ স্থানীয়ভাবে মিনকোওস্কির সমতল জগৎ। লোরেন্স রূপান্তরকে (সমীকরণ ২.২.২) চতুর্মাত্রায় ঘূর্ণন হিসেবে দেখানো যায়। অর্থাৎ বিশেষ লোরেন্স রূপান্তরকে লেখা যায় :

$$
\begin{aligned}
x^{0'} &= \cosh\varphi\, x^0 + \sinh\varphi\, x^1 \\
x^{1'} &= \sinh\varphi\, x^0 + \cosh\varphi\, x^1 \qquad (২.২.৩) \\
x^{2'} &= x^2 \\
x^{3'} &= x^3
\end{aligned}
$$

এটি x^0-x^1 তলে φ কোণে ঘূর্ণনমাত্র এবং $\tanh\varphi = -v/c$।[৩]

বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বে সকল জড়-কাঠামোর ভৌতবিধিসমূহ একই থাকে। প্রশ্ন করা যেতে পারে, জড়-কাঠামোকে কেন এতো প্রাধান্য দিতে হবে? এর উত্তর রয়েছে সাধারণ স্থানাঙ্ক রূপান্তরের ধারণায় যা আইনস্টাইন প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। সাধারণ স্থানাঙ্ক রূপান্তর থেকেই সাধারণ সহভেদিতার ধারণা আসে। যেকোনো সমীকরণকে সাধারণভাবে

---

৩. যদি $x^4 = iv^0 = ict$ লেখা হয় তবে বলতে হবে x^1-x^4 তলে অবাস্তব কোণ ($i\varphi$)-এ অক্ষদ্বয়ের ঘূর্ণন সংজ্ঞায়িত হয়। সূত্রটা যে $\cosh\varphi = \cos i\varphi$ এবং $\sinh\varphi = -i\sin i\varphi$।

সহভেদিতার সম্ভব। আইনস্টাইনের সাধারণ সহভেদিতার নীতি অধিকতর তাৎপর্যময় এবং এখানে মহাকর্ষ একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা অধিকার করে আছে। সহজ ভাষায় বললে দাঁড়ায়, যদি সমীকরণ কোনো মহাকর্ষ অভিকর্ষের উপস্থিতিতে সত্য হয়, তবে সহভেদিতার নীতি অনুযায়ী সে সমীকরণ অভিকর্ষের অনুপস্থিতিতেও সত্য হবে। যেকোনো সমীকরণকে যেমন সহভেদিতার নীতি অনুযায়ী যেকোনো সমীকরণকে লোরেন্ত্স উপরিবর্তী (Lorentz invariant) করা যায়।

মহাকর্ষের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ তত্ত্ব প্রণয়ন করতে হলে, যাতে সমতুলতার নীতিও অন্তর্ভুক্ত থাকে, তত্ত্ব প্রসঙ্গ কাঠামোর অভ্যন্তরে আমাদেরকে চলন করতে হবে। বাস্তবিক পক্ষে তত্ত্ব মহাকর্ষসমূহ এমনই যে তা সকল প্রসঙ্গ কাঠামোতেই উপযোগী হয়। এটা কিভাবে করা সম্ভব? যেহেতু আমরা সবসময়েই প্রসঙ্গ কাঠামোকে স্থানাংক ব্যবস্থার সাহায্যে বিশেষিত করে থাকি, সেজন্য লোরেন্ত্স স্থানাংক ব্যবস্থা দিয়ে উপস্থাপন করে থাকি, কাজেই ব্যাপকতর তত্ত্বের ভিত্তিতে আমাদের লোরেন্ত্স স্থানাংক ব্যবস্থার উল্লেখ নেতে হবে। মনে রাখতে হবে, রূপান্তর সহজ সমৃদ্ধ কোনো রৈখিক রূপান্তর আইন এক্ষেত্রে খাটবে না। কারণ এতে প্রসঙ্গ কাঠামোদের রূপান্তর আইন কখনোই রৈখিক হবে না। কাজেই আমাদের সহজাত পছন্দ হচ্ছে এমন এক দল অবিচ্ছিন্ন, অন্তরকলনযোগ্য স্থানাংক রূপান্তর আইন (continuous, differentiable coordinate transformation) যাদের জেকোবিয়ান (Jacobian) ধনাত্মক। এতগুলোই মহাকর্ষের ব্যাপকতর আইনকে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব বলা হয়।

১.৩ সাধারণ সহভেদিতা (principle of covariance)

চতুর্মাত্রিক স্থানে বক্ররৈখিক স্থানাংক ব্যবস্থা (curvilinear coordinate system) প্রবর্তন সম্ভব। ভেক্টর ও টেন্সর ক্যালকুলাসের সকল রাশিকেই বক্ররৈখিক অক্ষাংশে এবং অভিলম্বিক কার্তেসীয় স্থানাংকেও প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যদি বক্ররৈখিক স্থানাংক এবং যেকোনো ইচ্ছামূলক রূপান্তর আইন প্রয়োগ করা হয় তবে শেষ কয়েকটি টেন্সর সমীকরণের প্রয়োজনে মৌলিক টেন্সরের (g_{ij}) সংজ্ঞা করতে হয় যার উপাংশগুলি প্রত্যেকে স্থানাংকের অপেক্ষক। কাজেই চতুর্মাত্রিক স্থানে যদিও যেকোনো জ্যামিতিক সম্পর্ককে বক্ররৈখিক স্থানাংকে প্রকাশ করা সম্ভব, তথাপি এক্ষেত্রে কার্তেসীয় স্থানাংক ব্যবহৃত হয় অন্তত সরলতার খাতিরে। চতুর্মাত্রিক স্থানে কার্তেসীয় স্থানাংক এবং অভিলম্বিক (orthogonal) স্থানাংক রূপান্তর করতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে টেন্সর রাশিমালার একটি সীমাবদ্ধ (restricted) ক্যালকুলাস সম্ভব, এবং সীমাবদ্ধ টেন্সর ক্যালকুলাস সাধারণ সূত্রায়নের তুলনায় অনেক কম সংখ্যক মৌলিক ধারণাসমৃদ্ধ। কিন্তু রিমান স্থানে কার্তেসীয় স্থানাংকের প্রবেশ নিষেধ। এক্ষেত্রে কেবলই সাধারণ সূত্রায়ন সম্ভব যা সাধারণ স্থানাংক রূপান্তর আইনের সাথে সহভেদী (covariant) অন্তর্ভুক্ত করে।

মহাকর্ষের সাধারণ তত্ত্বে একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। চারমাত্রার জগতে বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বকে বক্ররৈখিক স্থানাংক ও সাধারণ রূপান্তর আইন দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে এমন স্থানাংক পছন্দ করা সম্ভব যেখানে মেট্রিক টেন্সরের উপাংশগুলির মান ধ্রুব হয়ে যায় (η_{ij}) এবং এফিন সংযোগের (affine connection) উপাংশগুলি শূন্য হয়ে যায়। একই প্রকৃতির এক স্থানাংক থেকে অন্যের স্থানাংকে রূপান্তরের সাথে সহভেদী কোনো রূপরেখায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এমন কোনো জ্যামিতিক ধারণার প্রয়োজন নেই যা সাধারণ রূপান্তর আইনের সাথে সহভেদী। যে স্থানাংকে মেট্রিক টেন্সরের উপাংশগুলির মান ধ্রুব থাকে (η_{ij}) সেটাই জড়-কাঠামো এবং এ সংক্রান্ত রূপান্তর আইনটি লোরেন্স রূপান্তর আইন। সকল প্রসঙ্গ-কাঠামোর সমতুল্যতা দাবি করে যে সকল স্থানাংক ব্যবস্থাও সমতুল। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে পছন্দকৃত লোরেন্স স্থানাংক প্রয়োগই করা যায় না। কাজেই আমরা একটি চতুর্মাত্রিক মিনকোওস্কি স্থানকে তখনই রিমানীয় বলব যখন লোরেন্সীয় স্থানাংক প্রয়োগ করা অসম্ভব হয় পড়ে। রিমান স্থানে টেন্সরের উপাংশগুলি সকল স্থানাংক ব্যবস্থায় স্থানাংকের পরিবর্তনশীল অপেক্ষক হয়ে যায়; লোরেন্স রূপান্তরে সীমাবদ্ধতা আনলেই সহজ গাণিতিক প্রকাশ সম্ভব হয় না। কাজেই সাধারণ সহভেদিতার বক্তব্য হলো: সাধারণ রূপান্তর আইনের সাথে সহভেদী কোনো রূপরেখাই (formalism) ভৌতস্থানের জ্যামিতিকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম এবং কোনো কম-মাত্রার সাধারণ রূপান্তর আইনকে (less general group of transformation) সীমাবদ্ধ করলেই রূপরেখা সহজ হয় না। এটা সমতুল্য তার নীতিরই ব্যাপকতর পটভূমিতে গাণিতিক প্রকাশ।

"বাস্তবিকপক্ষে স্থানীয় লোরেন্স প্রসঙ্গ-কাঠামোর পদার্থবিজ্ঞান আর স্থানকালের বেশ বড়ো অংশ যেমন পৃথিবী বা সূর্যের চারদিকের মহাকাশে পদার্থবিজ্ঞানে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে"। নিউটনীয় গতিসমীকরণসমূহ ইউক্লিডীয় প্রসঙ্গ- কাঠামোর প্রেক্ষিতে সূত্রায়িত — যে কাঠামো সর্বব্যাপী ব্যাপ্ত এক পরম সত্তা। এই পরমস্থানে মহাকর্ষ একটি 'বহিরাগত প্রভাব' যা জ্যামিতির ব্যাখ্যার অতীত। কিন্তু আইনস্টাইনের বক্তব্য হলো মহাকর্ষীয় প্রভাব উদ্ভূত হয় তখনই যখন বস্তু স্থানকালে বক্রতার সৃষ্টি করে। মহাশূন্যযানে চড়লেই বোঝা যায় অভিকর্ষ শূন্যতা। তাই বলা যায়, "স্থানীয়ভাবে পদার্থবিজ্ঞান অভিকর্ষ মুক্ত"। যেকোনো জড়কাঠামোয় মুক্তবস্তু সুষমগতিতে সরলরেখায় চলে। অর্থাৎ এধরনের জড় কাঠামোয় পদার্থবিজ্ঞান সহজ রূপ নেয়। কিন্তু এ ধরনের জড় কাঠামো স্থানকালের ক্ষুদ্র অংশেই নেওয়া সম্ভব। তাই জড়-কাঠামোর সংজ্ঞায় 'স্থানীয়' শব্দটি যোগ করা হয়। স্থানকালের ক্ষুদ্র অংশে বিদ্যমান এ ধরনের জড় কাঠামোয় জ্যামিতি সমতল ইউক্লিডীয়। কাজেই বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব বা লোরেন্সীয় রূপান্তর আইন স্থানকালের ক্ষুদ্র 'স্থানীয়' অংশেই প্রযোজ্য। মহাকর্ষের উদ্ভব তখনই হয় যখন নিকটবর্তী দুটো ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে স্থানকালের বক্রতার জন্য পার্থক্যের সৃষ্টি হয়।

২.৪ সমতুল্যতার নীতি (Principle of Equivalence)

চিরায়ত বলবিজ্ঞানে কোনো বস্তুর প্রাথমিক গতিসমীকরণ হলো :

$$m_i a = f_{i,a} \qquad (২.৪.১)$$

(কেবল x অক্ষ বরাবর গতি বিবেচ্য)। এই অত্যন্ত সহজ সমীকরণটির বক্তব্য হলো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল তার ত্বরণের সমানুপাতিক। যখনই কোনো স্থিরবস্তুকে বল প্রয়োগে গতিশীল করার চেষ্টা করা হয় তখনই তা বাধা দেয়। এই বাধার কারণ বস্তুর জড়তা (inertia)। আবার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অধীন কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত মহাকর্ষীয় বল তার ভরের সমানুপাতিক :

$$f_g = G\frac{m_g M}{r^2} \qquad (২.৪.২)$$

সমীকরণ (২.৪.২) এর একটি সাধারণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ ফল হলো এই যে, বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল জানা থাকলে তার ভর m_g পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ বস্তুটিকে ওজন করে (স্প্রিং নিক্তির সাহায্যে) আমরা এর মহাকর্ষীয় ভর m_g পরিমাপ করতে পারি। প্রশ্ন হলো, এই দুই পদ্ধতিতে কি বস্তুর একই ধর্ম (অর্থাৎ একই ভর) পরিমাপ করা যায়? অর্থাৎ জড়-ভর m_i ও মহাকর্ষীয় ভর m_g কি অভিন্ন? লক্ষণীয় যে, 'ভর' শব্দটি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরীক্ষণ পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয়েছে। চিরায়ত বলবিজ্ঞানে m_i ও m_g এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক দাবি করা হয়নি।

উদাহরণস্বরূপ আমরা একটি ছোট পরীক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারি। একটি অনুভূমিক ঘর্ষণহীন তলের উপর নিশ্চল কোনো বস্তুকে যদি ঠেলা দেওয়া হয় তবে লক্ষ্য করা যায় যে একে গতি প্রদান করতে হলে কিছু শক্তি ব্যয় করতে হয়। প্রাথমিকভাবে বস্তুটি স্থির অবস্থাতেই থাকতে চায় এবং গতিশীল হলে গতিশীল অবস্থাতে থেকে যেতে যায়। একই ভৌত অবস্থায় থেকে যাওয়ার এই প্রবণতা বস্তুর জড়তার জন্য হয়ে থাকে। এই পুরো পরীক্ষণ-ব্যবস্থায় অভিকর্ষের কোনো প্রভাবই নেই। অভিকর্ষ মুক্ত স্থানে বস্তুটিকে ত্বরিত করতে কিছু শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ভরের কারণেই বস্তুর গতি পরিবর্তনের জন্য এই বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এবার একটি পৃথক পরিবেশে ঐ একই বস্তু নিয়ে আরেকটি পরীক্ষা করা যেতে পারে যাতে অভিকর্ষের প্রভাব চলে আসে। ভূমি থেকে কিছু উপরে বস্তুটিকে ধরে রাখা যেতে পারে। এভাবে শূন্যে নিশ্চল অবস্থায় রাখার জন্য বস্তুটির উপর শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। এই বলের মান বস্তু ও পৃথিবীর মধ্যকার মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বলের সমান। এই দ্বিতীয় পরীক্ষণ-ব্যবস্থায় বস্তুর জড়তার কোনো ভূমিকাই নেই। বস্তুটিকে যদি স্বেচ্ছ ছেড়ে দেওয়া হয় তবে বস্তুটি অভিকর্ষের অধীনে মুক্তভাবে পতিত হয়ে এক ত্বরিত গতিতে ভূমিতে পড়ে। তাহলে m_i ও m_g এর পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্তে আসা যায়?

ধরা যাক দুটি বস্তু A ও B, যাদের মহাকর্ষীয় ভর m_{gA} ও m_{gB}, এর উপর তৃতীয় একটি বস্তু C, যার মহাকর্ষীয় ভর m_{gC}, ক্রিয়া করে। যদি C উভয় বস্তু থেকে একই দূরত্বে (r) থাকে তবে,

$$f_{AC} = G\frac{m_{gA}\,m_{gC}}{r^2},\quad f_{BC} = G\frac{m_{gB}\,m_{gC}}{r^2}$$

এবং
$$\frac{f_{AC}}{f_{BC}} = \frac{m_{gA}}{m_{gB}}$$

যদি তৃতীয় বস্তুটি পৃথিবী হয় তাহলে উপরের অনুপাত আসলে বস্তুদ্বয়ের ওজনের অনুপাত নির্দেশ করে :

$$\frac{W_A}{W_B} = \frac{m_{gA}}{m_{gB}} \qquad (২.৪.৩)$$

অর্থাৎ পৃথিবীর একই স্থানে বিভিন্ন বস্তুর ওজন তাদের মহাকর্ষীয় ভরের সমানুপাতিক। এবার আমরা A ও B বস্তু দুটিকে একটি প্রদত্ত স্থান থেকে ভূমিতে অবাধে পড়তে দিই এবং তাদের ত্বরণ পরিমাপ করি। দেখা যাবে, ভিন্ন ভিন্ন জড়ভরের বস্তুসমূহ একই ত্বরণে (g) ভূমিতে পতিত হয়। এদের উপর পৃথিবীর টানই এদের ওজন :

$$W_A = m_{iA}\cdot g,\quad W_B = m_{iB}\cdot g$$

এবং একইভাবে
$$\frac{W_A}{W_B} = \frac{m_{iA}}{m_{iB}} \qquad (২.৪.৪)$$

কাজেই একইস্থানে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুর ওজন তাদের জড়-ভরের সমানুপাতিক। সুতরাং সিদ্ধান্তে আসা যায় যে জড় ভর ও মহাকর্ষীয় ভর অন্তত সমানুপাতিক। বিভিন্ন সময়ে নিউটন, ইয়োৎভস (১৯০৬) ও ডিকি (১৯৬৪) দেখিয়েছেন যে, জড়ভর ও মহাকর্ষীয় বল অভিন্ন এবং সমান জড়ভরের বস্তু সর্বদা সমান মহাকর্ষীয় বল অনুভব করে (১০-১২ সূক্ষ্মতায়)।

বস্তুর জড়ভর ও মহাকর্ষীয় ভরের এই সমতুল্যতাকে চিরায়ত বলবিজ্ঞানে সচরাচর তাৎপর্যহীন অথচ আকস্মিক ব্যাখ্যাহীন একটি ফলাফল হিসেবে দেখা দেয়। আইনস্টাইন এই ফলকে প্রাপ্য গুরুত্ব দান করলেন। সমতুল্যতার নীতির সহজাত সিদ্ধান্তে হলো এই যে, মহাকর্ষকে স্থানীয়ভাবে বিলোপ করে দেয়া যায়। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত 'লিফট পরীক্ষা' উদ্ভাবন করেন। এই লিফট পরীক্ষা থেকে জড় ও অজড় কাঠামোর সমতুল্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমতুল্যতার নীতির মূল বক্তব্য হলো এই যে, একটি সুষম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অধীনে বিদ্যমান কোনো ত্বরণহীন জড়কাঠামো (K) এবং কোনো জড় কাঠামোর সাপেক্ষে সুষমভাবে ত্বরিত (মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রবিহীন) কোনো প্রসঙ্গ কাঠামো (K') প্রকৃতপক্ষে সমতুল্য। এবার এমন একটি মহাশূন্যযান কল্পনা করা যাক যা একটি জড়-কাঠামো Kতে নিশ্চল অবস্থায় আছে। ধরা যাক, এটি ভূপৃষ্ঠে আছে। মহাশূন্যযানের

মহাশূন্যযানের ভেতরে একটি বল ওপর দিকে ছুঁড়ে দিলে দেখা যাবে কিছুদূর ওপরে ওঠার পর তা মহাকর্ষীয় ত্বরণ g সহকারে নিচে পড়ছে। এখন যদি মহাশূন্যযানকে এমন অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে K কাঠামোর সাপেক্ষে এর ত্বরণ $a = -g$ অর্থাৎ পৃথিবী থেকে দূরে $a = g$ ত্বরণে এটি পৃথিবীর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রভাবের বাইরে চলে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় মহাশূন্যযানের ভেতরকার কোনো দর্শক যদি তার হাতের বলটি ওপর দিকে ছুঁড়ে দেয় তবে দেখবে যে বলটি পূর্বের মতোই g ত্বরণে মহাশূন্যযানের ভূমিতে পড়ছে। বস্তুত যদি মহাশূন্যযানের ভেতরের দর্শকের জ্ঞান থাকে যে উপরস্থ স্থির K কাঠামোয় নাকি a ত্বরণে মহাশূন্যে ছুটে চলছে K' কাঠামোয়, তবে কোনো ভৌত পরীক্ষা থেকেই দর্শকের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে K কাঠামোতে নাকি K' কাঠামোতে রয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান এ দুটি কাঠামোতে একই আচরণ করে অর্থাৎ কোনো জড় কাঠামোর সাপেক্ষে ত্বরণ কিন্তু মহাকর্ষীয় প্রভাবশূন্য এবং ত্বরণীয় মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র যথাযথ ভাবে সমতুল্য। "সুতরাং বলা যায় যে স্থানীয় ভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি রূপান্তর করে অদৃশ্য করে দেওয়া যায়।"[৪]

মহাশূন্যযানের স্থলে একটি লিফট কল্পনা করলে আইনস্টাইনের মূল পরীক্ষাটির বর্ণনা পাওয়া যায়। আইনস্টাইনের লিফট পরীক্ষার একটি চমৎকার, সহজ বর্ণনার জন্য অ্যালেবার্ট আইনস্টাইন ও লিওপোল্ড ইনফেল্ড রচিত 'দ্য ইভোলিউশন অফ ফিজিক্স' বইটি দেখা যেতে পারে।

১.৫ আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব

সাধারণ আপেক্ষিকতাত্ত্ব আসলে একটি মৌলিক তত্ত্ব। এখানে দিশা ও সময়ের ব্যবধানের পার্থক্য পরিমাপের একককে (অর্থাৎ দিশার একক বা ঘড়ির) উপর নির্ভর করে না। এদের সংজ্ঞা ও আচরণ ব্যাখ্যা করে মৌলিক টেন্সরের একটি ক্ষেত্র। স্থানীয়ভাবে বিশেষ আপেক্ষিকতাত্ত্বের জগৎ হলো চতুর্মাত্রিক মিনকোভস্কির জগৎ। এখানে দুটি ঘটনার সময়ের পার্থক্য dt হলে এবং এদের স্থানিক দূরত্ব dx, dy ও dz হলে তিনটি দূরত্বের ব্যবধান পাওয়া যায় সমীকরণ ১.৫.৩ থেকে। সময় ও স্থানের স্থানাঙ্কের মধ্যে ঋণাত্মক চিহ্নের জন্য মিনকোভস্কি জগৎ ইউক্লিডীয় নয়— অর্থাৎ-ইউক্লিডীয়।

সাধারণ আপেক্ষিকতাত্ত্বে এই অর্থাৎ-ইউক্লিডীয় মিনকোভস্কি জগৎ কেবল স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। কেবল আমাদের ক্ষুদ্র পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ। সেজন্যেই মিনকোভস্কি জগতে লোরেন্স রূপান্তরের অধীনে আপেক্ষিকতাত্ত্বিক বিশেষ— এটি সবরকম নয়, কেবল বিশ্বের সামগ্রিক তত্ত্বে এটি প্রযোজ্য নয়। অন্যথায় তার অর্থ হবে মহাকর্ষের সম্পূর্ণ বিলোপ। কিন্তু তা কাম্যও নয়, বাস্তবসম্মতও নয়। তাই স্থানীয় মিনকোভস্কি জগৎকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে যাতে "স্থানীয় ভাবে আমরা

৪. এরকমই নিউটন ও আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গি। একটি প্রবিত্ত প্রসঙ্গ কাঠামো কি করে মহাকর্ষ অনুভব করে— সে প্রশ্নের উত্তরে নিউটন বলেছিলেন তারা 'নিরপেক্ষ', কিন্তু আইনস্টাইনের উত্তর 'স্থানীয়ভাবে'।

মিনকোওস্কি জগতে থাকতে পারি কিন্তু সর্বত্র একই সাথে নয়। অর্থাৎ এমন এক জ্যামিতি প্রয়োজন যা স্থানীয়ভাবে মিনকোওস্কি জ্যামিতিতে পর্যবসিত হয় কিন্তু বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে যা সর্বাপেক্ষা সাধারণ এবং ব্যাপক"। রিমানীয় জ্যামিতির রয়েছে ঠিক এই প্রার্থিত গুণ। রিমান জ্যামিতিতে স্থানকাল বক্র। এখানেই আমাদের অভ্যস্ত চিরাচরিত চিন্তাভাবনা থমকে দাঁড়ায়। এবার আমরা সংক্ষেপে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির উপর আলোচনা করব।

অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি (Non-Euclidean Geometry) : ইউক্লিডীয় জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের উপর এসব জ্যামিতি নির্ভর করে না। আসলে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সব থেকে আপত্তিকর বিষয় হলো এর পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধ যাকে এভাবেও বলা যায় :

কোনো প্রদত্ত রেখার বাইরের কোনো বিন্দু দিয়ে ঐ রেখার সমান্তরাল একটি রেখাই আঁকা যায়।

অধিকাংশ গণিতবিদদের কাছে এই স্বতঃসিদ্ধটিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয়নি এবং অনেকেই অপর চারটি স্বতঃসিদ্ধ থেকে এই পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধটিকে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। এই স্বতঃসিদ্ধটিকে প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা গণিতশাস্ত্রের একটা বিরাট বিজয় কারণ এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি। প্রায় ২০০০ বছরের এই দীর্ঘ পরিক্রমায় যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন : টলেমী (১৬৬), প্রোক্লাস (৪০০-৪৮৫), নাসিরউদ্দীন তুসী (১৩শ শতাব্দী), লোভ গাসন (১২৮৮--১৩৪৪), জি. ভিটালি (১৬৩৩-১৬২৬), জি. সাকেরি (১৬৬৭-১৭৩৩), ল্যাম্বার্ট (১৭২৮-১৭৭৭), লেজেন্ডার (১৭৫২–১৮৩৩) প্রমুখ। অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি যে যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব তা প্রথম স্বীকার করেন কার্ল ফ্রিডরিখ গাউস ১৮২৪ সালে, কিন্তু তিনি এতৎসংক্রান্ত গবেষণাপত্র কখনো প্রকাশ করেননি এবং এ নিয়ে অধিক গবেষণাও আর করেননি। দেখা গেল যে পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধকে প্রমাণ করা যায় না তবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর স্বতঃসিদ্ধ দিয়েও সঙ্গতিপূর্ণ জ্যামিতি গঠন সম্ভব।

১৮২৬ ও ১৮২৯ এর মধ্যে লোবাচেভস্কি এ রকম একটি জ্যামিতি গড়ে তুললেন যেখানে কোনো প্রদত্ত রেখার বহিঃস্থ কোনো বিন্দু দিয়ে ঐ রেখার সমান্তরাল একাধিক রেখা আঁকা যায়। ১৮২৯ সালে জানোস বোলাই একই রকম গাণিতিক জ্যামিতি গঠন করলেন যেখানে ঐ বহিঃস্থ বিন্দু দিয়ে অসীম সংখ্যক রেখা আঁকা সম্ভব। গাউস, বোলাই ও লোবাচেভস্কি স্বাধীনভাবে যা আবিষ্কার করেছিলেন তাহলো 'ঋণাত্মক বক্রতাবিশিষ্ট হিমাত্রিক জগৎ'। এই নতুন জ্যামিতিতে কোনো অভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্য নেই। গাউসই প্রথম এই নতুন জ্যামিতির অন্তর্নিহিত মূল সূত্রটি খুঁজে পান। স্থানের বর্ণনা যদি জ্যামিতির উদ্দেশ্য হয় তবে যেকোনো তলের বর্ণনায় তার অভ্যন্তরীণ গুণ ও বাহ্যিক গুণের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বিস্তৃত স্থানের মধ্যে কোনো বিশেষ তলের অন্তর্ভুক্তি প্রকাশ করা হয় তার বাহ্যিক গুণ দিয়ে। কিন্তু ঐ তলের উপর থেকে ঐ তলকে কিরকম দেখাবে তা নির্ভর করে তলের অভ্যন্তরীণ গুণের উপর। গাউস দেখিয়েছিলেন যে ঐ অভ্যন্তরীণ গুণ আবিষ্কার করাই জ্যামিতির আসল কাজ।

দ্বিমাত্রিক জগতে গাউস এবং অন্যান্যের এ ধরনের প্রচেষ্টার সার্থকতা স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য গণিতজ্ঞদের ত্রিমাত্রিক জগতের জন্য এ ধরনের বিকল্প জ্যামিতি উদ্ভাবনের প্রেরণা দিয়েছে। ১৮৫৪ সালে জি. রিমান টেন্সর ক্যালকুলাস প্রয়োগ করে এ সমস্যার সমাধান করেন। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে রিমান যে বক্রতা টেন্সর (curvature tensor) নির্ধারণ করেন তার নাম রিমান-ক্রিস্টোফেল বক্রতা টেন্সর। রিমানের প্রস্তাবিত স্বতঃসিদ্ধ অনুযায়ী কোনো প্রদত্ত রেখার বহিঃস্থ কোনো বিন্দু দিয়ে ঐ রেখার সমান্তরাল কোনো রেখাই অঙ্কন করা যায় না। রিমানের এই জ্যামিতি elliptical geometry নামে পরিচিত এবং এখানে 'সমতল' বক্র বা গোলকের পৃষ্ঠের অনুরূপ, ফলে ত্রিভুজের তিনকোণের সমষ্টি ১৮০° এর চেয়ে বেশি হয়। অন্যদিকে লোবাচেভস্কি ও বোলাইয়ের জ্যামিতি hyperbolic geometry নামে পরিচিত এবং এখানকার সমতল অনেকটা ঘোড়ার জিনের পৃষ্ঠের মতো (বা pseudosphere) ; এখানে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ এর কম। স্মর্তব্য যে, ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে স্থান সমতল (flat) এবং ত্রিভুজের তিনকোণের সমষ্টি ১৮০° এর সমান (চিত্র ৭.১)।

রিমানীয় জ্যামিতি দীর্ঘদিন যাবৎ গণিতশাস্ত্রের একটি সুন্দর অবদান হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছিল। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রথম রিমান টেন্সরকে সরাসরি পদার্থবিজ্ঞানে প্রয়োগ করেন। এভাবে আইনস্টাইন বক্র স্থানকালের জ্যামিতির সূচনা করেন এবং তাঁর যুগান্তকারী সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব (general theory of relativity) প্রণয়ন করেন। অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির পূর্বাপর ইতিহাসের বিশদ বর্ণনার জন্য Rosenfeld (1988) দেখা যেতে পারে।

ইউক্লিডীয় জ্যামিতি থেকে আমরা এই ধারণা পেয়েছি যে, দুটি বিন্দুর মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব হলো একটি সরলরেখা। কাজেই কোনো মুক্ত কণার গতিপথ এখানে সরলরেখা মাত্র, কারণ তার উপর কোনো বল প্রযুক্ত নেই এবং ফলে তা ত্বরিতও নয় (নিউটনের প্রথম গতিসূত্র)। কিন্তু রিমানীয় স্থানকালে দুটি বিন্দুর ন্যূনতম দূরত্ব আর সহজ সরলরেখা থাকে না, বরঞ্চ তা বক্ররৈখিক হয়ে যায়। একে জিওডেসিক (geodesic) বলে। কাজেই রিমানীয় জগতে (এক অপক্ষে সমগ্র মহাবিশ্বে) উপরিউক্ত কণাটি একটি জিওডেসিক অনুসরণ করে। এজন্যেই মহাবিশ্বে গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ জিওডেসিক অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে বস্তু তখনই সরলরেখায় চলে যখন তা ত্বরণহীন ; কিন্তু বক্ররেখায় চললে তাকে অবশ্যই ত্বরণযুক্ত হতে হবে। তাই গ্রহ-নক্ষত্র, যারা জিওডেসিক অনুসরণ করে, তারা ত্বরণগতিসম্পন্ন। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের জন্য যে ত্বরণের আবিষ্কার করেছিলেন তা আসলে মহাবিশ্বের বক্রতার প্রকাশমাত্র। এটাই সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের যুগান্তকারী শিক্ষা। জন আর্চিবাল্ড হুইলারের ভাষায় :

curved spacetime tells mass-energy how to move
mass energy tells spacetime how to curve.

সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের স্থানকালে কোনো ঘটনাকে সময়ের ও স্থানের আলাদা স্থানাংক (যথাক্রমে t ও x, y, z) হিসেবে না দেখিয়ে একত্রে সূচকের সাহায্যে দেখানো হয় যেমন কোনো ঘটনার স্থানাংক x^i হতে পারে যেখানে $i = 0, 1, 2, 3$। কাজেই স্থানকালের দুই ঘটনার মধ্যবর্তী স্থানাংকের ব্যবধান হবে dx^i ; একে লাইন-এলিমেন্ট আকারে লিখলে একটি অপরিবর্তী (invariant) আকার পাওয়া যায় :

$$dx^2 = g_{ij}\, dx^i\, dx^j \qquad (২.৫.১)$$

এই g_{ij} কে মেট্রিক টেন্সর বলে। এবং স্থানকালে এই টেন্সর ক্ষেত্রটির ষোলোটি উপাংশ আছে যারা অবস্থান $x = x^i$ এর অপেক্ষক। এটি একটি প্রতিসাম্য টেন্সরও বটে ($g_{ij} = g_{ji}$)। কাজেই এর দশটি স্বাধীন অপেক্ষক আছে। একজোড়া ঘটনার জন্য ds^2 এর একটি নির্দিষ্ট স্থানাংক-নিরপেক্ষ মান আছে। স্থানীয় মিনকোওস্কি জগতে স্থানাংক এমনভাবে পছন্দ করা হয় যাতে মেট্রিক টেন্সরটি 'মিনকোওস্কি রূপ' ধারণ করে :

$$g_{ij} = \eta_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} ; \frac{\delta g_{ik}}{\delta x^k} = 0 \qquad (২.৫.২)$$

সমীকরণ (২.৫.২) এর দ্বিতীয় সম্পর্কটি বলছে যে g_{ij} এর সকল প্রথম অন্তরকলন সহগ (first derivative) শূন্য। অবশ্য আধুনিক নিয়মানুযায়ী সমস্ত একক এমনভাবে পছন্দ করা হয় যাতে $c = 1$ হয়। ফলে আমরা সমীকরণ (২.৫.১) হতে সরাসরি পাই :

$$ds^2 = dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 \qquad (২.৫.৩)$$

বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বে লোরেন্স রূপান্তরের ফলে ds^2 রাশিটি অপরিবর্তী থাকে। সমীকরণ (২.৫.৩) এর ds^2 যদি ধনাত্মক হয় তবে দুটি ঘটনার ব্যবধান হবে সঠিক সময়সদৃশ ব্যবধান বা timelike। যদি ঋণাত্মক হয় তবে সঠিক স্থানসদৃশ বা spacelike ব্যবধান হবে। যদি শূন্য হয় তবে নাল লাইটকোন। সমীকরণ (২.৫.১, ও ৩) উভয়ক্ষেত্রে ds^2 এর মান পরিমাপের একক বা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে না।

আইনস্টাইনের ক্ষেত্র-সমীকরণ (সমীকরণ ৩.২.১ এবং অনুচ্ছেদ ৩.২ দ্রষ্টব্য) হলো মেট্রিক টেন্সর $g_{ij}(x)$ এবং ভর-বন্টনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী এক সেট ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণ। অর্থাৎ ভর-বন্টন আসলে মেট্রিক টেন্সর ক্ষেত্রে একটি উৎস হিসেবে (source for the metric tensor) কাজ করে ; এবং মেট্রিক টেন্সর সমীকরণ (২.৫.১) এর অধীনে স্থানকালের বক্রতা নির্ধারণ করে। এই মেট্রিক টেন্সরই আবার স্থানীয় মিনকোওস্কি জগতের

---

৫. এখানে আইনস্টাইনের নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে ; অর্থাৎ কোনো সূচক দুইবার আবির্ভূত হলে তার উপর যোগচিহ্ন (Σ) আছে বুঝতে হবে।

[illegible] স্থানাঙ্ক ঠিক করে দেয়। $g_{ij} = \eta_{ij}$ ক্ষেত্র-সমীকরণের একটি সম্ভাব্য সমাধান হচ্ছে [illegible] কারণ আমাদের [illegible] ও তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে ভরের ঘনত্ব অত্যন্ত কমেই স্থানকাল প্রায়ই সমতল (g_{ij} ও η_{ij} প্রায় অভিন্ন বা যথেষ্ট কাছাকাছি)। সেজন্য মিনকোভস্কি ফর্ম বা η_{ij} কে কেন্দ্রে ভরের অনুপস্থিতিতে ক্ষেত্র সমীকরণের একটি [illegible] অনতিক্রমী গোলীয় [illegible] সমাধান (unique nonsingular spherically symmetric solution) বলা যায়। এক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাতে কোনো কণিকা মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ থেকে [illegible] পড়ে যেখানে ভর ঘনত্বের প্রভাব অতি নগণ্য হয়ে যায়। কাজেই এমন স্থানের বড় কাঠামোর সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব যা মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ থেকে ইচ্ছামূলক দূরত্বে (arbitrarily far) অবস্থিত। কিন্তু ডি সিটার যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটা সম্ভব নয়; কারণ তা হলে যে অঞ্চলে মেট্রিক টেন্সর g_{ij} η_{ij} ফর্ম থেকে বিচ্যুত হয় সেখানে স্থানের মহাকর্ষীয় বক্রতার দরুন বর্ণালিতে মহাকর্ষীয় সরণ দেখা যায়। এই ভরা [illegible] বস্তুকে [illegible] করা হয়। অবশ্য এটা আইনস্টাইনের এক মাত্রার থেকে খুব একটা পৃথক কিছু বলে মনে হয় না। এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্যে আইনস্টাইন যুক্তি দেখালেন যে, বাস্তবে পদার্থমাত্রে মহাবিশ্বের ভর বন্টন সুষম এবং এই ভর স্থানকে এমনভাবে বেঁকায় যাতে তা আবদ্ধ দ্বিমাত্রিক বেলুনের মতো নিজের উপরই আবদ্ধ হয় (close in on itself)। ফলে মহাবিশ্বের স্থানিক আয়তন সীমিত হয়ে যায়। কাজেই কোনো কণার [illegible] হয়তো [illegible] করা সম্ভব হয় না। কারণ সেখানেই এটি যাবে সেখানেই এটি একটি স্থানীয় বড় কাঠামো এবং অনতিক্রমী টেন্সর ক্ষেত্রের সাক্ষাৎ পাবে যা মহাবিশ্বের পদার্থের বড় বেলুনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আইনস্টাইনের বিখ্যাত ক্ষেত্র-সমীকরণে যে দিকে বক্রতার টেন্সর (R_{ij}) ব্যবহার করা হয়েছে তা আসলে রিমান-ক্রিস্টোফেল বক্রতা টেন্সরের (R_{ijkl}) সংক্ষিপ্ত রূপ। চার মাত্রায় এর ২০টি অংশক আছে যার কেবল বিশটি স্বাধীন। এদের প্রত্যেকে g_{ij} এবং এর ডেরিভেটিভের উপর নির্ভর করে। আমরা দেখেছি যে স্থানকালের যেকোনো অংশে স্থানাংক এমনভাবে পছন্দ করা যায় যাতে মেট্রিক টেন্সরটি মিনকোভস্কি ফর্ম ($g_{ij} = \eta_{ij}$) ধারণ করে এবং g_{ij} এর প্রথম অন্তরকলন সহগ শূন্য হয় [১] ($g_{ij,k} = 0$)। কিন্তু যদি দ্বিতীয় অন্তরকলন সহগগুলোকে ($g_{ij,kl} = 0$) অপসারণ (eliminate) করে ফেলা যায় তাহলে বক্রতার টেন্সর শূন্য হয়ে যায়। কারণ বক্রতার টেন্সর এদের দিয়েই তৈরি। বিশেষ আপেক্ষিকতার মিনকোভস্কি জগতে এটি প্রকৃতই অদৃশ্য হয়ে যায়। বক্রতার টেন্সরটির অশূন্য মান নির্দেশ করে যে $g_{ij,kl}$ সমূহের সকলকে অপসারণ করা যায় না এবং ফলে স্থানকে [illegible] সেখানে [illegible]। ফলে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র দাঁড়ায়; "বস্তু জড়তা ও মহাকর্ষের

[১] [illegible] অন্তরকলন (partial derivative) [illegible] যদি চারটি অস্থানাঙ্ক [illegible] হয় তবে: $\varphi_i = \frac{\delta\varphi(x)}{\delta x^i}$।

অধীনে একটি জিওডেসিক বরাবর ভ্রমণ করে"। সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের অনবদ্য অবদান এই যে তত্ত্বটি মহাকর্ষকে (gravitation) বিশ্বের স্থানকালের জ্যামিতির বিশেষ ধর্মের (বক্রতার, curvature) বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ভাবতে শেখায় (দ্বিতীয় বক্রতার বিশেষ ধর্ম, স্থান জ্যামিতির প্রকৃতি ৭.১ চিত্রে দ্রষ্টব্য)।

সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের চমৎকার, অগাণিতিক অথচ সংক্ষেপময় আলোচনার জন্য Taylor & Wheeler 1966 বিরচিত Spacetime Physics এর তৃতীয় অধ্যায় The Physics of curved Spacetime দ্রষ্টব্য।

২.৬ সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ

আইনস্টাইনের অনবদ্য সৃষ্টি সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের কয়েকটি পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ পাওয়া গেছে। তত্ত্বই এ ঘটনাবলির ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। এগুলি হলো :

১. মহাকর্ষের কারণে বর্ণালির রক্তিমসরণ

২. সূর্যের কাছে আলোর বেঁকে যাওয়া

৩. বুধগ্রহের অনুসূর বিন্দুর অগ্রগমন

৪. মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উপস্থিতি

১. মহাকর্ষের কারণে সৃষ্ট বর্ণালির রক্তিমসরণ প্রকৃতপক্ষে সমতুল্যতার নীতির প্রমাণ। "দেখানো যায় যে সূর্যের পৃষ্ঠদেশে ফোটনের উপর সূর্যের মহাকর্ষণ শক্তিজনিত বিভব হলো 2.12×10^{-6}। সুতরাং সূর্য থেকে যে আলো আসে তার স্পন্দনসংখ্যা পৃথিবীপৃষ্ঠে ঐ একই আলোর তুলনায় 2.12×10^{-6} ভাগ লালের দিকে সরে যাবে। এই রক্তিমসরণের পরীক্ষা বেশ কষ্টসাধ্য কিন্তু গত কয়েক বছরের পরীক্ষার ফল আইনস্টাইনের তত্ত্বকেই সমর্থন করেছে"। মহাকর্ষীয় রক্তিমসরণের ফলে কম্পাংকের আপেক্ষিক পরিবর্তনের সূত্র হলো : $\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{GM}{rc^2}$। স্মর্তব্য যে, দূরবর্তী ছায়াপথসমূহের অপসরণ বেগজনিত বর্ণালির রক্তিমসরণ এবং মহাকর্ষীয় রক্তিমসরণ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ভৌত কারণে ঘটে থাকে।

২. সমতুল্যতার নীতির একটি ফল হলো এই যে, আলো মহাকর্ষের অধীনে বক্রপথে চলে। কাজেই সূর্যের কাছ দিয়ে যখন কোনো আলো আসে তখন তা স্বভাবতই বেঁকে যাবে (চিত্র ২.৩)। এই বেঁকে যাওয়ার মান আইনস্টাইন নির্ধারণ করেছিলেন ১.৭৫ আর্কসেকেন্ড। ১৯১৯ সালের সূর্যগ্রহণের সময়ে এই ঘটনা পরীক্ষা করে দেখা হয়। গ্রহণের সময়ে চাঁদ যখন সূর্যকে ঢেকে ফেলে তখন নক্ষত্রসমূহের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। এই আলোকচিত্রকে অন্য সময়ে তোলা আকাশের একই অংশের আলোকচিত্রের সাথে তুলনা করা হয়। এতে সূর্যের উপস্থিতির কারণে নক্ষত্রের প্রতিবিম্বের বিচ্যুতি পরিমাপ করা যায়। এ পর্যন্ত বহুবার এই পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে আইনস্টাইন সঠিক। আইনস্টাইনকে যখন প্রশ্ন করা হতো যে যদি গ্রহণের ফলাফল অন্যরকম হতো (অর্থাৎ নক্ষত্রের আলোর কোনো বিচ্যুতি দেখা না যেতো) তবে তাঁর কি অনুভূতি হতো ; তিনি এর জবাবে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন "Then I

would have been sorry for the dear Lord--the theory is correct"। ঐতিহাসিক কৌতূহল মেটাতে এখানে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রহণের ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে[৬] :

পরীক্ষণ-পরিচালক সংস্থা	স্থান	কৌণিক বিচ্যুতি (আর্কসেকেন্ডে)	ভুলের পরিমাণ (আর্কসেকেন্ডে)
গ্রীনউইচ	অস্ট্রেলিয়া, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২	১.৭৭	০.৪০
পটসডাম	সুমাত্রা, ১২শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৯	১.৮২	০.২০
স্টার্নবার্গ	সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯শে জুন, ১৯৩৬	২.৭৩	০.৩১
সোদাই	জাপান, ১৯শে জুন, ১৯৪৯	২.১৩	১.১৫
ইয়েরকস	সুদান, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২	১.৭০	০.১০
ইয়েরকস	ব্রাজিল, ২৪শে মে, ১৯৫২	১.০১	০.২৭

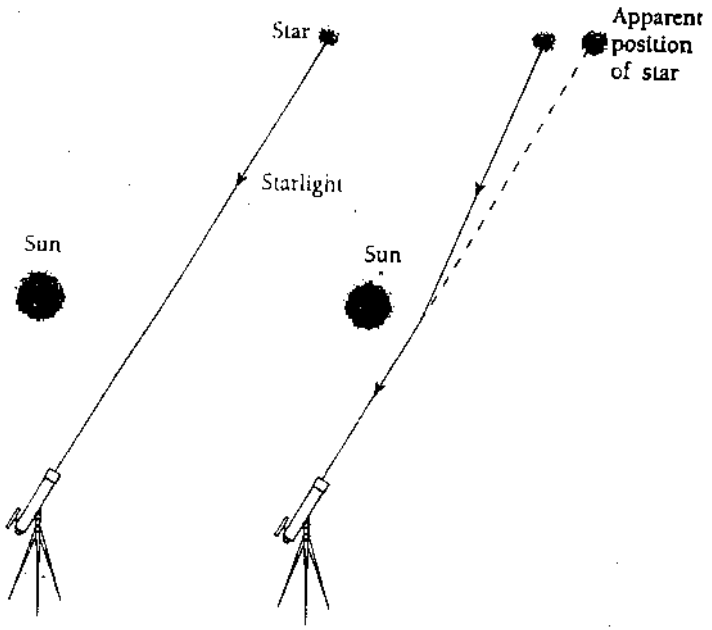

চিত্র ২.৩ : সূর্যের পাশে নক্ষত্রের আলোর বেঁকে যাওয়া।

৬. দ্রষ্টব্য পৃ. ১২৩, Bernstein (1991)।

যেহেতু খুব ভারি বস্তুর কাছে আলোকরশ্মি বেঁকে যায়, সেহেতু কোনো ভারি জ্যোতিষ্ক (যেমন ছায়াপথস্তবক) তার দুইপাশের আলোকরশ্মিকে বাঁকিয়ে দিতে পারে। এতে করে পৃথিবীতে দূরবর্তী আলোক উৎসের একাধিক প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এ প্রক্রিয়াকে মহাকর্ষীয় লেন্স (gravitational lens) বলে (চিত্র ২.৪)। ১৯৭৯ সালে প্রথম এ রকমের লেন্স প্রক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। এক্ষেত্রে একজোড়া কোয়েসারের প্রতিবিম্ব দেখা গিয়েছিল যা আসলে ছিল একটি কোয়েসারেরই মহাকর্ষীয় লেন্স প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন দুটি পৃথক প্রতিবিম্ব। অন্যান্য রেডিও তরঙ্গেও এটা ঘটতে দেখা গিয়েছে।

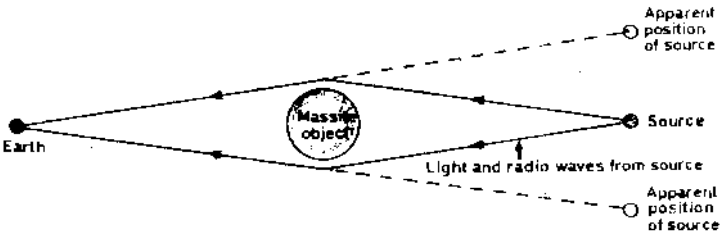

চিত্র ২.৪ : মহাকর্ষীয় লেন্স-প্রক্রিয়া।

৩. আমরা জানি, সূর্যকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান গ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। এই উপবৃত্তের যে বিন্দুতে (বা অবস্থানে) গ্রহ সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে তাকে অনুসূরবিন্দু (perihelion) এবং যে বিন্দু সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে তাকে অপসূরবিন্দু (aphelion) বলে। দেখা গেছে, প্রতিবার ঘুরে আসার পর গ্রহের অনুসূরের সরণ ঘটে অর্থাৎ বিন্দুটি পূর্বের অবস্থান থেকে সরে আসে। একে অনুসূর বিন্দুর অগ্রগমন বলে। "আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে গ্রহের কক্ষপথে নিউটন–কেপলার প্রদর্শিত গতি থেকে কিছুটা পার্থক্য দেখা যাবে এবং সে পার্থক্য এমন হবে যাতে এক অনুসূর থেকে পরবর্তী অনুসূরের মধ্যে সূর্য সৃষ্ট ব্যাসার্ধ সৃষ্ট কোণ একটি সম্পূর্ণ আবর্তনসৃষ্ট কোণের চেয়ে $\frac{24\pi^3 a^2}{T^2 c^2 (1-e^2)}$ পরিমাণ বেশি হবে"।[৮] এখানে a = কক্ষপথের অর্ধ-বৃহদাক্ষ, সে.মি. ; e = উৎকেন্দ্রিকতা ; c = আলোর বেগ ; T = আবর্তনকাল, সেকেন্ড। অর্থাৎ সূর্যকে ঘিরে গ্রহের আবর্তনের অনুযায়ী উপবৃত্তাকার কক্ষপথটিও ঘুরতে থাকে। এজন্যই অনুসূরের অগ্রগমন ঘটে। এই ঘূর্ণনের কৌণিক মান আবর্তন প্রতি রেডিয়ানে প্রকাশ করা হয় এবং এর সূত্র উপরে লেখা হয়েছে। এই আবর্তনের তত্ত্ব-প্রদত্ত কৌণিক পরিমাণ বুধগ্রহের জন্য ৪৩.০৩ সেকেন্ড। অন্য দিকে বুধগ্রহের অনুসূর বিন্দুর অগ্রগমন প্রতি একশ বছরে ১.৬° পরিমাণ হয়ে থাকে (চিত্র ২.৫)। সৌরজগতের অপরাপর গ্রহের প্রভাব বাদ দিয়েও ৪৩″ পরিমাণ সরণের পরিমাণের কোনো

৮. দ্রষ্টব্য পৃ. ১২০, আইনস্টাইন (১৯১৬)।

ব্যাখ্যা দীর্ঘদিন পাওয়া যাচ্ছিল না। এজন্য বুধ ও সূর্যের মধ্যবর্তী ভালকান নামক একটি কাল্পনিক গ্রহের প্রস্তাব করা হয়েছিল, আইনস্টাইন এসব সমস্যারই চমৎকার সমাধান দিলেন তাঁর সাধারণ তত্ত্বের সাহায্যে। বুধগ্রহের অনুসূরবিন্দুর চলনের হিসাব একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাখা হচ্ছে (লেভেরিয়ের ১৮৫৯ থেকে) এবং ১৯৪৩ সালে প্লিমেন্সের পরীক্ষালব্ধ মান ছিল ৪৩১১±০.৪৫ সেকেন্ড, এসবই আইনস্টাইনের তত্ত্বের যথার্থ্য প্রমাণ করে।

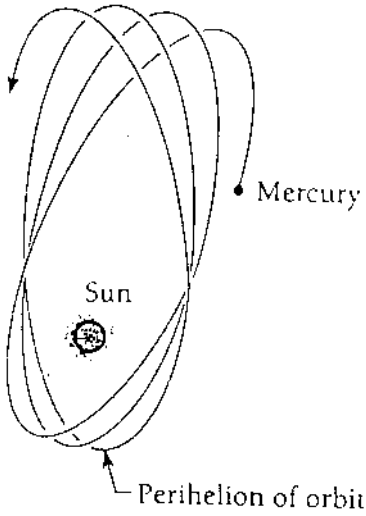

চিত্র ২.৫ : বুধের অনুসূর বিন্দুর অগ্রগমন।

৪. সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব অনুযায়ী মহাকর্ষ তরঙ্গের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী এবং তা আলোর বেগে চলাচল করে। একটি দ্বিমাত্রিক রবারশিট স্থান কল্পনা করা যাক যেখানে কোনো বস্তু রাখলে ভরের সমানুপাতে বক্রতার সৃষ্টি হয়। এই স্থানে যদি কোনো বস্তু রাখা হয় এবং সেটা যদি কম্পমান (তথা ঘূর্ণমান) হয় তবে সেটা থেকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এভাবেই মহাবিশ্বে কম্পমান ভরপিণ্ড দ্বারা মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ঠিক একইভাবে একটি কম্পমান আহিত কণা বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের সৃষ্টি করে। কিন্তু বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ এবং মহাকর্ষ তরঙ্গের পার্থক্য হলো মহাকর্ষ তরঙ্গ অত্যধিক দুর্বল এবং অতীব সূক্ষ্ম ইকুইপমেন্ট ছাড়া এই তরঙ্গ ডিটেক্ট করা সম্ভব নয়। মহাকর্ষ তরঙ্গের একটি উৎস হতে পারে জোড়া নিউট্রন তারা। ১৯৭৪ সালে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জোসেফ টেইলর (Joseph Taylor) ও রাসেল হালস (Russell Hulse) একটি জোড়া নিউট্রন তারা (PSR 1913+16) আবিষ্কার করেন যারা পরস্পরকে ঘিরে ঘূর্ণনশীল (এই বিশেষ জোড়া নিউট্রন তারা ব্যবস্থার উপর বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন অনুচ্ছেদ ৬.১২)। এদের একটি পালসার এবং এটি প্রতি ৫৯ মিলিসেকেন্ড পরপর একটি পালস প্রেরণ করে।

এই জোড়াতারা দুটির পরস্পরকে ঘিরে আবর্তনকাল ৮ ঘণ্টা। সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব অনুযায়ী এধরনের একটি সিস্টেম থেকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সৃষ্টি হবে এবং সিস্টেমটি শক্তি হারাতে থাকবে। কাজেই এরা পরস্পরের দিকে ঘুরতে ঘুরতে অগ্রসর হবে (spiral in toward each other) এবং এদের আবর্তনকাল কমতে থাকবে। হালস-টেইলর বিন্যাস তারাজোড়ার জন্য দেখা গেছে প্রতিবছর এদের আবর্তনকাল ৭৫ মিলিসেকেন্ড করে হ্রাস পাচ্ছে। এই মান তত্ত্ব-প্রদত্ত মানের খুব কাছাকাছি। ১৯৯৩ সালে মহাকর্ষ তরঙ্গের উপস্থিতি আবিষ্কারের জন্য হালস ও টেইলরকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।[১]

বইপত্র

সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের উপর প্রচুর বই আছে যদিও অধিকাংশ বইই আমাদের দেশে দুর্লভ। বাংলায় সহজ আলোচনার জন্য হারুন-অর রশীদ (১৯৯৪) দেখা যেতে পারে। বর্তমান অধ্যায়ে এই বইটি থেকে বহুমাত্রায় আহরণ করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বইটি এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া আইনস্টাইনের নিজের লেখা আইনস্টাইন (১৯৯৬) একটি মোটামুটি ভালো বই। ইংরেজিতে এই বিষয়ে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে। সাধারণ পাঠকের উপযোগী অগাণিতিক আলোচনার জন্য Beiser (1995), Penrose (1989) এবং Einstein & Infeld (1960) দেখা যেতে পারে। সাধারণ আপেক্ষিকতার উপর সাধারণ পাঠকের জন্য উৎকৃষ্ট বই হলো Thorne (1994)। হাল্কা গাণিতিক আধা-টেকনিকাল আলোচনার জন্য Einstein (1956), Berry (1989), Taylor & Wheeler (1966) দেখা যেতে পারে। সম্পূর্ণ গাণিতিক তত্ত্বের জন্য Bergmann (1976), Weyl (1952), Narlikar (1993a), Buchdahl (1981) প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। তবে Misner *et al* (1973) এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য এবং সম্পূর্ণ বই। এটি একটি বহুল উদ্ধৃত বইও বটে। বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের নিরিখে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের আলোচনার জন্য Weinberg(1972) এবং Peebles(1993) দুটি ক্লাসিক বই নিঃসন্দেহে। ইন্টারনেটে এ বিষয়ে প্রভূত তথ্য পাওয়া যায়। সাধারণ আপেক্ষিকতার উপর http : / / math.ucr.edu/home/baez/gr/outline2.html একটি চমৎকার ওয়েবসাইট।

১. মহাকর্ষ তরঙ্গের উপর ভাল সাধারণ আলোচনার জন্য দশম অধ্যায়, Thorne (1994) দ্রষ্টব্য। এখানে বিশদভাবে এবং সাধারণ ভাষায় মহাকর্ষ তরঙ্গের উদ্ভব, প্রকৃতি এবং প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিশদ গাণিতিক বর্ণনার জন্য 'Gravitational Radiation' by K. S. Thorne (in Hawking & Israel (ed.) 1987) দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

সৃষ্টির মাহেন্দ্র ক্ষণে

In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void ; and darkness was upon the face of the deep. And the spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good ; and God divided the light from darkness.

The BIBLE, Genesis (1-4)

It (the Universe) would simply be.

Stephen Hawking, *The Brief History of Time* (1988).

৩.১ প্রারম্ভিক

জ্যোতির্বিজ্ঞান একটি অত্যাধুনিক বিজ্ঞান। বর্তমানে নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান, কণা পদার্থবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, বর্ণালি বিশ্লেষণ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এই বিশ্বজগৎ বিশাল তায় যেমন অকল্পনীয়, দূরত্বেও তেমনি অভাবনীয়। আমাদের ছায়াপথের নাম আকাশগঙ্গা ছায়াপথ (Milky Way Galaxy)। সূর্য এই ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০০০০ আলোকবর্ষ দূরে ধনুর্রাশির দিকে অবস্থিত। সূর্য মাঝারি আকারের একটি নক্ষত্র ; পৃথিবী এর একটি ক্ষুদ্র গ্রহ। সূর্য থেকে সহস্রগুণ বড় নক্ষত্রও আছে, যেমন—রোহিণী (Aldebaran), মীরা (Mira), রাণরাজা (Rigel), জ্যেষ্ঠা (Antares)। এছাড়া ছোট নক্ষত্র আছে, অজস্র। আমাদের এই ছায়াপথের মোট নক্ষত্রের সংখ্যা দশ থেকে চল্লিশ হাজার কোটি। অপর দিকে মোট ছায়াপথের সংখ্যাও দশ হাজার কোটি। কোনও বিশ্বে মোট নক্ষত্রের আনুমানিক সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে : ১০^{১০} - ১০^{১১} - ১০^{১২} ; অর্থাৎ দশ কোটি কোটি কোটি (দশ বিলিয়ন ট্রিলিয়ন)।

আধুনিক তত্ত্বমতে এই সুবিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১৯ বিলিয়ন (১৯০০ কোটি) বছর আগে। বিশ্বের বয়স নিয়ে অনিশ্চয়তা অনুচ্ছেদ ৩.৪ এ আলোচিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞাত বিধিসমূহ প্রয়োগ করে আমরা বিশ্বের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার একটি চিত্র দাঁড় করাতে পেরেছি (দ্রষ্টব্য ৩.১০)। এই চিত্রকে সম্পূর্ণ বলা যাবে না। অনেক

অসমাহিত প্রশ্ন রয়ে গেছে। তবে এই বিশ্বচিত্রটি সন্তোষজনক নিঃসন্দেহে। এক মৌলিকও বটে। কার্য-কারণ সম্পর্ক কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি। বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmology) নিয়ে প্রথম গাণিতিক আলোচনা সম্ভব করে তোলেন আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রণয়নের মাধ্যমে। তাঁর অনাবদ্ধ এবং অসীম সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র সমীকরণটি বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের ভিত রচনা করেছে। সম্প্রতি সৃষ্টিতত্ত্বে যুক্ত হয়েছে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। ফলে জন্ম নিয়েছে কোয়ান্টাম সৃষ্টিতত্ত্ব। আধুনিক বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের প্রচলিত মডেল অনুযায়ী বিশ্ব জন্ম নিয়েছে এক বিপুল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। এটাই আধুনিক মহাবিস্ফোরণ বা বিগ-ব্যাং মডেলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মডেলের সপক্ষে তিনটি পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রমাণ পাওয়া গেছে। এগুলো হলো :

১. বিশ্বের ব্যাপক কাঠামোর প্রসারণ। দূরবর্তী ঘ-বস্তুসমূহ আমাদের থেকে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে। দূরত্ব যতো বেশি, অপসরণ হারও ততো বেশি। এটাকে হাব্‌লের বিধি বলে।

২. বার বিলিয়ন বছর আগে ঘটে যাওয়া মহাবিস্ফোরণের অবশেষ হিসেবে আজও রয়ে যাওয়া পটভূমি বিকিরণ। বর্ণালির মাইক্রো তরঙ্গ অংশে এই বিকিরণ পাওয়া গেছে ১৯৬৪ সালে। এই বিকিরণের মান ২.৭৪ ডিগ্রি কেলভিন এবং এই বিকিরণ সুষম ও দিকনিরপেক্ষ। অর্থাৎ বিশ্বের যেকোনো দিক থেকে যেকোনো সময়ে একই পরিমাণ বিকিরণ পাওয়া যায়।

৩. বিশ্বে পর্যবেক্ষিত হাইড্রোজেন-হিলিয়াম অনুপাত যার পর্যবেক্ষিত মান হলো ৩ : ১। এই মান তাত্ত্বিকভাবেও প্রমাণ করা গেছে।

বর্তমান অধ্যায়ে এই তিনটি পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রমাণের বিশদ বর্ণনা এবং বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে এদের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের আলোচ্য সময় পরিসর হলো বিশ্বের সৃষ্টির $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড থেকে শুরু করে ৫ লক্ষ বছর। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম তিন মিনিটে এতো অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে যে ৩ মিনিট থেকে ৫ লক্ষ বছরের মধ্যে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি। তাছাড়া অনুচ্ছেদ ৩.২ এ বিশদভাবে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে গাণিতিক আলোচনা করা হয়েছে। গণিত সম্পর্কে অনাগ্রহী পাঠক এই অনুচ্ছেদটি প্রথম পাঠে বাদ দিতে পারেন। তবে মনে রাখা ভালো, বিজ্ঞানীরা যখন কোনো তত্ত্ব দেন তখন গণিতের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই তা দিয়ে থাকেন। তদুপরি বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়টি অত্যন্ত বেশি পরিমাণে গণিতনির্ভর। গণিত কিভাবে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের ধারণাসমূহকে প্রভাবিত করে তার একটা আভাস দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে উক্ত অনুচ্ছেদে। প্রথম $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ডে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্যে কোয়ান্টাম সৃষ্টিতত্ত্বের প্রয়োজন। এবং একই সাথে স্ফীতিশীল বিশ্বের মডেলও গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ দুটি বিষয় পৃথক অনুচ্ছেদে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ড. স্টিফেন হকিং এর সৃষ্টি সংক্রান্ত কোয়ান্টাম শর্তাবলিও যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের অনেক অংশই কণা পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ধারণাসমূহ এবং সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। তাই

এই অধ্যায় পড়ার আগে পরিশিষ্টে সংযোজিত (পরিশিষ্ট ১ ও ২) বক্তব্যগুলির গভীরে এবং পরিশিষ্টের সঙ্গে যুক্ত পড়ে নিলে ভালো হয়।

৩.২ বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বসমূহ

বিশ্বসৃষ্টি সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে। পূর্ববর্তী সময়গুলোতে এই সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা হয়নি বললেই চলে। বিশ্বসৃষ্টির বিষয়টিকে আগে ধর্মীয় ও দর্শনের বিষয় বলেই মনে করা হতো। এই বিষয়ে প্রথম গণিতের দৃষ্টি নিয়ে আসেন ফ্রিডম্যান। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত তার বিশেষ আপেক্ষিকতাকে পরিপূর্ণতা দিয়ে ১৯১৬ সালে আইনস্টাইন তার যুগান্তকারী সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশ করেন। দেখা গেল, বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে গাণিতিক চিন্তাভাবনা সম্ভব। বিশ্বকে গণিতের তত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের অনবদ্য অবদান এই যে তত্ত্বটি মহাকর্ষকে (gravitation) বিশ্বের স্থানকালের জ্যামিতির বিশেষ ধর্মের (বক্রতার) বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ভাবতে শেখায়। এ কাজে সহায়তা করেছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গাণিতিক ধারণা যা আইনস্টাইন প্রথম পদার্থবিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এগুলো হচ্ছে—১. অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি (রিমান ও মিনকোস্কির জ্যামিতি); ২. লোরেন্টস রূপান্তর; ৩. আলোর বেগের ধ্রুব আচরণ; ৪. সহভেদতার নীতি (covariance principle) প্রয়োগ এবং সর্বোপরি ৫. টেন্সর ক্যালকুলাস।

সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব যে সব স্বতঃসিদ্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি হলো : ১. সমতুল্যতার নীতি (principle of equivalence) : কোনো দর্শকের পক্ষে স্থানীয়ভাবে মহাকর্ষ এবং ত্বরণের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। এর কারণ জড়ভর ও মহাকর্ষীয় ভর অভিন্ন। ২. সহভেদিতার নীতি : যেকোনো প্রসঙ্গ কাঠামোয় (reference frame) পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ অপরিবর্তনীয় থাকবে। এ সমস্ত ধারণা ব্যবহার করে এবং টেন্সর ক্যালকুলাসের সাহায্যে আইনস্টাইন তার অতুলনীয় মেধার পরিচয় দিলেন বিশ্বের বক্রতা এবং ভর শক্তির সমতা বিধান করে তার বিখ্যাত ক্ষেত্র সমীকরণ প্রণয়ন করে :

$$R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} = -k T_{ij} \qquad (৩.২.১)$$

এখানে R রিকি স্কেলার, k ধ্রুবক ; R_{ij} হচ্ছে রিকি বক্রতা টেন্সর (Ricci curvature tensor), g_{ij} মেট্রিক টেন্সর, T_{ij} শক্তি-ভরবেগ টেন্সর এবং $i, j = 0, 1, 2, 3$। এই সমীকরণের তাৎপর্য হলো এই যে, ভরের উপস্থিতি স্থানকালে বক্রতার সৃষ্টি করে, এই বক্রতাই মহাকর্ষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। টেন্সরের জটিলতা এড়িয়ে বলা যায় যে, সমীকরণের বাম অংশে স্থানের বক্রতা এবং ডান অংশে ভর শক্তি। কাজেই বক্রতা এবং ভর শক্তি তুল্যমূল্য। সমতাটা যে, ভর এবং শক্তিও আবার আইনস্টাইনের $E=mc^2$

সমীকরণের দ্বারা তুলনীয়। এই ক্ষেত্র-সমীকরণ থেকে আইনস্টাইন একটি স্থির (static) বিশ্বের তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন যা ছিল সময়ের সাথে প্রতিসম (time-symmetric)।

আইনস্টাইনের বিশ্বতত্ত্ব

আইনস্টাইনের তত্ত্ব স্থির বিশ্বের তত্ত্ব। তাঁর সময়ে মনে করা হতো বিশ্ব স্থানীয় স্থানীয় সময়ের সাথে তার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এ ধরনের বিশ্ব সম্পর্কে তত্ত্ব প্রণয়নের পূর্বে কয়েকটি শর্ত মেনে নিতে হবে : ১. স্থানীয়ভাবে মহাকর্ষ ক্ষেত্র থাকলেও (এবং এর ফলে অসুষম হওয়া সত্ত্বেও) ব্যাপক পটভূমিতে বিশ্ব সুষম এবং ২. বিশ্ব ρ ঘনত্বের এবং p চাপের ফ্লুইড দ্বারা পরিপূর্ণ। এ ধরনের বিশ্বের রেখা অংশ হবে :

$$ds^2 = dt^2 - \frac{dr^2}{1 - \frac{r^2}{R^2}} - r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \qquad (৩.২.৩)$$

রেখা অংশ হলো বিশ্বের যেকোনো দুই বিন্দুর মধ্যের দূরত্ব। এই দূরত্বের প্রকৃতি জানা গেলে বিশ্বের জ্যামিতিক ধর্ম জানা সম্ভব হবে। উপরের রেখা অংশটিতে কোনো সময় নির্ভর চলক নেই। বোঝাই যাচ্ছে এ ধরনের বিশ্ব হবে সুস্থির। এখন আমরা আইনস্টাইনের এই মডেলের কিছু গতীয় ধর্ম আলোচনা করব যা আসলে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে নির্ধারণ করা যায়। এখানে শুধু বিভিন্ন নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ ফলগুলি উদ্ধৃত হলো :

১. উপরিউক্ত (৩.২.১) সমীকরণকে পুনরায় লেখা যায় :

$$R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} = 8\pi G T_{ij} \qquad (৩.২.৪)$$

যেখানে R_{ij} এবং R হলো g_{ij} এবং এর প্রথম দুটি অন্তরকলন সহগের অপেক্ষক। G হলো নিউটনের মহাকর্ষীয় ধ্রুবক।

২. একটি আদর্শ ফ্লুইড কল্পনা করা হয় যার প্রতি একক আয়তনে ভর ρ এবং চাপ p যা ফ্লুইডের গতিবেগ এবং ফ্লুইডের নিশ্চল কাঠামোর কোনো দশক দ্বারা পরিমাপ করা যায়। এ ধরনের কোনো ফ্লুইডে স্থানীয় মিনকোওস্কি স্থানাংকে শক্তি ভরবেগ টেন্সরের সংজ্ঞা হয় :

$$T_{ij} = \begin{bmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \end{bmatrix} \qquad (৩.২.৫)$$

৩. স্থানকালের কোনো অংশে যেখানে বেগের মান কম সেক্ষেত্রে স্থানকালের কোনো ছোট অংশে আইনস্টাইনের ক্ষেত্র-সমীকরণ প্রয়োগ করলে তা নিউটনীয় মহাকর্ষ তত্ত্বের অনুরূপ ফল দেয়। অর্থাৎ কম গতিবেগসম্পন্ন ভরের ক্ষেত্রে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব (ক্ষেত্র-সমীকরণ) নিউটনীয় তত্ত্বে পর্যবসিত হয় যা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক এবং কাম্য।

সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্তের ফল হলো এই যে যদি চাপ বেশি হয় তবে মহাকর্ষীয় আকর্ষণের উৎসটির ভর ঘনত্ব ρ থেকে পরিবর্তিত হয়ে $\rho + 3p$ হয়। কাজেই কোনো ক্ষুদ্র অঞ্চলের ক্ষেত্রে নিউটনীয় মহাকর্ষীয় ত্বরণ g এর জন্য প্রযোজ্য পয়সনের সমীকরণকে সাধারণভাবে লেখা যায় :

$$\nabla \cdot \mathbf{g} = -4\pi G(\rho + 3p) \qquad (৩.২.৫)$$

এই সমীকরণ থেকে বলা যায় যে মহাকর্ষীয় ত্বরণের উৎস হিসেবে ক্রিয়াশীল সক্রিয় মহাকর্ষীয় ভর-ঘনত্ব হলো : $\rho_g = \rho + 3p$ ' লক্ষণীয় যে, এখানে গ্যাস কণাদের বেগ আলোর তুলনায় অত্যল্প ধরা হয়েছে, তাই এই নিউটনীয় বিশ্লেষণ সম্ভব হলো।

৪. বার্কহফের (Birkhoff) উপপাদ্য অনুযায়ী কোনো সুষম গোলকীয় ভর বণ্টনের জন্য আইনস্টাইনের ক্ষেত্র-সমীকরণের একটি অনন্য সমাধান (unique solution) আছে। স্থানের কোনো অঞ্চল যদি পদার্থশূন্য হয় ($T_{ij} = 0$), যা প্রতিসাম্যের বিন্দুকে ধারণ করে, তবে সেখানে ক্ষেত্র সমীকরণের সমাধান বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের সমতল স্থানকাল নির্দেশ করে। অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রে রেখা-অংশটি (line element) হবে :

$$\begin{aligned} ds^2 &= dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 \\ &= dt^2 - dr^2 - r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \end{aligned} \qquad (৩.২.৬)$$

৫. এবার আমরা ভর ঘনত্ব ρ এবং প্রসারণ/সংকোচনের স্থানীয় হারের ভেতর সম্পর্ক নির্ধারণ করব। স্থানিকভাবে সুষম এবং দিকনিরপেক্ষ ভর-বণ্টনের কথা চিন্তা করা যাক, ধরা যাক এ রকম কোনো স্থানে l ব্যাসার্ধের একটি গোলকের সব পদার্থ সরিয়ে একপাশে রাখা হলো। তাহলে উপরের ৪নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ গোলকের ভেতরে স্থানকাল সমতল। এবার গোলকটিকে পুনরায় পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করা হলো। ব্যাসার্ধ যদি ছোট হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে সমতল স্থানকালে সামান্য পরিমাণে পদার্থ রাখা হয়েছে। তাহলে সমীকরণ (৩.২.৫) অনুযায়ী ঐ পদার্থের ক্ষেত্রে নিউটনীয় বলবিজ্ঞান প্রয়োগ করা যায় এবং এভাবে ঐ গোলকের সক্রিয় মহাকর্ষীয় ভর হয় $M_g = \rho_g V = \frac{4}{3}\pi(\rho + 3p)l^3$। এখানে যদি পয়সন সমীকরণের চিরাচরিত বাস্তবগ আইন (inverse square law) ব্যবহার করা হয় তাহলে গোলকের পৃষ্ঠে মহাকর্ষীয় ত্বরণ হয় :

$$\ddot{l} = \frac{GM_g}{l^2} = -\frac{4}{3}\pi(\rho + 3p)l \qquad (৩.২.৭)$$

এটাই সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বে কোনো সুষম, দিকনিরপেক্ষ ভর বণ্টনের সময়ের সাথে পরিবর্তনের আইন। যেহেতু ρ হলো প্রতি একক আয়তনে ভর এবং যেহেতু ভর ও শক্তি তুলনীয়, কাজেই ঐ গোলকের মোট শক্তি হলো : $U = \rho V$। এই শক্তির পরিবর্তন তখনই হবে যখন ঐ গোলকের ব্যাসার্ধ পরিবর্তিত হবে এবং সেটা হবে পৃষ্ঠে চাপজনিত কার্যের জন্যে। কাজেই শক্তির পরিবর্তন : $dU = -p\,dV = d(\rho V) = \rho\, dV + V d\rho$

$$\Rightarrow \dot{\rho} = -(\rho + p)\frac{\dot{V}}{V} = -3(\rho + p)\frac{\dot{l}}{l} \quad [\text{যেহেতু } V \propto l^3] \qquad (৩.২.১৮)$$

এই সমীকরণ আদর্শ ফ্লুইডের শক্তি সমীকরণ। একে শক্তির সংরক্ষণশীলতার সমীকরণও বলা হয়। এখন (৩.২.৭) এবং (৩.২.১৮) সমীকরণ থেকে pকে অপসারণ করে লেখা যায় :

$\ddot{l} = -\frac{8}{3}\pi G\rho l + \frac{4}{3}\pi G\dot{\rho}\frac{l^2}{\dot{l}}$। একে $\dot{l}$ দিয়ে গুণ দিলে একটি পূর্ণ অবকলন (perfect differential) পাওয়া যায় যার সমাকলনটি হলো :

$$\dot{l}^2 = \frac{8}{3}\pi G\rho l^2 + K \qquad (৩.২.১৯)$$

যেখানে K সমাকলনের ধ্রুবক।

৬. উপরের (৩.২.৯) সমীকরণে স্থির সমাধানের জন্য সমাকলনের ধ্রুবকটির মান দাঁড়ায় $K = -\frac{l^2}{R^2}$ যেখানে l ধ্রুব এবং R রেখা-অংশকের বক্রতার ব্যাসার্ধ। ফলে সমীকরণ (৩.২.৭) এবং (৩.২.৯)কে স্থির বিশ্বের জন্য লেখা যায় :

$$\frac{4}{3}\pi G(\rho_e + 3p_e) = 0 \; ; \; \frac{8}{3}\pi G\rho_e - \frac{1}{R^2} = 0 \qquad (৩.২.২০)$$

সমীকরণে নিম্নসূচকে যে e লেখা হয়েছে সেটা ঘনত্ব ও চাপের গড়মান বোঝায়। সমীকরণটির প্রথমাংশে ρ_e যদি ধনাত্মক হয় তবে পদার্থের চাপ হয়ে যায় ঋণাত্মক [$p_e = -\rho_e/3$] যা কোনো নমনীয় বা ছায়াপথ বা যেকোনো গ্যাস-সংগ্রহের জন্য অসম্ভব। এ কারণে আইনস্টাইন তাঁর মূল ক্ষেত্র সমীকরণে একটি অতিরিক্ত পদ যোগ করেন। সমীকরণের নতুন রূপটি হলো :

$$R_{ij} - \frac{1}{2}Rg_{ij} - \Lambda g_{ij} = 8\pi G T_{ij} \qquad (৩.২.২১)$$

এখানে Λ-পদটিকে বলে **মহাজাগতিক ধ্রুবক** (cosmological constant) যার একক সময়ের ব্যস্তবর্গ। মিনকোওস্কি স্থানাংকে আদর্শ ফ্লুইডের জন্যে দেখা যায় যে এই ধ্রুবকটি এমন একটি ফ্লুইডের মতো আচরণ করে যার ঘনত্ব ও চাপ হলো :

$$\rho_\Lambda = \frac{\Lambda}{8\pi G} \; ; \; p_\Lambda = -\rho_\Lambda \qquad (৩.২.২২)$$

সংক্ষেপে এই হলো আইনস্টাইনের বিশ্বরূপ। পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে এ ধরনের বিশ্ব পর্যবেক্ষণসম্মত নয়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব সময়-অপ্রতিসম (time asymmetric)। আইনস্টাইনের মূল ক্ষেত্র-সমীকরণ (সমীকরণ ৩.২.১ বা ৩.২.২) অনুসরণ করলে অবশ্য এ ধরনের একটি বিশ্বচিত্র সম্ভব। আমরা দেখেছি, মহাজাগতিক ধ্রুবককে একটি বিকর্ষণী শক্তি হিসেবে দেখানো যায় যা বিশ্বের প্রসারণকে নাকচ করে দেয় যার ফলশ্রুতি হচ্ছে একটি সুস্থির বিশ্ব। এই ধ্রুব পদ সংযোজনের বিষয়টিকে আইনস্টাইন তাঁর জীবনের "সবচেয়ে বড়

ভুল" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। মজার ব্যাপার এই যে, প্রাথমিক বিশ্বে অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য অনেক বিজ্ঞানীই আজকাল এই ধ্রুবকটির একটি অশূন্য মানের পক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছেন। এবং যুক্তিগুলো নেহায়েতই ফেলনা নয় (অনুচ্ছেদ ৩.১৩ দ্রষ্টব্য)।

ডি সিটার বিশ্ব

১৯১৭ সালে ডাচ বিজ্ঞানী ভিলেম ডি সিটার (Willem de Sitter) একটি সুস্থিত মহাজাগতিক মডেল প্রণয়ন করেন। এটি আইনস্টাইনের মডেল থেকে পৃথক। ডি সিটারের বিশ্বে বস্তুর চাপ ও ঘনত্ব প্রায় শূন্য ($p = 0$; $\rho = 0$) এবং স্থান সমতল ($k = 0$)। এক্ষেত্রে ক্ষেত্র-সমীকরণটি হবে :

$$R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} = \Lambda g_{ij} \qquad (৩.২.১৩)$$

এর সমাধানটি স্থানিকভাবে সুষম এবং দিকনিরপেক্ষ এবং রবার্টসন-ওয়াকার রেখা-অংশের অনুরূপ [১]। আমরা যদি $\Lambda/3 = 1$ ধরি, তবে দেখানো যায় যে মহাজাগতিক সমীকরণগুলো হলো (সমীকরণ ৩.২.২১ ও ২৪ দ্রষ্টব্য) :

$$\frac{\ddot{a}}{a} = 1 \text{ এবং } \left(\frac{\dot{a}}{a}\right) = 1 - \frac{1}{a^2 R^2} \qquad (৩.২.১৪)$$

ক্ষেত্র-সমীকরণের বিভিন্ন সমাধান সম্ভব। যেমন একটি প্রসারমান বিশ্বের জন্য যদি $a \propto e^{t}$ হয় তবে $R^{-2} = 0$ (সমীকরণ ৩.২.২৪ থেকে যদি $\rho_b = 0$ এবং $\Lambda/3 = 1$ হয়) এবং

$$ds^2 = dt^2 - e^{2t} (dr^2 + r^2 d\Omega) \qquad (৩.২.১৫)$$

ডি সিটার বিশ্বে কোনো নমুনা কণিকা (test particle) রাখলে মহাজাগতিক ধ্রুবক এদের মধ্যকার পারস্পরিক দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়—অনেকটা প্রসারণের অনুরূপ। আইনস্টাইন ও ডি সিটার বিশ্বকে একত্রে এডিংটন বলতেন ; "আইনস্টাইনের বিশ্বে বস্তু আছে কিন্তু কোনো গতি নেই ; ডি সিটার বিশ্বে বস্তু নেই কিন্তু গতি আছে"। সম্প্রতি স্ফীতিশীল বিশ্বের তত্ত্ব (অনুচ্ছেদ ৩.৯) উদ্ভবের পর ডি সিটার বিশ্বের আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। দেখা গেছে, স্ফীতির তত্ত্বানুযায়ী আদি বিশ্ব কিছু সময়ের জন্য সূচকীয়হারে প্রসারিত হয়েছিল—যা আমরা উপরেই দেখেছি ($a \propto e^{t}$), এ ধরনের বিশ্বে কোয়ান্টাম ক্রিয়াজনিত কারণে ফ্লুইডের দশা-সমীকরণ হবে : $p \approx -\rho c^2$।

আধুনিক বিশ্বতত্ত্ব এবং রবার্টসন-ওয়াকার রেখা-অংশ

রুশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান কর্তৃক ১৯২২ সালে প্রদর্শিত ক্ষেত্র-সমীকরণের সমাধান প্রণালী অনুসরণ করে এই মডেল প্রণীত হয়েছে। ১৯২৭ সালে জর্জ লেমাইটারও

---

১. অর্থাৎ এটি $ds^2 = dt^2 - \alpha(t)^2 dl'^2$ ফর্মের যেখানে $dl'^2 = \frac{dr^2}{1 - \frac{r^2}{R^2}} + r^2 d\Omega$।

অনুরূপ মডেল দিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে হাওয়ার্ড রবার্টসন ও আর্থার ওয়াকার এই মডেল নিয়ে বিস্তারিত গাণিতিক গবেষণা করেন। এই তত্ত্বের মূলে রয়েছে একটি সময়-অভিলম্বিক সর্বোচ্চ প্রতিসাম্যের রেখা–অংশ যার নাম ফ্রিডম্যান রবার্টসন লেমাইটার ওয়াকার বা সংক্ষেপে রবার্টসন ওয়াকার লাইন এলিমেন্ট বা রেখা অংশ (FRW line element) :

$$ds^2 = c^2dt^2 - a(t)^2 \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2) \right] \quad (৬.২.১৬)$$

এখানে r, θ, ϕ সমগতিময় স্থানাংক ; t সঠিক বা প্রকৃত সময় ; $a(t)$ মহাজাগতিক মাপ উৎপাদক (scale factor) বা প্রসারণ প্যারামিটার (expansion parameter) যা সময় নির্ভর রাশি এবং k বক্রতার মান (+ ১, ০, − ১) নির্দেশ করে ; সাধারণত $c = 1$ ধরা হয়। স্পষ্টতই এ ধরনের লাইন এলিমেন্টবিশিষ্ট কোনো বিশ্ব সুস্থিত হতে পারে না ; এ কারণেই বিশ্বের প্রসারণ ঘটছে : ফ্রিডম্যানের মূল স্বীকার্যটি মেনে নিলে তিনটি পৃথক সম্ভাব্য নকশা পাওয়া যায় : ১. বিশ্ব যথেষ্ট ধীরভাবে প্রসারমান এবং এক সময়ে প্রসারণ বন্ধ হবে, ফলে সংকোচন শুরু হবে এবং এক পর্যায়ে বিশ্বের সমাপ্তি ঘটবে। এই বিশ্ব স্থানিক ভাবে সসীম কিন্তু কোনো সীমারেখা নেই (অনেকটা ভূপৃষ্ঠের মতো) – স্থান ধনাত্মক ভাবে বঙ্কিম ($k = +1$)। ২. বিশ্ব এতো দ্রুত প্রসারমান যে মহাকর্ষ কখনোই এই প্রসারণ বন্ধ করতে পারে না। এক্ষেত্রে স্থান ঘোড়ার জিনের মতো বাঁকানো বা ঋণাত্মক বঙ্কিম ($k = -1$)। ৩. বিশ্বের প্রসারণ গতি শুধু যাতে চুপসে না যায় সে রকম অর্থাৎ প্রসারণ গতি ক্রান্তিক মানের (critical) সমান। স্থান ফ্ল্যাট বা সমতল ($k = 0$)।

এবার রবার্টসন-ওয়াকার লাইন এলিমেন্টের গাণিতিক ধর্মাবলি সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। একটি সুষম এবং দিকনিরপেক্ষ বিশ্বে লাইন এলিমেন্টের জন্য সুবিধাজনক স্থানাংক হলো সমগতিময় সময়-অভিলম্বিক স্থানাংক (comoving time-orthogonal coordinates)। এক্ষেত্রে এক দল দর্শক কল্পনা করা হয় যাদের প্রত্যেকের ঘড়ি পার্শ্ববর্তী দর্শকের সাপেক্ষে মেলানো (synchronized) থাকে এবং যারা আশপাশের পদার্থের গড়বেগের সাথে সমগতিমান। এই বেগের গড়মান নেওয়া হয়েছে যথেষ্ট বড় এমন এক অঞ্চল থেকে যেখানে স্থানীয় বিক্ষোভসমূহ (local fluctuations) অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। স্থানকালে কোনো ঘটনাকে তিনটি স্থানিক স্থানাংক x^α দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এই ঘটনাবিন্দুর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো দর্শকের সময়াংক ধরা যাক $t = x^0$। পৃষ্ঠতত্ত্বের নীতির সুষমতা এবং দিকনিরপেক্ষতা দাবি করে যে গড় ভর ঘনত্ব এবং চাপ কেবল এই জগৎ-কাল (world-time) t এর অপেক্ষক হতে পারে। সুক্ষ্মতা থেকে স্থানীয় বিচ্যুতি অগ্রাহ্য করলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ছায়াপথসমূহ এসব সমগতিময় দর্শকদের সাপেক্ষে (x^α স্থানিক অবস্থানে) নিশ্চল থাকে। এই স্থানাংক লাইন এলিমেন্টকে সাধারণভাবে লেখা যায় :

$$\begin{aligned} ds^2 &= dt^2 + g_{\alpha\beta}dx^\alpha dx^\beta \\ &= dt^2 - dl^2 \end{aligned} \quad (৬.২.১৭)$$

$$= dt^2 \quad a(t)^2 g^0{}_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta$$

এখানে $g_{0\alpha}$ পদসমূহকে বাদ দেওয়া হয়েছে যারা স্থানিক ও কালের স্থানাংককে যোগ করে; সুষমতা এবং দিকনিরপেক্ষতা দাবি করে যে সমীকরণ (৩.২.১৭) ধরনের কোনো মেট্রিক টেন্সরের স্থানিক অংশ কেবল কালের কোনো বিশ্বজনীন অপেক্ষক $(a(t)^2)$ দ্বারাই বিবর্তিত হতে পারে। অর্থাৎ বলা যায় যে একজোড়া সমগতিময় ছায়াপথের মধ্যবর্তী সঠিক ভৌত দূরত্ব (proper physical distance) dl সময়ের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ

$$l(t) \propto a(t)$$
$$\rightarrow l(t) = l_0 a(t) \qquad (৩.২.১৮)$$

l_0 ঐ জোড়ার জন্যে ধ্রুবক। যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি যে t জগৎ–কালের কোনো স্থির মুহূর্তে স্থানিক জ্যামিতি সুষম, কাজেই t এর যেকোনো স্থিরমানের জন্য লাইন এলিমেন্টের স্থানিক অংশটি সমীকরণ (৩.২.২) এর ডানপাশের dl^2 এর পরবর্তী অংশ দ্বারা নির্দেশিত হয়। কাজেই সাধারণভাবে সময়–নির্ভর সম্পূর্ণ লাইন এলিমেন্টটিকে লেখা যায় :

$$dx^2 = dt^2 \quad a(t)^2 \left[\frac{dr^2}{1 - \frac{r^2}{R^2}} + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \right] \qquad (৩.২.১৯)$$

$$= dt^2 - a(t)^2 R^2 [d\chi^2 + \sin^2\chi d\Omega]$$

এখানে R ধ্রুব এবং প্রকৃত দূরত্ব $a(t)R$, যেখানে $a(t)$ মাপ উৎপাদক। দ্বিতীয় সমীকরণটিকে অরীয় স্থানাংককে লেখা হয়েছে যেখানে $r = R \sin\chi$। এখানে কৌণিক অংশটিকে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে : $d\Omega = d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2$ এবং সর্বত্র স্বভাবতই $c = 1$।

এবার একটি সমগতিময় গোলকের কথা ভাবা যাক- অর্থাৎ এমন একটি গোলক যা আশপাশের পদার্থের গড় প্রসারণবেগের সাথে একই বেগে প্রসারিত হয়, যাতে করে গোলকের পৃষ্ঠের কোনো অংশ থেকে পদার্থের কোনো নিট বহির্প্রবাহ না থাকে (ক্ষুদ্র বিচ্যুতি অগ্রাহ্য করে)। ফলে ঐ গোলকের সঠিক ভৌত ব্যাসার্ধ বৃদ্ধির হার পাওয়া যায় সমীকরণ (৩.২.১৬) থেকে। গোলকের ব্যাসার্ধের ত্বরণ নিউটনীয় বলবিজ্ঞান প্রয়োগ করে সহজেই পাওয়া যায় (সমীকরণ ৩.২.৭)। কারণ বাকহফের উপপাদ্য অনুযায়ী গোলকের বাইরের পদার্থের ভেতরের পদার্থের উপর কোনো মহাকর্ষীয় প্রভাব নেই। যেহেতু সমীকরণ (৩.২.৭) l এর সাপেক্ষে রৈখিক কাজেই l_0 দিয়ে উভয়পক্ষকে ভাগ করে সরাসরি লেখা যায় :

$$\frac{\ddot{a}}{a} = \frac{4}{3}\pi G(\rho + 3p) \qquad (৩.২.২০)$$

নক্ষত্র, ছায়াপথ কিংবা বিকিরণে যে সাধারণ পদার্থ থাকে তাদের ক্ষেত্রে ঘনত্ব ও চাপের গড়মানসমূহের ($\rho_b(t)$ ও $p_b(t)$) এবং মহাজাগতিক ধ্রুবকের (সমীকরণ ৩.২.১২) যোগফল লেখা হলে সমীকরণ (৩.২.২০) দাঁড়ায় :

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4}{3}\pi G(\rho_b + p_b) + \frac{\Lambda}{3} \qquad (৩.২.২১)$$

এটাই মহাজাগতিক প্রসারণের ত্বরণের প্রমিত আপেক্ষিক তত্ত্বীয় প্রকাশ। আমরা সমীকরণ (৩.২.৮) ব্যবহার করে সরাসরি লিখতে পারি :

$$\dot{\rho}_b = -3(\rho_b + p_b)\frac{\dot{a}}{a} \qquad (৩.২.২২)$$

লক্ষণীয় যে, সমীকরণ ৩.২.২১ ও ২২ l_0 থেকে মুক্ত এবং এটার অর্থ এই সম্পর্কগুলি গোলকের ইচ্ছামূলক (arbitrary) ব্যাসার্ধের উপর একেবারেই নির্ভর করে না। আবার সমীকরণ ৩.২.৮ ও ৯ ব্যবহার করে এবং ৩.২.২২ এর সাহায্যে চাপকে প্রতিস্থাপন করে ৩.২.২১ এর প্রথম সমাকল পাওয়া যায় :

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8}{3}\pi G\rho_b + \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda}{3} \qquad (৩.২.২৩)$$

k সমাকলনের ধ্রুবক। সমীকরণ (৩.২.২১) ও (৩.২.২৩)কে **মহাজাগতিক সমীকরণ** (cosmological equations) বলে।[২] সমীকরণ (৩.২.২৩) এর অধিকতর সাধারণ রূপটি হলো :

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8}{3}\pi G\rho_b \pm \frac{1}{a^2R^2} + \frac{\Lambda}{3} \qquad (৩.২.২৪)$$

এখানে দেখানো যায় যে k ও R পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং R হলো মূলবিন্দু থেকে ত্রিমাত্রিক গোলকের (three sphere)[৩] ধ্রুব-দূরত্ব। H হলো হাবলের প্যারামিটার। বক্রতা ধনাত্মক হয় যদি স্থানের জ্যামিতি উন্মুক্ত হয়; ঋণাত্মক হয় যদি স্থানের জ্যামিতি আবদ্ধ হয়।[৪]

বিশ্বের রক্তিমসরণ যখন $z \leq 1000$ ছিল তখন বস্তুর তুলনায় পদার্থের চাপের তুলনায় ছিল অত্যধিক বেশি ($p_b << \rho_b$)। ফলে এই সময়ে স্থানের বক্রতা এবং মহাজাগতিক ধ্রুবকের মান তার ঘনত্বের মানের তুলনায় ছিল উপেক্ষণীয়ভাবে ক্ষুদ্র। কাজেই সমীকরণ (৩.২.২২) থেকে লেখা যায় : $\dot{\rho}_b = -3\rho_b\frac{\dot{a}}{a}$ যার সমাধান :

$$\rho_b(t) \propto \frac{1}{a(t)^3} \qquad (৩.২.২৫)$$

এই সমীকরণের অর্থ হলো এই যে প্রতি একক আয়তনে তার আয়তনের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। এর কারণ হলো সমগতিময় গোলকের সার্বিক আয়তন সময়-নির্ভর হয়

---

২. ফ্রিডমান-লেমাইটর মডেলের এই সমীকরণদ্বয়কে নিউটনীয় বলবিজ্ঞান থেকেও আরেক ভাবে মিলানো ও যাচাইকরা দেখিয়েছেন। দেখুন Narlikar (1996)

৩. Three sphere হলো কোনো বেলুনের দ্বিমাত্রিক পৃষ্ঠের ত্রিমাত্রিক অনুরূপ

৪. আমরা যে ফুটন এলিমেন্ট (সমীকরণ ৩.২.১৯) ব্যবহার করেছি এর জ্যামিতি আবদ্ধ। উন্মুক্ত ও ধনাত্মক জ্যামিতির লাইন এলিমেন্ট হলো $ds^2 = dt^2 - a(t)^2R^2[d\chi^2 + \sinh^{-1}\chi d\Omega]$।

$a(t)^3$ এর সমানুপাতিক [৫]। যাহোক ভর-ঘনত্ব যদি প্রাধান্য বিস্তার করে তবে সমীকরণ (৩.২.২৪) থেকে লেখা যায় :

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8}{3}\pi G\rho_b \qquad (৩.২.২৬)$$

প্রসারমান বিশ্বের জন্য সমীকরণ ৩.২.২৫ ও ২৬ এর সমাধানকে লেখা যায় :

$$a \propto t^{2/3} \quad \text{এবং} \quad t = \frac{2}{3H} = \frac{1}{(6\pi G\rho_b)^{1/2}} \qquad (৩.২.২৭)$$

[জগৎ কালের মূলবিন্দুতে $\rho \to \infty$ হলে $a \to 0$] এই সমাধানকে **আইনস্টাইন-ডি সিটার সমাধান** বলে। সমীকরণ (৩.২.২৪)কে অন্যভাবেও লেখা যায় :

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \left(\frac{\xi_0}{1+z}\right)^2 = H_0^2\,[\Omega(1+z)^3 + \Omega_R(1+z)^2 + \Omega_\Lambda] \qquad (৩.২.২৮)$$

এবং মহাজাগতিক ত্বরণের সমীকরণ (৩.২.২১) দাঁড়ায় :

$$\frac{\ddot{a}}{a} = H_0^2\left[\Omega_\Lambda - \frac{\Omega(1+z)^3}{2}\right] \qquad (৩.২.২৯)$$

এখানে Ω_R , Ω_Λ এবং Ω ধ্রুবক। এদের সংজ্ঞা হলো :

ঘনত্ব প্যারামিটার : $\Omega = \dfrac{\rho_0}{\rho_c} = \dfrac{8\pi G\rho_0}{3H_0^2}$ (৩.২.৩০)

ρ_0 হচ্ছে গড় ভর ঘনত্বের বর্তমান মান এবং গড় ঘনত্ব $\rho_b \propto a^{-3} \propto (1+z)^3$।

বক্রতা প্যারামিটার : $\Omega_R = \dfrac{1}{(a_0 H_0 R)^2}$ (৩.২.৩১)

এটা উন্মুক্ত বিশ্বের জন্য ধনাত্মক কিন্তু আবদ্ধ বিশ্বের জন্য ঋণাত্মক (কারণ R কাল্পনিক)।

এবং **মহাজাগতিক ধ্রুবকের সাথে সংশ্লিষ্ট প্যারামিটার :** $\Omega_\Lambda = \dfrac{\Lambda}{3H_0^2}$ (৩.২.৩২)

যদি পদার্থের চাপ প্রাধান্য বিস্তার করে তবে : $\Omega + \Omega_R + \Omega_\Lambda = 1$ (৩.২.৩৩)

প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন মডেলে এই তিনটি প্যারামিটারের প্রভাব সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। লেমাইটারের প্রসারমান পদার্থ-শাসিত বিশ্ব মডেলে Ω এবং Ω_R এর মান এমন যে তা একটি নির্দিষ্ট রক্তিম সরণবিশিষ্ট অতীত মুহূর্তের কথা বলে যা থেকে প্রসারণের শুরু। তিনি

---

৫. যদি বক্রতার মান ($\propto a^{-2}$) প্রাধান্য বিস্তার করে এবং ধনাত্মক (উন্মুক্ত জ্যামিতিক স্থান) হয় তবে $a = (t-k)/R$। যদি মহাজাগতিক ধ্রুবক Λ প্রাধান্য বিস্তার করে তবে সমাধানে হাইপারবোলিক সাইন ও কোসাইন-পদ আবির্ভূত হয়।

এর নাম দিয়েছিলেন Primeval atom। এই অতি ঘন অবস্থায় $a \to 0$। আইনস্টাইন ও ডি সিটার ১৯৩২ সালে যুক্তি দিলেন যে বিশ্বের সবচেয়ে সহজ মডেল হচ্ছে যেখানে $\Omega = 1$। কারণ সমীকরণ (৩.২.২৮) থেকে দেখা যায় একমাত্র ঘনত্ব পদটিই উপেক্ষণীয় হতে পারে না (এবং তাই Ω_R ও Ω_Λ উপেক্ষণীয়)। এই আইনস্টাইন ডি সিটার মডেলে সমীকরণ (৩.২.২৭) অনুসারে $a \propto t^{2/3}$ এবং $H_0 t_0 = 2/3$ এবং লাইন এলিমেন্টটি হলো :

$$ds^2 = dt^2 - a(t)^2 [dr^2 + r^2 d\Omega] \qquad (৩.২.৩০)$$

এই স্থানকাল মহাজাগতিকভাবে সমতল (ব্র্যাকেটবন্দী অংশটি সমতল স্থান নির্দেশ করে)। ১৯৭০এ ভিকি প্রস্তাব করেন যে যেহেতু স্ফীতির কারণে বিশ্ব সমতল হয়ে যায় এবং যেহেতু মহাজাগতিক ধ্রুবকের মহাজাগতিক দিক দিয়ে শুরু গুরুত্ব তেমন কোনো প্রভাব নেই, কাজেই বর্তমান সময়ে যদি ঐ তিনটি প্যারামিটারের একটি বেশি গুরু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তবে তা হবে চমৎকার সংঘটন। যদি সমীকরণ (৩.২.২৮) এর ডানপাশে কোনো পদপদ আসে তবে বলা যায় বিশ্বের অতীতে বা ভবিষ্যতে প্রসারণের পরিবর্তে সংকোচন শুরু হবে। যদি $\Lambda = 0$ হয় এবং বিশ্ব যদি আবদ্ধ হয় তবে $\Omega_R < 0$, কাজেই ভবিষ্যতে a শূন্য হবে, অর্থাৎ বিশ্বের ইতিহাসে এক 'মহাসংকোচন' বা Big Crunch সংঘটিত হবে। প্রমিত উষ্ণ মহাবিস্ফোরণ মডেলে (standard hot Big Bang model) অবশ্য বিশ্বের প্রসারণ থেকে বলা যায় যে অতীতে বিশ্বের রক্তিম সরণ ছিল অত্যুচ্চ। এ অবস্থায় প্রসারণের হারকে আইনস্টাইন ডি সিটার সীমা বলে :

$$H = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right) = \left(\frac{2}{1+z}\right) = H_0 \Omega^{(1/2)} (1+z)^{3/2} \qquad (৩.২.৩১)$$

যার সমাধান হলো : $t = \frac{2}{3H}$।

আইনস্টাইনের চিরায়ত মডেলে সময়ের কোনো শুরু অথবা শেষ ছিল না। মনে করা হতো, এটা অতীত এবং ভবিষ্যতে অসীমভাবে বিস্তৃত। কিন্তু আধুনিক মডেলে দেখানো যায়, সময়ের একটি শুরু এবং (সম্ভবত) একটি শেষ আছে। ১৯৭০ সালে স্টিফেন হকিং ও রজার পেনরোজ প্রমাণ করেছেন যে, যদি সাধারণ আপেক্ষিকতা সত্য হয় এবং বিশ্ব পদার্থ প্রভাবিত হয় তবে আদিতে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে কোনো এক ব্যতিক্রমী বিন্দু (singularity) থেকে। এই উপপাদ্যের নাম সিংগুলারিটি থিওরেম। এভাবে অতীত থেকে ভবিষ্যতে অনিরুদ্ধ সময়ের একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ অনুভব করি। সুনির্দিষ্ট এই কাল শর (arrow of time) ব্যাখ্যা করতে বিশ্বের এনট্রপি এবং তাপগতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিধি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এমনও বলা হচ্ছে, আদি ব্যতিক্রমী বিন্দু (Big Bang singularity) এবং সর্বশেষ ব্যতিক্রমি বিন্দু (Big Crunch singularity) (যার সাথে কৃষ্ণাবিবরের ব্যতিক্রমী বিন্দুর সাদৃশ্য আছে) অভিন্ন নয়। অবশ্য এটি পৃথক বিষয়। এ সমস্ত তাত্ত্বিক ধারণাসমূহকে ভিত্তি করে বিশ্বের পূর্বাপর ইতিহাসের একটা রূপরেখা অংকন করা যায়। বিশ্ব সম্পর্কিত যেকোনো ধরনের মডেল প্রণয়ন করতে হলে একটি স্বতঃসিদ্ধ মেনে নেওয়া হয়। এর নাম সৃষ্টিতত্ত্বের

নীতি (cosmological principle)। এডওয়ার্ড এ মিল্নে একটি প্রথম স্বতঃসিদ্ধাকারে প্রস্তাব করেন। নীতিটি হলো "বিশ্ব সমসত্ত্ব এবং দিক্‌নিরপেক্ষ" অর্থাৎ যেকোনো দিকে এবং যেকোনো স্থান থেকে বিশ্বকে একই রকম দেখাবে; এটি কোনো প্রমাণিত পর্যবেক্ষণ নয়, বিমূর্ত ধারণামাত্র। তবে এর উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা বিশ্বচিত্র যথেষ্ট কার্যকর, তাই এতে অবিশ্বাসের কিছু নেই (চিত্র ১.১)।

প্রমাণ উষ্ণ মহাবিস্ফোরণ মডেল

ফ্রিডমান-রবার্টসন-ওয়াকার মডেলের সাধারণ অনুমিতিটি হলো, কোনো এক সুদূর অতীতে সমস্ত বস্তুনিচয় একত্র ছিল; অর্থাৎ ছায়াপথদের মধ্যে দূরত্ব ছিল শূন্য। এই মুহূর্তটিরই নাম দেওয়া হয়েছে মহাবিস্ফোরণ বা Big Bang। সে সময়ের বিন্দুবৎ বিশ্বের তাপমাত্রা, ঘনত্ব ছিল অত্যধিক (প্রায় অসীম)—এটিই আদিম ব্যতিক্রমী বিন্দু। এই ব্যতিক্রমী বিন্দুর প্রবল বিস্ফোরণে বর্তমান বিশ্বের সৃষ্টি। আর এ জন্যেই বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। আদি সেই প্রচণ্ড শক্তির অবশেষ আজ পাওয়া যাচ্ছে মাইক্রোতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ রূপে। এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জর্জ গ্যামো, ডি সিয়ামা, লেমাইটার প্রমুখ।

প্রমাণ উষ্ণ মহাবিস্ফোরণ মডেলের সাধারণ স্বীকার্যগুলি হলো :

১. ল্যাবরেটরিতে পদার্থবিজ্ঞানের যেসব আইন পরীক্ষাভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো বিশ্বের প্রাথমিক মুহূর্তেও প্রযোজ্য। (তবে GUT, পরমপ্রতিসাম্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়)। ধরে নেওয়া হয়েছে, বিশ্বের সর্বত্র স্থানকালের জ্যামিতি নির্ধারিত হয় সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব দ্বারা।

২. যেকোনো অবস্থাতেই সৃষ্টিতত্ত্বের নীতি প্রয়োগযোগ্য।

৩. কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শর্তাবলির উপস্থিতি : বিশ্বের কোনো মুহূর্ত t_i তে তাপমাত্রা $T_i > 10^{12}$ কেলভিন এবং সে সময়ে বিশ্বের পদার্থসমূহের তাপীয় সুস্থিতিতে অবস্থিতি ; Ω এর মান এককের কাছাকাছি ; ব্যারিয়ন (সংখ্যার) অপ্রতিসাম্য (অনুচ্ছেদ ৩.৮ দ্রষ্টব্য) ; এবং কাঠামোর সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ঘনত্ব-বিক্ষোভের উপস্থিতি।

বিশ্বসৃষ্টির এই প্রমিত মডেলের চারটি যুগান্তকারী সাফল্য হলো :

১. মহাবিশ্বের প্রসারণ

২. পটভূমি বিকিরণের উপস্থিতি

৩. হাল্কা মৌলের পর্যবেক্ষণসম্মত অনুপাত

৪. ছায়াপথ এবং অন্যান্য মহাজাগতিক কাঠামো তৈরির প্রয়োজনীয় প্রয়োগযোগ্য গাণিতিক প্রক্রিয়া এবং তাদের সংশোধনোপযোগিতা।

তারপরও এই মডেলের কিছু অব্যাখ্যাত সমস্যা আছে :

১. প্লাংকের সময়ের ($\sim 10^{-43}$ সেকেন্ড) পূর্বে বিশ্বের বিবর্তন
২. দিগন্তের সমস্যা
৩. সমতার সমস্যা
৪. মসৃণতার (অতিমাত্রায় সুষমতা ও দিকনিরপেক্ষতার) সমস্যা
৫. অদৃশ্য বস্তুর (dark matter) সমস্যা
৬. ব্যারিয়ন অপ্রতিসাম্য
৭. $T>600$ GeV শক্তিতে বিশ্বের বিবর্তন।

দেখা যাচ্ছে, সমাধানের চাইতে সমস্যার সংখ্যাই বেশি। তবে কণা পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম তত্ত্ব প্রয়োগ করে ৫, ৬, ও ৭ নং সমস্যাগুলের আপাত সমাধান পাওয়া গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু এই পরিবর্তিত বিশ্বচিত্রে আবার চৌম্বক একমেরু ও মহাজাগতিক ধ্রুবকের অশূন্য মানের উপস্থিতি পীড়া দেয়। স্ফীতিশীল বিশ্বের মডেল ২, ৩ ও ৪নং সমস্যা এবং চৌম্বক একমেরুর সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম।

একটি প্রশ্ন প্রায়শই শোনা যায়, যেহেতু বিশ্বের জন্ম হয়েছে একটি বিন্দু থেকে সেহেতু এর কেন্দ্র বলে কি কিছু আছে? না, নেই। কারণ মহাবিস্ফোরণের সাথে সাথে স্থানকালেরও জন্ম হয়েছে, কাজেই প্রশ্নটি অর্থহীন। বলা হয়ে থাকে, **মহাবিস্ফোরণ ঘটেছে মহাবিশ্বের প্রতিটি এবং যেকোনো বিন্দুতে।**

৩.৩ প্রসারমান বিশ্ব

যুগ যুগ ধরে মানুষ জেনে এসেছিল যে পৃথিবী সবকিছুর কেন্দ্রে—সৌরজগতের কেন্দ্রে, সমগ্র বিশ্বজগতের কেন্দ্রে। কিন্তু কোপার্নিকাসের রেপ্লবিক মডেলের মাধ্যমে পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়। সেখানে প্রতিষ্ঠা হয় সূর্যের। এটাই সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ।

পরবর্তীকালে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র থেকেও বিচ্যুত হয়। হালে শেপলীর গবেষণা থেকে জানা যায় পৃথিবী আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্র থেকেও ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। আসলে বিশ্বের কেন্দ্র বলতে কিছুই নেই, এটাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা। এবং আধুনিক বিশ্বচিত্রের একটি স্বীকার্য হলো সৃষ্টিতত্ত্বের নীতি : যে কোনো স্থান থেকে বিশ্বকে একই রকম দেখবে। বিশ্ব দিকনিরপেক্ষ এবং সমসত্ত্ব। মানুষের আরো একটি বিশ্বাস ছিল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্থানকাল ব্যাপী সুস্থিত। কিন্তু দূরবর্তী খ-বস্তুসমূহের ছায়াপথ, নীহারিকা) রক্তিমসরণ (redshift) দেখায় যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ত সম্প্রসারমান।

বিশ্বজনীন রক্তিমসরণ ব্যাখ্যা করার আগে ডপলার ক্রিয়া (Doppler effect) বুঝতে হবে। ১৮৪২ সালে ক্রিশ্চিয়ান ডপলার দেখান যে উৎস ও দর্শকের দৃষ্টিরেখা (line of sight)

বেগের উৎস ও দর্শকের আপেক্ষিক গতিবেগ যতো বেশি হবে উৎসের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সরণও ততো বেশি হবে। যে কোনো তরঙ্গের জন্য এটি প্রযোজ্য। রেলস্টেশনে দাঁড়ালে কাছে আসা ট্রেনের বাঁশি তীব্রতর মনে হয় কিন্তু ক্রমশ অপসৃয়মান ট্রেনের বাঁশি মৃদু থেকে মৃদুতর মনে হয়। একই ভাবে কোনো নক্ষত্র যদি পৃথিবীর দিকে বা পৃথিবী থেকে দূরে সরে যায় তাহলে তাদের বর্ণালির আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যথাক্রমে ছোটর দিকে এবং বড়র দিকে সরে যাবে। প্রথমটিকে নীল সরণ (blueshift) এবং পরেরটিকে রক্তিমসরণ বলে। কাজেই কোনো নক্ষত্রের বর্ণালিরেখার সরণ দেখে তার গতির দিক জানা যায়। ধরা যাক, পরীক্ষাগারে দেখা কোনো নির্দিষ্ট বর্ণালিরেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ_0; মনে করা যাক একই বর্ণালিরেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্য কোনো নক্ষত্রে তরঙ্গ λ। তাহলে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সরণ হবে : $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$

তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ভগ্নাংশীয় পরিবর্তন : $z = \Delta\lambda/\lambda = (\lambda - \lambda_0)/\lambda$ (৩.৩.১)

এবং ডপলার প্রভাব কারণে যে সম্পর্ক : $z = v/c$ (৩.৩.২)

তার অর্থ : $v = (\Delta\lambda/\lambda)c$; v হচ্ছে দর্শক ও উৎসের মধ্যে আপেক্ষিক বেগ; এক্ষেত্রে সর্বদা $v \ll c$, c আলোর বেগ। $z = 0.1$—এর অর্থ কোনো উৎসের সকল বর্ণালিরেখার তরঙ্গসমূহের দশ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু যদি v এর মান আলোর দ্রুতির এক তৃতীয়াংশের সমান বা তার বেশি হয় তখন $z = v/c$ সংশোধনের প্রয়োজন হয়। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বানুযায়ী তখন লেখা যায় :

$$z = \left[\frac{1 + v/c}{1 - v/c}\right]^{1/2} - 1 \qquad (৩.৩.৩)$$

দূরের ছায়াপথের জন্য $z = 1$ এবং কিছু কিছু কোয়াসারের জন্য $z = 4$ দেখা যায়। কাজেই কোনো ছায়াপথের বর্ণালির রক্তিমসরণ হলো ঐ ছায়াপথের দূরত্ব r এর সমানুপাতিক একটি মহাজাগতিক বস্তু এবং বড় গতিতরঙ্গের সাপেক্ষে দৃষ্টিরেখা বরাবর ছায়াপথটির গতির দরুন ছোট ও ডপলার সরণের যোগফলের সমান :

$$c\frac{\delta\lambda}{\lambda} \equiv cz = H_0 r + v \qquad (৩.৩.৪)$$

এখানে $H_0 r$ হলো মহাজাগতিক রক্তিমসরণের রাশি, H_0 হলো হাবলের ধ্রুবক এবং v হলো বিচিত্র গতিবেগ (peculiar velocity) বড় গতিবেগের সাপেক্ষে ছায়াপথের গতির দৃষ্টিরেখা বরাবর উপাংশের (line of sight component) বিচিত্র গতিবেগ বলে। এই বিচিত্র গতিবেগ স্বাভাবিক ক্ষেত্রে মাত্র ডপলার সরণ সৃষ্টি করে : $\frac{\delta\lambda}{\lambda} = \frac{v}{c}$। রক্তিমসরণ ও দূরত্বের মধ্যে এই রৈখিক সম্পর্ক ঘটে যদি $H_0 r$ ও v আলোর দ্রুতির তুলনায় নগণ্য হয়। যদি বিচিত্র গতিবেগ নগণ্য হয় তবে সমীকরণ (৩.৩.১) ও (৩.৩.৪) ব্যবহার করে দূরত্বকে রেডশিফ্টের একক্ষেত্রে মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় :

$$H_0 r = cz = c\frac{\delta\lambda}{\lambda} \qquad (৩.৩.৫)$$

১৯১৪ সালে ভেস্তো এম. স্লিফার ও 'কুণ্ডলিত নীহারিকাদের' বর্ণালি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি ১৫টির মধ্যে ১১টিরই রক্তিমসরণ দেখতে পান। কয়েক বছর পর জানা যায় যে এরা আসলে ছায়াপথ (galaxy)। এডুইন পি. হাবল এদের নিয়ে গবেষণা করছিলেন। অধিকাংশ ছায়াপথ কর্তৃক প্রদর্শিত রক্তিমসরণ (যার অর্থ এদের অপসরণ বেগ) হাবলকে কৌতূহলী করে তোলে এবং তিনি নিয়মমাফিক অনুসন্ধান শুরু করেন। ১৯২৯ সালে তিনি দেখতে পেলেন যে ছায়াপথসমূহের অপসরণ বেগ তাদের দূরত্বের সমানুপাতিক। বর্তমানে এটি হাবল বিধি নামে পরিচিত। এটি হলো :

$$v = H_0 l \qquad (৩.৩.৬)$$

H_0 হচ্ছে হাবল ধ্রুবক এবং l হচ্ছে স্থির ভৌত দূরত্ব। এই বিধির সাহায্যে কোনো ছায়াপথের শুধু রক্তিমসরণ জানা থাকলে এর দূরত্ব পাওয়া যায়। দূরত্ব ও বেগের এই রৈখিক সম্পর্কের মাধ্যমে বলা যায় বিশ্ব সুষমভাবে প্রসারমান। হাবল ধ্রুবকের মান নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে। যেহেতু মহাকর্ষ বিশ্বের সম্প্রসারণকে মন্দীভূত করেছে, তাই এ ধ্রুবকের মান সব সময়ে এক রকম ছিল না। মনে হয় আসলে এটা কোনো ধ্রুবকই নয়। সৃষ্টিতত্ত্বের নীতি অনুযায়ী সুষম এবং দিকনিরপেক্ষ বিশ্বের ক্ষেত্রে দুটি বস্তুর মধ্যে t সময়ে প্রকৃত দূরত্ব $r(t)$ হলো একটি সময়নির্ভর মাপ উৎপাদক $a(t)$ এবং কোনো ইচ্ছামূলক সময়ে এদের মধ্যের স্থির দূরত্ব l_0 এর গুণফল ; অর্থাৎ সমীকরণ (৩.২.১৮) অনুযায়ী : $l_0 = \frac{l(t)}{a(t)}$। যেহেতু কোনো ছায়াপথের অরীয় বেগ (radial velocity) v_r $l(t)$ এর পরিবর্তনের হার এবং যেহেতু l_0 ধ্রুব, সেহেতু $v_r = \frac{dl(t)}{dt} = l_0 \frac{da(t)}{dt} = \frac{l(t)}{a(t)} \frac{da(t)}{dt}$। কিন্তু হাবল বিধি অনুযায়ী $v_r = H_0 l(t)$; তাহলে সরাসরি লেখা যায় :

$$H = \frac{\dot{a}}{a} \qquad (৩.৩.৭)$$

দেখা যাচ্ছে, হাবল ধ্রুবক আসলে সময়নির্ভর। হাবল ধ্রুবকের মান সম্পর্কে তাই অনিশ্চয়তা সর্বজনবিদিত। বর্তমানে তাই লেখা হয় :

$$H_0 = 100\, h \ \ \mathrm{km.s^{-1}.Mpc^{-1}} \ ; \ 0.5 \le h \le 0.85 \qquad (৩.৩.৮)$$

হাবল ধ্রুবকের বিপরীত মানকে বলা হয় **হাবল সময়** :

$$H_0^{-1} = 0.98 \times 10^{10}\, h^{-1} \ \mathrm{yr.} \qquad (৩.৩.৯)$$

এবং হাবল দৈর্ঘ্যের সংজ্ঞা হলো : $\frac{c}{H_0} = 3000\, h^{-1} \ \mathrm{Mpc}$ (৩.৩.১০)

সমীকরণ (৩.২.৩০) ব্যবহার করে বর্তমান ঘনত্বকে লেখা যায় :

$$\rho_0 = \frac{3\Omega H_0^2}{8\pi G} = \Omega \rho_{crit} = 1.88 \times 10^{-29} \Omega h^2 \ \mathrm{g.cm^{-3}} \qquad (৩.৩.১১)$$

মহাশূন্যে স্থাপিত হাবল স্পেস টেলিস্কোপ (HST) দিয়ে কন্যা স্তবকের (Virgo cluster) দূরত্ব নির্ণয় করা হয়েছে। দূরত্ব নির্ণয়ে সেফাইড বিষমতারা (Cepheid variables) ব্যবহার করা হয় (অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য)। এ কাজে একটি বিশেষভাবে উজ্জ্বল কুণ্ডলিত ছায়াপথ M100 ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে H_0 এর মান পাওয়া যায় 82±17 কি.মি./সে.-মেগাপারসেক। তবে এই মান বিশুদ্ধ নয়। কারণ (ছায়াপথের অভ্যন্তরীণ গতির জন্য) এর

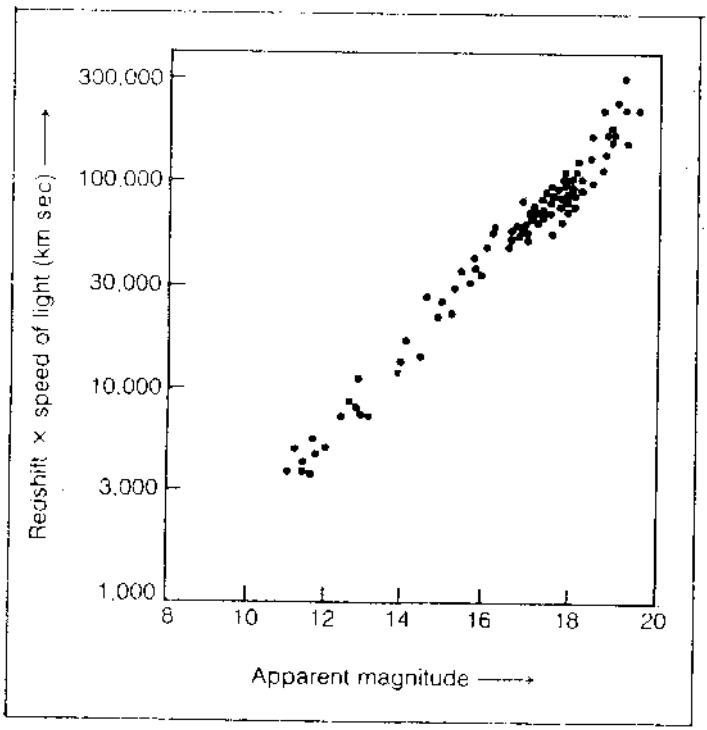

চিত্র ৩.১ : হাবল বিধির লেখচিত্র। এর অনুভূমিক অক্ষে আছে সংশোধিত আপাত উজ্জ্বলতা এবং উল্লম্ব অক্ষে আছে রক্তিমসরণ z। উল্লম্ব অক্ষের অন্যেকটি রাশি log(cz) অপসরণ বেগের আসন্নমান নির্দেশ করে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এ ছায়াপথসমূহের পক্ষে উজ্জ্বলতা ধ্রুবক, তবে আপাত উজ্জ্বলতা দূরত্বের আনুপাতিক হবে। z-এর মান বাড়লে দেখা যায় যে লেখচিত্র সরলরেখা থেকে কিঞ্চিৎ বিচ্যুত হয়।

কিছু উল্লেখযোগ্য অ-হাবল উপাংশ (non-Hubble component) থাকে। এ অসুবিধা দূর করার জন্য কোমা স্তবকের দূরত্ব নির্ণয় করা হয় যার রক্তিমসরণ $cz = 7000$ km. s^{-1}। এদের ক্ষেত্রে হাবল ধ্রুবকের মান পাওয়া যায় 77±16 কি.মি./সে.-মেগাপারসেক। এই দুই উপাত্ত থেকে হাবল ধ্রুবকের মান সাধারণ করা হয় :

$$H_0 = 80 \pm 15 \text{ km/sec-Mpc} \qquad (৩.৩.১৯)$$

দূরত্ব নির্ণয়ের আরেকটি মানদণ্ড হলো (টাইপ টু) সুপারনোভা। অনেকের মতে (যেমন স্মিড, কার্শনার ও ইস্টম্যান) সুপারনোভার ক্রমপ্রসারমান প্রালোকমণ্ডলের (photosphere) সাথে এর পরম উজ্জ্বলতার সম্পর্ক আছে এবং এভাবে দূরত্ব পরিমাপ সম্ভব। M100এর একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ থেকে এর দূরত্ব বের করা হয়েছে এবং এভাবে H_0 এর মান নির্ধারিত হয়েছে 73 ± 9 কি.মি./সে. মেগাপারসেক। আসলে H_0 এর মান 50 এর কাছাকাছি থাকা উচিত। নয়ত বিশ্বের বয়স ছায়াপথের বৃদ্ধ তারাদের চেয়ে কম হয়ে যায়। একমাত্র অ্যালন স্যান্ডাজই H_0 এর মান (টাইপ-ওয়ান সুপারনোভা ব্যবহার করে) নির্ধারণ করেছেন 52 ± 4 কি.মি./সে.-মেগাপারসেক। (টাইপ-ওয়ান) সুপারনোভার সময়-নির্ভর উজ্জ্বলতা থেকে এর দূরত্ব বের করে রিয়েস, প্রেস ও কার্শনার দেখান যে H_0 এর মান 67+7 কি.মি./সে.-মেগা পারসেক। আসলে H_0 এর মানের অনিশ্চয়তা আসে দূরত্ব নির্ণয়ে অনিশ্চয়তা থেকে, আর সেজন্যেই বিশ্বের বয়সও অনিশ্চিত (কারণ বিশ্বের বয়স হাবল ধ্রুবকের বিপরীত মানের সমান)।

অতি সম্প্রতি ১৯৯৯ সালের ২৫মে নাসা জানিয়েছে (প্রেস রিলিজ নং : ৯৯-৬৫) যে একদল বিজ্ঞানী হাবল টেলিস্কোপ (HST) ব্যবহার করে হাবল ধ্রুবকের বর্তমান মান নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে আট বছর ধরে ৬৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাপী ছড়ানো ১৮টি ছায়াপথকে হাবল টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এখান থেকে ৮০০টির মতো শেফার্লী বিষমতারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যারা দূরত্ব নির্ণয়ের আদর্শ মাপকাঠি (অনুচ্ছেদ ৬.৪ দ্রষ্টব্য)। আট বছরের এই সুবিস্তৃত গবেষণার দ্বারা বিজ্ঞানীদল অবশেষে H_0 এর একটি সর্বশেষ পরিসৃত মান নির্ধারণ করেছেন এবং আমরা এখন থেকে H_0এর এই নিম্নোক্ত মানই সর্বত্র অনুসরণের চেষ্টা করব :

$$H_0 = 70 \text{ km/sec/Mpc} \qquad (৩.৩.১৩)$$

এই মানে ভুলের সম্ভাবনা বা অনিশ্চয়তা ১০%। এর অর্থ হলো প্রতি ৩.৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের কোনো ছায়াপথ ১৬০,০০০ মাইল/ঘণ্টা বেশি গতিবেগে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

বিশ্বের এই প্রসারণের সঠিক ব্যাখ্যা দেয় আপেক্ষিকতত্ত্ব। এই তত্ত্বমতে মহাশূন্য প্রকৃতপক্ষে দৃঢ় ও সুস্থিত নয়। এটি সময়ের সাথে প্রসারণশীল। হাবল বিচ্যুতি (সমীকরণ ৩.৩.৬) তাৎপর্য এই যে দূরবর্তী কোনো ছায়াপথ থেকে ফোটন পৃথিবীতে আসতে প্রচুর সময় নেয়, ফলে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। ফলে রক্তিমসরণ বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে বেশি রক্তিমসরণ ঘটেছে 3 ডিগ্রি কেলভিন পটভূমি বিকিরণের। এদের রক্তিমসরণ, $z = 1000$। রক্তিমসরণ পর্যবেক্ষণের এটিই সর্বোচ্চ সীমা। যেহেতু অতিদূর কোয়েসারদের রক্তিমসরণ 4, যেহেতু মহাবিশ্বের এক ব্যাপক অঞ্চল ($4<z<1000$ সীমায়) আমরা এখনো পর্যবেক্ষণ করতে পারিনি। হাবল মহাশূন্য দূরবিন বোধহয় এ কাজে সহায়তা করবে।

বিশ্বের এই সম্প্রসারণকে বেলুনের সঙ্গে কল্পনা করা যায়। ধরা যাক, বেলুনের উপর কিছু ফুটকি আছে। এখন বেলুনকে ফুলালে দেখা যাবে ফুটকিগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বিশ্বের পরিস্থিতিও অনুরূপ (চিত্র ৩.৩)। (প্রসারণ-সংকোচন দশার মধ্যবর্তী) বিশ্বজনীন স্থানকাল চিত্রকে একটি বারেল বা পিপার সাহায্যে দেখানো যায় (চিত্র ৩.২)।

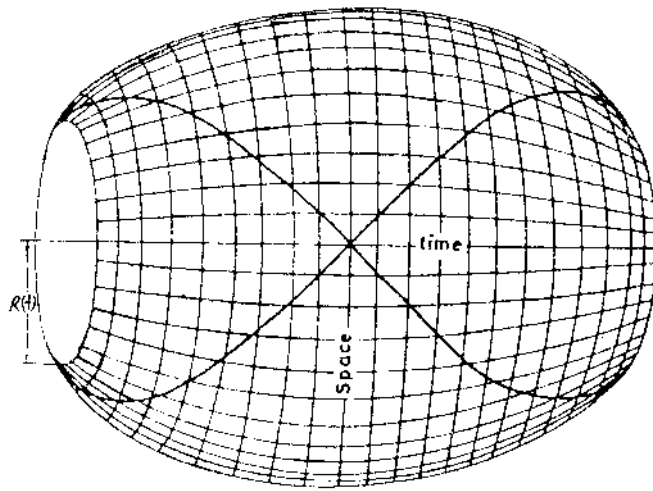

চিত্র ৩.২ : ৩ বঙ্গ বিশ্বের সংকোচন প্রসারণ দশার মধ্যবর্তী অবস্থায় বক্র স্থানকাল। এর প্রতিটি মানের জন্য স্থান অক্ষ অবদ্ধ বৃত্তের সৃষ্টি করে যার ব্যাসার্ধ $R(t)$ এটি চতুর্থ মাত্রায় বিশ্বের ব্যাসার্ধ।

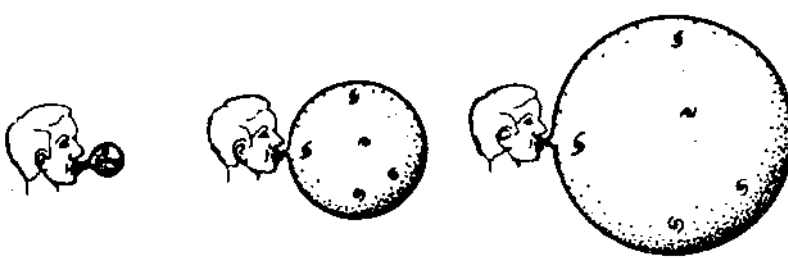

চিত্র ৩.৩ : বিশ্বের বেলুন প্রতিরূপ।

স্থান অক্ষ পিপার চারদিক মুড়ে থাকে। এবং এটি মহাবিশ্বের যে কোনো দিক নির্দেশ করে। প্রতিটি স্থানিক বিন্দুর মধ্য দিয়ে সময় অক্ষ আছে যা পিপার দৈর্ঘ্য বরাবর স্থানকাল পৃষ্ঠ দিয়ে বিস্তৃত। যেহেতু পিপাটি স্থানে ও কালে বক্র সেহেতু এর বক্রপৃষ্ঠস্থ গ্রাফচিত্রের গ্রিডসমূহ বিষম আকৃতির। যখন পিপা চওড়া হয় (বিশ্ব প্রসারিত হয়) তখন গ্রিড বড় হয় এবং যখন পিপা সংকুচিত হয় (বিশ্বের সংকোচন) তখন গ্রিড ক্ষুদ্র হয়। স্মর্তব্য যে, পিপার পৃষ্ঠেরই

শুধু ভৌত গুরুত্ব আছে। পিপার পৃষ্ঠ ও অক্ষদণ্ডের (axle) মধ্যের মাত্রাটি চতুর্থ মাত্রার। এটি বস্তুর ত্রিমাত্রিক জগতের নয়। স্থান অক্ষ পিপার উপর আবদ্ধ বৃত্ত যার পরিধি $2\pi R$ R চতুর্থ মাত্রায় বিশ্বের ব্যাসার্ধ। এটি আসলে সময়ের অপেক্ষক (function)। $t = 0$ সময়ে $R = 0$ থাকে (ফ্রিডম্যানের আবদ্ধ মডেল)। R সম্প্রসারিত হয়ে $t = t_m$ সময়ে সর্বোচ্চ হয় এবং $t = 2t_m$ সময়ে সংকুচিত হয়ে আবারো শূন্য হয়। এই দুই শূন্যাবস্থা চিত্রে নেই। t_m এর মান বিশ্বস্থ ভরের উপর নির্ভর করে। ধরা যাক, স্থানাঙ্ক বরাবর সমান দূরত্বে ছায়াপথসমূহ অবস্থিত। এখন এরা সময়ের সাথে বাহিত হয়ে যায় এবং এভাবে সম্প্রসারণের ফলে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব বেড়ে যায়। সময়ের সাথে মোট ছায়াপথ সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে এবং এদের অন্তর্বর্তী স্থান পরিধি $2\pi R$ অনুযায়ী বাড়ে বা কমে। আসলে স্থানের সম্প্রসারণই ছায়াপথসমূহকে বহন করে নিয়ে যায়। এর তাৎপর্য এই যে ছায়াপথসমূহের অপসরণকে 'গতি' বলা যায় না। যেমন R যখন খুব ছোট ছিল তখন আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ বিশ্বের যে অংশে আছে তার উল্টোদিকের ছায়াপথসমূহ আকাশগঙ্গা ছায়াপথের অনেক কাছে ছিল; কিন্তু এখন 10^{10} বছর পর এরা বিশ্বের অন্যদিকে চলে গেছে (স্থানীয় দর্শকের সাপেক্ষে) কোনো নিজস্ব গতিবেগ ছাড়াই এদের দূরত্ব হয়েছে 10^{10} আলোকবর্ষেরও বেশি। আসলে অপসরণ হারকে 'বেগ' বলা যায় যদি তা আলোর বেগের থেকে কম হয়। কিন্তু ছায়াপথের বেগ না থাকলে তো রক্তিমসরণকে আর ডপলার ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাবে না। তাহলেই আসলে পিপার চিত্রে বিশ্ব যখন প্রসারিত হয় তখন গ্রিডগুলোও বেড়ে যায়। মনে করা যাক, n সংখ্যক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কোনো বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণের সম্মুখ দিক এক শীর্ষে আছে এবং পেছন দিক এক স্থানিক কোষদৈর্ঘ্য পেছনে অপর শীর্ষে আছে (চিত্র ৩.৬)। আরো ধরা যাক, t_1 সময়ে কোনো উপবৃত্তাকার ছায়াপথ এ রকম একটি তরঙ্গ নির্গত করে, যে তরঙ্গের মাথা ছোট গ্রিডের এক কোনা থেকে আরেক কোনায় যায়। এই গ্রিডকে স্থানীয়ভাবে সমতল (flat) মনে করা যায় এবং তরঙ্গের লেজটিও এক কোনা থেকে অন্য কোনায় যায়, তবে একটি শীর্ষ পেছনে থাকে। t_2 সময়ের পর, একটি কুণ্ডলিত ছায়াপথ এই তরঙ্গের মাথা অভিগ্রহণ (intercept) করতে শুরু করে। t_2 সময় পরেও এই তরঙ্গের n সংখ্যক তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকে এবং লেজও এক শীর্ষ পেছনে থাকে, কিন্তু তরঙ্গদৈর্ঘ্য সম্প্রসারিত হয়ে যায়। অর্থাৎ বিশ্বের রৈখিক প্রসারণ-উৎপাদকের সমানুপাতে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। এভাবে সমস্ত বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণই মহাজাগতিক রক্তিমসরণ দেখাবে (অন্য কথায়, ছায়াপথসমূহের অন্তর্বর্তী স্থান বেড়ে যায়)। যে কোনো মহাজাগতিক মডেলের সম্প্রসারণ দশায় রক্তিমসরণ আসলে দূরত্ব ও সময় উভয়েরই একমুখী অপেক্ষক (monotonic function)।

১৯১৭ সালে ডি সিটার যখন তাঁর গবেষণা প্রকাশ করেন তখনই (স্লিফার এবং হুমেসনের গবেষণায়) জানা গিয়েছিল যে নিকটবর্তী বেশ কয়েকটি ছায়াপথের বর্ণালির রেখাগুলোর লাল প্রান্তের দিকেসরণ ঘটেছে। বিশের দশকে দেখা গিয়েছিল যে স্থানীয় স্তবকের (Local Group) বাইরে সব ছায়াপথই বর্ণালির রক্তিমসরণ দেখায় এবং এদের

[illegible] বিন্দুরূপ হিসেবে [illegible] দেখা যায়। অবশ্য [illegible] এই মহাকাশীয় [illegible] করে [illegible] অবস্থান ও গতিবেগের জন্য প্রারম্ভিক শর্তাবলি (initial conditions) নির্দেশ করা হয় তার উপর। [illegible] সময়ে [illegible] ১৯৬৪ [illegible] ১৯৬৫ [illegible] ১৯৬৬

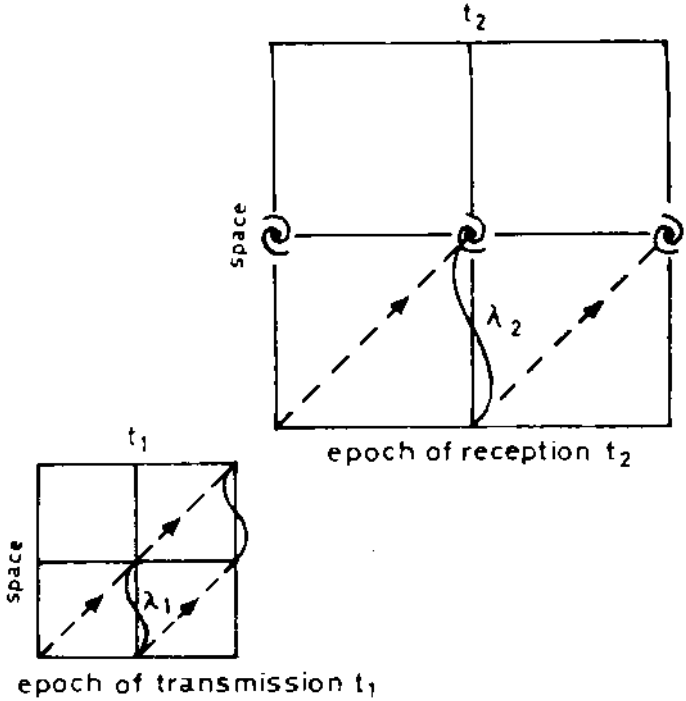

চিত্র ৩.৪ [illegible] A ও B [illegible]

[illegible] হয়। [illegible] বস্তুদের [illegible] এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে [illegible] করে [illegible] স্থিরীকরণ [illegible] কর্তৃক সংযোজিত স্থির অবস্থানাঙ্ক (0,0) সহ। [illegible] তবে এ তরঙ্গপথসমূহের আপেক্ষিক গতিবেগ যে তরঙ্গপথের [illegible] তার উপর নির্ভর করে না। এক্ষেত্রে তরঙ্গপথের রাশিমানসংক্রান্ত দূরত্বের আনুপাতিক। রবার্টসন (১৯৯৮) দেখিয়েছিলেন যে এই সংজ্ঞা ও রৈখিক সম্পর্ক [illegible] তরঙ্গপথসমূহের [illegible] হারজের মাপা তরঙ্গপথসমূহের দূরত্বের

পরিপন্থী নয়, বরং রবার্টসন অনুপাতের ধ্রুবকটির পরবর্তীতে হাবল কর্তৃক প্রদত্ত মানের মোটামুটি কাছাকাছি মান দিয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ডি সিটার মডেলের এই গতিবেগের কোনো সুসংজ্ঞায়িত দিক নেই। পদার্থপূর্ণ প্রসারমান বিশ্বে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি দেখা দেয়। এখানে পদার্থের স্রোতময় গতি (streaming motion) এমন একটি পীড়ন শক্তি টেন্সর (stress-energy tensor) প্রদান করে যা স্থানকালের সুষমতা ও দিকনিরপেক্ষতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ভিৎস (১৯২৪), লান্ডমার্ক (১৯২৫), রবার্টসন (১৯২৮) প্রমুখকেই ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন যে ছায়াপথের রক্তিমসরণ দূরত্বের সাথে বাড়ে এবং এই রৈখিক সম্পর্ক ডি সিটার সমাধানে প্রাপ্ত পূর্বোক্ত বিক্ষেপের অনুরূপ। ১৯২৯ সালে হাবল তাঁর রক্তিমসরণ ও দূরত্বের রৈখিক সম্পর্ক প্রকাশ করেন। লেমাইটার ধারণা করেছিলেন যে বিশ্ব এক ঘন অবস্থা (Primeval Atom, আদি অণু) থেকে বিবর্তিত হয়েছে ; তবে তিনি ঘনাত্মক মানবিশিষ্ট মহাজাগতিক ধ্রুবকের পক্ষপাতী। কোনো অতি ঘন অবস্থা থেকে বিশ্বের প্রসারণের শুরু হয়ে থাকলে উচ্চ রক্তিমসরণ ও উচ্চ ঘনত্বের প্রসারণের হারকে মহাজাগতিক ধ্রুবক প্রভাবিত করে না। তাই প্রসারণ কেন ও কিভাবে শুরু হলো তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। এই সমস্যার একটি সম্ভাব্য সমাধান হচ্ছে প্রাথমিক বিশ্বে স্ফীতির দশার প্রয়োগ এবং মনে করা হয় যে এই স্ফীতির কারণ আদি বিশ্বে বিরাজমান মহাজাগতিক ধ্রুবক। স্থির বিশ্বচিত্রকে হটিয়ে দিয়ে প্রসারমান বিশ্বচিত্রের আগমনকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা নীরব বিপ্লব হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়।

প্রশ্ন করা যায়, বিশ্বের প্রসারণ কে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন? আইনস্টাইনের প্রদত্ত সৃষ্টিতত্ত্বের নীতি এবং মহাকর্ষতত্ত্ব থেকে আমরা বিশ্বের সংকোচন/প্রসারণ এবং রক্তিমসরণ–দূরত্বের রৈখিক সম্পর্ক পেয়েছি। ভাইল প্রথম সৃষ্টিতত্ত্বের নীতির বিশ্লেষণী প্রয়োগের মাধ্যমে রক্তিমসরণ ও দূরত্বের রৈখিক সম্পর্ক নির্ধারণ করেন। ফ্রিডম্যান একটি সাধারণভাবে প্রসারমান পদার্থপূর্ণ (expanding matter-filled solution) বিশ্বের জন্য ক্ষেত্র–সমীকরণের সমাধান নির্ধারণ করেন। ফ্রিডম্যান প্রথমে ১৯২২ সালে উন্মুক্ত বিশ্বের জন্য এবং পরে ১৯২৪ সালে আবদ্ধ বিশ্বের জন্য তাঁর সমাধান প্রকাশ করেন। আইনস্টাইন ফ্রিডম্যানের সমাধানকে মেনে নিতে চাননি তবে তিনি এর গাণিতিক সত্যতা স্বীকার করেছিলেন। ১৯২৭ সালে লেমাইটার দেখিয়েছিলেন যে রক্তিমসরণ ও দূরত্বের রৈখিক সম্পর্ক আসলে পদার্থপূর্ণ বিশ্বের প্রসারণের বহিঃপ্রকাশ। এটাই ছিল প্রথম পথনির্দেশনা—আর এই পথ ধরেই বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব বা কসমোলজি তার প্রতিষ্ঠিত অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। অবশেষে এডুইন হাবল এই সম্পর্কটিকে একটি গাণিতিক রূপ দিলেন—যা আজকে হাবল বিধি নামে পরিচিত। সম্ভবত হাবল এই রৈখিক আচরণের তাত্ত্বিক যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হননি ; কিন্তু তিনি দেখিয়েছিলেন যে যদিও ঐ রক্তিমসরণ–দূরত্ব সম্পর্ককে ডি সিটার সমাধানের বিক্ষেপের সাথে যুক্ত করা যায় তবু এই সম্পর্কটি মডেল–সাপেক্ষ। তাঁর কথায় : "এই আলোচনায় প্রাপ্ত রৈখিক সম্পর্কটি আসলে দূরত্বের একটি সীমিত পরিসরে প্রয়োগযোগ্য প্রথম আসন্নীকরণ।"

৩.৪ বিশ্বের বয়স

আধুনিক বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বিশ্বের বয়স নির্ণয়। সাধারণভাবে বলা যায়, বিশ্বের বয়স ৬৫০ কোটি বছরের কম নয় এবং কোনোমতেই ১৩০০ কোটি বছরের বেশি নয়। আসলে বিশ্বের বয়স নির্ণয় করতে হাবল ধ্রুবকের সঠিক মান জানা চাই। সমীকরণ (৩.২.২৮) ব্যবহার করে উচ্চ রক্তিমসরণের জন্য বিশ্বের বর্তমান বয়স t_0 বের করা যায় :

$$H_0 t_0 = H_0 \int_0^{a_0} \frac{da}{\dot{a}} = \int_1^{\infty} \frac{dy}{y[\Omega_M y^3 + \Omega_R y^2 + \Omega_\Lambda]^{1/2}} \qquad (৩.৪.১)$$

যেখানে $y = 1+z = \frac{a_0}{a}$। প্রমিত মডেলে দেখা যায় প্রসারণের শুরু উচ্চ রক্তিমসরণের থেকে যেখানে $\dot{a}$ অশূন্য। যেহেতু বিশ্ব পদার্থ শূন্য নয় ($\Omega>0$), সেহেতু $y \to \infty$ হলে ডানপাশের সমাকলটি অভিসারী হয়। আইনস্টাইন-ডি সিটার মডেলের জন্য $\Omega_R = \Omega_A = 0$ হলে সমীকরণ (৩.৪.১) থেকে লেখা যায় : $H_0 t_0 = 2/3$ যা সমীকরণ (৩.২.২৭) এরও ফল। যদি শক্তি-ঘনত্বের তুলনায় চাপ উপেক্ষণীয় হয় ($p_b << \rho_b$) তাহলে সমীকরণ (৩.২.২৬) অনুযায়ী $\ddot{a} < 0$, কাজেই $t < t_0$ সময়ে $\dot{a} > \dot{a}_0$ এবং সমীকরণ (৩.৪.১) এর দ্বিতীয় অংশ থেকে বলা যায় $H_0 t_0 > 1$। কিন্তু যদি $H_0 t_0 < 1$ হয় তবে a সর্বদাই ত্বরিত হবে—প্রমিত মডেল অনুযায়ী যার অর্থ হলো ঋণাত্মক ভর-ঘনত্ব। এটাই তখনই সম্ভব যখন Λ এর মান উল্লেখযোগ্যভাবে ধনাত্মক।

সাধারণভাবে বিশ্বের বর্তমান বয়সকে আমরা লিখতে পারি (সমীকরণ ৩.৩.৯ ব্যবহার করে) :

$$t_0 = F(\Omega) H_0^{-1} \sim 0.98 \times 10^{10}\, F(\Omega)\, h^{-1} \text{ yr.} \qquad (৩.৪.২)$$

দেখানো যায় যে $\Omega > 1$, $\Omega = 1$ এবং $\Omega < 1$ এর জন্যে যথাক্রমে :

$$F(\Omega) = \frac{\Omega}{2}(\Omega-1)^{-3/2} \cos^{-1}\left(\frac{2}{\Omega} - 1\right) - (\Omega-1)^{-1} \qquad (৩.৪.৩ক)$$

$$= \frac{2}{3} \qquad (৩.৪.৩খ)$$

$$= (1-\Omega)^{-1} - \frac{\Omega}{2}(1-\Omega)^{-3/2} \cosh^{-1}\left(\frac{2}{\Omega} - 1\right) \qquad (৩.৪.৩গ)$$

উল্লেখ্য যে, ঘনত্ব প্যারামিটারের সঠিক মান যথেষ্ট বিতর্কিত (যদিও সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ Ω এর মান একের চেয়ে কমের পক্ষে) এবং সাধারণভাবে একটি পরিসরের মাঝে এই মান লেখা হয় :

$$0.01 < \Omega < 2.0 \qquad (৩.৪.৪)$$

পরবর্তীতে সপ্তম অধ্যায়ে এই মান কি ভাবে বিশ্বের নিয়তি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করে তা জানা যাবে। Ω এর এই মান ব্যবহার করে এবং সমীকরণ (৩.৪.২) ও (৩.৪.৩) এর সাহায্যে লেখা যায় :

$$t_{0H} \sim (6.5 \text{ to } 10) \times 10^9 \, h^{-1} \quad \text{বছর} \qquad (৩.৪.৫)$$

নাক্ষত্রিক বয়স

কোনো তারাসমষ্টির বয়স বিভিন্ন পর্যবেক্ষিত প্রতিভাস থেকে নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বর্তুলাকার স্তবক (globular cluster) (অধ্যায় ৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য)। কারণ এরা এইচ-আর চিত্রের উপর প্রধানধারায় (অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য) অবস্থিত এবং বর্তুলাকার স্তবকের তারাসদস্যদের সবার বয়স প্রায় অভিন্ন তবে তাদের পার্থক্য কেবল ভরে। সবচেয়ে ভারি তারাদের বয়স্কাল কম এবং তারা তাদের সমগ্র হাইড্রোজেন জ্বালানি পুড়িয়ে প্রধানধারা ত্যাগ করে এইচ-আর চিত্রে লাল দানবতারাদের অংশে প্রবেশ করে। একটি স্তবকের বয়স (t_c) নির্ণয় করা হয় যখনই স্তবকভুক্ত কোনো তারা প্রধানধারা ত্যাগ করে। এভাবে নির্ণীত বয়সে ভুলের সম্ভাবনা ১০%। এভাবে স্তবকের বয়স পাওয়া যায় ১৩০০ থেকে ১৮০০ কোটি বছর। ছায়াপথ তৈরি হতে যদি ১০০ থেকে ২০০ কোটি বছর সময় লাগে তবে বিশ্বের সম্ভাব্য বয়স দাঁড়ায় :

$$t_c \sim 1.4 \text{ to } 1.6 \times 10^{10} \text{ yr.} \qquad (৩.৪.৬)$$

কেন্দ্রীন সংশ্লেষণ

বিভিন্ন দীর্ঘজীবী তেজস্ক্রিয় মৌল এবং তাদের ক্ষয়জাত উৎপাদের আপেক্ষিক প্রাচুর্য থেকে বিশ্বের বয়স নির্ণয় করা যায়। কিছুটা পরোক্ষ উপায় হলেও বয়স নির্ণয়ে এটা একটা ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেয়। অধিকাংশ দীর্ঘজীবী তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রীনেরই উদ্ভব হয়েছে r পদ্ধতিতে যাতে কোনো ভারি কেন্দ্রীন (যেমন লোহা) কর্তৃক অতি দ্রুত নিউট্রন শোষিত হয়। সাধারণত কোনো সুপারনোভা বিস্ফোরণেই এই প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত নক্ষত্র সুপারনোভা হয় তারা অত্যন্ত ক্ষণজীবী (~১০⁶ বছর)। যদি আমাদের ছায়াপথের সৃষ্টি হয় $t=0$ সময়ে, যার পর থেকে ভারি পদার্থের কেন্দ্রীন সংশ্লেষণ (nucleosynthesis) শুরু হয় এবং t_{he} সময় পর্যন্ত চলতে থাকে ; এরপর আবার t_g সময় পর আমাদের সৌরজগৎ ছায়াপথ থেকে স্বতন্ত্র হয় এবং তারও পরে আমাদের সৌরজগতের বয়স যদি t_s হয় তবে বিশ্বজগতের বয়স হবে :

$$t_H = t_{he} + t_g + t_s \qquad (৩.৪.৭)$$

আইসোটোপের গড় জীবনকালের ধারণা ব্যবহার করে সৌরজগতের বয়স (t_s) নির্ণয় করা যায়। ^{235}U ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ^{207}Pb তৈরি করে যার গড় জীবনকাল $\tau_{235} = 10^9$ বছর। একইভাবে ^{238}U ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ^{206}Pb তৈরি করে যার গড় জীবনকাল $\tau_{238} =$

6.3×10^9 বছর। নিম্নসূচকে i এবং 0 যদি প্রাথমিক ও বর্তমান নির্দেশ করে তবে লেখা যায় :

$$^{235}U_i + {}^{207}Pb_i = {}^{235}U_0 + {}^{207}Pb_0 = {}^{235}U_0 \exp\left(\frac{t_s}{\tau_{235}}\right) + {}^{207}Pb_i$$

$$^{238}U_i + {}^{206}Pb_i = {}^{238}U_0 + {}^{206}Pb_0 = {}^{238}U_0 \exp\left(\frac{t_s}{\tau_{238}}\right) + {}^{206}Pb_i$$

এদেরকে সীসার প্রাচুর্য দিয়ে ভাগ দিলে এবং $^{204}Pb_0 = {}^{204}Pb_i$ হলে :

$$R_{207} = \frac{^{207}Pb_0}{^{204}Pb_0} = \frac{^{207}Pb_i}{^{204}Pb_0} + \frac{^{235}U_0}{^{204}Pb_0}\left[\exp\left(\frac{t_s}{\tau_{235}}\right) - 1\right]$$

$$R_{206} = \frac{^{206}Pb_0}{^{204}Pb_0} = \frac{^{206}Pb_i}{^{204}Pb_0} + \frac{^{238}U_0}{^{204}Pb_0}\left[\exp\left(\frac{t_s}{\tau_{238}}\right) - 1\right]$$

R_{207} ও R_{206}কে দুই বিভিন্ন জায়গা (যেমন ভিন্ন ভিন্ন উল্কাপিণ্ড থেকে) পরিমাপ করলে এবং এদেরকে I ও II দ্বারা চিহ্নিত করলে পাওয়া যায় :

$$\frac{R_{207,I} - R_{207,II}}{R_{206,I} - R_{206,II}} = \frac{^{235}U_0}{^{238}U_0} \left| \frac{\exp\left(\frac{t_s}{\tau_{235}}\right) - 1}{\exp\left(\frac{t_s}{\tau_{238}}\right) - 1} \right| \qquad (৩.৪.৮)$$

সমীকরণ (৩.৪.৮) থেকে t_s এর মান নির্ণয় করা যায় : $t_s = (4.6 \pm 0.1) \times 10^9$ yr.। অনুরূপ গাণিতিক হিসাব ^{87}Rb ব্যবহার করেও করা যায় যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ^{87}Sr এ পরিণত হয়। দেখা যায় যে $t_{he} + t_s \sim (0.6 \text{ to } 1.5) \times 10^{10}$ yr. এবং $t_g \sim (1 \text{ to } 2) \times 10^8 << t_{he} + t_s$ yr.। কাজেই সমীকরণ (৩.৪.৭) থেকে স্পষ্টতই :

$$t_u = (0.6 \text{ to } 1.5) \times 10^{10} \text{ yr.} \qquad (৩.৪.৯)$$

উপরের সার্বিক আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিশ্বের তাত্ত্বিক বয়স t_0, বর্তুলাকার স্তবকদের বয়স t_c এবং কেন্দ্রীন সংশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত বয়স t_u মোটামুটি কাছাকাছি এবং এরা বিশ্বের সম্ভাব্য বয়সের একটি ঊর্ধ্ব ও নিম্নসীমা নির্ধারণ করে দেয়।

অনুচ্ছেদ ৩.৩-এ H_0এর সাম্প্রতিক নির্ণীত মানের উল্লেখ করা হয়েছে। H_0 এর এই মান এবং মহাবিশ্বে পদার্থের গড় ঘনত্ব থেকে বিজ্ঞানীরা বিশ্বের বর্তমান বয়স মোটামুটি ১২ বিলিয়ন বছর নির্ধারণ করেছেন। বিশ্বের ঘনত্ব যদি সংকট ঘনত্ব থেকে কম হয় তবেই এই মান প্রযোজ্য হবে।

৩.৫ অলবার্সের হেঁয়ালি

বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের অনেক জটিল সমস্যাকে খুব সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। ১৮২৩ সালে হাইনরিখ ভিলহেলম অলবার্স (১৭৫৮–১৮৪০) এমনি একটি অতি সাধারণ প্রশ্ন তুলেছিলেন : 'রাতের আকাশ কালো কেন?' যদি বিশ্ব সুষমভাবে তারা ভর্তি হয় এবং অসীম হয় তাহলে পৃথিবী থেকে আমাদের প্রতিটি দৃষ্টিরেখা (line of sight) কোনো না কোনো তারার পৃষ্ঠে গিয়ে সমাপ্ত হবে। কাজেই রাতের আকাশ মোটেই অন্ধকার থাকার কথা নয়। অলবার্সের অনুমিতিগুলো হলো : বিশ্ব অসীমভাবে বড় এবং এর বয়স অসীম (infinitely old) ; মহাবিশ্ব অভিন্ন দীপ্তির খ-বস্তু দিয়ে সুষমভাবে ভর্তি। ধরা যাক, প্রতি একক আয়তনে n সংখ্যক বস্তু আছে যারা একক সময়ে L পরিমাণ বিকিরণ দেয়। এবার আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বকে অনেকগুলো এককেন্দ্রিক বৃত্তে ভাগ করতে পারি যাদের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী। আরো ধরা যাক, যে কোনো দুটি পরপর বৃত্তের মধ্যের দূরত্ব a (অর্থাৎ বৃত্তীয় খোলকগুলোর পুরুত্ব a (চিত্র ৩.৫)। এবার যে কোনো খোলকের কথা বিবেচনা করি যার

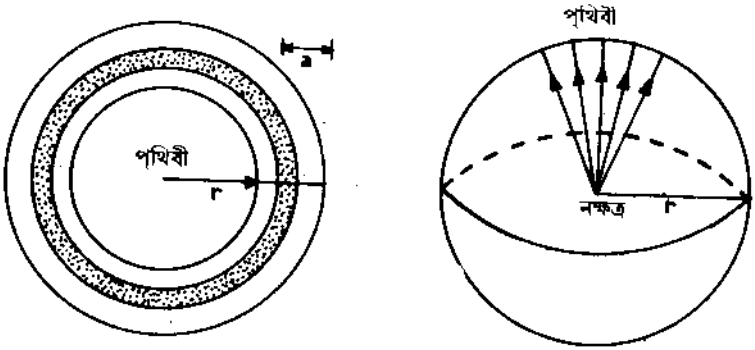

চিত্র ৩.৫ : অলবার্সের হেঁয়ালি।

অন্তঃব্যাসার্ধ r এবং বহিঃব্যাসার্ধ $r+a$। যদি a r এর তুলনায় ছোট হয় তবে প্রতিটি খোলকের আয়তন মোটামুটি $4\pi r^2 a$ ধরে নেয়া যায় ($\because \frac{4}{3}\pi\{(r+a)^3-r^3\}$, যেখানে a এর ঊর্ধ্বঘাত উপেক্ষণীয়)। কাজেই এই আয়তনের খোলকে অবস্থিত উজ্জ্বল বস্তুর সংখ্যা $N = nV = 4\pi r^2 an$। a ছোট বলে আমরা বলতে পারি এই খোলার যে কোনো উজ্জ্বল বস্তুর দূরত্ব r।

এখন মোট বিকিরণের পরিমাণ বের করা যাক। খোলকের যে কোনো উজ্জ্বল বস্তু r ব্যাসার্ধের একটি গোলক বরাবর সুষমভাবে বিকিরণ দেবে যার এক অংশে পৃথিবী রয়েছে। এই গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল $4\pi r^2$। কাজেই একক ক্ষেত্রফল দিয়ে একক সময়ে প্রাপ্ত বিকিরণ, $l = L/4\pi r^2$। অতএব r দূরত্বের খোলক থেকে প্রাপ্ত মোট বিকিরণ $Nl = anL$। দেখাই যাচ্ছে এই সম্পর্ক দূরত্ব নিরপেক্ষ (কোনো r নেই)। একটি অসীম বিশ্বে অনুরূপ খোলকের সংখ্যা যেহেতু অসীম, কাজেই উজ্জ্বল উৎসের (নক্ষত্রের) সংখ্যাও অসীম।

অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রাপ্ত বিকিরণের অসীম এবং প্রতিটি খোলকই একই পরিমাণ বিকিরণ দেবে, কারণ সেটি বিকিরণ দূরত্বের ওপর নির্ভর করে না। অতি সাধারণ অংক কষে অলবার্স এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। কিন্তু এটি পর্যবেক্ষণসম্মত নয়। তাহলে এ যুক্তির অসঙ্গতি কোথায়?

এই সমস্যার সমাধান করার অনেক ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে। এই সমস্যার সঠিক সমাধান বিশ্বের প্রসারণে নিহিত। দুভাবে এ ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া যায়। দূরবর্তী ছায়াপথসমূহ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই দূরবর্তী ছায়াপথের নির্গত আলোর কম্পাংক রক্তিমসরণের ফলে কমে যাচ্ছে। λ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ও ν কম্পাংকের কোনো কোয়ান্টামের শক্তি হচ্ছে, $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$; h প্লাংকের ধ্রুবক, c আলোর বেগ। লক্ষণীয় যে, রক্তিমসরণের ফলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছে, শক্তি সেহেতু হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিটি কণা থেকে শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, পৃথিবী এবং দূরবর্তী ছায়াপথের সময় স্কেলে পার্থক্য ঘটে। অর্থাৎ যে আলো দূরবর্তী ছায়াপথ থেকে, ধরা যাক এক সেকেন্ডে নির্গত হয়েছে, সেই আলো পৃথিবীতে পৌঁছাচ্ছে বেশ দীর্ঘ সময় ধরে। প্রাথমিক এক সেকেন্ড সময়দৈর্ঘ্য যে পরিমাণে বাড়ছে তা আলোর রক্তিমসরণের সমান। কাজেই এই দুভাবে প্রাপ্ত আলোর প্রাবল্য অনেক কমে যাচ্ছে। আরেকটি ব্যাপার হলো এই যে, বিশ্বের প্রসারণের ফলে ১০ বিলিয়ন আলোকবর্ষের চেয়ে অধিকতর দূরে অবস্থিত ছায়াপথসমূহের গতিবেগ আলোর দ্রুতির সমান। তাই এদের চেয়ে দূরের ছায়াপথের আলো আমাদের কাছে আর পৌঁছে না। কাজেই মহাবিশ্ব অভিন্ন দীপ্তির খ-বস্তু দিয়ে সুষমভাবে পূর্ণ — এ কথা আর বলা চলে না। অতএব অলবার্সের অদ্ভুত হেঁয়ালির সম্পূর্ণ উত্তর হচ্ছে : 'রাতের আকাশ কালো বা অন্ধকার হয় কারণ আমরা সে সময়ে সূর্যের বিপরীত দিকে অবস্থান করছি এবং যেহেতু আমাদের বিশ্ব নিয়ত প্রসারমান ও এর জ্যামিতি অ-ইউক্লিডীয়।'

৩.৬ মাইক্রোতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ

১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বসৃষ্টির দুটি তত্ত্ব পাওয়া যায় — স্থিতাবস্থার তত্ত্ব (steady state) ও মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব (Big Bang)। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বমতে, বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় ১২ বিলিয়ন বছর আগে অত্যুত্তপ্ত ও অতি ঘন এক বিন্দুর বিস্ফোরণের মাধ্যমে। সৃষ্টির পরমুহূর্ত থেকেই এটি প্রসারিত হতে থাকে। প্রথম 10^{-4} সেকেন্ডের তাপমাত্রা ছিল কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিনের চেয়েও বেশি। বিশ্বের প্রসারণের ফলে সমস্ত বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রক্তিমসরণ ঘটে। ফলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। কোনো কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যতো বাড়ে বিকিরণের তাপমাত্রা ততো কমে। ফলে বিশ্ব প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে শীতল হতে থাকে। সৃষ্টির তিন মিনিট পর তাপমাত্রা কমে কয়েক হাজার মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিনে দাঁড়ায়। এ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম সংশ্লেষণ সম্ভব হয়। এ সময়ের মধ্যেই বর্তমানে পর্যবেক্ষিত ঐ সমস্ত মৌলের সংশ্লেষণ নির্ধারিত হয়। এ অবস্থার শক্তি ঘনত্ব (energy density) ধনাত্মক আধানযুক্ত কেন্দ্রীনের ও বিপরীত আধানের

ইলেকট্রনের মধ্যেকার বৈদ্যুতিক আকর্ষণের চেয়েও বেশি ছিল। এক মিলিয়ন বছর পর তাপমাত্রা যখন 3000 ডিগ্রি কেলভিনে পৌঁছল তখন তাপীয় শক্তি আর বৈদ্যুতিক শক্তিকে রুখতে পারল না। এ সময়ে হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন পরমাণুতে পরিণত হলো। এ পর্যন্ত বিশ্ব ছিল অনচ্ছ (opaque)। কারণ বিকিরণ বা ফোটন কণা অন্য বিকিরণ বা জড় কর্তৃক শোষিত হয়ে যেতো। বিশেষ করে যখন ইলেকট্রন মুক্ত ছিল তখন ইলেকট্রনের সাথে বিকিরণের মিথস্ক্রিয়া ঘটতো, ফলে ফোটন শোষিত হতো। যখন মুক্ত ইলেকট্রন আর থাকল না তখন বিকিরণের সাথে মিথস্ক্রিয়া ঘটানোর মতো কোনো কিছুই রইল না এবং যেহেতু হাইড্রোজেনের একটিমাত্র বর্ণালি রেখা আছে, যার কোনো অবিচ্ছিন্ন বর্ণালি নেই সেহেতু ফোটন অবিচ্ছিন্ন বর্ণালির বদলে কেবল কিছুসংখ্যক বর্ণালি রেখায় শোষিত হলো; ফলে ফোটন আর কোনো বাধার সম্মুখীন হলো না এবং বিশ্ব স্বচ্ছ ও আলোকভেদ্য হয়ে উঠল। অর্থাৎ বিকিরণ ও জড় পরস্পর বিযুক্ত হলো। বিশ্বের প্রসারণের ফলে বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যায় এবং বর্তমানে বর্ণালির মিলিমিটার অংশে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর নাম পটভূমি বিকিরণ (background radiation)।

১৯৪০ সালে জর্জ গ্যামো এই বিকিরণের মান মৌল সংশ্লেষণের তত্ত্ব ব্যবহার করে বের করেছিলেন 10 ডিগ্রি কেলভিন। আলফের ও হেরমান বের করেছিলেন 5 ডিগ্রি। ১৯৬৪ সালে আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন (Arno Penzias & Robert Wilson) আমেরিকার নিউজার্সির হোমডেলে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীজ–এ উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা গোলমালশূন্য করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। 7.35 সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অ্যান্টেনা ও গ্রাহক যন্ত্র নিয়ে ওঁরা কাজ করছিলেন। কিন্তু বরাবরই তাঁরা একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। তাঁরা দেখলেন যন্ত্রের নকশাগত ত্রুটি, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া ইত্যাদি সব জ্ঞাত প্রভাব বাদ দিয়েও একটা বেতার সংকেত থেকেই যাচ্ছে। এমনকি তাঁরা নিজেদের বেতার যন্ত্রকেও অবিশ্বাস করতে লাগলেন। খুঁজে পেতে ওঁরা দেখলেন যে ওঁদের বেতার যন্ত্রের অ্যান্টেনায় এক পায়রা দম্পতি বাসা বেঁধেছে। কিন্তু পায়রা দম্পতিকে সরিয়েও সেই noise fluctuation থেকেই যাচ্ছে। তাঁরা দেখলেন যে এই সংকেত দিকনিরপেক্ষ, অর্থাৎ সব দিকেই সমান। এমনকি দিনের অন্যান্য সময়ে বছরের অন্যান্য ঋতুতেও অপরিবর্তনীয় থাকছে। এটাই পটভূমি বিকিরণ। এটা সবদিকেই সুষম। ওঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে এটি সৌরজগতের বাইরে থেকে এমনকি ছায়াপথের বাইরে থেকে আসছে। এই অ্যান্টেনা তাপমাত্রাকে এভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$T_A(\theta) = (4.4 + 2.3\sec\theta)^\circ \text{ K} \qquad (৩.৬.১)$$

এখানে θ হলো অ্যান্টেনার অক্ষ এবং খ–মধ্যবিন্দুর (খুবিন্দুর) অন্তবর্তী কোণ। সমীকরণের দ্বিতীয় অংশ বায়ুমণ্ডল থেকে পাওয়া যায়। সমস্যা 4.4 কেলভিনকে নিয়ে। পেনজিয়াস ও উইলসন অনেক পরীক্ষা করে এর মান নির্ধারণ করেন 3.2 ডিগ্রি কেলভিন। যেহেতু $KT_A >> h\nu$, কাজেই এই তাপমাত্রা একটি কৃষ্ণবস্তুর অনুরূপ যার তাপমাত্রা :

[illegible] K [illegible] K

[illegible] (Wein's law) [illegible] কৃষ্ণবস্তুর [illegible] এর সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে [illegible] তাপমাত্রা ও সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য [illegible] 0.29 সে.মি. [illegible] মাত্র কয়েক [illegible] এই পারস্পরের খবর [illegible] ইনস্টিটিউট [illegible] টেকনোলজির

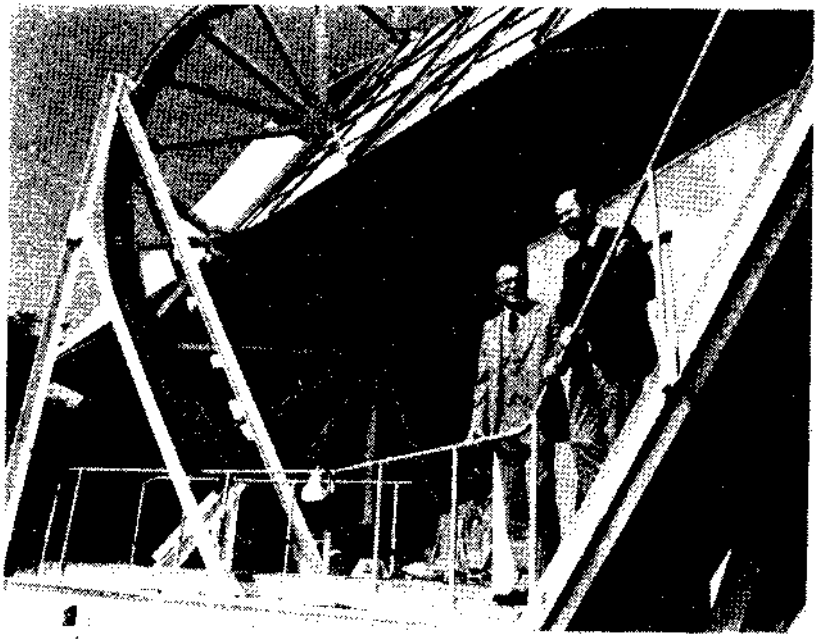

[illegible]

[illegible] ডিকে ও তার দলকে বললেন, [illegible] ওদের জানালেন ডিকে ও তার দলের তাত্ত্বিক [illegible] ডিকে ও তাঁর সহকর্মীদের গৃহীত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলো হলো : প্রথমত, [illegible] বিশ্বের মধ্য দিয়ে ভেদ করেছে সেহেতু এর বর্তমান অবশেষ সর্বদিকে সমান হবে। দ্বিতীয়ত, এই বিকিরণের বর্ণালি ও কৃষ্ণবস্তুর বর্ণালি অভিন্ন হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে বেরিয়ে আসা শক্তির পরিমাণকে তাপমাত্রার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। তৃতীয়ত, যদিও এক সময় এই তাপমাত্রা অত্যুচ্চ ছিল, তথাপি বর্তমানে এই তাপমাত্রা

একটি কৃষ্ণবস্তুর তাপমাত্রার অনুরূপ হবে বলে মনে করেন। কিছু উপরে যখন তাঁরা পরস্পরের কাজ সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে একই সময়ে তাঁরা তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করবেন। কাজে ডিকেন দলের পরিচয় কাজ আগে প্রকাশিত হলো, পরে এলো পেনজিয়াস ও উইলসনের গবেষণালব্ধ উপাত্ত। যতটুকু, এখন আমরা জানি যে মাইক্রো তরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের মান হলো :

$$T_0 = 2.736 \pm 0.017 \ \ K \qquad (১.৬.১)$$

এটি আদিম সেই মহাবিস্ফোরণের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। ১৯৭৮ সালে এজন্য পেনজিয়াস ও উইলসনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ প্ল্যাঙ্কের সূত্র মেনে চলে। ভীনের সরণ সূত্র, স্টেফান বোলৎসমানের সূত্র- এ সবই আসলে একটি সাধারণ সূত্রের বহিঃপ্রকাশ। এ সমস্ত সূত্রের সাধারণীকৃত রূপটি হলো প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ সূত্র। একে প্ল্যাঙ্ক অপেক্ষকও বলে। এই অপেক্ষকের মাধ্যমে কোনো প্রদত্ত তাপমাত্রায় কোনো বস্তুর বর্ণালি নির্দেশক তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও প্রাবল্যের মধ্যের সম্পর্ক পাওয়া যায়। প্ল্যাঙ্ক অপেক্ষক শুধু কৃষ্ণবস্তুর জন্য প্রযোজ্য। কৃষ্ণবস্তু এর তাপমাত্রার জন্য শুধু বিকিরণ করে, কোনো আলো প্রতিফলিত করে না। এদের কোনো বর্ণালিরেখাও নেই। যখন আমরা ভীন কিংবা স্টেফানের সূত্র প্রয়োগ করি তখন আমাদের মনে রাখা উচিত যে এটা আসলে আসন্নমান নির্ণয় করা হচ্ছে। প্ল্যাঙ্ক অপেক্ষকের পরিচিত রূপটি হলো $B=2hc^2\lambda^{-5}/(e^{hc/\lambda kT}-1)$; এখানে B হলো বিকিরণের প্রাবল্য, h প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, c আলোর বেগ, k বোলৎসমানের ধ্রুবক, λ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (সে.মি.), T পরম তাপমাত্রা এবং e সাধারণ লগারিদমের ভিত্তি (২.৭১৮...)। বিভিন্ন তাপমাত্রায় কৃষ্ণবস্তুর প্ল্যাঙ্ক রেখাচিত্র (Planck curve) থেকে দেখা যায় যে, কৃষ্ণবস্তুর তাপমাত্রা যতো কম হবে চিত্রের বক্ররেখার চূড়া ততো দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে পাওয়া যায়। প্ল্যাঙ্ক অপেক্ষক থেকে বলা যায় কম তাপমাত্রায় প্রাবল্যগুলোর বিকিরণের চূড়া পাওয়া যাবে দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। পেনজিয়াস ও উইলসন কর্তৃক প্রাপ্ত পটভূমি বিকিরণের যে গ্রাফচিত্র পাওয়া যায় তার সাথে কৃষ্ণবস্তুর 3 ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রায় বিকিরণের মিল লক্ষণীয় (চিত্র ৩.৭)। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমরা কেবল গ্রাফের ডান অর্ধাংশের তরঙ্গদৈর্ঘ্যেই পর্যবেক্ষণ করতে পারতাম। এগুলো অবশ্য 3 ডিগ্রি কেলভিন কৃষ্ণবস্তু বিকিরণের নির্দেশ দেয়; তবে এর একটি চূড়া (peak) থাকতে হবে। যদি বাম অর্ধাংশে কোনো বিন্দু পাওয়া যায় তবে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব যে এটি কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণই বটে, ফলে দরকার হলো গ্রাফের বাম দিকের ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কিছু বিন্দু নির্ণয় করা। কিন্তু এই কাজটিই অত্যন্ত দুরূহ, কারণ আমাদের বায়ুমণ্ডল দীর্ঘ অবলোহিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে 6 মি.মি. পর্যন্ত বিকিরণ শোষণ করে নেয়। অথচ 3 ডিগ্রি পটভূমি বিকিরণ ঘটে থাকে 2 মি.মি. এ। এজন্য দীর্ঘদিন যাবৎ পরোক্ষ পরিমাপ চলছিল। ১৯৭৫ সালে অবলোহিত পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়। আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে বেলুনে করে যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে উচ্চাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এতে বায়ুমণ্ডলের বাধা অনেকখানি এড়ানো যায়। এই পটভূমি বিকিরণের মান 2.7 K এবং এর চূড়ান্ত নিঃসরণ ঘটে 1.1 মি.মি. এ।

[illegible] isotropic [illegible]

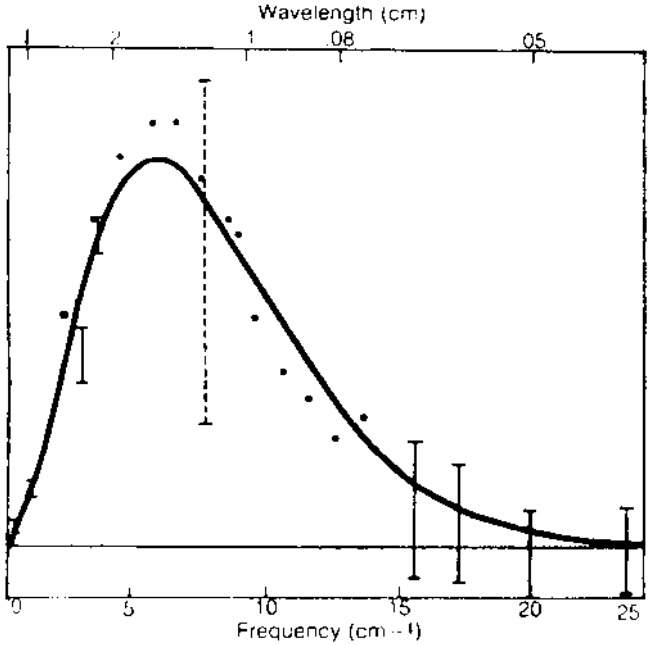

চিত্র [illegible]

[illegible] (dipole anisotropy) [illegible] (Virgo) [illegible]

[illegible]

মাইক্রো তরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের আবিষ্কার আধুনিক বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের এক গৌরবজনক অধ্যায়। এই ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণ উভয়ের সহযোগে বহু সম্ভাব্য মডেলের মধ্য থেকে বিশ্বজগতের জন্য একটি মডেলকে নির্বাচিত করতে এটা সহায় হয়েছিল যা প্রাচীন বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের প্রমিত মডেল নামে পরিচিত। পটভূমি বিকিরণের উপস্থিতি প্রসারমান বিশ্বজগতের মডেলকে একটি মজবুত ভিত্তি দিয়েছে। সময়ে এটি স্পষ্ট যে বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে এক অতিগরম অবস্থা থেকে এবং যখন তাপমাত্রা ছিল অত্যুচ্চ, সেই আদি তাপমাত্রারই অবশেষ হলো পটভূমি বিকিরণ। এখন এ মডেলকে 'উষ্ণ বা hot' বলা হয়। বিশ্বের উষ্ণ অবস্থা প্রসারিত এবং ফলে শীতল হয় এবং এই পদার্থ প্লাজমা থেকে গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে পরিণত হয়; অবশিষ্টাংশ হিলিয়াম এবং অন্যান্য আরো কিছু হাল্কা আইসোটোপে পরিণত হয়। এই অনুপাত পর্যবেক্ষণলব্ধ। তাছাড়া এই বিকিরণের বিকিরণক্ষেত্র এবং বর্ণালিতে কাঠামোর প্রভাব থেকে আদি বিশ্বে গ্যালাক্সির অনুরূপ কাঠামো গঠনের ধারণা পাওয়া যায়। কে সে ছায়াপথ স্তবকের প্লাজমা পটভূমি বিকিরণকে প্রভাবিত করে এবং তা COBE উপগ্রহ থেকে পর্যবেক্ষিত হয়েছে। এই বিচ্যুতির নাম আছে সাময়িক। আরো উচ্চ মাত্রার রেজলিউশনে কিন্তু এই সমস্যা অচিরেই আদি বিশ্বে কাঠামো সংগঠনের প্রকৃত প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন।

৩.৭ আদিম কেন্দ্রীন সংশ্লেষণ

আমরা দেখেছি বর্তমান বিশ্বে প্রতিপদার্থ থেকে পদার্থের কত বেশি। আমাদের অস্তিত্বের জন্যও এটা একটি অবশ্যম্ভাবী পূর্বশর্ত। বিশ্বসৃষ্টির 10^{-4} সেকেন্ড সময়ের মধ্যেই যে জড় কণাগুলি জোড়া তৈরি হয়েছিল তাদের মধ্যে চমৎকার তাপগতীয় সুস্থিতি (thermal equilibrium) বজায় ছিল এবং বিকিরণ ক্ষেত্রের তাপমাত্রা ছিল 10^{12} ডিগ্রি কেলভিন। প্রোটন-প্রতিপ্রোটন এবং নিউট্রন-প্রতিনিউট্রন বিনাশের পরে (কিন্তু ইলেকট্রন পজিট্রন বিনাশের পূর্বে) দেখানো যায় যে, প্রতিটি নিউট্রনের সঙ্গে পাঁচটি অতিরিক্ত প্রোটন 10^{10} ডিগ্রি কেলভিন তাপে নিউট্রিনো ও প্রতিনিউট্রিনো মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে তাপীয় সুস্থিতিতে ছিল। তারপর কয়েক সেকেন্ড পর তাপমাত্রা কমে নিচে হয় 10^{10} ডিগ্রি কেলভিনের নিচে এবং এ সময়ে যদি ইলেকট্রন পজিট্রন বিনাশ এভাবে নিউট্রিনো প্রতিনিউট্রিনো মুক্ত পায়। 10.6 মিনিট অর্ধজীবনের (half-life) নিউট্রন ক্ষয়ে ইলেকট্রন, প্রোটন ও প্রতিনিউট্রিনো তৈরি করে। অবশ্য 1.5 মিনিট বা তার এই ভাঙন সম্পন্ন হবার পূর্বেই তাপমাত্রা কমে 10^{9} কেলভিনে দাঁড়ায়। এই যথেষ্ট নিম্ন তাপমাত্রায় নিউট্রন ও প্রোটন একত্র হয়ে ডিউটেরিয়াম তৈরি হয়। অবশ্য এ সময়ের মধ্যেও ডিউটেরিয়াম তৈরি হতে পারে, তবে অত্যুচ্চ তাপমাত্রার কারণে তা মুহূর্তে ভেঙে যায়। পরবর্তীকালে ডিউটেরিয়াম তৈরি হবার পর তা প্রোটন ও নিউট্রনের সাথে যুক্ত হয়ে হিলিয়াম কেন্দ্রীন তৈরি করে। নিউট্রনের ভাঙন

উপেক্ষা করলে। বলা যায়, ১০টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রনের আদিম মিশ্রণ থেকে ১টি হিলিয়াম কেন্দ্রীন (১ টি প্রোটন + ২টি নিউট্রন) সংশ্লেষিত হয়। ফলে অবশিষ্ট থাকে ৮টি প্রোটন। ফলত হিলিয়াম ভরের ভগ্নাংশ থাকে $\frac{2}{10}$ বা ৩৩%। নিউট্রনের ভঙ্গন গণনায় ধরলে এর মান দাঁড়ায় ২৫% এবং হাইড্রোজেনের ভগ্নাংশ হয় ৭৫%। এই মান পর্যবেক্ষণসম্মত ; অবশ্য এর সাথে অতি সামান্য কিছু ভারি মৌলও থাকে। মহাবিস্ফোরণ মডেলের এটি একটি জোরালো প্রমাণ। পদার্থের এই সংশ্লেষণকে বলে **আদিম কেন্দ্রীন সংশ্লেষণ** (primordial nucleo-synthesis)

গাণিতিকভাবে দেখালে যায় যে, একটি তাপমাত্রা থেকে শীতল হয়ে অন্য তাপমাত্রায় যেতে বিশ্বের যে সময় লাগে সেটা এই দুই তাপমাত্রার বিপরীত মানের বর্গের অন্তরফলের সমান। এভাবে ১০০ মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিন থেকে ৩০০০ ডিগ্রি কেলভিন নেমে আসতে বিশ্বের সময় লাগে ৭,০০,০০০ বছর। এই সময়ে পদার্থও বিকিরণ বিযুক্ত (decoupled) হয়ে যায় এবং বিশ্ব স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এখন আদিম বিশ্বে তিনটি সংখ্যা সর্বদা সংরক্ষিত হয়। এগুলো হলো আধান (charge), ব্যারিয়ন ও লেপটন সংখ্যা। যে কোনো নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় এ সংখ্যাগুলো সংরক্ষিত থাকে। আদিম বিশ্বে প্রতি একক আয়তনে আধান, ব্যারিয়ন, লেপটন সংখ্যা ও তাপমাত্রার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে যেগুলো আদিম কেন্দ্রীন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথম তিনটি সংখ্যা ও ফোটন সংখ্যা যেহেতু বিশ্বের আয়তনের তৃতীয় ব্যস্তানুপাতে (inverse cube) পরিবর্তিত হয়, সেহেতু এদের সংখ্যা স্থির থাকে (আসলে ফোটন পরিবর্তিত হয় না, হয় এনট্রপি যা তাপগতিবিজ্ঞানের একটি রাশি। তবে আদিম বিশ্বের অত্যুচ্চ তাপমাত্রায় এনট্রপির পরিবর্তে ফোটন সংখ্যা হিসাব করা যায় গাণিতিক কারণে)। ফোটন প্রতি আধান সংখ্যা শূন্য অর্থাৎ বিশ্বের নিট আধান শূন্য। ফোটন-প্রতি ব্যারিয়ন সংখ্যা হচ্ছে 10^{-9}। এই বাড়তি ব্যারিয়নই আজকের পদার্থ-শাসিত শাশ্বত বিশ্বের সৃষ্টি করেছে। অথচ কত ক্ষুদ্রই না সে ঘাটতি। ফোটন প্রতি লেপটন সংখ্যা গণনায় অনিশ্চয়তা আছে। তবে ধরে নেওয়া যায় যে, যেহেতু ব্যারিয়নের সংখ্যা অত্যল্প, সেহেতু লেপটন সংখ্যা অনুরূপ অত্যল্প হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কাজেই দেখা যায় সকল কণা-প্রতিকণা জোড় বিনাশের পরও বাড়তি পদার্থ থেকে যাচ্ছে। ৭,০০,০০০ বছর পর সেটাই আমাদের চোখে ফুটে উঠে। এখন ফ্রিডম্যান মডেলে নিউক্লীয় বিক্রিয়ার হিসাব করতে হলে লেপটন সংখ্যা L ও এনট্রপি S এর গণনা করতে হবে। সবচেয়ে সহজ সমাবেশ মনে হয় $S = 0, L = 0$। এ ধরনের মডেলে নিউট্রন ভঙ্গনে উৎপন্ন প্রোটন আরেকটি নিউট্রনের সাথে মিলিত হয়ে ডিউটেরিয়ামে পরিণত হবে—এবং এভাবে একটি বিক্রিয়া শৃঙ্খলের মাধ্যমে দ্রুত হিলিয়ামে পরিণত হবে। ফলে জগতের ১০০% পদার্থই হিলিয়াম হয়ে যাবে। কিন্তু এতো পর্যবেক্ষণসম্মত নয়। একে বলে শীতল নিউট্রন অনুকল্প (cold neutron hypothesis) (কারণ $S = 0$)।

আরেকটি মডেল হচ্ছে 'উষ্ণ' (hot) মডেল—যা জর্জ গ্যামো (George Gamow) দিয়েছিলেন ১৯৪৬ এ, যেখানে $S>>1$। অর্থাৎ আদিম বিশ্বের তাপমাত্রা থাকে অত্যুষ্ণ। যখন S অনেক বেশি, t তখন অতি ক্ষুদ্র। প্রশ্ন হলো, এতে সমস্ত পদার্থ হিলিয়ামে পরিণত হতে বাধা কোথায়? বাধা হচ্ছে অত্যুচ্চ তাপমাত্রা। এই তাপমাত্রায় কোনো কেন্দ্রীনই (হাইড্রোজেন, ডিউটেরিয়াম ও কিছু হিলিয়াম ব্যতীত) স্থায়ী হতে পারে না। আদিম বিশ্ব 'উষ্ণ' না 'শীতল' ছিল তা এক সময় বিতর্কের বিষয় ছিল। জর্জ গ্যামো দেখিয়েছিলেন যে, পদার্থ ও বিকিরণের তাপীয় সুস্থিতিতে ফোটনের শক্তি তাপমাত্রার আনুপাতিক হয়। ফলে বিশ্বের অত্যুচ্চ তাপমাত্রায় যে সমস্ত ফোটন পদার্থের সাথে সুস্থিতিতে ছিল, তারা এখনো আছে। এবং তিনি দেখান যে, এই (পটভূমি বিকিরণের) তাপমাত্রা হবে পরম শূন্যের ওপর এক থেকে দশ ডিগ্রির মধ্যে। পদার্থ ও বিকিরণ বিযুক্ত হবার আগে এরা পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করত বিদ্যুৎ-চৌম্বক মিথস্ক্রিয়ার সাহায্যে এবং পদার্থ ও বিকিরণ তাপীয় সুস্থিতিতে ছিল। কিন্তু ৭,০০,০০০ বছর পর মহাজাগতিক প্লাজমা আর আয়নিত থাকে না, বরঞ্চ প্রশম পদার্থে রূপ নেয়। এর পূর্বে এর অবস্থা অনেকটা সূর্যের উপরিভাগের অনুরূপ ছিল। পদার্থ দ্রুত শীতল হলো এবং অবশিষ্ট ফোটন হয়ে গেল পটভূমি বিকিরণ। এই ফোটনের সাথে প্রায় সমান সংখ্যক নিউট্রিনোও আজো থাকার কথা। ১৯৪৮ সালে গ্যামো এবং রালফ আলফার এটি গবেষণাপত্রে প্রকাশ করেন। তবে রসিক গ্যামো এর সাথে হানস বেথের নাম যোগ করে দেন যাতে গ্রিক বর্ণমালার প্রথম তিনটি অক্ষর পাওয়া যায়। তাই এর নাম বিখ্যাত 'আলফা-বিটা-গামো গবেষণাপত্র'। এতে ওঁরা হাইড্রোজেন-হিলিয়াম প্রাচুর্যের ব্যাখ্যা দেন এবং পটভূমি বিকিরণের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। আদিম বিশ্বের পদার্থ সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো এভাবেই তৈরি হয়েছিল। কোনটি কখন, কিভাবে তৈরি হয়েছিল সে সম্পর্কে রয়েছে সুসংহত গাণিতিক মডেল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত এবং সহজ আলোচনা করেছেন নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ভাইনবার্গ তাঁর বিখ্যাত "The First Three Minutes". বইটিতে। তিনি বলেছেন :

"This is, in brief, our recipe for the contents of the early Universe. Take a charge per photon equal to zero, a baryon number per photon equal to one part in 1000 million and a lepton number per photon uncertain but small. Take the temperature at any given time to be greater than the temperature 3°K of the present radiation background by the ratio of the present size of the Universe to the size at that time. Stir well, so that the detailed distribution of particles of various types are determined by the requirements of thermal equilibrium. Place in an expanding Universe, with a rate of expansion governed by gravitational field produced by this medium. After a long enough wait, this concoction should turn into our present Universe."

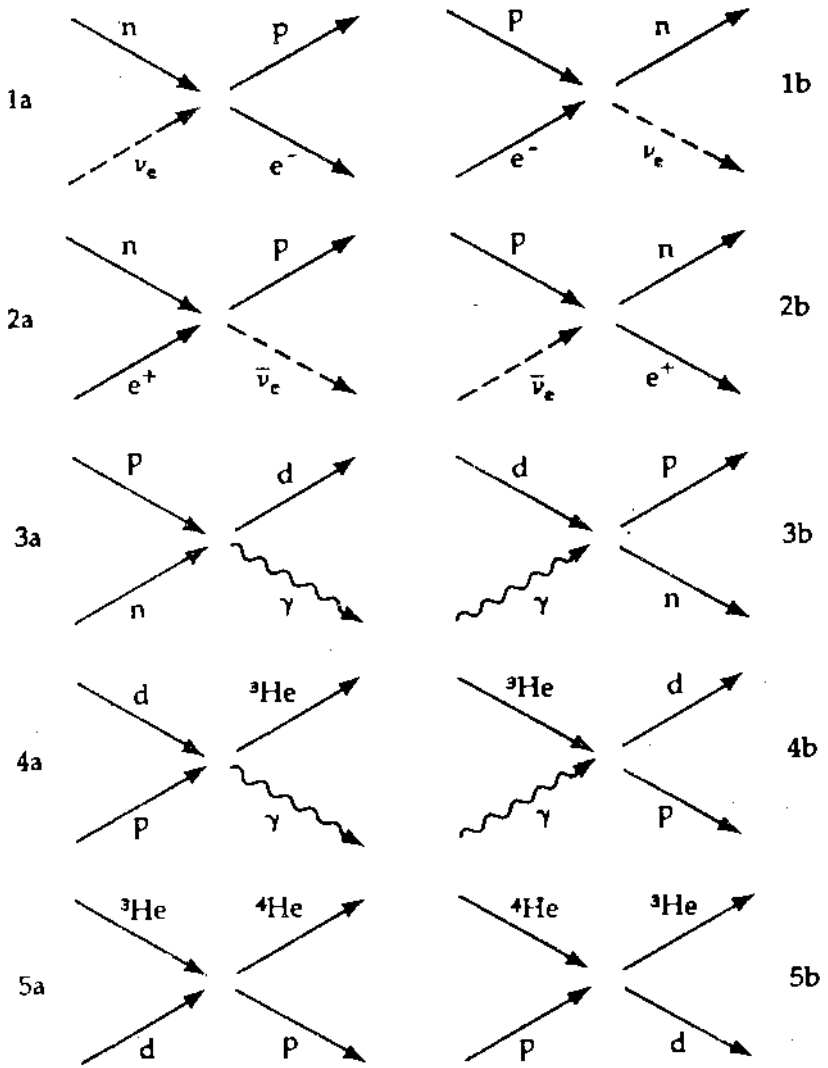

চিত্র ৬.৮ : [illegible] বিক্রিয়া (বাম দিকে) এবং [illegible] (ডান দিকে) [illegible] বিক্রিয়া মাধ্যমে [illegible] (e), নিউট্রিনো (ν_e), এবং [illegible] e^+ and $\bar{\nu}_e$ নিউট্রিনো (n) এবং উভয় (p) [illegible] (1a,2a) উল্টো [illegible] (1b,2b) [illegible] নিউট্রিনো (3a), নিউট্রন [illegible] (4a) [illegible] (5a) এবং [illegible] (3b, 4b, 5b)।

৩১ পদার্থ প্রতিপদার্থ অপ্রতিপাদ্য

[illegible] (P.A.M. Dirac) [illegible] [illegible] [illegible]

শীতলতা বড়ো কণাসমূহের উদ্ভব ঘটে যার মাধ্যমে ক্বার্কের সংখ্যার রূপান্তরসাধন ঘটতে পারে। পদার্থ প্রতিপদার্থের এই অপ্রতিসাম্য (matter-antimatter asymmetry) মহা একীভূত তত্ত্বে (GUT) মাধ্যমেও ব্যাখ্যা সম্ভব। আমরা পরে দেখব যে, এই তত্ত্ব বিদ্যুৎ ক্ষীণ ও সবল বলের একীভূত তত্ত্ব (পরিশিষ্ট ২)। এই তত্ত্বের সাধারণ বক্তব্য বলা হয় যে, ক্ষেত্র কণাদের (ফিল্ড বোসন; এক্স ও ওয়াই বোসন) ভাঙন ছিল অপ্রতিসম। শূন্য ব্যারিয়ন ও লেপটন সংখ্যাবিশিষ্ট এসব ভারি কণা হাল্কা কণায় ভেঙে যায় এবং এই ভাঙনে মিট ব্যারিয়ন থেকে লেপটন সংখ্যায় 10^9 ভাগে গড়ে ১ ভাগ বাড়তায় ঘটবে বলে আশা করা যায় এবং তা ঘটবে বিশ্বের ইতিহাসের প্রথম 10^{-36} সেকেন্ড সময়ে। প্রতিপদার্থের উপর পদার্থের এই জয়জয়কার বিশ্বের সৃজনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমাদের অস্তিত্বের জন্য পরোক্ষভাবে এই পক্ষপাতিত্বের, মনে হয়, দরকার ছিল।

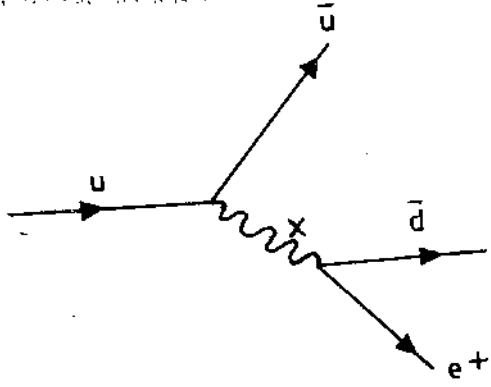

চিত্র ৩.৯ : কোয়ার্ক ও লেপটনের এক্স বোসন বিনিময় (10^{-35} সেকেন্ড)।

রুশ বিজ্ঞানী সাখারভ (ষাটের দশক) ও পরে জাপানি মোতোহিকো ইউশিমুরা (১৯৭৮) দেখান যে GUT সত্য হলে 10^{15}-10^{16} GeV ভরের এক্স-বোসন অবশ্যম্ভাবী। এরা বিশ্ব সৃষ্টির 10^{-36} সেকেন্ডে তৈরি হবে। GUT অনুযায়ী এক্স-বোসন প্রোটন ভাঙনে সহায়তা করে। তাহলে বলা যায় প্রোটন তৈরিতেও নিশ্চয় এটি সাহায্য করবে। গুট যুগে প্রচুর সংখ্যক এক্স ও প্রতিএক্স-বোসন জোড়া ছিল যারা ফোটনের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় ছিল। কিন্তু 10^{-35} সেকেন্ড সময়ে যে পরিমাণ X^+ জোড়া তৈরি হলো, তা X^+ জোড়ার বিক্রিয়ায় অংশ নেয়ার হারের সাথে তাল মিলাতে পারেনি। ফলে কিছু এক্স বোসন বিনাশ হবার আগেই লেপটন ও কোয়ার্কে পরিণত হলো (এক্স বোসন ভেঙে হয় দুটো কোয়ার্ক নতুবা একটি কোয়ার্ক ও একটি লেপটন দেবে)। প্রতিএক্স-বোসনও একইভাবে ভাঙবে। কিন্তু যেহেতু ভাঙন প্রক্রিয়ায় C অথবা CP প্রতিসাম্য সংরক্ষিত হয় না সেহেতু এক্স ও প্রতিএক্স কণা একই হারে ভাঙেনি। প্রতিএক্স বোসন যখন ১ বিলিয়ন প্রতিকোয়ার্ক তৈরি করল, এক্স-বোসন তখন তৈরি করে ১ বিলিয়ন ১টি কোয়ার্ক; ফলে একটি কোয়ার্ক অতিরিক্ত রইল। এভাবেই বিশ্বে প্রতি 10^9 ফোটনে একটি প্রোটন অতিরিক্ত থেকে গেল। বিশ্বের ব্যারিয়ন

অপ্রতিসাম্যের ওপর ভালো সাধারণ আলোচনার জন্যে : Wilczek (1980)।

উষ্ণ মহাবিস্ফোরণ

অতি উচ্চ শক্তির ফোটন সমপরিমাণে x এবং $\bar{x}$ কণিকা তৈরি করে } $\gamma \rightarrow x + \bar{x}$

পরবর্তী শীতল পর্যায় (১০$^{-৩৩}$সে.)

ধরা যাক, x ভেঙে a ভগ্নাংশ পরিমাণ কোয়ার্ক জোড় তৈরি করে এবং অবশিষ্ট পরিমাণে প্রতিকোয়ার্ক ও প্রতিলেপ্টন তৈরি করে } $X \rightarrow a(qq) + (1-a)(ql)$

$\bar{x}$ একইভাবে ভাঙে } $\bar{x} \rightarrow b(\bar{q}\bar{q}) + (1-b)(\bar{q}\bar{l})$

$a = b$ হলে জড় প্রতিজড় সুষম হবে $a = b : N_q = N_{\bar{q}}, N_l = N_{\bar{l}}$

$a \neq b$ হলে জড়-প্রতিজড় অপ্রতিসম হবে $a > b : N_q > N_{\bar{q}}, N_l > N_{\bar{l}}$

সংখ্যালঘু $q, l, \bar{q}$ ও $\bar{l}$ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় } $N_\gamma \rightarrow N_q + N_l$

অতিরিক্ত q এবং l বর্তমান বিশ্বের জড় অংশ গঠন } $N_B \rightarrow N_q - N_{\bar{q}}$ করে।

বর্তমান

3°K পটভূমি বিকিরণ সেই আদিম বিনাশ বিকিরণের অবশেষ হিসেবে আজ রয়ে গেছে। বর্তমানে দৃশ্য পদার্থজগৎ আদিতে সৃষ্ট বিপুল পদার্থের (এবং সাথে সাথে প্রতিপদার্থের মিশ্রণের) এক অতি ক্ষুদ্র অবশেষ $\frac{N_B}{N_\gamma} = 10^{-9}$

৩.৯ স্ফীতিশীল বিশ্বচিত্র

বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের প্রচলিত মহাবিস্ফোরণ মডেলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে যা আমরা অনুচ্ছেদ ৩.২ এ আলোচনা করেছি। প্রথমত, বিশ্বের বিভিন্ন দিক থেকে প্রাপ্ত মাইক্রোতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ সবদিকেই সুষম। এই সুষমতার কারণ কি? দেখা গেছে পটভূমি বিকিরণে প্রতি 10^4 ভাগে মাত্র একভাগ বিচ্যুতি রয়েছে। যেহেতু এই বিকিরণ বিশ্বের সমস্ত অংশের মধ্য দিয়ে গমন করেছে এবং যেহেতু তা সুষম, কাজেই প্রশ্ন হলো কেন বিশ্বের এমন দুই অংশ থেকে আমরা একইরকম বিকিরণ পাবো যেখানে তাদের মধ্যে কার্য-কারণসম্মত কোনো সম্পর্ক ছিল না? যেহেতু আলোর বেগই সবোচ্চ বেগ এবং যেহেতু বিশ্বের দূরবর্তী অংশসমূহ পরস্পরের থেকে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত কাজেই তাদের মধ্যে কোনো রকম তথ্যের আদান-প্রদান সম্ভব নয়। অথচ দেখা যাচ্ছে এমন সব দূরত্বেও বিশ্ব সুষম এবং দিক-নিরপেক্ষ। কেন? এটাই **দিগন্তের সমস্যা** (চিত্র ৩.১০)। যেকোনো সময়ে বিশ্বের দুই বিন্দুর মাঝের সর্বোচ্চ দূরত্বকে বলে দিগন্তের দূরত্ব (horizon distance)। সৃষ্টির পর থেকে ঐ সময় পর্যন্ত আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেটাই ঐ সময়কার বিশ্বের দিগন্তের দূরত্ব। দেখা গেছে, বিশ্বের দুই বিপরীত বিন্দুর পটভূমি বিকিরণের উৎসের মাঝের দূরত্ব যখন ঐ বিকিরণ নির্গত হয়েছিল সে সময়কার দিগন্তের দূরত্ব অপেক্ষা 90 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যেহেতু ঐ দুই অঞ্চলের মধ্যে কোনো যোগাযোগ সম্ভব ছিল না, তাই কিভাবে

তবে আমরা যেটি পর্যবেক্ষণের অধিকারী হলো সেটা একটা সমস্যা বটে। বিশ্বের ব্যাপক কাঠামোর এই সুষমতার কোনো ব্যাখ্যা মহাবিস্ফোরণ মডেল দিতে অক্ষম। এই সুষমতাকে কেবল প্রারম্ভিক শর্ত (initial conditions) হিসেবে ধরে নিতে হবে। দ্বিতীয় সমস্যা হলো প্রাথমিক বিশ্বের শক্তি-ঘনত্বের সমস্যা। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বানুযায়ী বিশ্ব ত্রসীম তাপীয়ভাবে বক্র এবং এই বক্রতা নির্ভর করে বিশ্বের শক্তি ঘনত্বের উপর। শক্তি-ঘনত্বের বিশেষ মানকে বলা হয় সংকট ঘনত্ব যার মানের উপর নির্ভর করে বিশ্ব আবদ্ধ, উন্মুক্ত বা সমতল হবে (চিত্র ৩.৯)। পর্যবেক্ষণ থেকে বলা যায়, সংকট শক্তি-ঘনত্বের মাত্র বিশ শতাংশ শক্তি এখন বিশ্বে আছে। শক্তি-ঘনত্ব ও সংকটমানের অনুপাত অপরিবর্তনীয় নয় এবং একক থেকে এই অনুপাতের বিচ্যুতি সময়ের সাথে রৈখিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই অনুপাতকে Ω (ওমেগা) দিয়ে লেখা হয় (সমীকরণ ৩.২.৩০)। যদি বিশ্ব সৃষ্টির পরপর Ω এর মান ঠিক একে হতো তবে বিশ্বের বিবর্তনের সাথে এর কোনো পরিবর্তন হতো না। কিন্তু যদি এই মান একের কম বা বেশি হতো তবে বিশ্বের বিবর্তনের সাথে এর পরিবর্তন হতো

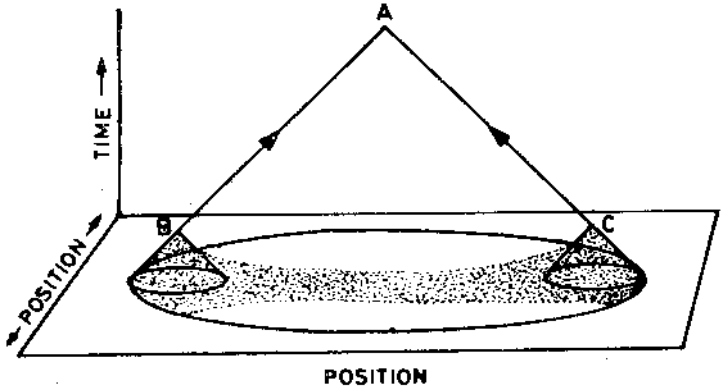

চিত্র ৩.১০ : দিগন্তের সমস্যা। এই কাল্পনিক চিত্রটিতে A বিন্দুতে আমাদের অবস্থান দেখানো হয়েছে। কাল-অক্ষের A বিন্দুতে আমরা নিচে দেখতে পাই, কেননা বাইরে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কারণ আলোর চেয়ে বেশি বেগে কিছু চলতে পারে না। তাই A বিন্দুতে কোণটি আঁকা হয়েছে যেটিই আমাদের পক্ষে সর্বাধিক দূরত্ব থেকে অনুভূমিক তলটি পর্যন্ত দৃষ্টিকোণ নির্দেশ করছে। B ও C বিন্দুকে যে বিবরণ বহু পূর্বে নির্গত হয়েছিল সেটি বর্তমানে আমরা উভয়দিকের দুই বিপরীত বিন্দু থেকে পেয়ে থাকি। B ও C বিন্দুর পক্ষে সেই একই পদার্থকণাকে দেখা করলে এই দুই আমাদের মধ্যে কোনো তেজ ও সংকেত সম্ভব নয়। তাই প্রশ্ন জাগে এমন দুই স্থানের মধ্যে কেন একই বিকিরণ পাওয়া যায় যাদের মধ্যে কোনো সংযোগ সম্ভব হয়নি?

অবশ্য কিন্তু বর্তমানে এর মান $\Omega_{\text{বর্তমান}} \approx 0.1$ বলা হচ্ছে, Ω এর এই বর্তমান মানের জন্য বিশ্ব সৃষ্টির মাত্র কয়েক সেকেন্ড পর Ω এর মান ঠিকঠিক এক হতে হবে এবং তাতে বিচ্যুতির মান প্রায় 10^{-15} ভাগের মাত্র এক ভাগ। কেন Ω এর মান একের এতো কাছাকাছি হবে মহাবিস্ফোরণের মডেল তার কোনো সমাধান দিতে পারে না; একে কেবল প্রারম্ভিক শর্ত হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। $\Omega = 1$ হলে বিশ্ব সমতল বা ফ্ল্যাট হবে এবং ইউক্লিডীয় জ্যামিতি

মেনে চলবে। তাই এই সমস্যাকে সমতার সমস্যা বলে। তাছাড়া বর্তমানে দৃষ্ট নিযুত-কোটি ছায়াপথের জন্যে প্রয়োজনীয় ভর-কেন্দ্রীকরণও সুবাখ্যাত নয়। কারণ ভরের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিষমতা (initial inhomogeneities) বিষয়টিকেও প্রারম্ভিক শর্তাবলির অধীনে রাখতে হয়। একে মসৃণতার সমস্যাও বলা যেতে পারে।

এ সমস্ত সমস্যা দূর করার জন্য এম.আই.টি.র অ্যালান গাথ (Alan Guth) ১৯৮০ সালে 'স্ফীতিশীল বিশ্বের' (inflationary universe) ধারণা দিয়েছেন। এই মডেল অনুযায়ী বিশ্ব প্রাথমিক কোনো মুহূর্তে এর আয়তনের 10^{50} গুণ বৃদ্ধি পায়। বলা হচ্ছে, পরম ঐক্যের সময়ে (প্ল্যাঙ্কের সময়, 10^{-43} সেকেন্ড) কিংবা মহা একীভবনের সময়ে (GUT সময়, 10^{-39} সে.) বিশ্ব একটি মেকি শূন্যস্থানে (false vacuum) ছিল। মেকি শূন্যস্থান চিরায়ত জগতের প্রকৃত শূন্যস্থান থেকে পৃথক এবং এর একটি শক্তিশালী ঋণাত্মক চাপ থাকে। অবশ্য এই ঋণাত্মক চাপ কোনো যান্ত্রিক বল প্রয়োগ করতে পারবে না (কারণ বল প্রযুক্ত হয় চাপের পার্থক্য থেকে)। তবে এই চাপের দরুন উদ্ভূত মহাকর্ষীয় প্রভাব থাকবে। এর প্রভাব অনেকটা মহাজাগতিক ধ্রুবকের বিকর্ষণী আচরণের মতো। সৃষ্টির যে মুহূর্তে মহা একীভূত তত্ত্বসমূহ (GUTs) ভেঙ্গে যায় তখনকার প্রতিসাম্য ভাঙনের হিগ্‌স অবস্থান্তর (Higgs transition) এই স্ফীতির জন্য দায়ী। দেখা গেছে, যখন হিগ্‌স ক্ষেত্র(গুলো)র মান শূন্য তখন প্রতিসাম্য ভাঙে না[৬] কিন্তু যদি কোনো হিগ্‌স ক্ষেত্রের মান অশূন্য হয় তাহলে প্রতিসাম্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে যায়। এই ক্ষেত্রের একটি ধর্ম হলো এই যে, এর ন্যূনতম শক্তির দশাটি শূন্যশক্তির নাও হতে পারে। এখানে মেকি শূন্যস্থান হলো শূন্যশক্তির; কিন্তু প্রকৃত শূন্যস্থানে এর শক্তি ন্যূনতম (minimum)। প্রকৃত শূন্যস্থানের ন্যূনতম শক্তিদশাতেই হিগ্‌স ক্ষেত্র অশূন্য। অত্যুচ্চ তাপমাত্রায়, প্রায় 10^{27} কেলভিনে, এই ক্ষেত্রের মান শূন্য হতে পারে; অর্থাৎ এটি মেকি শূন্যস্থানে থাকে; এটি একটি স্থানীয় ন্যূনতম অঞ্চল (local minimum)—অনেকটা মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মতো। এ অবস্থায় দুর্বল ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল একীভূত ছিল। এ সময়ে বিশ্বের শক্তি ঘনত্ব ছিল 10^{95} আর্গ/সি.সি.। ধীরে ধীরে যখন বিশ্বের তাপমাত্রা কমতে থাকে তখনও কিন্তু হিগ্‌স ক্ষেত্রের মান অশূন্য অবস্থায়ই ছিল। এ অবস্থা অনেকটা অতিশীতলীকৃত (supercooled) পানির মতো—পানির তাপমাত্রাকে অত্যন্ত দ্রুত হিমাংকের প্রায় 20 ডিগ্রি নিচে নিয়ে যাওয়া যায় অথচ বরফ জমে না। একইভাবে বলগুলোর অভ্যন্তরীণ প্রতিসাম্য না ভেঙেই স্ফীতিশীল বিশ্বকে ক্রান্তি তাপমাত্রার নিচে নিয়ে যাওয়া যায়। ফলে বিশ্ব একটা অস্থির (unstable) অবস্থায় থাকবে এবং প্রতিসাম্য ভাঙনের দশা থেকে শক্তি থাকবে বেশি। এই বাড়তি শক্তি মহাকর্ষের বিপরীত

---

৬. কণা পদার্থবিজ্ঞানে যখন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিসাম্য ভাঙন ঘটে তখন তা হিগ্‌স ক্ষেত্রের সাহায্যে ঘটে থাকে। এই ক্ষেত্রবর্তী কণাকে হিগ্‌স বোসন বলা হয়। ধারণা করা হয়, যখন উচ্চশক্তির ভরশূন্য কণা নিম্নশক্তিতে আসে তখন তা হিগ্‌স কণা থেকে শক্তি গ্রহণ করে। এছাড়া কণিকাদের ভরযুক্ত হওয়ার অন্য কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই পদ্ধতি পিটার হিগ্‌স আবিষ্কার করেছিলেন। হিগ্‌স ক্ষেত্র হচ্ছে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের ক্ষেত্র।

আচরণ করবে। স্টিভেন কেলমান দেখিয়েছেন যে এই হিগস মেকানিজম তাদের মৌল শূন্যস্থান থেকে সামান্য শক্তির বাধাকে (সুড়ঙ্গকরণ বা টানেলিং প্রক্রিয়ায়) অতিক্রম করে প্রকৃত শূন্যস্থায় অবস্থান্তর ঘটায়। প্রতিসাম্য ভাঙনের এই হার অনেক কম। যাহোক ঋণাত্মক চাপের জন্য বিশ্ব প্রতি 10^{-34} সেকেন্ডে দ্বিগুণ হতে থাকে। এই ত্বরিত প্রসারণকেই স্ফীতি বলে। বিশ্ব 10^{-32} সেকেন্ড বা ততোধিক সময় ধরে স্ফীত হয় এবং প্রায় 10^{50} গুণ স্ফীত হয়। ফলে প্রোটনের চেয়ে 10^{-36} গুণ ক্ষুদ্র বিশ্ব প্রসারিত হয়ে আঙ্গুরফলের সমান (অর্থাৎ আড়াআড়ি প্রায় ১০ সে.মি.) আকৃতি পায়। স্ফীতির পর ভগ্ন প্রতিসাম্যের দশায় অবস্থান্তর ঘটে এবং বাড়তি শক্তি কণা-প্রতিকণা জোড় তৈরি করে। এ সময়ে প্রচুর এক্স-বোসন তৈরি হয় যারা পরে পদার্থ তৈরিতে অংশ নেয়। বিশ্ব পুনরায় 10^{-27} কেলভিনে উত্তপ্ত হয় এবং এরপর থেকে চিরায়ত আইন অনুযায়ী বিশ্ব প্রসারিত হতে থাকে (চিত্র ৩.১১)।

স্ফীতিশীল বিশ্বের প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আলোর চলাচলের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে, কারণ সে সময়ে দিগন্তের দূরত্ব ছিল অনেক কম। ফলে সৃষ্টির মুহূর্তে আকাশের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সংযোগে আসতে পেরেছিল। আর তাই বিশ্বের দুই বিপরীত অংশ থেকে প্রাপ্ত পটভূমি বিকিরণ সুষম থাকে, কারণ এরা এক সময়ে পরস্পরের সংস্পর্শে ছিল। এভাবে দিগন্তের সমস্যার সুন্দর সমাধান পাওয়া যায়। বিশ্বের ত্বরিত প্রসারণে স্থান খুব দ্রুত সমতল হয়ে যায়। দেখা যায় যে এই অবস্থায় Ω এর মান বেশ দ্রুত একের কাছাকাছি চলে যায়। কাজেই বর্তমানে Ω এর মান এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই এই মান ঠিকঠিক নির্ণয় করা যথেষ্ট জরুরি; কারণ তাহলে স্ফীতি মডেলের একটি পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ পাওয়া যাবে। ফলে সমতার সমস্যা আর থাকে না। স্ফীতির মাধ্যমে কণিকার প্রাচুর্যও ব্যাখ্যা করা যায়। মহাবিশ্বে মোট শক্তি শূন্য। বলা হয়, পদার্থের সৃষ্টি ধনাত্মক শক্তি থেকে। দুটি বস্তু যখন কাছাকাছি থাকে তার চেয়ে যখন দূরে থাকে তখন শক্তি বেশি হয়। কারণ এই যে, মহাকর্ষ এদেরকে কাছে টানছে এবং এর বিরুদ্ধে বস্তু দুটিকে কাজ করতে হয়। ফলে শক্তি খরচ হয়। এ অর্থে মহাকর্ষ ঋণাত্মক শক্তি। একটি সমরূপ বিশ্বের জন্য দেখানো যায় যে এই দুই বিপরীত শক্তি পরস্পরকে নাকচ করে দেয়। এভাবে বিশ্বের মোট শক্তি শূন্য। এখন, শূন্যের দ্বিগুণও শূন্য। অর্থাৎ বিশ্ব এর ধনাত্মক জড়পদার্থ এবং ঋণাত্মক মহাকর্ষীয় শক্তিকে সংরক্ষণ সূত্রকে লঙ্ঘন না করেও দ্বিগুণ করতে পারে। সাধারণ প্রসারণে এটি সম্ভব নয়; কিন্তু স্ফীতিশীল বিশ্ব এতো দ্রুত বেড়ে যায় যে কণিকা গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিও বাড়াতে হয়। এক সময়ে স্ফীতি শেষ হয়ে শুরু হয় প্রসারণ। ফলে বলগুলির প্রতিসাম্য ভেঙে দিয়ে অভগ্ন প্রতিসম অবস্থার বাড়তি শক্তি মুক্তি পাবে এবং বিশ্বকে উত্তপ্ত করে এমন তাপমাত্রায় নিয়ে যাবে যা বলগুলির প্রতিসাম্য রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় সংকট তাপমাত্রার নিচে থাকে এবং মহাবিশ্ব মহাবিস্ফোরণ মডেলের সকল ধর্ম প্রকাশ করবে।

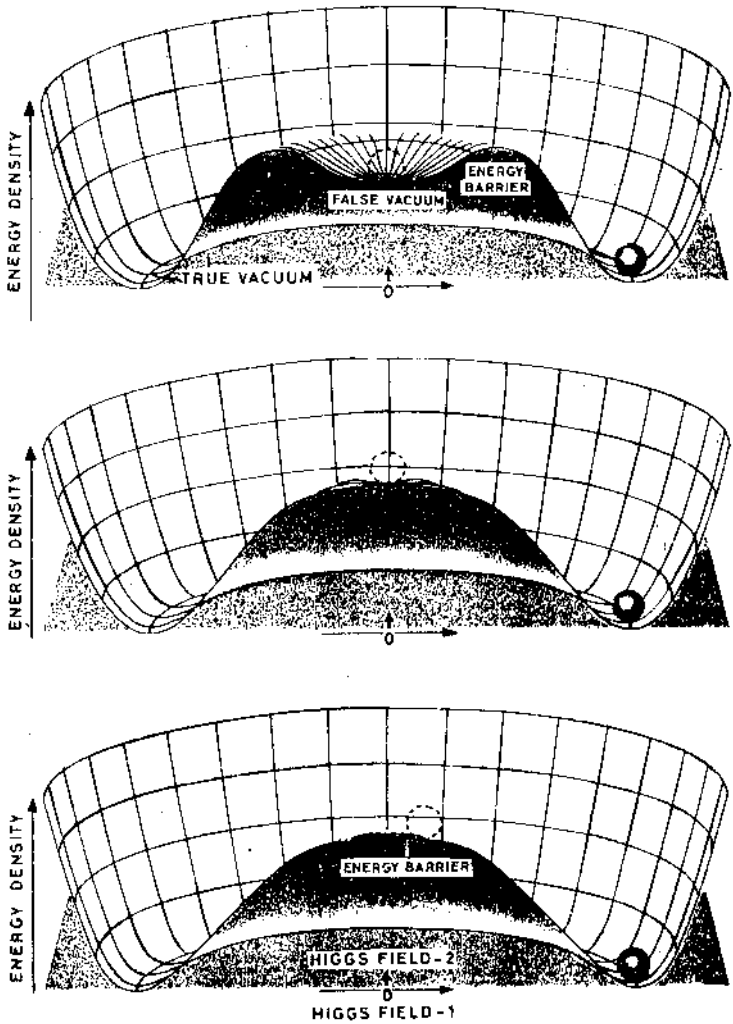
ENERGY DENSITY
FALSE VACUUM
ENERGY BARRIER
TRUE VACUUM
0
ENERGY DENSITY
0
ENERGY DENSITY
ENERGY BARRIER
HIGGS FIELD-2
0
HIGGS FIELD-1

স্ফীতির পুরনো মডেল নির্দেশ করছে যেখানে শুধু একটি মেকি শূন্যস্থান থেকে প্রকৃত শূন্যস্থানে অবস্থান্তর ঘটায় এমনকি একটি কোয়ান্টাম ফিল্ডের প্রক্রিয়ায় শক্তির বাধাটি অতিক্রম করে। মজার ব্যাপার বলটি একটি সমতল টিপিকাল ফিল্ড ব্যবহার করে যা স্ফীতির নতুন মডেল নির্দেশ করে। এটি অথবা কোয়ান্টাম ফিল্ডের ফলে হিগস ফেলডগুলো মেকি শূন্যস্থান ছেড়ে প্রকৃত শূন্যস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে মহাবিশ্বের স্ফীতি শুরু হয় কিন্তু শক্তিঘনত্ব মোটামুটি ধ্রুব থাকে। প্রকৃত শূন্যস্থানে পৌঁছে বলটি অসিলেট করতে থাকে ফলে হিগস কণাগুলো উদ্ভূত হয়। নিচের চিত্রটি এই নতুন মডেলেরই আরেকটি পরিবর্তিত রূপ যেখানে মেকি শূন্যস্থানের চতুর্দিকে ফলস শক্তি—বাধা থাকে।

মূল স্ফীতিশীল বিশ্বের মডেলে কিছু মারাত্মক ত্রুটি ছিল। যখন হিগস ক্ষেত্রগুলি টানেলিং করে প্রকৃত শূন্যস্থানে চলে যেতে চায় তখন প্রতিসাম্যের ভাঙন ঘটে। এই ভাঙন সবত্র এক সাথে না ঘটে নির্দিষ্ট কিছু বাবল বা বুদবুদে ঘটে অর্থাৎ ভাঙা প্রতিসাম্যের কিছু বুদবুদ—অঞ্চল থাকে। এই বুদবুদগুলো দ্রুত (প্রায় আলোর বেগে) প্রসারিত হতে থাকে। এদের তৈরির হার অত্যন্ত কম এবং এরা GUT এর কিছু অজানা প্যারামিটারের উপর নির্ভর করে। দেখানো যায় যে এই বুদবুদগুলো সবসময়েই পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন আলাদা আলাদা স্তবকভুক্ত থাকে। প্রতিটি স্তবকে থাকে একটি বৃহৎ বুদবুদ এবং সমস্ত স্তবকের প্রায় সব শক্তিই এর পৃষ্ঠে থাকে। এই শক্তির সমবণ্টনের কোনো উপায় জানা নেই। এটি পর্যবেক্ষণসম্মতও নয়। তাছাড়া এই বুদবুদগুলো যখন প্রসারিত হয়ে একত্র হবে, যাতে করে সমগ্র বিশ্বেই ভগ্ন প্রতিসাম্য বজায় থাকে, তখন কিছু সমস্যা দেখা দেয়। GUT অনুযায়ী ভগ্ন—প্রতিসাম্যের দশায় দুটি প্যারামিটার—বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন (discrete and continuous)—থাকে যা দিয়ে এদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। যখন বুদবুদগুলো পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তখন সীমান্ত অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন প্যারামিটারের মানের পার্থক্যের কারণে এক ধরনের পৃষ্ঠ ত্রুটি (surface defect) হিসেবে ডোমেইন ওয়াল দেখা দেয়। আবার একই বুদবুদের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন প্যারামিটারের মানের পার্থক্যের কারণে এক ধরনের বিন্দুবৎ ত্রুটি (point like defect) হিসেবে চৌম্বক—একমেরু (magnetic monopoles) দেখা দেয়।[1] এ ধরনের স্থানিক ত্রুটি বিশ্বের ব্যাপক কাঠামোয় বিশেষ ভূমিকা রাখে। যেমন মহাবিস্ফোরণ মডেল অনুযায়ী এরা প্রোটনের মতোই বিশ্বব্যাপী সহজলভ্য হবে। সেক্ষেত্রে বিশ্বের গড় ভর—ঘনত্ব হতো বর্তমান ঘনত্বের (10^{-29} গ্রাম/সি.সি.) 10^{15} গুণ বেশি। কিন্তু এটি পর্যবেক্ষণসম্মত নয়। চৌম্বক—একমেরুর ভর হবে প্রোটনের ভরের 10^{16} গুণ বা 0.00001 মিলিগ্রাম।

১৯৮১ সালের শেষের দিকে মস্কোর লেবেদেভ ইনস্টিটিউটের আন্দ্রেই লিন্ডে (Andrei Linde) এবং পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটির অ্যান্ড্রিয়াস আলব্রেখট (A. Albrecht) এবং পল স্টাইনহার্ড (P. Steinhardt) নতুন স্ফীতির মডেল প্রস্তাব করেন। হিগস ক্ষেত্রগুলো পূর্বে একটি মেকি শূন্যস্থানে ছিল এবং প্রকৃত শূন্যস্থান ও এর মাঝে একটি শক্তির বাধা ছিল;

1. চৌম্বক একমেরু সমস্ত শূন্যমাত্রিক; এদের চেয়ে বেশি মাত্রার পৃষ্ঠত্রুটি সম্ভব। যেমন একমাত্রিক স্ট্রিং, দ্বিমাত্রিক ডোমেইন ওয়াল এবং ত্রিমাত্রিক টেক্সচার

এই মডেল অনুযায়ী এরা একটি সমতল মালভূমিতে অবস্থান করে। অর্থাৎ প্রকৃত ও মৌক শূন্যস্থানের মাঝে কোনো শক্তির বাধা আর থাকে না। ফলে দশা পরিবর্তনের জন্যে হিগস ক্ষেত্রকে আর কোনো সন্দেহজনক টানেলিং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় না। এক্ষেত্রে হিগস ক্ষেত্রের মান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং শক্তি-ঘনত্বের এই বিশেষ অবস্থান্তরকে slow-rollover transition বলে। বলে রাখা ভালো, এই নতুন মডেল অনুযায়ী বুদবুদের পরিবর্তে ভাঙা প্রতিসাম্যবিশিষ্ট ডোমেইন তৈরি হয় যাদের প্রাথমিক ব্যাসার্ধ থাকে দিগন্তের দূরত্বের সমান। দশা পরিবর্তনের শুরুতে এই দিগন্তের দূরত্বের মান থাকে 10^{-24} সে.মি. এবং প্রতিসাম্য ভেঙে যাবার পর এই ডোমেইন (10^{50} গুণ) স্ফীত হয়ে 10^{-26} সে.মি. হয়। ঐ সময়ে সমগ্র দৃশ্যমান বিশ্বের ব্যাসার্ধ থাকে 10 সে.মি. যা সহজেই এ রকম একটি ডোমেইনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। স্ফীতি পরবর্তী পরিস্থিতি আগের মতোই থাকে। এমনকি শক্তি-ঘনত্ব এবং তাপমাত্রাও অপরিবর্তিত থাকে। দশা পরিবর্তনের পরপরই এই তাপমাত্রা এমন কণা মিথস্ক্রিয়ার পরিবেশ তৈরি করে যে তা কণা প্রতিকণা (তথা ব্যারিয়ন) অপ্রতিসাম্যের সৃষ্টি করে (অনু. ৩.৬ এ আলোচিত)।

নতুন মডেলে দিগন্তের সমস্যা, সমতার সমস্যা আগের মতোই দূর হয় এবং ডোমেইন-ওয়াল বা চৌম্বক একমেরুর সমস্যাও দূর হয়। যখন ডোমেইনগুলো পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তখন সীমান্ত অঞ্চলে এ ধরনের ত্রুটি দেখা দিতে পারে ; কিন্তু পরবর্তীতে এই ডোমেইনগুলো এতো দ্রুত স্ফীত হয় যে ঐ ত্রুটিসমূহ প্রায় দূর হয়ে যায় (কারণ এদের মধ্যের দূরত্ব এতো বেশি বেড়ে যায় যে তা বিশ্বের কাঠামোয় তেমন কোনো প্রভাব রাখতে পারে না)। অবশ্য তাপীয় অস্থিতির কারণে কিছু সামান্য পরিমাণ ত্রুটি তৈরি হতে পারে তবে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাছাড়া অতিসম্প্রতি দেখানো গেছে যে এই একমেরুগুলো নিজেদেরকে এতো বেশি স্ফীত করে ফেলে যে তারা আর দৃশ্যমান থাকে না। নতুন মডেলটি মসৃণতার সমস্যাকেও সুন্দরভাবে দূর করে। প্রথমত স্ফীতির ফলে ঘনত্বের যেকোনো প্রকার প্রাথমিক বিষমতা (initial inhomogeneity) দূর হয়ে যায়। পরবর্তীতে হিগস ক্ষেত্রের দশা পরিবর্তনের ফলে এ বিষমতাগুলো পুনরায় আবির্ভূত হয়। প্রথমে এরা কোয়ান্টাম স্তরে আবির্ভূত হয়, পরে স্ফীতি এদেরকে মহাজাগতিক স্কেলে বিবর্ধিত করে। অর্থাৎ প্রথমে স্ফীতির ফলে প্রাথমিক বিষমতা দূর হয়ে যায়। কিন্তু পরে কোয়ান্টাম কারণে নতুন বিষমতার জন্ম হয়। তবে সমস্যা এই যে, এই মডেল অনুযায়ী ঘনত্ব বিষমতার যে বিশাল মানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা পর্যবেক্ষণসম্মত নয়। স্ফীতির মডেল GUT তত্ত্বের উপর বেশি পরিমাণে নির্ভর করে। সেই GUT তত্ত্ব কতখানি বাস্তবসম্মত তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। লিন্ডে তাঁর সাম্প্রতিক তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে আসলে বিশ্বের প্রাথমিক দশায় স্ফীতির উপস্থিতির জন্যে কোয়ান্টাম মহাকর্ষজনিত প্রক্রিয়া, দশা পরিবর্তন, অতিশীতলীকরণ কিংবা এমনকি আদিতে বিশ্ব যে উষ্ণ ছিল -এসব পূর্ব-নির্ধারিত শর্তের কোনো দরকারই নেই। কেবল বিশ্বের প্রাথমিক দশায় প্রযোজ্য বিভিন্ন রকমের নিদিক ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করতে হবে এবং দেখতে হবে তাদের কোনোটি স্ফীতির জন্ম দেয় কিনা। যেসব ডোমেইনে স্ফীতি কাজ

কণা না পেগুলো ছোটই রয়ে যাবে ; যে ডোমেইনে স্ফীতি কার্যকর হয় সেটা প্রসারিত হয়ে চিরন্তন বিশ্বে পরিণত হয়। একে লিন্ডে বলেছেন বিশৃঙ্খল স্ফীতির (chaotic inflation) মডেল। এদিকে স্ফীতি সংক্রান্ত মডেলেরও কমতি নেই—সাধারণ স্ফীতি, সম্প্রসারিত স্ফীতি, মিশ্র স্ফীতি এবং আরো অনেক। সম্প্রতি অতিপ্রতিসাম্যের কিছু ধারণা স্ফীতির মডেলে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এমনকি কোয়ান্টাম সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণাও ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে সুপারস্ট্রিং তত্ত্ব থেকে সহজাতভাবে স্ফীতির উদ্ভব হয় না। তার জন্য প্রয়োজন নতুন ধারণার। তবে কণা পদার্থবিজ্ঞানের অধিক শক্তি মডেল সহজাতভাবেই বিশ্বের আদিতে একটি স্ফীতির দশা আরোপ করে। তাই কণা-পদার্থবিজ্ঞানের নতুন ধারণাগুলোকে নিয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন। স্ফীতির ফলে সৃষ্ট আদি ঘনত্ব-বিচলন (density perturbation) বিশ্বে পদার্থের বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে ; তাই এরা পটভূমি বিকিরণকে প্রভাবিত করে ; এমনকি এরা মহাকাশীয় তরঙ্গও বিকিরণ করতে পারে। ১৯৯২ সালে COBE (Cosmic Background Explorer) পটভূমি বিকিরণে যে অতিসামান্য পরিমাণ অসুষমতার সন্ধান পেয়েছে (অনু ৩.৩) তা স্ফীতির মডেলকে সমর্থন করে। অবশ্য অতি দ্রুত এমন মন্তব্য করাও ঠিক নয়। আগামী পঞ্চাশ বছরে এ সম্পর্কে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।[৮]

৩.১০ সৃষ্টির মাহেন্দ্র ক্ষণে

আমরা দেখেছি যে, মহাবিস্ফোরণ মডেল মতে বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছিল একটি অতি ঘন, অতি উত্তপ্ত ও অতি ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে। বিশ্বের পর্যবেক্ষিত অধিকাংশ ঘটনার সাথে এই মডেল যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। তবে অসঙ্গতিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ছায়াপথ তৈরি ও পটভূমি বিকিরণের সমরূপতা। আরো রয়েছে 'দিগন্তের সমস্যা' ও 'সমতার সমস্যা'। এসব অসঙ্গতির ফলে মহাবিস্ফোরণ মতবাদকে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংশোধনী তত্ত্ব আলোচিত হচ্ছে। বহুল পরিচিত ও ব্যাপক সমর্থিত মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের আলোকে এবার সৃষ্টির পরম পবিত্র মাহেন্দ্র ক্ষণের একটি রূপরেখা (বা ভাবচিত্র) এখানে আলোচিত হবে। একে 'ভাবচিত্র' এ কারণে বলা যায় যে, এই সময়কার পরিস্থিতি কখনোই আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না। এ সময়ে শুধু তত্ত্বের ভাবনাই চলতে পারে।

$t_{পরম} \sim 10^{-43}$ সেকেন্ড

একপ্লাঙ্কীয়ভাবে খুব এই সময়কালে বিশ্ব ছিল সর্বাধিক সহজ। 10^{-43} সেকেন্ডকে বলা হয় প্লাঙ্কের সময়। বলা হয়, এই সময়ের পূর্বেই ছিল পদার্থবিজ্ঞানের 'সোনার হরিণ'—প্রকৃতির বলচতুষ্টয়ের সেই কল্পিত পরম ঐক্য। তখন সমস্ত বল মাত্র একটি বলে একীভূত থাকবে।

৮. স্ফীতিশীল বিশ্বের তত্ত্বের উপর ভাল সাধারণ আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য Guth & Steinhardt (1984)। স্ফীতির উপর সাম্প্রতিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Linde (1998)। এছাড়া দ্রষ্টব্য Linde (1990)।

সমস্ত কণিকা থাকবে অভিন্ন। এই সময়কালের সঠিক বর্ণনা হতে মহাকর্ষের কোনো কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিতে পারবে। এই নির্দিষ্ট সীমানার ওপারকার বিশ্বের সঠিক দশা জানতে এ রকম একটি তত্ত্বের একান্ত দরকার।

10^{-43} সেকেন্ড ... 10^{-36} সেকেন্ড

এই অতি ক্ষুদ্র সময় ব্যবধানে বিশ্ব ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত (প্রায় 10^{32} কেলভিন)। এ সময়ের কণিকাসমূহ (সবল–বিদ্যুৎ–ক্ষীণ) একীভূত বল অনুভব করে। বিশ্বের আকৃতি মাত্র 10^{-33} সে.মি.। এই সময়ের তাপমাত্রা মহাকর্ষের জন্য যথেষ্ট শীতল। তাই 10^{-43} সেকেন্ডের পরই মহাকর্ষ মুক্ত হয়ে যায়। এ সময়ে বিশুদ্ধ শক্তি কণায় রূপ নিতে থাকে। এই সময় ব্যবধানে একটি নতুন কণার উদ্ভব হয় যার নাম এক্স বোসন। ভারি এক্স-কণার উপস্থিতি বিদ্যুৎ–ক্ষীণ বলের সাথে সবল বলের একীভবন ঘোষণা করে। এই কণা কোয়ার্ককে লেপ্টনে পরিণত করতে পারে (এবং বিপরীতক্রমও সত্য)। এভাবে কণিকাদের বিভিন্ন পরিবারের মাঝে পরম প্রতিসাম্য সূচিত হয়। এই এক্স কণার আরেকটি গুণ এই যে যদি মুক্ত কোয়ার্ক রূপান্তরযোগ্য হয় তবে হাড়ুনস্থিত কোয়ার্কের পক্ষেও এই রূপান্তর সম্ভব। ফলত স্থায়ী কণাসমূহ আর স্থায়ী থাকে না। যেমন এ কারণে প্রোটনের ভাঙন ঘটতে পারে, যার আয়ু 10^{32} বছর। তাহলে 10^{32} সংখ্যক প্রোটনের মধ্যে নিশ্চয়ই একটি প্রোটন বছরখানেকের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে কিন্তু এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। দেখে শুনে মনে হয় পদার্থবিজ্ঞানীরা যেন প্রোটনের চারদিকে বসে আছেন এর ভাঙন দেখার জন্য। ঠিক 10^{-36} সেকেন্ডে সবল বল বিদ্যুৎ–ক্ষীণ একীভূত বলের থেকে আলাদা হয়। মহাবিস্ফোরণ মডেলের বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য এই সময়ে বিশ্বে একটি নতুন দশার সংযোজন করা হয়। এটি স্ফীতির (inflation) দশা।

10^{-36} সেকেন্ড ... 10^{-10} সেকেন্ড

এই সময়ে বিশ্বের তাপমাত্রা যথেষ্ট কমে যায় এবং সবল বল সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। তবে দুর্বল ও বিদ্যুৎ চৌম্বক বল একীভূতই থেকে যায়। তবে কোয়ার্ক ও লেপ্টন আর পরিবর্তনযোগ্য থাকে না। এই সময়ের শুরুর দিকে চুম্বক একমেরুর (magnetic monopole) আবির্ভাব হতে পারে। এ সময়ে তরের সুতাকৃতির কেন্দ্রীকরণ (concentration) গড়ে উঠে থাকতে পারে (এবং এভাবে হয়ত ছায়াপথ তৈরির বীজ তৈরি হয়েছিল)। তাপমাত্রা ছিল 10^{15} কেলভিন। যখন সবল বল পৃথক হতে থাকে তখন এটি সর্বজনীনভাবে হয়নি। স্থানের এখানে কোথাও, ওখানে কোথাও এভাবে বিচ্ছিন্নভাবে সবল বল পৃথক হতে থাকে। এই সমস্ত স্থান, যেখানে বলের পৃথকীকরণ ঘটেছে, আয়তনে বাড়তে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে সর্বত্রই সবল বল পৃথক সত্ত্ব হয়ে দাঁড়ায়। এ সমস্ত বাড়ন্ত অঞ্চল যখন পরস্পরের সাথে মিলিত হতে শুরু করে তখন সীমান্ত অঞ্চলসমূহে, তাত্ত্বিকরা যাকে বলেন, 'স্থানের বিকৃতি' (বা মোচড়, twists in space) আবির্ভূত হয়। মহা একীভূত

তত্ত্বানুযায়ী (GUT) এই স্তরের বিকৃতিসমূহ কণিকারূপে আবির্ভূত হতে পারে। এ ধরনের কণিকাই চুম্বক একমেরু। আমরা জানি, দ্বিমেরুত্ব চুম্বকের অনিবার্য ধর্ম। কিন্তু এই সমরূপ চরমাবস্থার স্তরে একমেরুত্ব সম্ভব হয়। এ সমস্ত একমেরু এক্স কণার মতোই বেশ ভারি। ক্লিভল্যান্ড ইউনিভার্সিটির ডি. ফ্রেইবার্গার এ ধরনের চুম্বক একমেরুর কণিকারূপ (বা জ্যামিতিক রূপ) দিয়েছেন ভোর্টন (vorton) হিসেবে। এদের জ্যামিতিক আকার টরাস (torus) এর মতো। কোনো একটি সরলরেখাকে কেন্দ্র করে একটি কনিককে (conic) ঘুরালে যে ঘনবস্তুর সৃষ্টি হয় সেটাই টরাস। ক্ষেত্ররেখা বা বলরেখাসমূহ কুণ্ডলিত হয়ে টরাসের চারদিকে ধূর্ণায়মান হয়। এ সময়ে বিশ্বের আয়তন সৌরজগতের সমান হয় অর্থাৎ ব্যাস প্রায় 10^{13} মিটার হয়।

10^{-12} সেকেন্ড ... 10^{-6} সেকেন্ড

বিকিরণের তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল ও দুর্বল বল আলাদা হয়ে যায়। এই সময়কালের শেষ দিকে সবল বলের প্রভাবে কোয়ার্কসমূহ (বিভিন্ন 'গন্ধের' ও 'রঙের') আবদ্ধ হয়ে হ্যাড্রন (প্রোটন, নিউট্রন) গঠন করে। 10^{-10} সেকেন্ডে বিদ্যুৎ-ক্ষীণ বলের একীভবন ঘটে এবং এ সময়কার ভৌত বর্ণনা পাওয়া যায় সালাম-ভাইনবার্গ-গ্লাশোর একীভূত মডেল (Salam-Weinberg-Glashow Unified Model) থেকে। 10^{-8} থেকে 10^{-6} সেকেন্ড সময়ের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। সম্ভবত মুক্ত কোয়ার্ক এ সময়ে দশমান ছিল। নিউট্রন, প্রোটন (হ্যাড্রন) কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত, আমরা জানি। আমরা এও জানি নিম্নশক্তিতে মুক্ত কোয়ার্ক (হয়ত) কোনোদিনই দেখা যাবে না। তবে এ সময়ে কণিক সমূহের অত্যুচ্চ শক্তি কোয়ার্কসমূহের দশমান বা মুক্ত থাকার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু 10^{-6} সেকেন্ড বা তার পরে শক্তি যথেষ্ট কমে যায় এবং ফলে এরা কণিকার অন্দরমহলে চিরজীবনের মতো বন্দী হয়ে পড়ে।

10^{-6} সেকেন্ড ... 10^{-1} সেকেন্ড

এই সময়ে বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল প্রায় ১০,০০০ মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিন। টাইম জিরোর প্রায় ০.১১ সেকেন্ড পর এই সময়ে প্রায় সব ধরনের কণিকা তৈরি হয়ে গেছে। কোনো কণিকাই পরমাণু-কেন্দ্রীন তৈরি করেনি, তবে ক্রমহ্রাসমান তাপমাত্রার কারণে ভারি নিউট্রন হাল্কা প্রোটনে রূপান্তরিত হয় ($p+e^- \leftrightarrow n+\nu$; $p+\nu \leftrightarrow n+e^+$)। এই বিক্রিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। কিন্তু এই বিক্রিয়ায় নিউট্রন প্রোটনের চেয়ে অধিকতর ভারি বলে ঘনত্বের সমতা রক্ষিত হয় না। আসলে এই বিক্রিয়া শক্তির হিসাবে বেশি লাভজনক। এই বিক্রিয়া যদি চলতে থাকে তবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সব নিউট্রন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বিক্রিয়ার হার নির্ভর করে তাপমাত্রার (পঞ্চম ঘাতের) উপর। তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সাথে সাথে এই

বিক্রিয়াও এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ের শেষে ৩৬% নিউট্রন ও ৬৪% প্রোটন থাকে। এ সময়কার শক্তি–ঘনত্ব সাধারণ পানির নিশ্চল ভরের শক্তি ঘনত্বের ৩০ মিলিয়ন গুণ হয়।

10^{-5} সেকেন্ড ... 10^{-2} সেকেন্ড

বিশ্বের প্রায় ১.০৯ সেকেন্ড বয়সে তাপমাত্রা ছিল প্রায় ১০,০০০ মিলিয়ন ডিগ্রি (10^{10}) কেলভিন। তাপমাত্রা ও শক্তি–ঘনত্ব এতো কমে যায় যে নিউট্রিনো (এবং প্রতি নিউট্রিনো) মুক্ত কণার ন্যায় আচরণ করে। এ সময় থেকেই নিউট্রিনো অন্য কণাদের সঙ্গে আর তাপীয় সুস্থিতিতে থাকে না। এর পূর্বে নিউট্রিনোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক ছিল। যেহেতু তাপমাত্রা বিশ্বের আয়তনের ব্যস্তানুপাতে হ্রাস পাচ্ছিল, নিউট্রিনোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশ্বের আয়তনের সমানুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নিউট্রিনো বিযুক্ত (decoupled) হবার পর এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশ্বের আয়তনের সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়। এ সময়কার বিশ্বের শক্তি–ঘনত্ব পানির শক্তি–ঘনত্বের ৩৮০০০ গুণ। প্রোটন–নিউট্রন অনুপাত ছিল ৭৬% ও ২৪%।

10^{-2} সেকেন্ড ... 10^{3} সেকেন্ড

$10s < t < 100s$ সময়ে ইলেকট্রন পজিট্রন বিনাশ ঘটে। এর পূর্বে e^{+} জোড়া সংখ্যায় ফোটনের সমান ছিল। এ সময়ে বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল ৩০০০ মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিন। সৃষ্টির ১৩.৮২ সে. পর থেকেই ইলেকট্রন-পজিট্রন বিনাশের ফলে বিশ্বে ইলেকট্রন কমতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় যে শক্তি নির্গত হয় তা বিশ্বের শীতল হবার হারকে কমিয়ে দেয়। এখন থেকে বিশ্বের তাপমাত্রা বলতে ফোটনের তাপমাত্রাই বুঝাবে। এ সময়ে নানা ধরনের স্থায়ী উপাদান তৈরি হতে থাকে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে এটি ঘটে না। কারণ বিশ্ব তখনো এতো দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে যে কেবল অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন দুই কণা বিক্রিয়ায় (two-particle reaction) স্থায়ী কেন্দ্রীন গঠিত হতে পারে। ডিউটেরিয়াম (এবং ট্রিটিয়াম, হিলিয়াম ৩) শক্ত বাঁধুনির নয় বলে এরা তৈরি হওয়া মাত্রই ভেঙে যায় (কিন্তু মজবুত বাঁধুনির জন্য হিলিয়াম এই তাপমাত্রায়ও টিকে থাকতে পারে)। কাজেই ভারি মৌল তৈরি হতে বাধা পায়। এ সময় তখনো নিউট্রন–প্রোটন বিক্রিয়া চলছে এবং এদের অনুপাত ১৭ : ৮৩ (শতাংশে)। ফোটনের মতো নিউট্রিনোও বিশ্বের প্রসারণে অংশ নেয়, তবে যেহেতু এরা $e^{\pm}$ বিনাশে অংশ নেয় না অথবা ফোটনের সঙ্গেও বিক্রিয়া করে না, তাই এদের তাপমাত্রা ফোটনের ৪০% থাকে।

10^{3} সেকেন্ড ... ৩ মিনিট

এ সময়ে বিশ্বের তাপমাত্রা প্রায় ১ বিলিয়ন ডিগ্রি (10^{9} K)। অধিকাংশ ইলেকট্রন ও পজিট্রন অদৃশ্য হয়েছে এবং বিশ্বের প্রধান উপাদান হচ্ছে নিউট্রন, প্রোটন, নিউট্রিনো, ফোটন। এ সময়ে নিচের বিক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয় :

$$p+n \rightarrow d+\gamma.$$

$$D+D \begin{cases} \rightarrow T+p. \\ \rightarrow He^3+n. \end{cases}$$

$$T+D \rightarrow He^4+n.$$

$$He^3+n \rightarrow T+p.$$

আরো জটিল মৌল এ সময়ে তৈরি হতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে ভারি মৌল তৈরি হতে হলে বিশ্বের সে সময়কার প্রা ক্রমশ কেন্দ্রীন ও কণার সংঘর্ষ প্রয়োজন। তার মানে ভারি মৌল তৈরি হবে He^4 এর সাথে নিউট্রন বা প্রোটন বা He^4 কেন্দ্রীনের সংঘর্ষের ফলে। কিন্তু ৫ ও ৮ পারমাণবিক ওজনের কোনো স্থায়ী কেন্দ্রীন নেই বলে He^4 এর চেয়ে ভারি মৌল হয় না। অর্থাৎ

$$He^4 + He^3 \rightarrow Be^7 + \nu \; ; \; He^4 + T \rightarrow Li^7 + \nu$$

এ সমস্ত বিক্রিয়া বিক্রিয়ক পদার্থসমূহের স্থির–তড়িৎ বিকর্ষণের (electro-static repulsion) ফলে হতে পারে না। এ সমস্ত কারণে আদিম কেন্দ্রীন সংশ্লেষে হাল্কা মৌল ব্যতীত অন্য কিছুর কেন্দ্রীনই গঠিত হতে পারে না এবং সৃষ্টির ৩০০ সেকেন্ডের মধ্যেই যখন উষ্ণ কেন্দ্রীন সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায়।

৩ মিনিট ... ২,০০০,০০০ বছর |

মহাবিস্ফোরণের তিন মিনিট পরে বিশ্বের তাপমাত্রা যথেষ্ট কমে আসে। ফলে প্রোটন ও নিউট্রন আবদ্ধ হয়ে পরমাণু-কেন্দ্রীন গঠিত হয়। প্রথম কেন্দ্রীন—হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন। তবে পরমাণু তৈরির জন্য ইলেকট্রন আবদ্ধ হওয়ার পক্ষে তাপমাত্রা ছিল যথেষ্ট উচ্চ। যদি কোনো ইলেকট্রন কক্ষাবদ্ধ হয়েও পড়ে তবে মুহূর্তেই অন্য কণিকার সাথে সংঘর্ষে বিচ্যুত হয়ে যায়। ছায়াপথ তৈরির বীজ ভরের কেন্দ্রীকরণ এ সময়ে প্রকট হয়ে পড়ে। ৩ মিনিট সময়ে তাপমাত্রা ছিল প্রায় সূর্যের কেন্দ্রের তাপের ২০ গুণ। এ সময়ে উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে ডিউটেরিয়াম (১টি প্রোটন + ১টি নিউট্রন), ট্রিটিয়াম (১ প্রোটন + ২ নিউট্রন), হিলিয়াম-৩ (২ প্রোটন + ১ নিউট্রন), হিলিয়াম-৪ (২ প্রোটন + ২ নিউট্রন)। অন্যান্য ভারি পদার্থ পরবর্তীতে নক্ষত্রের কেন্দ্রে তৈরি হয়েছে।

২,০০০,০০০ বছর ... নিকট অতীত |

২ লক্ষ বছর পর তাপমাত্রা অনেক কমে যায় এবং ইলেকট্রন আবদ্ধ হয়ে পরমাণু তৈরি হতে থাকে। ৩ লক্ষ বছরের মাথায় অধিকাংশ পরমাণু গঠন সম্পন্ন হয়। পরমাণু গঠন সম্পন্ন হওয়া মাত্রই বিকিরণ আর মিথস্ক্রিয়াযোগ্য থাকে না। ফলে বিশ্ব হলো আলোর পক্ষে ভেদনযোগ্য।

এর পূর্ব পর্যন্ত বিকিরণ চাপের জন্য পদার্থের যে কোনো প্রকারের কেন্দ্রীকরণ সম্ভব ছিল না। যখন পরমাণু তৈরি হতে গেল তখন তাদের কেন্দ্রীকরণ শুরু হলো। বস্তুকণাকে ঘোরা করে যেমন মেঘ তৈরি হয় ঠিক একইভাবে কেন্দ্রীভূত তারকে কেন্দ্র করে ছায়াপথ গঠিত হতে পারে। ধীরে ধীরে বিশেষ কেন্দ্রগুলো চিরস্থায়ী আকারে রূপ নেয়। এবং এই পর্যায়ে পৌঁছে সূর্য সহায়তায়। মহাকর্ষ শক্তি প্রাধান্য পেতে পারে। ১ থেকে ১০ লক্ষ বছরের মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা তিন লক্ষ থেকে ১৫ হাজার ডিগ্রি কেলভিনে নেমে এলে এক ক্রান্তি অতিক্রম করে।

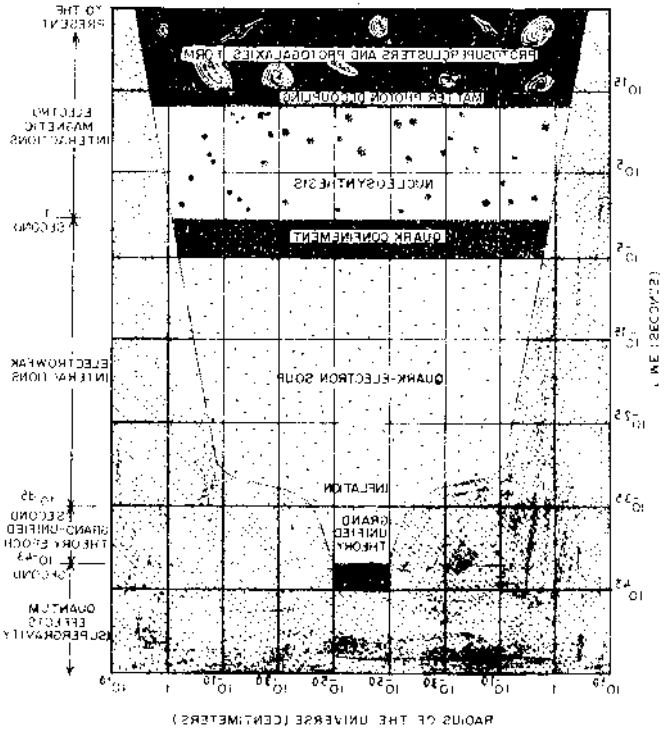

চিত্র ৩.১২ : [illegible]

[illegible] বস্তুকণা

[illegible] বলতে [illegible] যা বুঝি [illegible] সূর্য তারা, নীহারিকা তারার বেলা— এ সবই সৃষ্টি হয়েছে ২ থেকে [illegible] সেকেন্ড সময় সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আজ কৌতূহলী। এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব তাঁরা বের করতে চাইছেন। পরীক্ষণবিদেরা চেষ্টা করছেন—মুক্ত কোয়ার্ক দেখা সম্ভব কিনা, চুম্বক একেবারে কি সম্ভব— এসব সমস্যা সমাধান করতে।

সেন্ট অগাস্টিনের মতো প্রশ্ন করা যায় : 'সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর কি করতেন?' এ ভাবেও বলা যায় : 'মহাবিস্ফোরণের বা টাইম-জিরোর আগে কি ছিল?' এর উত্তর এভাবে দেওয়া যায় : যেহেতু ধরা সময়েরই উৎপত্তি হয়েছে টাইম জিরোতে, তাই এর আগে কি ছিল প্রশ্ন করা অর্থহীন।

৩.১১ বিকল্প অনুকল্প

প্রমাণ উষ্ণমহাবিস্ফোরণ মডেলই সৃষ্টিতত্ত্বে একমাত্র প্রস্তাবিত মডেল নয়। এছাড়াও আরো অনেক মডেল প্রস্তাবিত হয়েছে। এদের মধ্য থেকে আইনস্টাইন–ডি সিটার–লেমাইটার–ফ্রিডম্যান রবার্টসন ওয়াকার কৃত মডেলের পরিমার্জিত রূপটিই আজ প্রমাণ মডেল হিসেবে অনুসৃত হচ্ছে। নিছক ঐতিহাসিক কৌতূহল মেটাতে এবং প্রমাণ মডেল ছাড়া আর সম্ভাব্য কি হতে পারে কিছুটা সে আগ্রহ মেটাতে এখানে অধুনা অপ্রচলিত মডেলগুলি আলোচিত হলো।

পরম্পরা বিশ্ব : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় এ ধরনের বিশ্বচিত্র অনুকল্পিত হয়েছিল যার মূলচিন্তাটি ছিল এরকম : বিশ্বের বস্তুনিচয় কাঠামোর এক পারম্পর্য বজায় রেখে বণ্টিত হয়েছে। কাঠামো পরম্পরার এ ধারণাই পরবর্তীতে আধুনিক ফ্র্যাকটাল বিশ্বের অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এ মডেলে বস্তুর গড় ঘনত্ব স্কেল r এর সাথে পরিবর্তিত হয় এভাবে : $\rho(r) \propto r^{-\gamma}$ যেখানে $\gamma \sim 2$। এভাবে দেখা যায় যে ব্যাপক হর পটভূমিতে বিশ্বে বস্তুর ঘনত্ব শূন্যের কোঠায় নেমে যায় ($r \to \infty$ হলে $\rho(r) \to 0$)।

মিলনে বিশ্ব : ই. এ. মিলনে তিরিশের দশকে এই মডেল প্রস্তাব করেন। এ মডেলে স্থানকাল সমতল এবং লাইন এলিমেন্ট হলো :

$$ds^2 = dt^2 - t^2 \left[\frac{dr^2}{1 - \frac{r^2}{R^2}} + r^2 d\Omega \right]$$

মিলনে তার বিশ্বচিত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের নীতিকে স্বতঃসিদ্ধাকারে প্রয়োগ করেন এবং এই নীতির এক সুগভীর দর্শনকে ভিত্তি দেন যাকে ভাইল আরো সম্প্রসারিত করেন)। মিলনে দেখিয়েছিলেন যে সুষম বিশ্বের ধারণা থেকে সহজেই হাবলের বিধি আহরণ করা যায় ; বিশ্বের প্রসারণ গতিকে পারস্পরিক সংগতীয় দর্শকের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান দূরত্ব হিসেবে গণ্য করা যায় এবং আপেক্ষিক বেগের যোগে প্রচলিত ভেক্টরের আইন প্রয়োগ করা যায়।

ডিরাকের বৃহৎ সংখ্যার অনুকল্প : পজিট্রনের আবিষ্কর্তা পল ডিরাকের এই চমৎকার অনুমানের ভিত্তি হলো একটি বিশেষ বৃহৎ সংখ্যা। প্রথমত আমরা যদি প্রোটন ও ইলেকট্রনের মধ্যে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ (electrostatic force) বল (F_E) এবং এদের

মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বলের (F_G) অনুপাত নেই তবে একটি মাত্রাহীন বৃহৎ সংখ্যা পাই :

$$\frac{F_E}{F_G} = \frac{\frac{e^2}{r^2}}{\frac{Gm_e m_p}{r^2}} = \frac{e^2}{Gm_e m_p} \approx 10^{40}$$ [e, G, m_e, m_p হলো যথাক্রমে ইলেকট্রনের আধান, মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, ইলেকট্রন ও প্রোটনের ভর]।

এবার আমরা যদি মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ (R) এবং ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধের তুলনা করি তাহলেও অনুরূপ একটি বৃহৎ সংখ্যা পাই :

$$\frac{R}{r} = \frac{c/H}{\frac{e^2}{m_e c^2}} = \frac{cT}{e^2/m_e c^2} \approx 10^{40}$$ [এখানে c আলোর বেগ, H হাব্‌লের ধ্রুবক, T বিশ্বের বয়স]।

এখানে ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ r হচ্ছে এর বিদ্যুৎ-চৌম্বক ও গতীয় ধর্মাবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি রাশি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে : 'এতো বড় সংখ্যা কেন?' এর কি কোনো তাৎপর্য আছে? ডিরাকের ভাষায় "...এই সম্পর্ক, আমার বিশ্বাস, মোটেই কাকতালীয় নয়। এর নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। সেই কারণটি কি আমরা তা জানি না, তবে এই সম্পর্কের কারণেই আমরা $\frac{Gm_e m_p}{e^2}$ সংখ্যাটিকে বুঝতে পারছি। এই সংখ্যাটি আসলে বিশ্বের বয়সের সমান।" আপাত সম্পর্কহীন দুটি অনুপাত প্রায় সমান হওয়ায় প্রশ্ন জাগে যে তাহলে এদের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে? ডিরাকের মতে এই সম্পর্কটি বিশ্বের বয়সের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমরা যদি উপরিউক্ত দুটি অনুপাত স্বীকৃত করি তবে দেখানো যায় : $G = \frac{e^4}{m_e^2 m_p^2 c^3 T} = \frac{1}{T} = (T)^{-1}$। অর্থাৎ মহাকর্ষীয় ধ্রুবকটি সময়নির্ভর একটি রাশি। এটাই ডিরাকের বৃহৎ সংখ্যার অনুমান (Large Number Hypothesis, LNH)। আমরা এ রকম আরো একটি বড় সংখ্যার উদাহরণ দিতে পারি। $\frac{c}{H_0}$ ব্যাসার্ধের কোনো গোলকের মধ্যের ঘনত্ব যদি ρ_c এবং প্রতিটি কণার ভর যদি m_p হয় তবে মোট কণার সংখ্যা দাঁড়ায় : $N = \frac{4\pi}{3m_p}\left(\frac{c}{H_0}\right)^3 \frac{3H_0^2}{8\pi G} = \frac{c^3}{2m_p G H_0} = 4\times10^{79} h_0^{-1} \approx 10^{80}$। এই সংখ্যাটিকে আমরা বিশ্বের মোট ব্যারিয়ন সংখ্যা বলে থাকি। দেখাই যাচ্ছে $\sqrt{N}$ হচ্ছে 10^{40} যা আমরা পূর্বেই নির্ধারণ করেছি। এতসব কাকতালীয় ঘটনাই ডিরাকের LNH অনুমানে ব্যক্ত হয়েছে। ডিরাকের অনুমানের সাধারণ বর্ণনা হলো : যদি বিশ্বের বয়স হাবল ধ্রুবকের বিপরীত হয় ($T_0 = H_0^{-1}$) এবং ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ অতিক্রম করতে আলোর যদি t_e সময় লাগে, তবে বর্তমান সময়ের যেকোনো বিশাল সংখ্যাকে $(T_0/t_e)^k$ আকারে লেখা যায় (যেখানে k এর মান এক)। কাজেই $e^2/Gm_p m_e$ সংখ্যাটি $(t/t_e)^{-1}$ এর সমানুপাতিক (অনুপাতিক ধ্রুবক

এক ; আমরা যদি t_Eকে পারমাণবিক এককে হিসাব করি তাহলে এটা ধ্রুব থাকে (পরমাণু স্কেলে) ; ফলে $G \propto (t)^{-1}$ হয়।

এবারে আমরা আলোচনা করব এই ডিরাক অনুমানের কি কি ফল আছে। ডিরাক দেখিয়েছেন যে, এই অনুমান সত্য হলে বিশ্বের প্রসারণ সুষম গতিতে হবে (এবং কোনো ত্বরিত প্রসারণ সম্ভব নয়)। ডিরাকের অনুমানের সবচেয়ে মজাদার ফল হলো, দুই মেট্রিকের ব্যবহার। স্থানকাল বিস্তৃতিতে যে কোনো দুই বিন্দুর মধ্যের সঠিক দূরত্বকে মেট্রিক (metric) বলে। এখন আইনস্টাইনের তত্ত্বে G ধ্রুবরাশি অথচ ডিরাক দেখিয়েছেন যে তা সময়নির্ভর। এ অসঙ্গতি দূর করার জন্য ডিরাক পরিমাপের দুটি স্কেলের প্রস্তাব করেন : একটি পারমাণবিক স্কেল (atomic scale) অন্যটি মহাজাগতিক স্কেল। এ দুটি স্কেলে পরিমাপিত মেট্রিককে ds_A এবং ds_E লেখা হয়। আমরা যদি পারমাণবিক স্কেল ব্যবহার করি তবে পারমাণবিক স্কেলে পরিমাপিত রাশিসমূহ ধ্রুব থাকে, তখন মহাজাগতিক স্কেলের রাশিসমূহ ধ্রুব থাকে না। যেমন পারমাণবিক স্কেল ব্যবহার করলে $G_A, (m_e)_A, (m_p)_A$ ধ্রুব থাকে ; কিন্তু $G_E, (m_e)_E, (m_p)_E$ ধ্রুব থাকে না, তখন মহাজাগতিক স্কেল ব্যবহার করলে উল্টো ঘটনা ঘটে। ডিরাক উপরিউক্ত দুই মেট্রিকের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন : $ds_A = t\,ds_E$। যদি মহাজাগতিক এককে বিশ্বের বয়স পরিমাপ করা হয় $\tau = \log t$ অর্থাৎ বিশ্ব অনাদিকাল থেকে ছিল, এর কোনো শুরু নেই ($t = 0$তে $\tau = -\infty$)। মহাজাগতিক স্কেল ব্যবহার করলে পারমাণবিক স্কেল ধ্রুব থাকে না। তখন ইলেকট্রনের চার্জ এবং h যথাক্রমে $t^{-3/2}$ ও t^{-3} এর সমানুপাতিক। এভাবে e^2/h রাশি ধ্রুব থাকে। ডিরাক তাঁর অনুমিতি ব্যবহার করে দূরবর্তী ছায়াপথের অপসারণেরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন : যদি ds_A ধ্রুব থাকে তবে $ds_E \propto (t)^{-1}$। অর্থাৎ মহাজাগতিক স্কেলের সাপেক্ষে পারমাণবিক ঘড়ি খুব দ্রুত চলে। এখন সুদূরকাল পূর্বে কোনো ছায়াপথ কর্তৃক নির্গত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য মহাজাগতিক স্কেলের সাপেক্ষে ধ্রুব থাকে। কিন্তু যখন তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয় তখন তা পারমাণবিক ঘড়ি দিয়ে মাপতে হবে, কিন্তু নির্গমনের মুহূর্তে যে পারমাণবিক ঘড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল তার তুলনায় বর্তমানের ঘড়ি দ্রুত চলে। ফলে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রক্তিম সরণ ঘটে। ডিরাক বৃহৎ সংখ্যার অনুমান ব্যবহার করে বেশ কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব, প্রতিসাম্য ভাঙন, পদার্থের অবিরাম সৃজন (continuous creation of matter) ইত্যাদি নিয়ে ডিরাক আলোচনা করেছেন। এছাড়া জর্ডান, ব্রান্স্ এবং ডিকি, হয়েল ও নারলিকার পৃথক পৃথকভাবে তাঁদের তত্ত্বে ডিরাকের অনুরূপ ফলাফল (অর্থাৎ একটি সময়নির্ভর G-তত্ত্ব) পেয়েছেন। হাল আমলের পদার্থবিজ্ঞানীরা অবশ্য ডিরাকের এই অনুমান নিয়ে খুব একটা চিন্তা করছেন না। ডিরাকের প্রশ্ন 'এতো বড় সংখ্যা কেন' (Why such a large number) এর উত্তরে তাঁরা বলছেন 'কেন নয়'। এটা আসলেই কোনো কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে।

স্থিতাবস্থার তত্ত্ব (Steady State Theory) : ১৯৪৮ সালে ফ্রেড হয়েল, টমাস গোল্ড ও হের্মান বন্ডি এই তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। এরা বিশ্বের দিকনিরপেক্ষতা, সমরূপতা ছাড়াও

সময়ের সঙ্গে বিশ্বকে অপরিবর্তনীয় করে তোলে। এক্ষেত্রে বিশ্বের কোনো শুরু অথবা শেষ নেই। অনাদিকাল থেকে এটি ছিল, এটি আছে এবং এটি অনন্তকালব্যাপী থাকবে। বিশ্বের প্রসারণের ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে অন্যভাবে। বলা হয়েছে, যে হারে বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে সে হারে নতুন পদার্থ প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে। সম্ভবত হয়তো কোনো — অর্থাৎ ঋণাত্মক শক্তির একটি সৃষ্টিক্ষেত্র (creation field) আছে। ফলে পদার্থ এবং তেজ ফলত একই থাকছে। অবশ্য হাইড্রোজেন পদার্থের পরিমাণ খুব কম— এক ঘনমিটারে ও স্থানে এক কিলোগ্রাম পদার্থ তৈরি হতে। মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন বছর সময় লাগে। কিন্তু এই সময়ে তৈরির কোনো পরিমাণের কোনো নেই, অর্থাৎ ৬ ফুটের দশকে রাইল দেখালেন যে পৃথিবী থেকে যতদূর দেখা যায় রেডিও উৎসগুলোর সংখ্যা তত বেশি পাওয়া এর ব্যাখ্যায় হলো এই যে অতীতের তুলনায় বর্তমানে সময়ের বিভিন্ন রেডিও উৎসগুলোর সংখ্যা কম। তাহলে বিশ্ব যদি সময়ের সঙ্গে প্রসারিত হচ্ছে না, তাহলে পদার্থ সৃষ্টির বিকিরণেরও কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। বর্তমানে এটি একটি মৃত তত্ত্ব। অতি সম্প্রতি ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্ত বি. নারলিকারের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী Quasi Steady State Theory নামে একটি নতুন তত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন যেখানে তারা স্থিতাবস্থার তত্ত্বকে নতুনভাবে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। যদিও তাদের মডেল বিশ্বে হাবল মৌলের প্রাচুর্যের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছে তথাপি তাঁদের মডেল মতে বিশ্বের বয়স অসীম যোগ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

গোডেল বিশ্ব, নাট বিশ্ব : ১৯৪৯ সালে গণিতবিদ কুর্ট গোডেল (Kurt Godel) আইনস্টাইনের ক্ষেত্র-সমীকরণের সমাধান (৬.১১) এমন এক সমাধান প্রকাশ করেন যা ছিল অকারণিক (acausal) অর্থাৎ এধরনের বিশ্বে প্রচলিত কার্যকারণ সম্পর্ক কাজ করে না। গোডেল বিশ্বে সময়ের প্রবাহগুলো আবদ্ধ লুপ সদৃশ — সময় এখানে চক্রিক (cyclic), অসীম সংখ্যকবার নিজেকে পুনরাবৃত্ত করতে পারে। ফলে দর্শক তার অতীতকে দেখতে পারে। সময় নিয়ে এ সমস্যা আইনস্টাইনও নিজেও স্বীকার করেছেন। যদিও এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় তাদের নেই। গোডেল বিশ্ব আবদ্ধ সময় সদৃশ পথের (closed timelike path) জন্ম দেয়। এ ধরনের বিশ্বে দর্শক কিছু সময় পরে তার নিজের অতীতে পৌঁছে যান। পুরো বিশ্বটাই এখানে টাইম মেশিনের মতো আচরণ করে। কাজেই এ ধরনের বিশ্বে স্বাবিরোধিতা প্রবণতাদুষ্ট নিয়ে চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বে এ ধরনের জটিলতা কাম্য নয়।

ষাটের দশকের মধ্যভাগে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ই. টি. নিউম্যান, টি. ডব্লিউ. উইট এবং এল. এ. টেম্পলেটোরিন আরেক ধরনের সমাধান প্রকাশ করেন। উইটরাই প্রবক্তাদের

---

১০. পদার্থ তৈরির হার 4.5 × 10[illegible] টি কণা [illegible]

১১. স্থিতি বস্তুর তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সমাধান খোঁজার জন্য দেখুন Narlikar (1993a & b; Peebles (1993)

১২. যেমন দর্শক যদি তার অতীতে গিয়ে নিজের বাবাকে বা নিজের মাকে হত্যা করে তাহলে তার দর্শকের নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নটি সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এ ধরনের স্বাবিরোধিতাকে গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্স বলে।

নামের আদ্যক্ষর নিয়ে এই মডেলের নাম দেওয়া হয় NUT সমাধান। নট বিশ্বে যদিও সময়-ভ্রমণ সম্ভব নয় (কোনো আবদ্ধ সময়সদৃশ পথ নেই), কিন্তু এর রয়েছে স্থানকালের অদ্ভুতুড়ে জ্যামিতি। যদি আমরা দুই মাত্রায় ৩৬০° কোণে ঘুরি তবে আমরা যে বিন্দু থেকে চলা শুরু করেছিলাম সে বিন্দুতেই ফিরে আসি। কিন্তু যদি আমরা তিনমাত্রায় ৩৬০° কোণে ঘোরানো কোনো প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে চলি তবে আমরা পরবর্তী তলায় পৌঁছি। কিন্তু নট বিশ্বে যদি কোনো নক্ষত্রের চারিপাশে ৩৬০° কোণে ঘোরা হয় তবে স্থানকালের এক পৃথক অঞ্চলে পৌঁছে যেতে হয়। এ ধরনের সমাধানও অবাস্তব।

প্লাজমা বিশ্বচিত্র : ১৯৭১ সালে ক্লাইন এবং হ্যালফেন এই তত্ত্ব দেন। প্লাজমা বিশ্বের মূল চিন্তনটি হলো এ রকম : ছায়াপথে দৃশ্যমান সকল বস্তুনিচয়ের উৎপত্তি হয়েছে পদার্থ ও প্রতিপদার্থের এক লঘু ও ধীর সংকোচমান মেঘ থেকে। এই মেঘের সংকোচনের এক পর্যায়ে পদার্থ এবং প্রতিপদার্থ পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে বিপুল বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। বিনাশ বিকিরণের বিপুল ধাক্কায় প্রসারণের সৃষ্টি হয়। এই বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট অস্থায়িত্বের ফলে পদার্থ ছায়াপথের আকারে ঘনীভূত হয়। এই বিস্ফোরণের ফলেই হয়ত পদার্থ ও প্রতিপদার্থ এমনভাবে বণ্টিত হয়েছে যে তারা পর্যবেক্ষিত গামারশ্মির বিকিরণ ছাড়া অন্য কোনোভাবে বিনাশ বিকিরণ দিতে না পারে। দূরবর্তী ছায়াপথসমূহ যদি প্রতিপদার্থ দিয়ে তৈরি হয়েও থাকে তথাপি তা জানার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া মহাজাগতিক রশ্মিতেও প্রতিপদার্থের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। তদুপরি যদি অনুচ্ছেদ ৩.৮ এর অনুমিত সত্য হয় তবে বিশ্বজগৎ প্রকৃতপক্ষে প্রতিপদার্থের তুলনায় পদার্থের প্রতিই অধিকতর পক্ষপাতী। কাজেই পদার্থ-প্রতিপদার্থের যুগ্ম মেঘ কল্পনা করাটা যুক্তিযুক্ত হবে বলে প্রতীতি হয় না।

ফ্র্যাকটাল বিশ্ব : এই মডেলের মূল চিন্তনটি হলো এই যে ছায়াপথের স্থানব্যাপী বণ্টন (galaxy space distribution) আসলে একটি বিশুদ্ধ স্কেল-অপরিবর্তী ফ্র্যাকটাল বা স্তবক পরাম্পরা (scale-invariant fractal or clustering hierarchy)। কিন্তু মহাজাগতিক রক্তিমসরণ কিংবা পটভূমি বিকিরণের তেমন কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক ফ্র্যাকটালের একটি চমৎকার উদাহরণ হলো সমুদ্র তীরবর্তী তটরেখা। এছাড়া কম্পিউটার সিমুলেশনে প্রচুর ফ্র্যাকটালকে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রশ্ন হতে পারে : ব্যাপক পটভূমিতে ছায়াপথের স্থানব্যাপী বণ্টনকে ফ্র্যাকটাল হিসেবে গণ্য করার কি কোনো পর্যবেক্ষণসম্মত প্রমাণ আছে? দেখা যায়, যদি একটি ফ্র্যাকটাল মাত্রাকে ছোট স্কেলে ছায়াপথ স্তবকের পর্যবেক্ষণে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে ব্যাপক পটভূমিতে ছায়াপথের সংখ্যার যে বণ্টন দেখা যায় তা আদৌ পর্যবেক্ষণসম্মত নয়। কোনো ছায়াপথ থেকে r দূরত্বের মধ্যে প্রস্থ ছায়াপথসমূহের গড় সংখ্যা $N(<r)$ এর উপর নির্ভর করে কোনো ছায়াপথবণ্টনের ফ্র্যাকটাল মাত্রা। একটি স্কেল-অপরিবর্তী ফ্র্যাকটালে যেখানে সকল ছায়াপথ একই পরিস্থিতিতে সেখানে : $N(<r) = Ar^d$; যেখানে A ধ্রুব এবং d ম্যান্ডেলব্রটের ফ্র্যাকটাল মাত্রা। স্থানিকভাবে সুষম বণ্টনে N আয়তনের সমানুপাতিক, কাজেই d হবে স্থানের মাত্রার সমান (এক্ষেত্রে ৩)। তবে ব্যাপক পটভূমিতে ফ্র্যাকটাল মাত্রা যদি $d = 3$ হয় তবে

ছায়াপথ বন্টনের সমস্যা দূর হয়ে যায়। সুষমভাবে বন্টিত পটভূমি বিকিরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হলে হয় আমাদেরকে একটি গোলকাকার প্রতিসম বিশ্বের কেন্দ্রে বাস করতে হয়, নচেৎ d এর মানে d = 3 এই মান থেকে প্রতি 10^5 ভাগে ১ ভাগ পার্থক্যের $(3 - d < 0.0001)$ সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরোক্ষ পর্যবেক্ষণে ব্যাপক পটভূমিতে ছায়াপথের যে বণ্টনচিত্র আমরা পেয়েছি তা এই সুন্দর ফ্র্যাকটাল চিত্রের সাথে আদৌ সঙ্গত নয়।[১২]

এছাড়া ব্রানস ডিকির স্কেলার-টেন্সর তত্ত্ব (১৯৬১) এবং হয়েল নারলিকারের কনফর্মাল মহাকর্ষ তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। এগুলো মূলত মহাকর্ষের তত্ত্ব এবং সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী। যদিও সাধারণভাবে এগুলো আজকাল আর গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে মহাকর্ষের তত্ত্ব হিসেবে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব ও ব্রানস-ডিকির তত্ত্ব যেখানে ক্ষেত্রতত্ত্ব, সেখানে হয়েল-নারলিকারের তত্ত্ব সরাসরি কণিকাদের ভৌত মিথস্ক্রিয়াজনিত তত্ত্ব এবং মাখের নীতিকে[১৩] এখানে কাজে লাগানো হয়।

৩.১২ কোয়ান্টাম সৃষ্টিতত্ত্ব

বলা হচ্ছে, বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এক অতি ক্ষুদ্র, অত্যুত্তপ্ত, অতি ঘন ব্যতিক্রমী বিন্দুর (point of singularity) প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এবং সুপ্রচলিত মহাবিস্ফোরণ মডেলের (Big Bang model) মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এটাই। ব্যাপক পটভূমিতে বিশ্বের প্রসারণ এবং বিশ্বমঞ্চে পটভূমি বিকিরণের উপস্থিতি এ ধারণার জোরালো সমর্থন দিচ্ছে। বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করতে গেলে বারবারই আমাদের ফিরে যেতে হচ্ছে অতি ক্ষুদ্রের জগতে। তাই তৈরি হয়েছে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের এক নতুন এবং শক্তিশালী শাখার—কোয়ান্টাম কসমোলজি বা কোয়ান্টাম সৃষ্টিতত্ত্ব। অবধারিতভাবে আমাদের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের।

চিরায়ত জগৎ নিশ্চয়তাভিত্তিক থাকা সত্ত্বেও পরমাণুর অভ্যন্তরের অতি ক্ষুদ্র জগতে বাস্তবতার স্বরূপ এটি সম্পূর্ণ দিতে পারে না। আর তাই এই সীমাবদ্ধতা থেকেই জন্ম দিয়েছে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। এ তত্ত্বে "কিভাবে পরীক্ষণ করতে হবে তা তত্ত্বই নির্ধারণ করবে।" এর কারণ হাইজেনবার্গের সুবিখ্যাত অনিশ্চয়তার নীতি। আসলে বস্তুকণার পরিবর্তে স্থানিক তরঙ্গপ্যাকেট ধরে নেয়ার জন্যেই এই অনিশ্চয়তা। অর্থাৎ চিরায়ত জগতে যা বস্তুর গতি কোয়ান্টাম জগতে সেটা তরঙ্গ গুচ্ছের গুচ্ছবেগ। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান অনুযায়ী যেকোনো বস্তুকণাকে একটি তরঙ্গ অপেক্ষক বা ওয়েভ-ফাংশন দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায় যা একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তরক সমীকরণকে (শ্রোডিংগার সমীকরণ) সিদ্ধ করে। এই সমীকরণের সমাধান হিসেবে গণিতের নিয়মানুযায়ী এই তরঙ্গ অপেক্ষকের একাধিক (মূলত অসীম

---

১২. ফ্র্যাকটাল বিশ্বের উপর ভাল সাধারণ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Peebles (1993)

১৩. মাখের নীতি অনুযায়ী বস্তুর ভর তার একান্ত নিজস্ব কোনো ধর্ম নয় বরঞ্চ বিশ্বের অপরাপর বস্তুর উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল

সম্ভাবনা সমান্তর যার প্রত্যেকে পৃথক পৃথক সম্ভাব্য অবস্থা নির্দেশ করে। কিন্তু বাস্তবে তরঙ্গ-অপেক্ষকের সীমিত সংখ্যক সমাধান কাম্য, তাই দেখা যায় অনেকগুলো সম্ভাবনার মধ্যে থেকে একটি সম্ভাবনাই কার্যকর হয়ে ওঠে। এভাবে একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনার কার্যকর হয়ে ওঠাকে বলে তরঙ্গ-অপেক্ষকের লম্বুকরণ (collapse of wave function)। এই কোলাপ্স ঘটে দর্শকের চেতনায়; কারণ আমরা যখন 'দেখি' বা মাপন-ক্রিয়া চালাই তখনই জানতে পারি ঠিক কোন সম্ভাবনাটি কার্যকর হচ্ছে। তাই কোয়ান্টাম স্তরে মাপন ক্রিয়া অপরিহার্য এবং এ ক্রিয়ায় দর্শকের উপস্থিতি প্রয়োজন। এভাবে ভৌত ঘটনার জগতে মানসিক প্রক্রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটে। নীলস বোরের ভাষায় "অস্তিত্বের মহান নাটকে আমরা দর্শক ও অভিনেতা উভয়ই।" কোয়ান্টাম বাস্তবতা আসলে সম্ভাবনাভিত্তিক। কোয়ান্টাম থিওরিজ্ঞদের এই সিদ্ধান্তকে বলে কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা।[১৯]

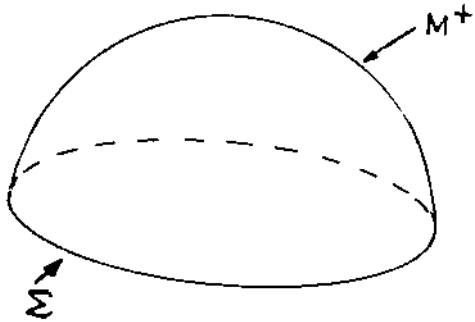

চিত্র ৩১৩ : M⁺ বিন্দুতে রেখার উপর লাম্ব ইটিয়ান দিলে উদ্দিষ্ট অংশে ফলন পাওয়া যাবে। চিত্রে বিশ্ব-পৃষ্ঠটিকে দেখানো হয়েছে

চিরায়ত বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে আমরা দেখেছি যে প্লাংকের সময়ের (10^{-43} সেকেন্ড) পর থেকে বিশ্বের ঘটনাবলীর আমাদের মোটামুটি জানা। কিন্তু প্লাংকের সময়ের পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর সঠিক বর্ণনা পেতে হলে তাই মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্বের[২০] কিন্তু মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম থিওরিজ কিভাবে প্রয়োগ করা যায়? এক্ষেত্রে বস্তুকণার অনুরূপ সমগ্র মহাবিশ্বের জন্য একটি তরঙ্গ সমীকরণ লেখা হয়। এই সমীকরণের নাম হুইলার-ডিউইট সমীকরণ (Wheeler DeWitt equation)। এটিই মহাবিশ্বের জন্য শ্রোডিঙ্গার সমীকরণের

১৯. কোয়ান্টাম থিওরিজের দার্শনিক পটভূমি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন : *বিজ্ঞান ও দর্শন*—ড. এ. এম. চক্রবর্তীর বইটি, বাংলা একাডেমী।

২০. মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্বের সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : DeWitt (1983) ও চক্রবর্তীর বইটি।

অনুরূপ সমীকরণ (এখানে বিশ্বের স্থানিক আকৃতি এবং প্রসারণ হার যথাক্রমে কণার অবস্থান ও ভরবেগের সমতুল্য)। ধরা যাক, কোনো স্থানকাল বহুধার (spacetime manifold) অন্তর্ভুক্ত কোনো ত্রিমাত্রিক বহুধা Σ যার রয়েছে প্রবর্তিত (induced) মেট্রিক h_{ij}। এখন এই Σ পৃষ্ঠের অবস্থানকে স্থানাংকের (three coordinates, x_i) অপেক্ষক τ দিয়ে প্রকাশ করা যায় (চিত্র ৩.১৩)। কিন্তু উক্ত পৃষ্ঠের উপর কোনো পাথ ইন্টিগ্রাল বা পথ সমাকল কর্তৃক সংজ্ঞায়িত তরঙ্গ অপেক্ষক τ বা স্থানাংক-ব্যবস্থা উক্ত x_i এর উপর নির্ভর করে না। এর অর্থ তরঙ্গ অপেক্ষক Ψকে চারটি অপেক্ষক অন্তরকলন সমীকরণ (ফাংশনাল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন) মেনে চলতে হবে। এদের মধ্যে তিনটিকে বলে মোমেন্টাম কনস্ট্রেন্ট : $\left(\frac{\delta}{\delta h_{ij}}\Psi\right)_{;j}=0$। এই সমীকরণত্রয়ের অর্থ এই যে তরঙ্গ অপেক্ষকটিকে পৃথক পৃথক তিন মেট্রিক (three-metric) h_{ij} এর জন্য অভিন্ন হতে হবে। এই তিন মেট্রিক পাওয়া যায় পরস্পরের জন্য স্থানাংকের (x_i) রূপান্তরের মাধ্যমে। চতুর্থ ফাংশনাল সমীকরণটি হলো। বিখ্যাত হুইলার–ডিউইট সমীকরণ :

$$\left(G_{ijkl}\frac{\partial^2}{\partial h_{ij}\partial h_{kl}} - h^{1/2}\,{}^3R\right)\Psi = 0 \qquad (৩.১১.১)$$

দেখা যাচ্ছে যে সমীকরণটি τ নিরপেক্ষ এবং এটি সময়–নিরপেক্ষও বটে। এই সমীকরণটিকে বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য শ্রোডিংগার সমীকরণ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু মহাকর্ষের একটি সার্থক কোয়ান্টাম তত্ত্ব না পাওয়া পর্যন্ত সমস্যা রয়েই যাচ্ছে। আরেকটি সমস্যা হলো এই যে, কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান প্রযোজ্য কেবল অতি ক্ষুদ্রের জগতে। কাজেই বিশ্বের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত ধরনের কোনো তরঙ্গ সমীকরণ আদৌ লেখা যায় কিনা সেটা একটা বড় প্রশ্ন। তবে স্মর্তব্য যে, যে সময়ের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে (অর্থাৎ প্লাংকের সময়) তখন বিশ্বের আকৃতি ছিল অত্যন্তিক্ষুদ্র। এ পর্যন্ত জানা কোনো মৌলিক কণার থেকেও ক্ষুদ্র। কাজেই নীতিগতভাবে কেনো সমস্যা থাকার কথা নয়। তাছাড়া কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান অতি বৃহতের ক্ষেত্রে যা ফলাফল দেয় তা চিরায়ত বলবিজ্ঞানের খুব কাছাকাছি। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো হুইলার ডিউইট সমীকরণের তরঙ্গ অপেক্ষকটি চুপসে যাবে বা কোলাপ্স করবে কিভাবে কারণ এখানে দ্রষ্টা স্বয়ং দৃষ্ট বিশ্বেরই অংশ ; তরঙ্গ-সমীকরণের সম্ভাব্য সমাধান যেহেতু তাত্ত্বিকভাবে অসীম—তাহলে কি একেক দ্রষ্টার কাছে একেক রকম বিশ্ব দেখা দেবে?

এই সমস্যার এক চমৎকার সমাধান দিয়েছেন হিউ এভারেট। তিনি একটি বিশ্বজনীন তরঙ্গ–অপেক্ষকের অস্তিত্বের কথা বলেছেন যা বৃহদাকার দ্রষ্টা এবং ক্ষুদ্রাকার সিস্টেম উভয়কেই যুগপৎ ধারণ করতে সক্ষম। তরঙ্গ–অপেক্ষকটি এদের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করে না। তিনি মাপন ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে এটি আসলে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া নির্দেশ করে। তরঙ্গ–অপেক্ষকটিই বলে দেবে একটি অংশ কি 'দেখবে' যখন তা অন্য কোনো অংশকে পর্যবেক্ষণ করছে। কাজেই এখানে তরঙ্গ–

অপেক্ষকের কোনো কোলাপ্স বা লঘুকরণ ঘটে না ; বরঞ্চ এক ধরনের মসৃণ বিবর্তন (smooth evolution) ঘটে। এভাবে দেখা যায় যে মাপন ক্রিয়া বা মেজারমেন্টের ফলে বিশ্ব অনেকগুলো পৃথক অংশে ভাগ হয়ে যায়। এর কারণ পূর্বোল্লিখিত মাপন–ক্রিয়ার কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা। একই তরঙ্গ–অপেক্ষকের অনেকগুলো সম্ভাব্য মান থাকে। মারে গেল–মান এবং জিম হার্টল এই ধারণাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁদের তত্ত্বমতে বিশ্বের অনেকগুলো পৃথক ইতিহাস সম্ভব যাদের বলে বিসংসক্ত ইতিহাস (decoherent history)। এই ইতিহাসগুলো হলো বিশ্বের 'সম্ভাব্য ইতিহাস' যাদের উপর সম্ভাবনা আরোপ করা যায়। এভাবে দ্রষ্টার অনন্য ভূমিকাকে নাকচ করে দেওয়া যায়, ফলে তরঙ্গ অপেক্ষকের কোলাপ্স বা লঘুকরণের কোনো প্রয়োজন থাকে না। বিখ্যাত পদার্থবিদ জন হুইলার অবশ্য বহুবিশ্বের পক্ষপাতী। তাঁর মতে অসীম মাত্রাবিশিষ্ট পরমস্থানে (superspace) রয়েছে অসীম সংখ্যক বিশ্ব। এই পরমস্থানের প্রতিটি বিন্দুই একটি সমগ্র বিশ্ব ধারণ করতে সক্ষম। কোন মুহূর্তে বর্তমানের মধ্যে কোনটি দর্শকের সামনে উপস্থিত হবে তা নির্ভর করে দর্শক ও তার পারিপার্শ্বিকের বস্তুর সাথে মিথস্ক্রিয়ার উপর।[১৬] এটি আসলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের দর্শক সাপেক্ষতার নীতি (Principle of Observership)–এর একটি সম্প্রসারণ।

চিরায়ত স্থানকাল মসৃণ বা অবিচ্ছিন্ন (continuous) মনে হলেও আসলে কোয়ান্টাম স্তরে এর মসৃণতা থাকে না। সেখানে বিরাজ করে এক অব্যয় অনিশ্চয়তা। এই কোয়ান্টাম বিক্ষোভের (quantum fluctuation) ফলে স্থানকালের জন্য তৈরি হতে পারে একটি স্ফীত অংশ (buldge)। এ ধরনের কোয়ান্টাম স্ফীত অংশ থেকে জন্ম নিতে পারে একটি শিশুবিশ্ব (baby universe)। এ ঘটনা কাল্পনিক সময়ে ঘটছে বলে বাস্তবে তা কখনোই দেখা যাবে না। এই নতুন সৃষ্ট বুদবুদ বিশ্বের সাথে মূল বিশ্বের যোগাযোগ থাকে একটি নাড়ির (umbilical cord) দ্বারা যার ব্যাস প্রায় 10^{-35} মিটার। এই নাড়িকে বলা হয় কীটছিদ্র বা ক্ষুদ্রবিবর (wormhole)। এটি হঠাৎ অস্তিত্বশীল হয়ে আবার মুহূর্তেই অন্তর্হিত হয়ে যায় (চিত্র ৩.১৫)। ঐ ক্ষুদ্র বিবরের সাথে সংযুক্ত শিশুবিশ্ব ক্ষুদ্র জীবনকালের নাও হতে পারে এবং প্রসারিত হয়ে বর্তমান বিশ্বের মতো কোটি কোটি আলোকবর্ষের ব্যাসবিশিষ্ট হতে পারে। এখানে মহাকর্ষীয় শক্তি থেকে পদার্থ তৈরি সম্ভব (কারণ এরা যথাক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক)। আমাদের বিশ্ব হয়ত এ রকম আরো অসীম সংখ্যক বিশ্বের গোলকধাঁধার কোনো অংশ। এ ধরনের দুটি বিশ্ব পরস্পরের সাথে কীটছিদ্র দ্বারা যুক্ত হতে পারে। বলে রাখা ভাল, বহু-বিশ্বের ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনা–বিস্তারের (probability amplitude) কথা বলা হয়েছে তাদের মান এক বা শূন্যের কাছাকাছি। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে যেখানে আমাদের সম্ভাব্য ফলাফলের সম্ভাবনা (যা অবশ্যই ভগ্নাংশ বোঝায়) সম্পর্কে গণনা করতে হয় (অর্থাৎ সম্ভাবনার মান কখনই পূর্ণাঙ্গ এক বা শূন্য নয়) সেখানে কোয়ান্টাম কসমোলজিতে সম্ভাবনা বিস্তারের মান এক বা শূন্য হয়। এই সূত্রায়নের অর্থ এই যে, বিশ্ব যখন যথেষ্ট বড় তখন স্থান

---

১৬. হুইলারের তত্ত্বের উপর সহজ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Wheeler (1973)।

ও কালের কোনো বিন্দুতে বিশ্বের তরঙ্গ–অপেক্ষকটির আচরণ চিরায়ত সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ অর্থাৎ চিরায়ত স্থানকাল তরঙ্গ–অপেক্ষকের একটি অন্যতম সম্ভাব্য ফলশ্রুতি। একইভাবে কিছু কিছু অঞ্চলে, যেমন কোনো কৃষ্ণবিবরের কেন্দ্রস্থিত চিরায়ত বা ক্লাসিকাল সিংগুলারিটিতে সম্ভাবনার এ রকম কোনো নির্দিষ্ট মান দেওয়া সম্ভব নয়। এখানেই আসে বিশ্বমঞ্চের মহান কুশীলব সুপরিচিত কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা (quantum fuzz)। এভাবে দেখা যায় কোয়ান্টাম কসমোলজির ক্ষেত্রে, যেখানে চিরায়ত আইনসমূহ ঠিক কার্যকর নয় সেখানে, চিরায়ত প্রারম্ভিক শর্তাবলির (initial conditions) তেমন প্রাসঙ্গিকতা নেই।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে বিশ্বের প্রারম্ভিক শর্তাবলির একেবারেই কোনো তাৎপর্য নেই। অনেকগুলো সম্ভাব্য তরঙ্গ–অপেক্ষকের মধ্য থেকে কিভাবে আমাদের এই বর্তমান রূপ–রস–বর্ণ গন্ধে ভরপুর বিশ্বটি মূর্তমান হলো তা ব্যাখ্যা করতে হলে বিশেষ কিছু প্রারম্ভিক শর্তাবলির প্রয়োজন আছে বৈকি। বিশ্বের ক্ষেত্রে উইলার–ডিউইট সমীকরণ সমাধান করার জন্য কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর নাম পথ সমাকল বা পাথ ইন্টিগ্রাল বা ইতিহাসসমূহের সংযোজন (path integral or sum over histories)—এই পদ্ধতিটির প্রবর্তন করেছেন বিখ্যাত মার্কিন পদার্থবিদ রিচার্ড পি. ফাইনম্যান (R.P. Feynman)। সাধারণত কোনো তরঙ্গ–অপেক্ষকের গণনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সিস্টেমের কয়েকটি ইতিহাসের উপর যোগ করা হয়। স্থান ও কালের যে বিন্দুতে তরঙ্গ–অপেক্ষকটির মান নির্ণয় করতে হবে সে বিন্দুতে ইতিহাসগুলোর সমাপ্তি ঘটে। তরঙ্গ–অপেক্ষককে অনন্য (unique) হতে হলে বিশেষ কিছু ইতিহাসের উপর যোগ করতে হবে এবং এই বিশেষ ইতিহাস শুধু চিরায়ত ইতিহাস নয় বরঞ্চ সিস্টেমের সকল সম্ভাব্য ইতিহাস। এই ইতিহাসসমূহের সংযোজন পদ্ধতিটি আসলে শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ সমাধানেরই নামান্তর। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের এই সুন্দর পদ্ধতিটিকে সহজেই কোয়ান্টাম সৃষ্টিতত্ত্বে প্রয়োগ করা যায়। সেখানে এর প্রয়োগের অর্থ হলো উইলার ডিউইট সমীকরণের সমাধান। এর একটি সাধারণ প্রমাণ দেখিয়েছেন স্টিফেন হকিং ও জিম হার্টল। ওঁরা দেখিয়েছেন যে a স্কেল উৎপাদক বিশিষ্ট এবং স্কেলার ক্ষেত্র φ সমৃদ্ধ বিশ্বের নিম্নতম দশা বা গ্রাউন্ড স্টেটের জন্য একটি আধা-চিরায়ত আসন্ন তরঙ্গ–অপেক্ষক হলো :

$$\Psi_0(a, \varphi) \sim \exp(-S_E(a, \varphi)) \qquad (৩.১২.২)$$

এখানে $S_E(a,\varphi)$ হলো $a(\tau)$ ও $\varphi(\tau)$ এর জন্য প্রযোজ্য লাগ্রাঞ্জ সমীকরণের ইউক্লিডীয় সমাধান থেকে প্রাপ্ত ইউক্লিডীয় ক্রিয়া (Euclidean action)। এখানে সীমান্ত শর্ত হলো : $a(0) = a$, $\varphi(0) = \varphi$। দেখানো যায় যে, (কোনো ডি সিটার স্থান ds_4 এর ইউক্লিডীয় ছেদ (section) S_4 এর জন্য) মহাকর্ষীয় ক্রিয়া (যেখানে $a(\tau) = H^{-1}(\varphi)\cos H\tau$) ঋণাত্মক :

$$S_E(a,\varphi) = \frac{1}{2}\int d\eta\left[\left(\frac{da}{d\eta}\right)^2 - a^2 + \frac{A}{3}a^4\right] = \frac{3\pi M_p^2}{2} = \frac{3M_p^2}{16V(\varphi)} \qquad (৩.১২.৩)$$

[এখানে $A = 8\pi V/M_p^2$, কনফর্মাল সময় $\eta = \int \frac{dt}{da(0)}$]

কাজেই : $\Psi_0(a, \varphi) \sim \exp(-S_E(a,\varphi)) \sim \exp\left(\frac{3M_P^4}{16V(\varphi)}\right)$ (৬.১২.৪)

এখন আমাকে বলা যায় যে φ = ধ্রুবক এবং $a = H^{-1}(\varphi) = \left(\frac{3M_P^2}{8\pi V(\varphi)}\right)^{1/2}$ দশায় বিশ্বকে পাবার সম্ভাবনা :

$$\Pr(\varphi) \sim |\Psi_0|^2 \sim \exp\left(\frac{3M_P^4}{8\pi V(\varphi)}\right) \qquad (৬.১২.৫)$$

কাজে রাখা ভাল, (৬.১২.৪) এর কোনো সুনির্দিষ্ট গাণিতিক নির্ধারণ নেই।[১৭] তারা দেখিয়েছেন যখন এই ইতিহাসসমূহের সংযোজন করা হয় তখন সিস্টেমের অধিকাংশ ইতিহাসই পরস্পরের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে পরস্পরকে নাকচ করে দেয় এবং কেবল কয়েকটি ইতিহাসের থাকে অধিক সম্ভাবনা। এ কাজে তারা ব্যবহার করেছেন উচ্চতর টপোলজির ধারণা যার সাধারণ নাম 'Global Method'।

আমরা জানি, বিশ্ব চতুর্মাত্রিক। ত্রিমাত্রিক স্থান আমরা সহজেই দেখতে পাই। কিন্তু সময়ের মাত্রাটি অবাস্তব বা কাল্পনিক। আপেক্ষিকতাতে লেখা হয় : $x_4 = ict$। মিনকভস্কির পথ সমাকল পদ্ধতি ব্যবহার করতে হলে গাণিতিক সুবিধার জন্য এই কাল্পনিক সময়ের প্রয়োজন আছে। অবাস্তব বা কাল্পনিক কাল আসলে একটি নামমাত্র। গণিতে ছাড়া এর আর কোনো তাৎপর্য নেই। কাল্পনিক কাল ব্যবহারের ফলে স্থান ও সময়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। যে স্থানকালে সময় স্থানাংকের মান অবাস্তব তাকে ইউক্লিডীয় স্থান বলে। ইউক্লিডীয় স্থানকালে স্থান এবং কালের দিক অভিন্ন ; কিন্তু বাস্তব স্থানকালের (যেখানে সময় স্থানাংকের মান বাস্তব) তা অভিন্ন নয়—এ ক্ষেত্রে সময়ের দিক অবশ্যই আলোক-শঙ্কু[১৮] (light cone) ভেতরে থাকে। সহজ ভাষায় বলা যায় যে এই অবাস্তব কাল এবং ইউক্লিডীয় স্থানকাল কেবল গাণিতিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় যাতে করে বাস্তব সময়ে বিশ্বের আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। এখন মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্বানুযায়ী বিশ্বের জন্য অনেকগুলো পৃথক সম্ভাব্য কোয়ান্টাম দশা থাকে। বিশ্বের আদিম মুহূর্তে ইউক্লিডীয় বক্র স্থানকালের প্রকৃতি কিরূপ ছিল তা জানা থাকলে নীতিগতভাবে বিশ্বের কোয়ান্টাম দশাটি জানা সম্ভব। মহাকর্ষের চিরায়ত তত্ত্ব (সাধারণ আপেক্ষিকতাত্ত্ব) অনুযায়ী (বাস্তব স্থানকালে) বিশ্বের দুটি মাত্র সম্ভাব্য দশা আছে ; ১. বিশ্ব অসীম কাল থেকে রয়েছে ; ২. নির্দিষ্ট সময় পূর্বে কোনো বীজক্রমী বিন্দু থেকে এর সৃষ্টি হয়েছে। তবে মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্বানুযায়ী

---

১৭. দেখ, Linde (1990)।

১৮. কখনো আপেক্ষিকতাত্ত্বে আলোক-শঙ্কুর কল্পনা করা হয় এজন্য যে এই শঙ্কুর ভেতরে যদি জগৎ রেখা (world line) থাকে তাহলে দুটি ঘটনার মাঝের বিভেদ বা সেপারেশন ধনাত্মক বা বাস্তব হবে। দেখ, অনুচ্ছেদ ১.৫।

ও ভীষণ সম্ভাবনার কথা বলে যায়; যে ইউক্লিডীয় স্থানকাল বরাবর ও তাতে যেখানে সময় ও স্থানের অভিমুখ একই, সেখানে স্থানকালের বিস্তার সীমিত (finite) হলেও বিশ্বের আদিতে কোনো বর্তিতরেখী বিন্দু অস্তিত্ব নেই। এটা অনেকটা ভূপৃষ্ঠের মতো, স্থান সীমিত হলেও এর কোনো সীমা নেই। ভূপৃষ্ঠের উত্তর মেরু থেকে যতই দক্ষিণ বরাবর দিকে যাওয়া যায় স্থান দূরত্ব অক্ষাংশ বৃদ্ধিতে বাড়তে থাকে; কোনো বস্তু কোনোদিকে সমতলে প্রসারমান। বস্তুটি অঞ্চলে এ রকমের বিন্দু সবচেয়ে আয়তনে ছোট। এটা কোনোদিকে সময় বর্ধিত সাথে সাথে সংকুচিত হয়ে একটি বিন্দুতে পৌঁছে যেতে পারে। যাদের গ্রহ দুটি মেরুতে বিশ্বের আয়তন শূন্য। তখনো এরা কোনো বর্তিতরেখী বিন্দু নয়। যেমন পৃথিবীর দুই মেরু কোনো বর্তিতরেখী বিন্দু নয়। এটাই হকিং এর বিখ্যাত সীমানাহীনতার নীতি (no boundary principle)। এছাড়া দেখা যায় হকিং এর সীমানাহীনতার শর্ত মেনে নিলে বিশ্বের শুরু সময়ে বিশ্ব প্রসারমান হয়, কিন্তু এর আদিতে কোনো অপবিত্তের বর্তিতরেখী বিন্দুর অস্তিত্ব থাকে না। বর্তিতরেখী বিন্দুর অস্তিত্ব থাকার অর্থই হলো যে কোনো চিরন্তন ভৌত বিধি ঐ অঞ্চলে ভেঙে পড়ে। আর কাল্পনিক সময়ের কথা বিবেচনা করলে বিশ্বের আদিতে অবশ্যম্ভাবী বর্তিতরেখী বিন্দুর অস্তিত্ব সবকিছুকে এড়িয়ে যায়। সীমানাহীন তার শর্তের সাথে ঐতিহাসিকসমূহের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, বিশ্বের প্রসারণ সুষম ও দিকনিরপেক্ষ হবে। এর সাথে পরিমিত বিকিরণের পর্যবেক্ষিত সুষম তত্ত্ব যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। সীমানাহীন তার শর্ত বিবেচনা করে দেখানো যায় যে অনিশ্চয়তা নীতি কতক অনুমোদিত পরিমাণে সম্ভাব্য বিষমতা নিয়েই বিশ্বের শুরু হয়েছে। স্ফীতির (inflation) সময়ে এসব বিষমতা বিবর্ধিত হয়ে গ্যালাক্সি নীহারিকাগুলোর সৃষ্টি করেছে।

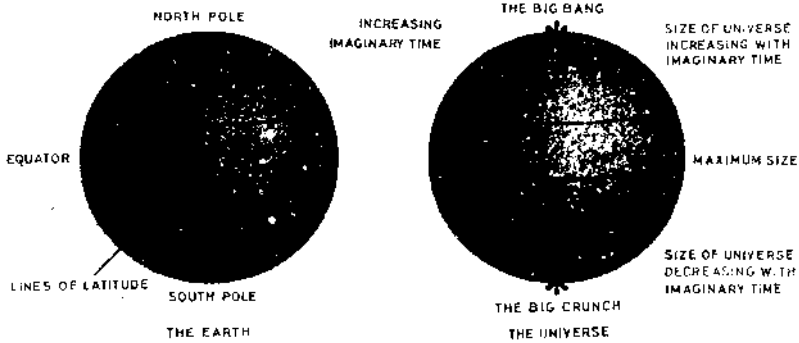

চিত্র ৩.১৪ : [illegible]

এবার আসা হকিং এর বিখ্যাত সীমানাহীনতার শর্ত নিয়ে কিছুক্ষণ বক্তব্য রাখলে তা করবে। যদি ভৌত আইনসমূহকে বিশ্বের সবত্র প্রযোজ্য না হতে হয় তবে সবকিছু ক্ষেত্রে পথ সমাকল বা পথ ইন্টিগ্রাল নিতে হবে অর্থাৎ অনুরূপী (nonsingular metric) মেট্রিকের উপর। একইভাবে কোয়ান্টাম মহাকর্ষের পথ সমাকল বা পথ ইন্টিগ্রালও নিতে হবে

ইউক্লিডীয়, মসৃণ মেট্রিকের উপর। ব্যতিক্রমী বিন্দুসমৃদ্ধ ক্ষেত্রে পাথ ইন্টিগ্রাল গ্রাহ্য করা হয় না। এজন্যের সমাধানে দুটি স্বাভাবিক উপায় থাকে : ১. অসীমতটীয়ভাবে ইউক্লিডীয় মেট্রিক (asymptotically Euclidean metric) ; ২. সীমানাহীন আবদ্ধ মেট্রিক (compact metrics without boundary)। প্রথম মেট্রিকের ক্ষেত্রে মাপন-ক্রিয়া করতে হয় অসীমে

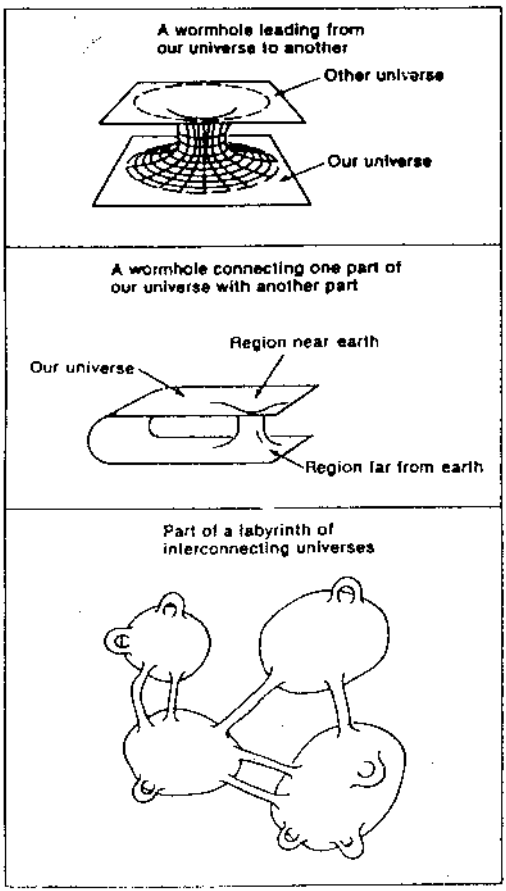

চিত্র ৩.১৫ : ওয়ার্মহোল ও বহির্বিশ্বের কল্পকথা।

এবং এক্ষেত্রে পাথ ইন্টিগ্রাল নিতে হবে অসীমতটীয়ভাবে ইউক্লিডীয় সকল মেট্রিকের উপর। বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের ক্ষেত্রে মাপন-ক্রিয়া চালাতে হয় সীমিত অঞ্চলে ; তাই দেখানো যায় কোয়ান্টাম মহাকর্ষের ক্ষেত্রে সকল অবদ্ধ কিন্তু সীমানাহীন ইউক্লিডীয় মেট্রিকের উপর পাথ

ইন্টিগ্রাল নেয়াই যুক্তিযুক্ত। এটাই হকিং ও হার্টলের (১৯৮৩) বিখ্যাত সীমানাহীনতার শর্ত। অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্বের সীমান্ত শর্তই হচ্ছে যে এর কোনো সীমানা নেই (The Boundary Condition of the Universe is That it Has no Boundary)। সমগ্রবিশ্ব পূর্ণভাবে স্ব-বর্তী (self-contained) এবং বহিঃস্থ কিছু দ্বারা প্রভাবিত নয়। এটি সৃষ্টও নয়, এর ধ্বংসও হবে না; হকিং এর ভাষায় : "It would just BE"।

আমরা আবার ডুইলার-ডিউইট সমীকরণে ফিরে যাই। সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বে আইনস্টাইনের (Λ-পদ যুক্ত) ক্ষেত্র-সমীকরণের বস্তুর সময়ে সর্বোচ্চ প্রতিসাম্যের সমাধান হলো ডি সিটার স্থান—যাকে একটি হাইপারবোলয়েড হিসেবে পাঁচ-মাত্রার মিনকোস্কি স্থানে দেখানো যায়। একে একটি আবদ্ধ বিশ্বের চিত্র হিসেবে মনে করা যেতে পারে যা একটি সর্বোচ্চ ব্যাসার্ধের প্রসারিত অবস্থা থেকে সংকুচিত হয়ে সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধে পৌঁছে এবং পুনরায় সূচকীয় হারে প্রসারিত হয়। ফ্রিডমান বিশ্বের অনুরূপে এই মেট্রিকটিকে লেখা যায় যার মাপ-উৎপাদক (scale factor) হলো $\cosh Ht$। এখানে $t = it$ বসালে cosh পরিবর্তিত হয়ে cos এ পরিণত হয়—যা $\frac{1}{H}$ ব্যাসার্ধের একটি গোলকের (four-sphere) ইউক্লিডীয় মেট্রিক নির্দেশ করে। কাজেই যে তরঙ্গ-অপেক্ষক তিন-মেট্রিক h_{ij} এর সাপেক্ষে সূচকীয় হারে পরিবর্তিত হয় তা কাল্পনিক সময়ে ইউক্লিডীয় মেট্রিক নির্দেশ করে। অন্যভাবে যে তরঙ্গ অপেক্ষকের মান দ্রুত পরিবর্তিত হয় (oscillate) তা বাস্তব সময়ে লোরেন্সীয় মেট্রিক (Lorentzian metric) নির্দেশ করে। এই দুটি মেট্রিকের গাণিতিক রূপ নিচে লেখা হলো :

$$\left.\begin{aligned} ds^2 &= -dt^2 + \frac{1}{H^2}\cosh Ht(dr^2 + \sin^2 r(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2)) \\ &\qquad\qquad\qquad\qquad \text{লোরেন্সিয়ান ডিস্টিংক্ট মেট্রিক} \\ ds^2 &= dt^2 + \frac{1}{H^2}\cosh Ht(dr^2 + \sin^2 r(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2)) \\ &\qquad\qquad\qquad\qquad \text{— ইউক্লিডীয় মেট্রিক} \end{aligned}\right| \quad (৩.১২.৬)$$

হকিং-এর এই সূত্রায়নে একটি ইউক্লিডীয় গোলকের (four-sphere) নিম্নের অর্ধাংশ আরেকটি লোরেন্সিয়ান হাইপারবোলয়েডের উপরের অর্ধাংশের সাথে যোগ করে দেওয়া হয় (চিত্র ৩.১৭)। এই টপোলজির বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এখানে বিশ্বের সৃষ্টি হয় কার্যত একেবারে নাস্তি থেকে এবং এখানে কোনো বিপদজনক ব্যতিক্রমী বিন্দুও নেই। এভাবে দেখানো যায় বাস্তব সময়ে বিশ্ব প্রসারমান এবং আদিতে এর একটি ব্যতিক্রমী বিন্দু আছে; কিন্তু যখন বিশ্বের আকৃতি খুব ছোট তখন কোয়ান্টাম সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী (অর্থাৎ সীমানাহীনতার নীতি অনুযায়ী) কাল্পনিক সময়ে কোনো ব্যতিক্রমী বিন্দুর অস্তিত্ব বেশ চমৎকারভাবে নাকচ করে দেওয়া যায়।

কোয়ান্টাম সৃষ্টিতত্ত্বে সীমানাহীনতার নীতি ছাড়াও আরো একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবনা আছে—সেটি হলো রুশ পদার্থবিদ আন্দ্রেই লিন্ডে এবং ভিলেনকিনের প্রস্তাবিত সুড়ঙ্গকরণ

এ সমীকরণে $p = -p$ বসালে পীড়ন–শক্তি টেন্সর মহাজাগতিক ধ্রুবকের মতো আচরণ করে। কাজেই মহাজাগতিক ধ্রুবকের ক্ষেত্রে সক্রিয় মহাকর্ষীয় ভর হলো (অনু. ৩.২ দ্রষ্টব্য) -2ρ। দেখা যাচ্ছে, মহাজাগতিক ধ্রুবক বিশ্বের প্রাথমিক মুহূর্তগুলোতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাই এর অশূন্য মানের প্রতিই আজকাল অধিকাংশ বিজ্ঞানীর পক্ষপাত। আইনস্টাইন একে তাঁর জীবনের 'সবচেয়ে বড় ভুল' বলে অভিহিত করেছিলেন; কিন্তু আজকাল মনে হচ্ছে এটি তাঁর জীবনের 'সবচেয়ে রহস্যময় সংযোজন'। অতিসম্প্রতি[২২] পর্যবেক্ষণ থেকে এমন সব সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে যাতে মনে হচ্ছে বিশ্ব আদৌ সমতল বা flat নয়, বরঞ্চ open বা উন্মুক্ত এবং এর প্রসারণ বেগও মন্দীভূত হবার চেয়ে বরং ত্বরিত হবার পক্ষে। সেক্ষেত্রে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে মহাজাগতিক ধ্রুবকের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্ব পাবে এবং যদি বিশ্বকে সমতল হতে হয় তবে বাড়তি শক্তির সরবরাহ মহাজাগতিক ধ্রুবককেই করতে হবে। আমরা জানি, সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বে মহাকর্ষীয় আকর্ষণের উৎস হলো শক্তি। ভর আসলে শক্তিরই রূপভেদমাত্র। কিন্তু মহাজাগতিক ধ্রুবকের প্রকৃতি অন্যরকম। এর সাথে সংশ্লিষ্ট শক্তি সময় বা স্থানের উপরে নির্ভর করে না—তাই এটি 'ধ্রুবক'। পদার্থ বা বিকিরণের অনুপস্থিতিতেও এটি ক্রিয়াশীল থাকে; কাজেই এর উৎস অবশ্যই শূন্যস্থানে (empty space) নিহিত, যেমন আমরা একটু আগেই ব্যক্ত করেছি। তাই সাম্প্রতিককালে বিশ্বের নিয়তি নির্ধারণে মহাজাগতিক ধ্রুবকের ভূমিকা জোর আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৭.৫ এ পুনরায় এ প্রতিভাস নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বইপত্র

বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব বা কসমোলজি বিষয়ে প্রচুর পাঠযোগ্য বই রয়েছে। তবে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে Weinberg (1972) এবং Peebles (1993) আবশ্যিক পাঠ্য বই। অধিকতর সাম্প্রতিক বিধায় Peebles (1993) অপরিহার্যও বটে। বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ আকরগ্রন্থ হিসেবে এটি নিঃসন্দেহে সংগ্রহে রাখার মতো একটি বই। এছাড়া Cole (1995), Berry (1989), Einstein (1956), Freedman (1998), Gribbin (1986), Hawking (1988), Islam (1992), Narlikar (1993a), Novikov (1979 & 1990), Sciama (1973), Tolman (1934), Wagonar (1982) প্রভৃতি বই এবং আলোচনাসমূহ বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্নমাত্রার পাঠকের জন্য লেখা হয়েছে। তবে Gribbin (1986), Hawking (1988) ও Weinberg (1976) সাধারণ পাঠকের জন্য অপরিহার্য কয়েকটি বই। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কসমোলজি বিষয়ে একটি অসাধারণ ওয়েবসাইট খুলেছে যার ঠিকানা হলো : http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/bb_cosmo.html। এখানে হকিং-এর বক্তৃতাগুলোও পাওয়া যায় : http://www.damtp.cam.ac.uk./user/hawking/ হকিং-এর নিজস্ব হোমপেজ হলো : http://www.pbs.org/wnet/hawking/mysteries/html/gleiser-1.html।

২২. দেখুন Kraus (1999)।

চতুর্থ অধ্যায়

অনন্ত ছায়াপথরাজি

শীতের কুয়াশার সে কোন অন্তিম পোচড়ের ফাঁকে–ফাঁকে বৃহস্পতি কালপুরুষ অভিজিৎ সিরিয়াস যেন লণ্ঠন হাতে করে এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে কোন সুদূরযানের পথে চলেছে, কেমন একটা আশ্চর্য দূর পরলোকের নিক্কণ শোনা যায় যেন।

—জীবনানন্দ দাশ, *মাল্যবান*।

৪.১ প্রারম্ভিক

অন্ধকার (চাঁদহীন) রাতে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে অসংখ্য তারার এক মনোমুগ্ধকর সমাহার লক্ষ্য করা যায় এবং এটি আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। একে আমরা **ছায়াপথ** বলে থাকি। ইংরেজিতে একে Milky Way বা The Galaxy বলা হয়। বাংলায় এর বেশ কয়েকটি সুন্দর প্রতিশব্দ আছে—'আকাশগঙ্গা', 'সুরগঙ্গা' বা 'স্বর্গগঙ্গা'। টেলিস্কোপে একে অসংখ্য তারায় বিশ্লিষ্ট দেখা যায়। বিশ শতকের পর থেকে দেখা গেছে যে আমাদের ছায়াপথ ছাড়াও মহাবিশ্বে আরো অনেক ছায়াপথ আছে যেগুলো আমাদের থেকে বহুদূরে অবস্থিত। আজ আমরা জানি, মহাবিশ্বে ছায়াপথের সংখ্যা অসংখ্য এবং এদের মাঝে আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ কোনো কেন্দ্রীয় অবস্থানে নেই।

ছায়াপথ হচ্ছে অসংখ্য নক্ষত্র এবং নীহারিকার এক সুবিপুল সমাহার। বিশ্বে ছায়াপথের আনুমানিক সংখ্যা $১০^{১১}$। ছায়াপথদের রয়েছে বিভিন্ন রকম আকৃতি (অর্থাৎ ঠিক যে আকৃতিটি আলোকচিত্রে এবং টেলিস্কোপে দেখা যায় তথা দ্বিমাত্রিক প্রতিকৃতি)। যেমন কোনোটি উপবৃত্তাকার, কোনোটি কুণ্ডলিত (spiral), কোনোটি বা অনিয়মিত। ছায়াপথের আকারও বিভিন্ন হয়; ক্ষুদ্র বামনাকৃতির তারাসমষ্টি থেকে শুরু করে দানবাকৃতির বিশাল ছায়াপথও রয়েছে। এ সমস্ত ছায়াপথের জন্ম খুব সম্ভবত ১×১০^{১০} বছর পূর্বে। এদের উদ্ভবের জন্য আদি বিশ্বে পদার্থের সুষম ঘনত্বের এক বিশেষ ধরনের বিচলনকে (perturbation) দায়ী করা হয়। আকাশে ছায়াপথসমূহ মোটেই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে নেই, বরঞ্চ এরা বিভিন্ন স্তবকের অন্তর্ভুক্ত থাকে। এসব স্তবকের আকার কয়েকশত মিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃত হতে পারে। এসব স্তবকে কয়েকশ' থেকে কয়েক হাজার ছায়াপথ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এছাড়া ৫/৬টি ছায়াপথস্তবকের সমন্বয়ে গঠিত হয় একেকটি মহাস্তবক (supercluster)।

এছাড়াও অনেকে দাবি করেছেন যে স্তবকদেরও স্তবক আছে। এভাবে ছায়াপথসমূহের এক পরম্পরা রচিত হয়েছে।

ইংরেজি শব্দ 'galaxy' এর সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ সম্পর্কে এখনো মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেউ একে গালাক্সি, কেউ ছায়াপথ, কেউ আকাশগঙ্গা ইত্যাদি লিখে থাকেন। কিন্তু 'গালাক্সি' শব্দটি বাংলায় লেখা বেশ অসুবিধাজনক, তাছাড়া galactic cluster, spiral galaxy ইত্যাদি শব্দগুলোর সুন্দর কোনো প্রতিশব্দ সম্ভব হয় না যদি 'গালাক্সি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে আমরা যদি 'ছায়াপথ' শব্দটি ব্যবহার করি (যেমন ছায়াপথ স্তবক, কুণ্ডলিত বা সর্পিল ছায়াপথ ইত্যাদি) তাহলে সুন্দর সমাধান পাওয়া যায়। 'গালাক্সি' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'ছায়াপথ' শব্দের ব্যবহার এর আগে দৃষ্টিগোচর হয়েছে একুশে জ্যোতির্বিদ্যা, শব্দবিদ্যা, জ্যোতিঃশাস্ত্র ও শ্রীগোলিক পরিভাষাকোষ, দক্ষকোষ; সরদার ফজলুল করিম ইত্যাদি। বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার অগ্রদূত প্রফেসর মোঃ আব্দুল জব্বার 'galaxy' শব্দের প্রতিশব্দ 'ছায়াপথ' ব্যবহার করেছেন তাঁর বইগুলোতে। কিন্তু 'ছায়াপথ' শব্দটির মূল সাড়া হলো অন্ধকার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে উত্তর থেকে দক্ষিণে অসংখ্য তারার যে মৃদু আলোকীয় পথ দেখা যায় সেটা। ইংরেজীতে এটাই Milky Way. বাংলায় বলা হয় 'ছায়াপথ' বা 'আকাশগঙ্গা' বা 'সুরগঙ্গা' বা 'স্বর্গগঙ্গা'। তাই আমাদের গালাক্সি বলতেরকে আমাদের ছায়াপথ বলা আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। অবশ্য অন্য কোনো গালাক্সির নক্ষত্রের কোনো গ্রহ থেকে সেই গালাক্সিকেও ছায়াপথের মতোই দেখাবে। কিন্তু সাড়া পরিবর্তনের উদাহরণ নতুন নয়। যেমন নক্ষত্র বলতে আমরা এখন star বুঝি, কিন্তু আসলে নক্ষত্র বলতে পূর্বে চন্দ্রদিবস বুঝানো হতো। চন্দ্রের ছিল ২৭টি নক্ষত্র। ইংরেজিতে মিল্কিওয়ে ছায়াপথকে The Galaxy লেখা হয় আর বহিস্থ গালাক্সিদের external galaxies বা শুধু galaxies লেখা হয়। বাংলায় আমাদের বেড় অক্ষর ব্যবহার করার এ সুবিধাটি নেই। অবশ্য 'galaxy' শব্দের প্রতিশব্দ 'ছায়াপথ' রাখলে মিল্কিওয়েকে তখন আমরা 'আমাদের ছায়াপথ' বা 'আকাশগঙ্গা ছায়াপথ' বলতে পারি। External galaxy বুঝাতে শুধু 'ছায়াপথ' লেখা যেতে পারে। আমরা এ গ্রন্থে এই রীতিই অনুসরণ করব।

এ অধ্যায় মূলত আমাদের ছায়াপথ বহির্ভূত অন্যান্য ছায়াপথের (external galaxies) প্রসঙ্গে রচিত। দূরান্তের ছায়াপথ নিয়ে গবেষণা, বিশেষত মহাস্তবকদের প্রকৃতি নির্ণয়, তাদের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা ইত্যাদি আধুনিক জ্যোতির্ঃপদার্থবিজ্ঞানে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এ অধ্যায়ে রেডিও ছায়াপথ, তাদের ধর্মাবলি ও ভৌত প্রকৃতি, সক্রিয় ছায়াপথ কেন্দ্রীন, মহাকাশের বিস্ময়কর বস্তু কোয়েসার ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

৪.২ ছায়াপথ বনাম নীহারিকা

এ বিতর্কটি বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে নয়। এটি মূলত ধারণাগত (conceptual) বিতর্ক। ১৯১০ সালের দশকের দিকে আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের বাইরে অবস্থিত বহিস্থ ছায়াপথদের

(external galaxies) অস্তিত্ব জোরালো হতে থাকে। আসলে ১৯২৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত কুণ্ডলিত নীহারিকাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তখন পর্যন্ত জানা ছিল যে এরা দূরবর্তী নীহারিকা মাত্র। এরা যে আমাদের ছায়াপথের মতোই একেকটি বিশাল তারার সংগ্রহ তা ভাবাই যেতো না। এজন্য এদের spiral nebulae বা কুণ্ডলিত নীহারিকা বলা হতো। কিন্তু এ সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত যে এরা আসলে ছায়াপথ বা galaxy। ছায়াপথ হলো এমন বস্তু যাকে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে নক্ষত্রে বিশ্লেষণ (resolved into stars) সম্ভব। কিন্তু নীহারিকা বা nebula হলো গ্যাসীয় মেঘ যাদের নক্ষত্রে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এটাই এখন প্রমিত সংজ্ঞা।

ইমানুয়েল কাণ্ট প্রথম ধারণা করেন যে দূরে আমাদের ছায়াপথের মতোই তারক-সংগ্রহ আছে। অবশ্য তখন ছায়াপথ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। মার্কিন বিজ্ঞানী হেবার কার্টিসও এদেরকে বহিঃস্থ তারা-সংগ্রহ বলে মনে করতেন। এদিকে দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশ থেকে দেখা দুটো মেঘখণ্ড (ম্যাজেলানীয় মেঘপুঞ্জ) নিয়ে যথেষ্ট সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বহু বছর ধরে বিশেষজ্ঞরা এ দুটোকে আমাদের ছায়াপথের অংশবিশেষ বলে মনে করতেন। বিখ্যাত মার্কিন জ্যোতির্বিদ হালো শেপলী ছোট ম্যাজেলানীয় মেঘে উপস্থিত শেফালী বিষমতারাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পর্যায়-প্রভা সম্পর্ক থেকে এদের দূরত্ব প্রায় ৭৫০০০ আলোকবর্ষ স্থির করেন। কাজেই সমস্যা আরো ঘনীভূত হয়; কারণ ছায়াপথের অংশবিশেষের দূরত্ব এতো বেশি হবার কথা নয়। এদিকে আকাশগঙ্গা ছায়াপথ নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক শুরু হয়। একে একটি চাকতি আকৃতির তারাসংগ্রহ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এর কেন্দ্রে সূর্য অবস্থিত এবং একে চওড়ায় ১৫০০০ আলোকবর্ষ মনে করা হতো। ১৯১৭ সালে শেপলী এই চিত্রকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করলেন। তিনি দেখালেন যে, তারার মুক্তস্তবক যেখানে ছায়াপথের উজ্জ্বল বেল্ট বরাবর বিস্তৃত সেখানে এবং গুচ্ছস্তবকগুলো ধনুরাশির দিকে অধিক পরিমাণে ঘনীভূত। তাই শেপলী এক যুগান্তকারী ধারণা দিলেন। তিনি বললেন যে আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্র সূর্য থেকে ৩০০০০ আ. বর্ষ দূরে বিশাল বর্তুলীয় তারাস্তবকের সংগ্রহে (spherical cloud of clusters) অবস্থিত। এবং ছায়াপথটিকে আগে যেমন ভাবা হয়েছিল তার তুলনায় অনেক বেশি বড়ো— প্রায় ১ লক্ষ আলোকবর্ষ চওড়া। কিন্তু ছায়াপথের কেন্দ্রে অর্থাৎ ধনুরাশির দিকে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কিছু দেখাই যায় না। এর কারণ এই যে, এই দিক বরাবর খুব ঘন ধূলির স্তর রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টিপথে বাধার সৃষ্টি করে। এদিকে আমাদের ছায়াপথের বিশাল আকৃতি দেখে শেপলীর দৃঢ় ধারণা জন্মালো যে দূরবর্তী কুণ্ডলিত নীহারিকাগুলো আসলে এই ছায়াপথেরই অংশ। শেপলীর এই ভুল ধারণার আরো দুটি কারণ হলো কুণ্ডলিত নীহারিকার তথাকথিত ভ্যান মানেন ঘূর্ণন (Van Maanen rotation) এবং অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকার কাছে বিস্ফোরিত একটি নবতারার (nova) ভুল ব্যাখ্যা।

এ সম্পর্কে শেপলী এবং হেবার কার্টিসের বিতর্ক সুবিখ্যাত। এটি শেপলী-কার্টিস বিতর্ক নামে পরিচিত। ১৯২০ সালে ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটে ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সেজ কর্তৃক আয়োজিত একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞানমূলক অনুষ্ঠানে এই

বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই বিতর্কের নথিপত্র থেকে বুঝা যায় যে দু'জনেই ভুল অনুমানের উপর ভিত্তি করে তর্ক করেছিলেন এবং কেউই মহাবিশ্বের বিশালত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। শেপলীর বক্তব্য ছিল আকাশগঙ্গা ছায়াপথ তখনকার ধারণার চেয়ে অনেক বড় (শেপলীর বিতর্কের এ অংশটি ঠিক ছিল)। কিন্তু কার্টিস অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছায়াপথের মতের সমর্থক ছিলেন। এবং এভাবে কার্টিস বলেন যে দূরবর্তী কুণ্ডলিত নীহারিকাগুলো আসলে একেকটি দ্বীপ-বিশ্ব (Island Universe)। অন্যদিকে শেপলী দূরে অবস্থিত পৃথক পৃথক ছায়াপথের তীব্র বিরোধিতা করেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন আকাশগঙ্গা ছায়াপথ যথেষ্ট বড় এবং কুণ্ডলিত নীহারিকাগুলো আসলে ছায়াপথেরই অংশ। এদিকে ১৯২০ সালের দিকে ই.পি.হাবল বেশ কিছু দূরত্বের বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করলেন। একাজে তিনি সেফালী বিষমতারাদের জন্য প্রযোজ্য পর্যায়-প্রভা সম্পর্ক ব্যবহার করেছিলেন। যদিও তিনি যে সব দূরত্ব নির্ণয় করেছিলেন তা প্রকৃত দূরত্ব থেকে অনেক কম (যেমন তিনি NGC6822 এর দূরত্ব বের করেছিলেন ৭ লক্ষ আ.বর্ষ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহলো ২০ লক্ষ আ.বর্ষ)। তথাপি এই বিপুল দূরত্ব এবং কিছু আনুষঙ্গিক তথ্য প্রমাণ করে যে এগুলো আসলে দূরবর্তী ছায়াপথ। ১৯২৯ সালে হাবল অ্যান্ড্রোমিডার দূরত্ব স্থূলভাবে নির্ণয় করেন। তিনি এখানে ৫০টির মতো সেফলী বিষমতারা খুঁজে পান এবং হিসাব করে দেখান যে অ্যান্ড্রোমিডার দূরত্ব ছোট ম্যাজেলানীয় মেঘের দূরত্বের ৮.৫ গুণ (সঠিক দূরত্ব ২ মিলিয়ন আ.বর্ষ)। অবশ্য হাবল কর্তৃক নির্ণীত দূরত্ব এর কম ছিল। অ্যান্ড্রোমিডায় তিনি প্রায় ১৫০টি গুচ্ছস্তবক, এইচ-টু (HII) অঞ্চল ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে এর ভর ৩.৫ বিলিয়ন সূর্যভরের সমান। এই প্রথম প্রমাণিত হলো যে আমাদের ছায়াপথের বাইরেও পৃথক ছায়াপথের অস্তিত্ব সম্ভব। আজ আমরা জানি বিশ্বে মোট ছায়াপথের সংখ্যা প্রায় $১০^{১১}$। হাবল তাঁর গবেষণায় মাউন্ট উইলসনের দুরবিন ব্যবহার করে প্রায় ৩৫০টি আলোকচিত্রের প্লেট সংগ্রহ করেছিলেন।

বর্তমানে ছায়াপথ (galaxy) ও নীহারিকার (nebula) মধ্যে আর কোনো বিরোধ নেই। একটি ছায়াপথের মধ্যে অসংখ্য নক্ষত্র, নক্ষত্রস্তবক ও গ্যাসীয় নীহারিকা থাকে। কিন্তু একটি নীহারিকার মধ্যে খুব বেশি তারা খুঁজে পাওয়া যায় না। এরা আসলে গ্যাসের মেঘ এবং অধিকাংশ নীহারিকার অন্তঃস্থলে নতুন তারা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। ছায়াপথ ও নীহারিকার উপর শেপলী ও কার্টিসের এই বিতর্কটি 'জ্যোতির্বিজ্ঞানের মহাবিতর্ক' (Great Debate) নামে পরিচিত। এর উপর বিস্তারিত তথ্যের জন্য Smith (1982) দ্রষ্টব্য।

৪.৩ নিকটবর্তী ছায়াপথসমূহ

আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ মহাবিশ্বে একেবারে নিঃসঙ্গ নয়। ছায়াপথসমূহ সবসময়েই একত্র হয়ে থাকার একটা প্রবণতা দেখায়। আমাদের ছায়াপথও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের ছায়াপথ এবং চারপাশের নিকটবর্তী আরো কিছু ছায়াপথ নিয়ে স্থানীয় ছায়াপথগুচ্ছ (Local

Group of Galaxies) তৈরি। এই স্থানীয়গুচ্ছের সদস্য ২০ থেকে [illegible]। এই স্থানীয়গুচ্ছের বিস্তৃতি প্রায় ১ মেগাপারসেক। মূলত এই গুচ্ছটি কোমা স্কাল্পটর (Coma Sculptor) মেঘের অন্তর্ভুক্ত যার বিস্তৃতি [illegible] আরো [illegible] ছায়াপথসহ [illegible] বছর, এটি একটি সমতল বিস্তৃতি (flattened distribution)। এটি স্থানীয় মহাগুচ্ছের (Local Supercluster) কেন্দ্রস্থিত কন্যাস্থবকের দিকে অবস্থিত।

স্থানীয়গুচ্ছের প্রধান ৩টি সদস্য হলো ভরের নিম্নক্রমে, অ্যান্ড্রোমিডা (M31) আকাশগঙ্গা এবং ট্রায়াংগুলাম (M33) ছায়াপথ। এই ৩টিই কুণ্ডলিত ছায়াপথ। এছাড়া অ্যান্ড্রোমিডা ও আমাদের ছায়াপথের [illegible] বেশ কয়েকটি উপছায়াপথ (satellite galaxies)। আমাদের ছায়াপথের উপছায়াপথ হলো ছোট ও বড়ো ম্যাজেলানীয় মেঘপুঞ্জ (অনিয়মিত ছায়াপথ), এছাড়া আরো ৭টি বর্তুলাকার বামন ছায়াপথ (dwarf spheroidals) যেমন-ফরনাক্স, স্কাল্পটর, লিও-১, লিও-২, ড্রাকো, কারিনা ও আর্স মাইনর। এরা কোনো তারা তৈরির প্রক্রিয়া নেই। অ্যান্ড্রোমিডার ৪টি উপছায়াপথই উপবৃত্তাকার ; এরা হলো -NGC 221, 205, 185 ও 147।

ম্যাজেলানীয় মেঘপুঞ্জ : এরা আমাদের ছায়াপথের দু'টি উপছায়াপথ। দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশ থেকেই কেবল এদের দেখা যায় (চিত্র ৪.১)। ফার্দিনান্দ ম্যাজেলান ১৫১৯ সালে যখন বিশ্ব ভ্রমণে বের হন তখন তিনি এ দু'টো আবিষ্কার করেন। ম্যাজেলানীয় মেঘ দুটি বড় এবং ছোট (Large & Small Magellanic Clouds, LMC & SMC)। এদের দূরত্ব যথাক্রমে ৫০ ও ৬৫ কিলোপারসেক। বড় মেঘটির রয়েছে বেশ বড়, প্রশস্ত ও উজ্জ্বল দণ্ডাকৃতির কাঠামো (barred structure)। কিন্তু এ দণ্ডটি বিশৃঙ্খল তারার সমন্বয়ে গঠিত। অনুজ্জ্বল তারাদের এক ঘন সমাবেশও এখানে লক্ষ্য করা গেছে। এখানে অবস্থিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বস্তু হলো টারানটুলা নীহারিকা যার অন্য নাম 30-Doradus, NGC 2070। বড় ম্যাজেলানীয় মেঘের এটিই ক্রিয়াশীল কেন্দ্র। আয়নিত গ্যাস ও নবীন তারার সমন্বয়ে এটি গঠিত। এর ব্যাস ২৫০ পারসেক। এর ভর প্রায় ৫ মিলিয়ন সৌরভর। এই নীহারিকার মধ্যে একটি উজ্জ্বল নিউক্লিয়াস দেখা যায় যার ব্যাস ২৫ পারসেক। এটি এখনও একটি রহস্যময় বস্তু বলেই বিবেচিত হয়। বড় ম্যাজেলানীয় মেঘটি আসলে ১ম শ্রেণীর অনিয়মিত দণ্ডাকৃতি ছায়াপথ যার রয়েছে অন্তত দুটি অসুসংজ্ঞায়িত কুণ্ডলিত বাহু যারা দণ্ডের দুই প্রান্ত থেকে বিস্তৃত হয়েছে। আকাশে এটি ৫০° বর্গ ডিগ্রি এলাকা দখল করেছে। এর ব্যাস প্রায় [illegible] কিলোপারসেক এবং ভর ১০[illegible] সৌরভর।

- *Cambridge Atlas of Astronomy* '94 অনুযায়ী [illegible] *McGraw Hill Encyclopedia of Science & Technology*, '92 অনুযায়ী ৩১ [illegible]। অবশ্য এর মধ্যে অনেক সন্দেহজনক সদস্য রয়েছে। সদস্যদের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য দেখুন Local Group *McGraw Hill Encyclopedia of Science & Technology*, 7th ed '92

এদিকে ছোট ম্যাজেলানীয় মেঘটির কাঠামো অপেক্ষাকৃত জটিল। এর ভর প্রায় ১০[illegible] সৌর ভর। এর একটি স্থানীয় কাঠামো আছে যাকে উইং (wing) বলে। আরো আছে একটি অস্পষ্ট দণ্ড। এর বিশ শতাংশই গ্যাসময়। অনেকে মনে করেন যে আকাশগঙ্গা ছায়াপথ এবং বড় মেঘের (LMC) টানাপোড়েনের ফলে এটি বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ম্যাজেলানীয় মেঘপুঞ্জ যে শেফালী বিষমতারা আছে তাদেরকেই প্রথম দূরত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দূর ভবিষ্যতে এ দুটি উপছায়াপথ আমাদের ছায়াপথের সাথে একীভূত হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

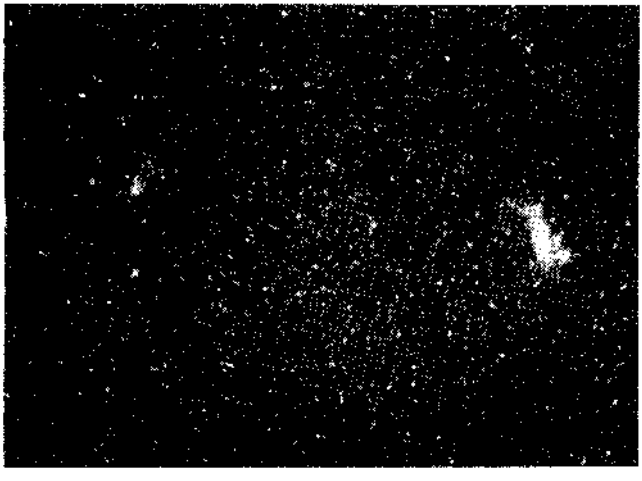

চিত্র ৪.১ : ম্যাজেলানীয় মেঘপুঞ্জ : বামে ধূসর ছোট মেঘটিকে (SMC) দেখা যাচ্ছে, ডানে বড় মেঘটি (LMC)।

অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথ : স্থানীয়গুচ্ছের সবচেয়ে ভারি ছায়াপথ (চিত্র ৪.২)। এর ভর ১০[illegible] সৌর ভর। আমাদের ছায়াপথের প্রায় দ্বিগুণ) এবং ব্যাস ৫০ কিলোপারসেক। আমাদের থেকে এর দূরত্ব ৩৭০ কিলোপারসেক। আমাদের কাছে একে এর ধার-বরাবর (edge on) থাকতে দেখা যায়। তাই এর কুণ্ডলিত বাহুগুলো দেখা যায় না। এটি আসলে একটি Sb শ্রেণীর ছায়াপথ। খালি চোখেই এর কেন্দ্র দেখতে পাওয়া যায়। এর ব্যাস ৪.৬ কিলোপারসেক। এটি অবলোহিত এবং রেডিও তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বেশ জোরালো উৎস হিসেবে দেখা যায়। কেন্দ্রীয় অঞ্চল বাহুপ্রান্তের তুলনায় প্রায় ৩ গুণ বেশি ভারি মৌলসমৃদ্ধ। এই ছায়াপথের (disc) চকতির অংশটি এইচ-টু (HII) অঞ্চলে সমৃদ্ধ। প্রায় ২০০০টি অনুরূপ অঞ্চল পাওয়া গেছে। তাছাড়া এখানে O.B.OB তারার দল (association) প্রচুর দেখা যায়। আমাদের ছায়াপথের তুলনায় এখানে তারা তৈরির প্রক্রিয়া বেশ কিছুটা দ্রুত। এছাড়া এর

কেন্দ্রের চারদিকে অসংখ্য হলুদ ফুটকি দেখা যায়। এরা গুচ্ছস্তবক (globular clusters)। সবচেয়ে দূরবর্তী গুচ্ছস্তবকের দূরত্ব প্রায় ৬০ কিলোপারসেক। অর্থাৎ এর কাঠামো (structure) বেশ বিস্তৃত।

অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথ এর সঙ্গী ক্ষুদ্র উপবৃত্তাকার ছায়াপথ NGC 211 (M 110) [illegible] নেবুলা নিঃসরণ প্রদর্শন করে। তাছাড়া এর বহিঃপ্রান্ত থেকে [illegible] অ্যান্ড্রোমিডার ভেতরে চলে যায় প্রবল আকর্ষণে। অ্যান্ড্রোমিডা [illegible] উপছায়াপথ যাদের নাম আগেই বলা হয়েছে।

চিত্র ৪.২ : অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথ।

৪.৪ ছায়াপথের শ্রেণীবিভাগ

আমাদের বিশ্বে নানা ধরনের ছায়াপথ আছে। অবশ্য এরা এতোদূরে অবস্থিত [illegible] খালি চোখে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। দূরবীনে দেখা ছায়াপথের [illegible] আকৃতি নিয়ে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এককে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন [illegible] এডুইন পি. হাবল। মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের টেলিস্কোপ ব্যবহার করে হাবল [illegible] যে আকৃতি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তা থেকেই তিনি ছায়াপথগুলির শ্রেণীবি[illegible]

এটাই আজ পর্যন্ত প্রমিত (standard) শ্রেণীবিভাগ হিসেবে প্রচলিত। অবশ্য এর আরো সম্প্রসারণ ঘটেছে। ছায়াপথের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আলান সান্ডেজ, জেরার্ড ডি ভোকুলেরস, ভ্যান্ডেনবার্গ প্রমুখ। ছায়াপথ গবেষণার বড় বাধা হলো এই যে আমরা ছায়াপথের শুধু দ্বিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি পাই, এর গভীরতা সম্পর্কে ত্রিমাত্রিক কোনো ধারণাই নেই।

হাবলের শ্রেণীবিভাগ

১৯২৬ সালে হাবল ছায়াপথ শ্রেণীবিভাগ শুরু করেন। আলোকচিত্রে প্রাপ্ত ছায়াপথদের আকৃতি থেকেই এর শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে (চিত্র ৪.১)। হাবল এই ছায়াপথদের মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন: উপবৃত্তাকার (ellipticals), কুণ্ডলিত (spirals), অনিয়মিত (irregular) ছায়াপথ। হাবল প্রথম এদের আকৃতি প্রকৃতিতে সংজ্ঞা দেন। পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে আলান সান্ডেজ এই শ্রেণীবিভাগকে আরো সুসংহত করেন। ছায়াপথদের আকৃতিগত গঠন (morphology) সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব গবেষণা এক্ষেত্রে তিনি প্রয়োগ করেন। ১৯৬১ সালে *Hubble Atlas of Galaxies*-বইটিতে তিনি এসব প্রকাশ করেন। যদিও সাম্প্রতিক এমন কিছু ছায়াপথ পাওয়া গেছে যারা মূল বিন্যাস থেকে ভিন্ন, তবুও এই বিন্যাসটিকেই প্রামাণ্য বলে ধরে নেওয়া হয়।

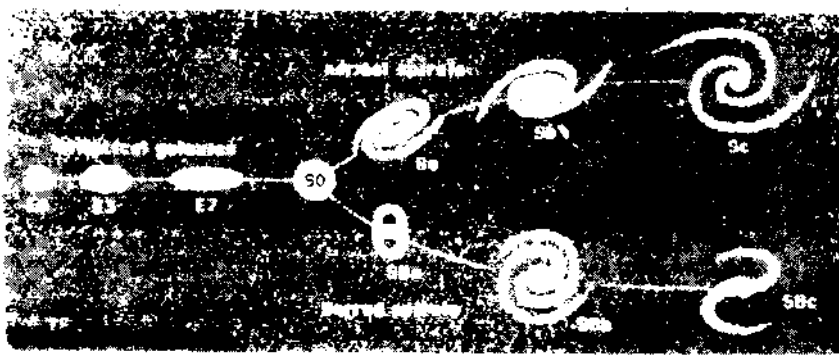

চিত্র ৪.১: হাবলের ছায়াপথের শ্রেণীবিভাগ

উপবৃত্তাকার ছায়াপথ (elliptical galaxies) : অধিকাংশ দৃশ্যমান ছায়াপথই উপবৃত্তাকার। এদের কেন্দ্রস্থলের উজ্জ্বলতা সর্বাধিক এবং কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে দূরত্ব অনুযায়ী উজ্জ্বলতা কমতে থাকে। এরা সূর্যের তুলনায় কিছুটা লালচে। সবচেয়ে বড়

[illegible] rotational symmetry [illegible]

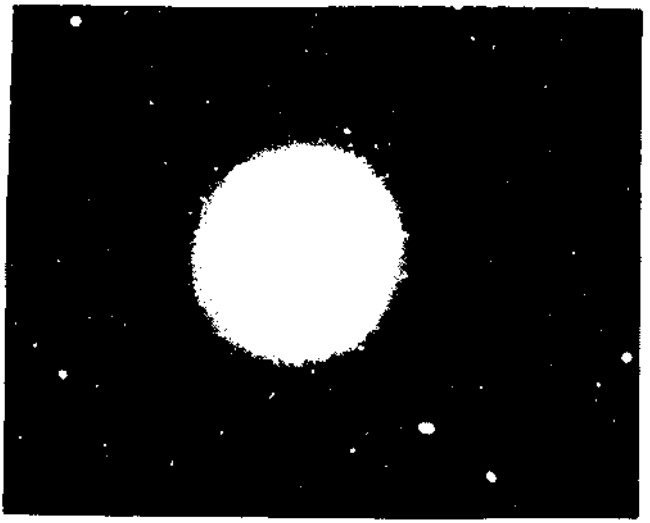

[illegible] Mn

[illegible] Expressed [illegible]

উপবৃত্তাকার ছায়াপথে আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূলিকণা এবং O ও B শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র নেই। এরা লোহিত হয় এবং মনে হয় এই আলো আসে বয়োবৃদ্ধ লাল দানব তারা থেকে। সাধারণের এই মানদণ্ড সমস্ত ছায়াপথই এককভাবে অনুসরণ করে না। যেমন উচ্চশ্রেণীর (high quality) পর্যবেক্ষণে এমন ছায়াপথ দেখা যায় যারা প্রবল্যের উপরিউক্ত আইনটি মেনে চলে না। অনেক ছায়াপথে আবার O এবং B তারাও দেখা যায়।

কুণ্ডলিত ছায়াপথ (spiral galaxies) : এ ধরনের ছায়াপথ তাদের মাকড়সার মতো কুণ্ডলিত বা প্যাঁচানো বাহুর জন্য বিখ্যাত (চিত্র ৪.৫), যদিও এদের সামগ্রিক সংখ্যা

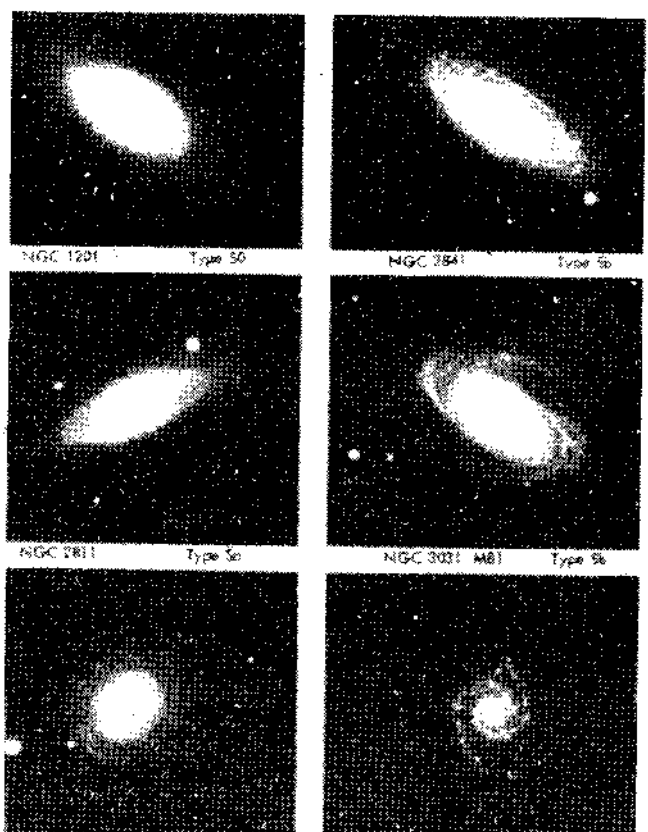

চিত্র ৪.৫ : কুণ্ডলিত ছায়াপথ।

কম। এ ধরনের ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চল বা কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে সর্পিলাকারে কুণ্ডলিত বাহু নির্গত হয়। সাধারণত এ ছায়াপথে দুটো বিপরীত বাহু থাকে যারা কেন্দ্রের চারপাশে প্রতিসম্মভাবে বিন্যস্ত। এদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি বেশ প্রকাণ্ড। কুণ্ডলিত বাহু

এবং ছায়াপথের ডিস্ক উভয়ই নীলচে বর্ণের, তবে কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি [illegible] কুণ্ডলিত সিস্টেমটি অপেক্ষাকৃত নবীন। দৃশ্যমান ছায়াপথের প্রায় ৩৩% কুণ্ডলিত এবং তারাদের সংখ্যা [illegible] থেকে ১ [illegible]

আগেই বলেছি, কুণ্ডলিত ছায়াপথের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৃত্তীয় প্রতিসাম্য এবং [illegible] (superimposed) কুণ্ডলিত কাঠামো। এদেরকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়; সাধারণ (normal) এবং দণ্ডাকৃতির (barred)। সাধারণ কুণ্ডলিত ছায়াপথে কেন্দ্রীয় অঞ্চল [illegible] কুণ্ডলিত বাহু নির্গত হয়। দণ্ডাকৃতির কুণ্ডলিত ছায়াপথে কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি [illegible] না, বরঞ্চ দণ্ডাকার থাকে—অনেকটা দণ্ডচুম্বকের মতো। এক্ষেত্রে কুণ্ডলিত বাহু [illegible] হয় দণ্ডের দুই প্রান্ত থেকে (চিত্র ৪.৬)। সাধারণ কুণ্ডলিত ছায়াপথের লেখা হয় 'S' [illegible] দণ্ডাকারদের জন্য 'SB' ব্যবহার করা হয়। এরা আবার প্রত্যেকে তিনটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। এই উপবিভাগ করা হয়েছে কেন্দ্রের গঠন এবং কুণ্ডলিত বাহুর প্যাঁচের [illegible] উপর। এই তিনটি উপবিভাগকে লেখা হয় a, b, c। অবশ্য উপবৃত্তাকারও [illegible] কুণ্ডলিতও নয় এমন ছায়াপথও আছে। এদের জন্য 'SO' লেখা হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে কুণ্ডলিত ছায়াপথের দুটি অংশের উদ্ভব কি করে হলো? প্রথমে তৈরি হয় কেন্দ্রীয় স্ফীত অংশ (buldge)। এ অংশটি বেশ দ্রুতই তৈরি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে [illegible] তৈরির প্রক্রিয়া উপবৃত্তাকার ছায়াপথের তুলনায় অনেক পরে শুরু হয়। কেন্দ্রীয় অঞ্চল তৈরি হবার পরে অনেকখানি গ্যাসীয় পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, এ অংশটি ছায়াপথের ডিস্ক তৈরি করে এবং নতুন তারা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই মডেলটি ছায়াপথের আকৃতির [illegible] দেয় এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও ডিস্কে পদার্থের পরিমাণের পার্থক্য ব্যাখ্যা করে। তবে কুণ্ডলিত বাহু কি করে তৈরি হয় তার ব্যাখ্যা এখান থেকে পাওয়া যায় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কুণ্ডলিত বাহু কি দিয়ে তৈরি। লক্ষণীয় যে এই বাহুগুলোর বিভিন্ন অংশের গতি বিভিন্ন (differential rotation)। অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সাথে সাথে নক্ষত্রের ঘূর্ণনগতি কমতে থাকে। আমরা [illegible] করে নেই যে, প্রথমে তারাগুলো এক রেখা বরাবর (aligned) ছিল। তবে পুরুকে [illegible] জন্য কাছের তারা দূরের তারার চেয়ে বেশি জোরে ঘুরবে। এর ফলে এক ধরনের বয়াবজন বা মোচড় বলের (winding up effect) সৃষ্টি হবে যা পরবর্তীতে কুণ্ডলিত সিস্টেমের জন্ম দেবে। এর ফলে কয়টি মোড়ের (turns) দরকার হবে তা হিসাব করা যায় ডিস্কের বয়সকে (প্রায় ১০ বিলিয়ন বছর) তার পর্যায়কাল (প্রায় [illegible] মিলিয়ন বছর) দিয়ে ভাগ দিয়ে। ফলে দেখা যায় প্যাঁচের সংখ্যা একশ হয়। কিন্তু কুণ্ডলিত ছায়াপথে প্যাঁচের সংখ্যা একটি বা দুটি। কাজেই ঘূর্ণন বেগ দিয়ে কুণ্ডলিত [illegible] ব্যাখ্যা [illegible] কুণ্ডলিত কাঠামো আসলে একটি গাঠনিক প্যাটার্ন (structural pattern) যা [illegible] নক্ষত্রসমূহ ভ্রমণ করে। এর একমাত্র ব্যাখ্যা ঘনত্বের তরঙ্গ যা [illegible] পরে [illegible] প্রবেশ করে।

SO ছায়াপথ : এই ছায়াপথ শ্রেণী উপবৃত্তাকার এবং কুণ্ডলিত শ্রেণীর মাঝের মধ্যবর্তী। SO ছায়াপথ সম্পর্কে সান্ডেজ অনেক তথ্য দিয়েছেন। SO [illegible] একটি

উজ্জ্বল কেন্দ্র থাকে যার চারপাশে থাকে মসৃণ, বৈশিষ্ট্যহীন স্ফীত অংশ (buldge) এবং অনুজ্জ্বল বহিঃস্থ আবরণ (envelope)। এদের ক্ষেত্রে b/a অনুপাতটি ০.১ থেকে ০.৩ এর মধ্যে পাওয়া যায়। এদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তুলনায় ছায়াপথের ডিস্ক ১০ গুণ বেশি চওড়া। উপরন্তু এদের উজ্জ্বলতার জন্য প্রযোজ্য উজ্জ্বলতার আইন এদের জন্য প্রযোজ্য নয়। অনেক SO ছায়াপথের বহিরাবরণীতে একটা অস্পষ্ট কাঠামো নজরে পড়ে—মনে হয় এখানে আছে অস্পষ্ট, বিচ্ছিন্ন ধরনের বাহু অথবা ধূলিকণার সরু অঞ্চল। অধিকাংশ SO ছায়াপথের কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস কাছে নজরে পড়ে না। মনে হয় এরা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর অনিয়মিত ছায়াপথ (Irregular II) অথবা সে সমস্ত ছায়াপথ যারা হালো বিন্যাসে সহজে খাপ খায় না (সেগুলি ছায়াপথের এরা মাত্র এক বা দুই শতাংশ)। যেমন NGC4753, NGC2685। এদেরকে সাধারণ ভাবে বিচিত্র (peculiar) SO ছায়াপথ বলা হয়। SO ছায়াপথদের অন্য নাম Lenticular বা লেন্সাকৃতির ছায়াপথ।

লক্ষণীয় যে, SO ছায়াপথে নতুন তারা তৈরি হয় না। এর কারণ এই যে, তারা তৈরি অনেকটা নির্ভর করে আশপাশের পরিবেশের উপর। দেখানো যায় যে, কোনো একটি অঞ্চলে SO ছায়াপথ ও কুণ্ডলিত ছায়াপথের অনুপাত ঐ অঞ্চলের ছায়াপথের ঘনত্বের অপেক্ষক। কাজেই ঐ অঞ্চলের ছায়াপথদের ঘনত্ব যতো বেশি হবে SO ছায়াপথ ও কুণ্ডলিত ছায়াপথের অনুপাত ততো বেশি হবে। কাজেই বেশি ঘনত্বের অঞ্চলে তৈরি ছায়াপথ SO শ্রেণীর হবে এবং অন্যত্র তা কুণ্ডলিত হবে। এরা যে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় আন্তঃছায়াপথীয় (intergalactic) পদার্থসমূহ প্রচণ্ড উত্তপ্ত (কয়েক কোটি ডিগ্রি) এবং খুব কম ঘনত্বের হয় (প্রতি ঘন মিটারে মাত্র কয়েকশ কণা)। ছায়াপথসমূহ এই গ্যাসীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বেশ দ্রুত অগ্রসর হয়। ফলে এরা ঐ গ্যাসের ওপর এক ধরনের গতীয় চাপ প্রয়োগ করে। এই চাপ বিশেষ করে ছায়াপথের অন্তঃস্থ আন্তঃছায়াপথীয় গ্যাসের উপর। কিন্তু প্রচণ্ড গতীয় চাপ যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ায় এই গ্যাস ছায়াপথ থেকে বেরিয়ে যায়। এর ফলে যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ায় এই গ্যাস ছায়াপথ থেকে বেরিয়ে যায়। এর ফলে নতুন তারা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস থাকে না। এর ফলে নতুন তারাসমৃদ্ধ কুণ্ডলিত বাহুও থাকে না। এভাবে লেন্সাকৃতির বা SO ছায়াপথের কোনো কুণ্ডলিত বাহু থাকে না।

Sa ছায়াপথ : সাধারণ শ্রেণীর কুণ্ডলিত ছায়াপথ যাদের বাহু খুব বেশি ছড়ানো নয় অর্থাৎ কেন্দ্রের বেশ কাছাকাছি অঞ্চলে বিন্যস্ত (tightly wound)। প্রচুর আন্তঃনক্ষত্রিক ধূলিকণা এবং উজ্জ্বল নক্ষত্র থাকায় এদের খালি চোখে দেখা যায়। এদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি মাঝারি আকার ও বর্ণের এবং স্ফীত। তবে এমন কিছু Sa ছায়াপথ আছে যাদের কেন্দ্র ছোট, যারা অনিয়মিত আকার (amorphous) স্ফীত অংশ (buldge) এবং উপরিপাতিত কুণ্ডলিত বাহু। কিন্তু কেন্দ্রীয় অঞ্চলবিশিষ্ট ছায়াপথের উদাহরণ হলো NGC 1302।

Sb ছায়াপথ : এ ধরনের কুণ্ডলিত ছায়াপথের মাঝারি আকারের নিউক্লিয়াস থাকে। এর বাহুগুলো কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে একটু বড় অঞ্চল নিয়ে ছড়ানো থাকে এবং বাহুগুলো অপেক্ষাকৃত শিথিল (loosely wound)। এদের বর্ণ হতে থাকে নীলাভ,

তারাসেষ, আন্তঃনক্ষত্রিক গ্যাস ও ধূলিকণা। হাবল ও [illegible] দেখেছিলেন যাদের বাহু নির্গত হয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র [illegible]

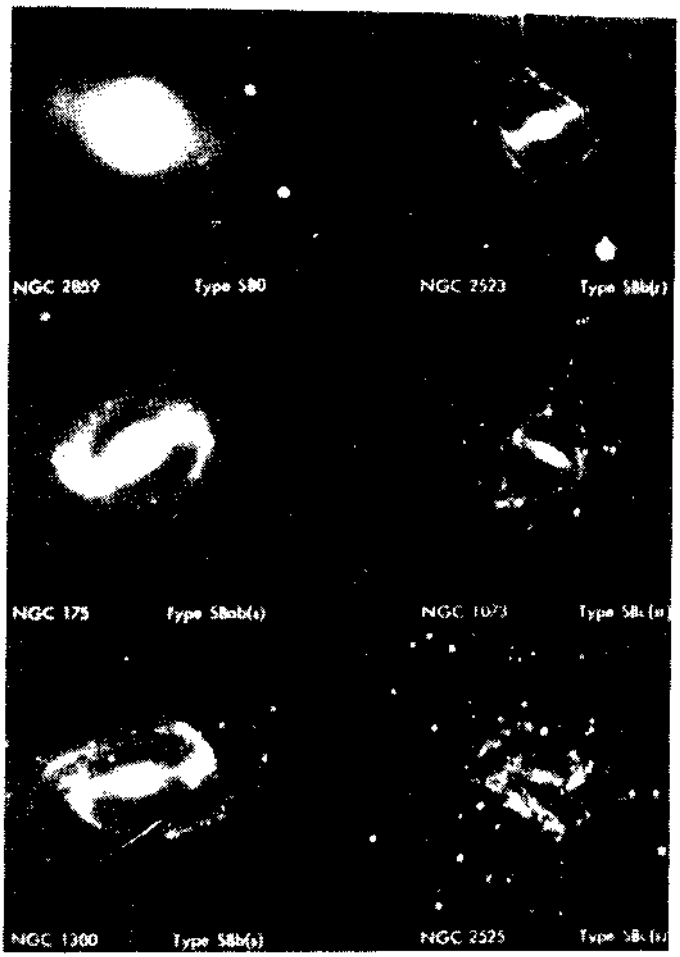

চিত্র ৪.৬ : বিভিন্ন ধরনের দণ্ডাকৃতি কুণ্ডলিত [illegible] spirals

ছায়াপথে বাহুটি নির্গত হয় উজ্জ্বল, প্রায় গোলাকার [illegible] (tangentially)। এদের ক্ষেত্রে কুণ্ডলিত বাহুগুলো বিভিন্ন [illegible] পরে (পিচ্ কোণ হলো কোনো একটি বাহু এবং কেন্দ্রীয় [illegible] কোণ যা ঐ বাহুটিকে ছেদ করেছে)। হাবল ও স্যান্ডেজ SI [illegible]

থেকে আরো বিচ্যুতি লক্ষ্য করেছেন। কোনো কোনো ছায়াপথে কুণ্ডলিত বাহুর চারদিকে বিশৃঙ্খল ধূলিকণার উপস্থিতি দেখা যায়। আবার কারোবা পুরু বাহু আছে যাদের পৃষ্ঠের উজ্জ্বলতা কম এবং যাদের কিনারা দিয়ে সরু ধূলিকণার কালো রেখা দেখা যায়। এছাড়া আছে এমন সব ছায়াপথ যাদের বিশাল, অবিচ্ছিন্ন কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে কুণ্ডলিত বাহু কেন্দ্রের সাথে স্পর্শকাকারে নির্গত হয়। এভাবে ক্ষুদ্র বাহুখণ্ড (segments) তৈরি হয়। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথ এরকম একটি ছায়াপথ।

এ সমস্ত আকৃতিগত বিচ্যুতির প্রকৃত ব্যাখ্যা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি। কুণ্ডলিত ছায়াপথ তৈরির যে সমস্ত তাত্ত্বিক মডেল আছে সেগুলো প্রয়োগ করে প্রাথমিক Sb ছায়াপথের প্রতিকৃতি গঠন করা সম্ভব (কম্পিউটার সিমুলেশন ব্যবহার করে)। তবে কেন এ রকম রহস্যজনক গঠন দেখা যাবে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

Sc ছায়াপথ : এ সমস্ত ছায়াপথের খুব ছোট নিউক্লিয়াস থাকে এবং থাকে একগুচ্ছ কুণ্ডলিত বাহু যারা বেশ খোলামেলা (অর্থাৎ পিচ্ কোণ বড়)। এই বাহুগুলো খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। এতে আছে প্রচুর সংখ্যক অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত তারামেঘ, তারাস্তবক এবং গ্যাসমেঘ (যাদের নিঃসরণ নীহারিকা বলে)। এদের বাহুতে থাকে অসংখ্য ধূলিকণা ; এদের HII অঞ্চল বলে। Sc ছায়াপথেরও আবার Sb এর মতো উপবিভাগ আছে। যেমন :

১. একটি ছোট নিউক্লিয়াস থেকে বাইরের দিকে সর্পিলাকারে বের হয়ে যাওয়া চিকন, শাখাযুক্ত ছায়াপথ। যেমন Whirlpool Galaxy (M51)।

২ নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্রে রেখে অবস্থিত একটি উজ্জ্বল রিং থেকে স্পর্শকাকারে নির্গত বহুসংখ্যক (multiple) বাহু।

৩. এমনসব ছায়াপথ আছে যাদের বাহুগুলো অস্পষ্ট অর্থাৎ সুসংজ্ঞায়িত নয়।

৪. বহুসংখ্যক বাহুবিশিষ্ট কুণ্ডলিত প্যাটার্ন যা সহজে নজরে পড়ে না। বাহুতে প্রচুর ধূলিকণার স্তর উপস্থিত।

৫. পুরু, খোলামেলা বাহুগুচ্ছ যা সুস্পষ্ট নয়। যেমন Triangulum নীহারিকা (M33)।

৬. এমন কিছু ছায়াপথ আছে যাদের কোনো অন্তর্নিহিত শৃংখলা নজরে পড়ে না। এদেরকে অনিয়মিত ছায়াপথেরও শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এরা পরিবৃত্তি (transition) শ্রেণীর। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ (যেমন ডি ভোকোলোর) এই শ্রেণীকে Sd লিখেছেন।

SB ছায়াপথ : উজ্জ্বলতা, বর্ণালি, বিন্যাস এসব দিক দিয়ে দণ্ডাকার ছায়াপথসমূহ সাধারণ কুণ্ডলিত ছায়াপথদের অনুরূপ। কাজেই SB সিস্টেমের শ্রেণীবিভাগও সাধারণ কুণ্ডলিত ছায়াপথদের অনুরূপ। SBO ছায়াপথদের রয়েছে বিশাল স্ফীত কেন্দ্র (nuclear buldge) যার চারপাশে থাকে চাকতি বা ডিস্কের মতো একটি বহিরাবরণ (envelope) যার

মধ্যে থাকে একটি উজ্জ্বল দণ্ড বা বার। কোনো কোনো ছায়াপথের দণ্ডাকৃতির কেন্দ্রটি ছোট, কোনো কোনোটির আবার বড়। সাধারণত দণ্ডের চারপাশে থাকে এক রকমের বলয় বা রিং। SBa ছায়াপথদের থাকে উজ্জ্বল ও বিশাল স্ফীত নিউক্লিয়াস এবং বাহুগুলো বেশ কাছাকাছি পেঁচানো (tightly wound)।

এদের কুণ্ডলিত বাহুগুলো মসৃণ এবং হয় দণ্ডাকৃতির কেন্দ্রের দুই প্রান্ত থেকে অথবা বলয় সদৃশ অংশ থেকে মুক্ত হয়। SBb ছায়াপথদের থাকে একটি মসৃণ, অবিচ্ছিন্ন বার বা দণ্ডাকৃতির কেন্দ্র এবং বাহুগুলোও অবিচ্ছিন্ন। এদের অনেক নমুনায় দেখা যায় দণ্ডাকৃতির কেন্দ্রের ধার ঘেঁষে ধূলিকণার অঞ্চল (dust lane) একেবারে কেন্দ্র পর্যন্ত চলে গিয়েছে। আবার অনেকের ক্ষেত্রে কুণ্ডলিত বাহু দণ্ডের বাইরের বলয় থেকে স্পর্শকাকারে মুক্ত হয়। SBc ছায়াপথদের কুণ্ডলিত বাহুতে উপস্থিত তারাস্তবক ও ধূলিমেঘ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। বাহুগুলো বাইরের দিকে মুক্ত (open) থাকে।

অনিয়মিত ছায়াপথ (Irregular Galaxies) : এ ধরনের ছায়াপথের কোনো সুনির্দিষ্ট কেন্দ্র নেই। এরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল অংশে বিভক্ত এবং বিশৃংখলায় পূর্ণ। কোনো রকমের প্রতিসাম্যই এদের নেই। কুণ্ডলিত ছায়াপথের তুলনায় এদের বর্ণ নীলচে। হাবল দুধরনের অনিয়মিত ছায়াপথ চিহ্নিত করেছিলেন : প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনিয়মিত ছায়াপথ (Irr I & II)। প্রথম শ্রেণীর অনিয়মিত ছায়াপথই (Irr I) বেশি দৃশ্যমান। মনে হয় এরা কুণ্ডলিত ছায়াপথের শেষ উপবিভাগের কিছুটা সম্প্রসারিত শ্রেণীতে পড়ে। অর্থাৎ Sc শ্রেণীর পরে এদের অবস্থান এবং এদের কোনো সুনির্দিষ্ট কুণ্ডলিত প্যাটার্ন নেই। এরা নীলচে বর্ণের এবং এর অংশগুলো স্পষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর (Irr II)। অনিয়মিত ছায়াপথ সংখ্যায় কম। নানান ধরনের বিশৃংখল ছায়াপথ এদের অন্তর্ভুক্ত। অনেক অনিয়মিত ছায়াপথের আবার দণ্ডাকৃতির কেন্দ্র আছে অথচ চারপাশের অংশসমূহ বিশৃংখল। দক্ষিণাকাশে দৃশ্যমান বড় ম্যাজেলানিক মেঘপুঞ্জ (Large Magellanic Cloud, LMC) এর উদাহরণ। দৃশ্যমান ছায়াপথের মাত্র ১০% অনিয়মিত ছায়াপথ।

অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ : পরবর্তীতে আরো অনেক নতুন গবেষণালব্ধ তথ্য পাওয়া যায় যার ভিত্তিতে অনেকেই নতুন নতুন শ্রেণীবিভাগ চালু করেন। উল্লেখ্য যে সকল শ্রেণীবিন্যাসের মূল হাবল শ্রেণীবিন্যাস, শুধু উপবিভাগ নিয়েই যা কিছু পার্থক্য।

১৯৫৯ সালে জেরার্ড ডি ভোকোলোরের (Gerard de Vaucouleurs) একটি নতুন শ্রেণীবিন্যাস প্রণয়ন করেন। E7 থেকে Sa এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আরো অনেক উপশ্রেণী তিনি যোগ করেছেন। ছায়াপথের ডিস্ক ও নিউক্লিয়াসের আকৃতি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এই উপবিভাগ করা হয়েছে। অন্যদিকে SO অনুক্রমের উপবিভাগ S অনুক্রমের অনুরূপ

রাখা হয়েছে। অবশ্য SO ছায়াপথদের কোনো কুণ্ডল কাঠামো (spiral structure) নেই এবং খুব কম পরিমাণে গ্যাস উপস্থিত। হাবল বিন্যাসের Sc ও Irr I শ্রেণীকে আরো বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন নতুন বিন্যাসে Sm হলো অনিয়মিত ছায়াপথ যাদের সুনির্দিষ্ট কুণ্ডল কাঠামো বর্তমান। বড়ো ম্যাজেলানিক মেঘপুঞ্জ হলো SBm, কিন্তু ছোট ম্যাজেলানিক মেঘপুঞ্জ হলো IBm। কারণ IBmদের কোনো কুণ্ডল কাঠামো নেই। ডি ভোকোলোরের নতুন শ্রেণীবিন্যাসে মধ্যবর্তী অবস্থা বুঝাতে Sab ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাথে s যোগ করা হয় যদি কুণ্ডলিত বাহু কেন্দ্র থেকে নির্গত হয় ; r যোগ করা হয় যদি বলয় থেকে নির্গত হয়। SAB হচ্ছে সাধারণ ও দণ্ডাকৃতির কুণ্ডলিত ছায়াপথদের মধ্যবর্তী দশা। এভাবে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা ব্যবহৃত হয় এ সমস্ত গুণাগুণ প্রকাশ করতে। ধারাটি হলো : O - a - b - c - d -m, A-B, (r) - (S) ; ডি ভোকোলোরের এই শ্রেণীবিন্যাসটি সারণি-১ এ দেয়া হলো।

১৯৬০ সালে সিডনি ভ্যান ডেন বার্গ (Sidney Van den Bergh) আরেকটি নতুন বিন্যাস তৈরি করেন। ছায়াপথদের আঙ্গিক গঠনের উপর নির্ভর করে এদের একটি উজ্জ্বলতার শ্রেণী দেয়া হয়। এভাবে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছায়াপথদের জন্য I এবং অনুজ্জ্বলদের জন্য V বা VI লেখা হয়। এই পদ্ধতি নক্ষত্রের M-K শ্রেণীবিভাগের অনুরূপ (অনুচ্ছেদ

সারণি-১

আকার	পরিবার (family)	প্রকারভেদ	স্তর	শ্রেণী
উপবৃত্তাকার			উপবৃত্তাকার (0-7) মধ্যবর্তী বিলম্বিত উপবৃত্তাকার	E E0 E0-1 E^+
লেন্স আকৃতির (lenticulars)	সাধারণ (ordinary) দণ্ডাকৃতির (barred) মিশ্র (mixed)			SO SAO SBO SABO
		অন্তর্বলয় (inner ring) S-আকৃতির (S-shaped) মিশ্র (mixed)		S(r) O S(s) O S(rs) O
			প্রাচীন (early) মধ্যবর্তী বিলম্বিত (late)	SO^- SO° SO^+

কুণ্ডলিত (spirals)	সাধারণ দণ্ডাকৃতির মিশ্র	অন্তর্বলয় S-আকৃতির বিন্দু		S A SB SAB S (r) S (s) S (rs)
			O/a a ab b bc c cd d dm m	S O/a Sa Sab Sb Sbc Sc Scd Sd Sdm Sm
অনিয়মিত (irregulars)	সাধারণ দণ্ডাকৃতির মিশ্র	S-আকৃতির		IA IB IAB I (s)
			মাঙ্গেলানিক ডম্যাঙ্গেলানিক	Im IO
অদ্ভুত (peculiars)			বিচিত্র (peculiarity)	P P
			অনিশ্চিত (uncertain)	:
			সন্দেহজনক	?
			কুয়া (spindle)	sp
			বহির্বলয়	(R)
			ছদ্ম বহির্বলয়	(R)

৬.৮)। এভাবে মুক্ত, স্পষ্ট বাহুবিশিষ্ট একটি উজ্জ্বল ছায়াপথের জন্য লেখা হবে ScI। কিন্তু কিছুটা অনুজ্জ্বল ছায়াপথের জন্য লেখা হবে ScII বা III । অবশ্য উজ্জ্বলতার শ্রেণীবিভাগের জন্য একসেট প্রমাণ উজ্জ্বলতার ছায়াপথ প্রয়োজন যাদের দূরত্ব জানা।

এ ছাড়াও হুবেকস শ্রেণীবিভাগ আছে যেখানে ছায়াপথের বর্ণালির পাশাপাশি এর সাধারণ আকৃতিও বিবেচনা করা হয়। এভাবে প্রতিটি শ্রেণীর সাথে একটি অক্ষর যোগ হয় যেটা ছায়াপথের বর্ণালি শ্রেণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত (বর্ণালি শ্রেণী সম্পর্কযুক্ত থাকে ছায়াপথের কেন্দ্রীয়

অঞ্চলের সাথে)। ছায়াপথ শ্রেণীর আগে বসে : a, af, f, fg, g, gk, k — যা শীতল তারার প্রাধান্য প্রকাশ করে। এভাবে অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথকে লেখা হয় KS5।

আরেক রকমের পদ্ধতি আছে যাতে ছায়াপথদেরকে তাদের রেডিও তরঙ্গ নিঃসরণের প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যেমন—

g : স্বাভাবিক রেডিও উৎসের ছায়াপথ।

R : শক্তিশালী রেডিও উৎসের ছায়াপথ।

cD : অস্বাভাবিক বড় এবং বিকৃত আকৃতির ছায়াপথ। সাধারণত ছায়াপথ স্তবকের কেন্দ্রে দেখা যায়। মনে হয় এরা একীভূত ছায়াপথ।

S : সেফার্ট (Seyfert) ছায়াপথ। ১৯৪৩ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী কার্ল সেফার্ট এ ধরনের ছায়াপথ আবিষ্কার করেন। এদের কেন্দ্রীয় অঞ্চল বাহুর তুলনায় উজ্জ্বল (চিত্র ৪.৯)। এছাড়াও আছে শক্তিশালী রেডিও নিঃসরণ। নিঃসরণ রেখার উপস্থিতি উত্তপ্ত গ্যাসের (বিশেষ করে হাইড্রোজেন) প্রবল ক্রিয়ার সম্ভাবনা ব্যক্ত করে।

N : ছোট কিন্তু বেশ উজ্জ্বল কেন্দ্রবিশিষ্ট ছায়াপথ যাদের শক্তিশালী রেডিও নিঃসরণ রেখা আছে। এরা সেফার্ট ছায়াপথ থেকে দূরবর্তী।

Q : কোয়েসার। ছোট, প্রচণ্ড উজ্জ্বল এবং প্রবল রেডিও উৎস। সাম্প্রতিক গবেষণার বিষয়বস্তু।

ছায়াপথদের হাব্‌ল শ্রেণীবিভাগ একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা। তাই মনে করা হতো বাঁ দিকের উপবৃত্তাকার ছায়াপথসমূহ অধিকতর প্রাচীন এবং উপবৃত্তাকার ছায়াপথসমূহ বিবর্তিত হয়ে কুণ্ডলিত ছায়াপথ তৈরি করে। কিন্তু দেখা যায় প্রাচীন মনে করা ছায়াপথ অধিকতর নতুন তারা ধারণ করে। আসলে হাব্‌ল শ্রেণীবিন্যাস ছায়াপথের বিবর্তন নির্দেশ করে না। কারণ দেখা যায় দানবাকৃতির উপবৃত্তাকার ছায়াপথসমূহ বিশালতম কুণ্ডলিত চায়াপথের তুলনায় দশগুণ ভারি। বিবর্তনের ফলে এই পরিমাণ ভর হারানো (বা লাভ করা দুটোই) দুরূহ। তাছাড়া পর্যবেক্ষিত কৌণিক ভরবেগের বিভিন্নতাও ঘূর্ণনের সহজ পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সব শ্রেণীর ছায়াপথেই লাল অতিদানবদের (red supergiants) দেখা যায় যারা কমপক্ষে $১০^{১০}$ বছরের পুরোনো। কাজেই ছায়াপথসমূহ সমবয়স্ক বলেই মনে হয়। বলা হয়, ভরের পর্যবেক্ষিত পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন ছায়াপথের জন্মপদ্ধতি দায়ী। আসলে নক্ষত্রের বর্ণালিশ্রেণী এবং ছায়াপথের গ্যাসাধার (gas content) তথা হাব্‌ল শ্রেণীর মধ্যে রৈখিক সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। কেবল Sc, SBc, অনিয়মিত ছায়াপথে, যাদের যথেষ্ট গ্যাস ও ধূলিকণা আছে, O এবং B তারাদের দেখা যায়। এরা কমবয়স্ক। অর্থাৎ ঐ সমস্ত ছায়াপথ গত কয়েক কোটি বছরে তৈরি হয়েছে। আবার উপবৃত্তাকার ছায়াপথে কুণ্ডলিত ছায়াপথ অপেক্ষা লাল এবং বয়স্ক তারাদের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

৪.৫ ছায়াপথের সাধারণ ধর্ম

বহিস্থ ছায়াপথসমূহের যে সমস্ত সাধারণ ধর্ম দেখা যায় সেগুলো এখানে আলোচনা করা হবে। এ সমস্ত ভৌত ধর্ম একেক ছায়াপথের ক্ষেত্রে একেকরকম। তবুও একটা নির্দিষ্ট পরিসরের মাঝে এদের বিস্তার দেখা যায়।

আকৃতি ও ভর : ছায়াপথদের আকৃতিগত দিক নিয়ে অনুচ্ছেদ ৪.৪ এ আলোচনা করা হয়েছে। আসলে ছায়াপথ বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ডিম্বাকার অবয়ব—যার মধ্যভাগ স্ফীত এবং বাকি অংশ চাকতির মতো (ফ্লাট বা ডিস্কের মতো)। ডিস্কের ব্যাস মোটামুটি ১ লক্ষ আলোকবর্ষ ($১০^{১৮}$ কি.মি.) এবং মাত্র ১ হাজার আলোকবর্ষ ($১০^{১৬}$ কি.মি.) পুরু। সাধারণভাবে খুব ছোট ছায়াপথদের (যেমন GR8) ব্যাস হয় প্রায় ৫,০০০ আলোকবর্ষ এবং দানবাকৃতির রেডিও ছায়াপথের ক্ষেত্রে ব্যাস হয় প্রায় ৩ মিলিয়ন আলোকবর্ষ।

ছায়াপথদের দৃশ্যমান ভরের সাধারণ বিস্তার হচ্ছে ১০০,০০০ থেকে ১,০০০,০০০,০০০,০০০ সূর্যভর। একটি প্রমাণ আকারের বিশাল কুণ্ডলিত ছায়াপথের ভর হয় প্রায় ৫০০,০০০,০০০,০০০ সূর্যভর। ছায়াপথদের ভর পরিমাপের দুটি পদ্ধতি আছে (অনুচ্ছেদ ৪.৭ দ্রষ্টব্য)। হয় ছায়াপথের মধ্যে নক্ষত্রের গতিবেগ অথবা কোনো একটি স্তবকের মধ্যে ছায়াপথের গতিবেগ পরিমাপ করতে হবে। অতঃপর সিস্টেমের আকার জানা থাকলে সহজেই ভর বের করা যায়। কিন্তু প্রথম পদ্ধতিতে (অর্থাৎ ছায়াপথস্থিত নক্ষত্রের গতি পর্যালোচনা করে) ভর নির্ণয় করা হয় তবে ছায়াপথের ভর পাওয়া যায় ২×১০^{১১} সূর্যভর। অথচ স্তবকের অন্তর্গত ছায়াপথের গতি থেকে ছায়াপথের ভর পাওয়া যায় ৩×১০^{১২} সূর্যভর। ভরের এই পার্থক্য বিজ্ঞানীদের বিকল্প চিন্তা করতে বাধ্য করছে। তাঁরা বলছেন যে ছায়াপথের অধিকাংশ ভরই লুকানো (hidden) বলে মনে হয়। এটাই 'লুকানো ভর' সমস্যা। এজন্য বিজ্ঞানীরা বলছেন যে আসলে ছায়াপথ হচ্ছে বিশাল সব অন্ধকার কীরিটের (massive dark halo) সামান্য উজ্জ্বল অংশ যা আমরা দেখতে পাই। ছায়াপথের অধিকাংশ ভরই আমাদের অজ্ঞাত কোনো রূপে আবদ্ধ আছে এদের থেকে কোনো বিকিরণই আমরা পাই না। মতান্তরে বলা হয় ছায়াপথ স্তবকে বিপুল পরিমাণে অব্যবহৃত পদার্থ এক অজানা পন্থায় আবদ্ধ রয়েছে। 'লুকনো ভর' এর সমস্যা ছায়াপথ গবেষণার এক বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে।

দীপ্তি : বহিঃস্থ ছায়াপথদের মধ্যে সবচেয়ে কম দীপ্তির ছায়াপথ হচ্ছে বামন ছায়াপথ Ursa Minor dwarf যার দীপ্তি হচ্ছে ১০০,০০০ সূর্যের সমান; সবচেয়ে উজ্জ্বল দীপ্তির ছায়াপথদের কেন্দ্রে থাকে কোয়েসার যাদের দীপ্তি হচ্ছে প্রায় ২,০০০,০০০,০০০,০০০ সূর্যের সমান। মোট উজ্জ্বলতা L বিশিষ্ট ছায়াপথের সংখ্যা $L^{-১}$ এর সমানুপাতিক যেখানে γ এর মান ১ থেকে ১.৫ (উজ্জ্বলতা ৩×১০^{১০} সৌরদীপ্তির কম হলে)। কিন্তু ছায়াপথের সংখ্যা উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির সাথে সূচকীয় হারে কমে। এভাবে দেখা যায় সবচেয়ে উজ্জ্বল ছায়াপথসমূহের দীপ্তি ২×১০^{১১} সৌরদীপ্তির চেয়ে কম; আবার সবচেয়ে কম উজ্জ্বল ছায়াপথসমূহের দীপ্তি ১×১০^{৭} এর চেয়ে বেশি। আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের দীপ্তি ১×১০^{১০} সূর্যের সমান। সাধারণভাবে

ধরে নেয়া হয় যে ছায়াপথের দীপ্তি ভরের আনুপাতিক। তাই উজ্জ্বল ছায়াপথসমূহই বেশি ভারি

গঠন (composition) : লক্ষ কোটি তারার সমন্বয়ে ছায়াপথ গঠিত। সমস্ত তারাকে টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয় কারণ এরা বহু দূরে অবস্থিত। নিকটস্থ ছায়াপথসমূহের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রসমূহই কেবল পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। দেখা যায় ছায়াপথে থাকে তিন ধরনের তারা : ১. হাইড্রোজেন দহনকারী, নবীন, প্রধানধারার (main sequence) নীল তারা ; ২. হিলিয়াম দহনকারী, লাল অন্তিম দশায় উপস্থিত দানবতারা ; ৩. বিস্ফোরণশীল (যেমন নোভা বা সুপারনোভা) এবং বিষমতারা (variable stars)। যদিও এরাই ছায়াপথের উজ্জ্বলতম বস্তু, ছায়াপথের অধিকাংশ ভর আসে প্রধানধারার বামনাকৃতির অসংখ্য তারা এবং অন্তিম দশার নিউট্রন, সাদা বামনতারা অথবা কৃষ্ণবিবর থেকে। ছায়াপথে দুধরনের তারাসমষ্টি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম তারাসমষ্টির (Population I) তারা হচ্ছে বয়সে নবীন এবং এ অঞ্চলে নতুন তারা জন্ম নিচ্ছে। এ অঞ্চলে প্রচুর গ্যাস থাকে। এ অঞ্চল ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে বিস্তৃত। অন্যদিকে দ্বিতীয় তারাসমষ্টির (Population II) তারা হচ্ছে বয়োবৃদ্ধ, লাল এবং এ অঞ্চলে তারা সৃষ্টির প্রক্রিয়া অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছে। এরা সাধারণত ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে থাকে।

ছায়াপথে যে গ্যাস দেখা যায় তার অধিকাংশই অ আয়নিত হাইড্রোজেন এবং মোট গ্যাসীয় পদার্থের ১% ধূলিকণা। আমাদের সূর্যে যে সমস্ত মৌল পাওয়া গেছে, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আমাদের ছায়াপথের অন্যান্য নক্ষত্রে এবং অন্যান্য ছায়াপথের নক্ষত্রেও মোটামুটি একই ধরনের অনুপাত পাওয়া যাবে। পার্থক্য যদিও বা থাকে তবে তা হবে কেবল হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের আনুপাতিক পার্থক্য।

বয়স : যদিও সব ছায়াপথের ইতিহাস অভিন্ন নয়, তথাপি বয়োবৃদ্ধ তারাদের বয়স পরিমাপ করে দেখা যায় যে প্রায় সব ছায়াপথেরই বয়স প্রায় একই। আকাশগঙ্গা ছায়াপথের বয়স পরিমাপ করে প্রায় ১০ বিলিয়ন বছর পাওয়া যায়। দূরবর্তী ছায়াপথদের ক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে (বয়োবৃদ্ধ তারাদের পর্যবেক্ষণ করে) বয়সের একই মান পাওয়া গেছে। নিকটবর্তী ছোট এবং বড়ো ম্যাজেলানিক মেঘপুঞ্জের (SMC ও LMC) ক্ষেত্রেও একই বয়সের বয়োবৃদ্ধ তারা দেখা যায়। মনে হয়, ছায়াপথ তৈরির প্রক্রিয়া একই সময়ে শুরু হয়েছে। বিশ্ব যখন শীতল হতে থাকে এবং পদার্থ ঘনীভূত হয়ে নক্ষত্র তৈরি হতে থাকে তখনই ছায়াপথ আকার নিতে থাকে (ছায়াপথের বীজ বোধহয় আরো আগে উপ্ত হয়েছিল)। ছায়াপথের যে বিভিন্ন আকৃতি দেখা যায় সেটা হয়েছে নক্ষত্র তৈরিতে কিভাবে পদার্থ ব্যবহৃত হয়েছে তার উপর, বয়সের উপর নয়। উপবৃত্তাকার ছায়াপথের অধিকাংশ তারাই তৈরি হয়েছে প্রথম কয়েক বিলিয়ন বছরের মধ্যে। অন্যদিকে কুণ্ডলিত এবং অনিয়মিত ছায়াপথে তারা তৈরি প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত আছে।

দূরত্ব : আকাশগঙ্গা ছায়াপথের সবচেয়ে কাছের দুটি ছায়াপথ হচ্ছে বড় ও ছোট ম্যাজেলানিক মেঘ (Large ও Small Magellanic Clouds)। এ দুটি ছোট অনিয়মিত

ছায়াপথের দূরত্ব প্রায় ১.৫ লক্ষ আলোকবর্ষ (1.5×10^{5} কি.মি.)। এ দুটি উপছায়াপথকে (satellite galaxy) কেবল দক্ষিণাকাশেই দেখা যায়। এছাড়া আমাদের ছায়াপথের নিকটবর্তী বিশাল কুণ্ডলিত ছায়াপথ হচ্ছে M31 (অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথ)। রুবনা তা (অ্যান্ড্রোমিডা) মণ্ডলে এই ছায়াপথটি দেখা যায়। এছাড়া আমাদের স্থানীয় ছায়াপথগুচ্ছে আরো প্রায় ৩০টি ছায়াপথ আছে। 6×10^{7} আলোকবর্ষ (6×10^{23} কি.মি.) দূরে রয়েছে শত শত ছায়াপথ যাদের টেলিস্কোপের সাহায্য ছাড়া দেখা সম্ভব নয়। মেসিয়েরের বিখ্যাত তালিকায় এ রকম কয়েকটি ছায়াপথ লিপিবদ্ধ আছে (যেমন— M51, M81, M87)। কোমাস্তবকে আছে বিশাল ছায়াপথস্তবক। এর দূরত্ব 3×10^{8} আলোকবর্ষ এবং এটিই সবচেয়ে ভালো ভাবে দেখা ছায়াপথস্তবক। এ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে দূরবর্তী ছায়াপথের দূরত্ব হলো 10^{9} আলোকবর্ষ (10^{23} কি.মি.)।

৪.৬ ছায়াপথ কাঠামো ও তার ধর্ম

বহিস্থ ছায়াপথগুলোর ভৌত ধর্ম সম্পর্কে আমরা জেনেছি। এবার এদের কাঠামোগত (structural) ধর্ম সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

প্রায় সব ছায়াপথেরই বয়স্ক তারার একটি অংশ থাকে। একে বর্তুলাকার অংশ (spheroidal component) বলে। উপবৃত্তাকার ছায়াপথের পুরো কাঠামো জুড়েই বর্তুল অংশ উপস্থিত। কিন্তু কুণ্ডলিত ছায়াপথের ক্ষেত্রে মাত্র অর্ধাংশই বর্তুলীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত তথা বয়স্ক। অনিয়মিত ছায়াপথের ক্ষেত্রে এদের উপস্থিতি যথেষ্ট সন্দেহজনক এবং একেবারেই অনুপস্থিত বলে মনে হয়। বয়স্ক তারাদেরকে 'বর্তুলীয় অংশ' বলার কারণ এই যে এদেরকে প্রধানত ছায়াপথের কেন্দ্রের স্ফীত ও বৃত্তীয় অংশেই দেখা যায়। বর্তুলীয় অংশে তারাদের বিস্তৃতি সম্পর্কে পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ভিত্তিতে এক সেট সমীকরণ নির্ধারণ করা যায়। পর্যবেক্ষণের সাথে এসব সমীকরণের দীর্ঘপর্যায়ী পূর্বাভাস (prediction) মিলে যায়। আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো এই যে, উপবৃত্তাকার ছায়াপথ এবং কুণ্ডলিত ছায়াপথের বর্তুলীয় অংশের ঘূর্ণন হয় খুব ধীরে যেটা এদের চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়ার (flattening) প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করে না। অনেকে মনে করেন উপবৃত্তাকার ছায়াপথের ঘূর্ণন হয় বৃহদক্ষ বরাবর ডিম্বাকৃতির গোলক (prolate spheroid) হিসেবে।

বর্তুলীয় অংশ ছাড়াও আছে চাকতি অংশ (disc component)। খুব প্রাথমিক শ্রেণীর তথা বয়স্ক ছায়াপথ (SO, SBO, Sa, SBa) ব্যতিরেকে কুণ্ডলিত ও অনিয়মিত ছায়াপথদের ক্ষেত্রে নক্ষত্রদের একটি সমতল অংশ (flat component) দেখা যায় যারা ছায়াপথের অধিকাংশ উজ্জ্বলতার জন্য দায়ী। এই চাকতি অংশের পুরুত্ব এদের ব্যাসার্ধের এক পঞ্চমাংশের মতো হয়ে থাকে। এদের ক্ষেত্রে নক্ষত্রদের বিশেষ অরীয় বণ্টন (radial distribution) লক্ষ্য করা যায়। এই বণ্টন অনুসারে নক্ষত্রের সংখ্যা বাইরের দিকে সূচকীয় হারে কমে যায়। অর্থাৎ নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা $\log I = -kr$ সূত্রানুসারে হ্রাস পায় (এখানে I

হলো পৃষ্ঠ উজ্জ্বলতা, r কেন্দ্র থেকে দূরত্ব, k মাপ ধ্রুবক বা scaling constant)। এই মাপ ধ্রুবকটি ছায়াপথের শ্রেণী এবং অভ্যন্তরীণ উজ্জ্বলতার উপর নির্ভর করে।

ছায়াপথসমূহের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কাঠামো হলো কুণ্ডলিত বাহুনিচয় (spiral arm system)। কুণ্ডলিত বাহুদের গঠন নির্ভর করে ছায়াপথের শ্রেণীর উপর। সাধারণভাবে দেখা যায় হাবল শ্রেণীবিভাগের প্রথমদিকের ছায়াপথদের রয়েছে খুব কম পিচ্ কোণ বিশিষ্ট ক্ষীণ বাহুনিচয়। কিন্তু পরের দিকের ছায়াপথদের বাহুগুলো বেশ খানিকটা খোলামেলা থাকে। সকল ছায়াপথের ক্ষেত্রেই কুণ্ডলিত বাহুগুলো লগারিদমিক স্পাইরালের সূত্র মেনে চলে (অনুচ্ছেদ ৫.২ দ্রষ্টব্য)। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কুণ্ডলিত বাহুগুলো ছায়াপথের চারপাশে একাধিক পাক খেয়ে তারপর উন্মুক্ত হয়।

এরপর আসা যাক ছায়াপথসমূহে গ্যাসীয় পদার্থের বণ্টনের কথায়। রেডিও তরঙ্গদৈর্ঘ্যে যে গ্যাস শনাক্ত করা যায় তাহলো প্রশম হাইড্রোজেন পরমাণু। এরা মূল ছায়াপথের প্রায় দ্বিগুণ এলাকাব্যাপী ছড়িয়ে থাকে। অনেক সময়ে প্রশম হাইড্রোজেনের বিন্যাসের কেন্দ্রে একটি গহ্বর (hole) দেখা যায়। এখানে প্রশম H_2 এর কোনো উপস্থিতি দেখা যায় না। আণবিক হাইড্রোজেন শনাক্ত করা খুবই কঠিন। আণবিক H_2 অবশ্য কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি অন্যান্য মৌলের সাথে মিশে থাকে যাদের রেডিওতে শনাক্ত করা সহজ।

অ্যাংলো–অস্ট্রেলিয়ান মানমন্দিরের ডেভিড জে. ম্যালিনের প্রদর্শিত ফটোগ্রাফির বিশেষ পন্থা ব্যবহার করে এবং চার্জ–কাপ্‌লড ডিভাইসের (CCD) সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এমন অনেক ছায়াপথ খুঁজে পেয়েছেন যাদের পৃষ্ঠের উজ্জ্বলতা অনেক কম। এ রকম প্রায় ১০০০টিরও বেশি কম–পৃষ্ঠ–উজ্জ্বলতার ছায়াপথের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এ সমস্ত ছায়াপথের আকৃতি সাধারণ ছায়াপথের মতোই, এমনকি নক্ষত্রের সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ। তবে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় তাহলো এই কম পৃষ্ঠ–উজ্জ্বলতার ছায়াপথগুলি গড়পরতার ছায়াপথের তুলনায় আয়তনে অনেক বড় এবং একক আয়তনে নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক কম। সাধারণ কুণ্ডলিত ছায়াপথের কুণ্ডলিত বাহুতে সাধারণত নীল বর্ণের নবীন তারা দেখা যায় এবং এই অঞ্চলে নতুন নক্ষত্র সৃষ্টির প্রক্রিয়াও চালু থাকে। তবে কম উজ্জ্বল ছায়াপথের বাহুতে আরো অনেক বেশি গ্যাস থাকে এবং ফলত এদের ক্ষেত্রে বিবর্তন হয় চার থেকে পাঁচগুণ ধীরে। গবেষণা করে দেখা গেছে এ ধরনের ছায়াপথের সংখ্যা সাধারণ ছায়াপথসমষ্টির (general galaxy population) মোটামুটি ৫০ শতাংশ। কম পৃষ্ঠ–উজ্জ্বলতার ছায়াপথ ভারি পদার্থের (baryonic mass problem) সমস্যার সমাধান দিতে পারে। বিশ্বের পর্যবেক্ষিত হিলিয়ামের পরিমাণ নির্দেশ করে যে ছায়াপথসমূহে দৃষ্ট পরিমাণের তুলনায় আরো বেশি ব্যারিয়ন থাকা উচিত।

১৯৮৬ সালে আবিষ্কৃত হয় এ পর্যন্ত জানা সবচেয়ে বৃহৎ ছায়াপথ। এর নাম ম্যালিন-১। এটি আমাদের ছায়াপথের তুলনায় ২০গুণ বড় এবং ৮০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। একে যদি ২.৩ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথের স্থানে রাখা হতো তবে এটা

আকাশে ২০ ডিগ্রি পরিমাণ জায়গা দখল করত যা আকাশে চাঁদের ৪০গুণ। একই রকম বিশালাকৃতির আরেকটি ছায়াপথ হলো ম্যালিন-২ যা ১৯৯০ সালে আবিষ্কৃত হয় এবং দূরত্ব ৪৫০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। ম্যালিনের প্রদর্শিত পন্থায় এখন আরো অনেক ছায়াপথ দেখা যাচ্ছে যাদের পৃষ্ঠ উজ্জ্বলতা ২৭ ম্যাগনিচিউড প্রতি বর্গ আর্কসেকেন্ড। উজ্জ্বলতার এই মান রাতের পটভূমি আকাশের (background night sky) তুলনায় মাত্র ২% উজ্জ্বল। এ সমস্ত ছায়াপথ সাধারণভাবে কুণ্ডলিত ছায়াপথের ভর, আকৃতি এবং ঘূর্ণন গতিবেগ নির্দেশ করে।[২]

৪.৭ ছায়াপথের ভর ও দূরত্ব নির্ণয়

ছায়াপথের ভর ও দূরত্ব সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। ফলে ভর ও দূরত্ব সম্পর্কে আমাদের একটি প্রাথমিক ধারণা জন্মেছে। এবার আমরা দেখব ঠিক কি পদ্ধতিতে ভর ও দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। নভোবলবিদ্যার (celestial mechanics) এ এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

ভর : প্রথমে কুণ্ডলিত ছায়াপথের ভর নির্ণয়ের পদ্ধতি আমরা আলোচনা করব। কুণ্ডলিত ছায়াপথের রয়েছে সুনির্দিষ্ট এবং জোরালো ঘূর্ণন (পৃথকভাবে নক্ষত্রের চলন উপেক্ষণীয়)। দেখা গেছে কুণ্ডলিত ছায়াপথের তল বা ডিস্ক আমাদের দৃষ্টিরেখার (line of sight) সাথে একটা নির্দিষ্ট কোণে আনত থাকে। কাজেই ঐ দৃষ্টিরেখা বরাবর ঘূর্ণনের উপাংশই আমরা কেবল পরিমাপ করতে পারি। ডপলার সরণ ব্যবহার করে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে গতিবেগ নির্ণয় করা যায়। এইচ টু (H II) অঞ্চলের নিঃসরণ রেখা এবং সম্মিলিত তারার আলোর শোষণ রেখা ব্যবহার করে এই ডপলার সরণ নির্ণয় করা যায়। অবশ্য রেডিও তরঙ্গে ২১সে.মি. হাইড্রোজেন রেখাও এ কাজে ব্যবহৃত হয়। এখন ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ বল ছায়াপথের কেন্দ্রমুখী মহাকর্ষীয় আকর্ষণকে সুস্থিত রাখে। এভাবে ঘূর্ণনের গতিবেগ থেকে ভর নির্ণয় সম্ভব। অবশ্য ছায়াপথের তলস্থিত কোনো বিন্দুতে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ কেবল কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত পদার্থের উপর নির্ভর করে। ফলে দৃশ্যমান (সর্বাধিক) ব্যাসার্ধের বাইরের ভর সম্পর্কে আমাদের কেবল 'স্বজ্ঞাত অনুমান'ই করা চলে।

অন্যদিকে উপবৃত্তাকার ছায়াপথের ক্ষেত্রে ঘূর্ণনের মাধ্যমে ভর নির্ণয় সম্ভব নয়, কারণ ঘূর্ণন এখানে গৌণ। এক্ষেত্রে তারার সম্মিলিত আলোর (integrated starlight) শোষণ রেখা থেকে ডপলার সরণের মাধ্যমে নক্ষত্রসমূহের গতিশক্তি T নির্ধারণ করা যায়। এ থেকে ভর M বের করা যায়। এ কাজে কেন্দ্রীয় বলের অধীনে গতীয়মান বস্তুর জন্য প্রযোজ্য ভিরিয়াল উপপাদ্য (Virial theorem—ক্ল্যাসিকাল মেকানিক্সের যেকোনো বই দ্রষ্টব্য) ব্যবহার করতে হয়। এই উপপাদ্য অনুযায়ী : $V + 2T = 0$, যেখানে V হচ্ছে (ঋণাত্মক) বিভব শক্তি এবং

---

২. বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য "The Ghostliest Galaxies"—G.D. Bothun, *Scientific American*, February 1997।

T হচ্ছে গড় গতিশক্তি, N সংখ্যক পরস্পর মিথস্ক্রিয়ারত কণা যদি সুস্থিতিতে থাকে তবে ঐ কণা ব্যবস্থার ভিরিয়ালের সংজ্ঞা হলো : $W = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{F}_i.\mathbf{r}_i$; যেখানে $\mathbf{F}_i$ i তম কণার উপর নিট বল এবং $\mathbf{r}_i$ কণার অবস্থান ভেক্টর। ভিরিয়াল উপপাদ্য অনুযায়ী $2T + W = 0$। যদি নিট বল ব্যস্তবর্গীয় (inverse-square) হয় তবে দেখান যায় $W = V$। এভাবে দেখানো যায় সুষম, সমসত্ত্ব ছায়াপথের জন্য $V = \frac{3}{5}\frac{GM^2}{R}$ এবং $T = \frac{1}{2}M\bar{v}^2$ যেখানে M ছায়াপথের ভর, V মহাকর্ষীয় বিভব, $\bar{v}^2$ গড় বর্গবেগ। এভাবে ভিরিয়াল উপপাদ্য ব্যবহার করে ভরের জন্য লেখা হয় : $M = \frac{5}{3}\frac{R\,\bar{v}^2}{G}$। গড় বর্গবেগ বের করা হয় শোষণ রেখার ডপলার বিস্তার (Doppler spread) থেকে, দূরত্ব এবং কৌণিক আকার থেকে R বা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা হয়। কিন্তু উপবৃত্তাকার ছায়াপথ যদি আরো একটু বিস্তৃত এবং চ্যাপ্টা হয় (flattened) তাহলে ঘূর্ণন অক্ষ গৌণ ব্যাপার থাকে না। এজন্য আরো জটিল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

অনেক সময় জোড়াতারার মতো জোড়াছায়াপথও দেখা যায়। এক্ষেত্রে শুধুই কৌণিক পার্থক্য ছাড়া ভর বা কক্ষপথ কিছুই জানা যায় না। আবার অনেক সময় ছায়াপথ দুটো সত্যিকারের জোড় কিনা তা-ও বোঝা যায় না। এদের জন্য নানা পরোক্ষ উপায়ে ভর নির্ণয় করা হয়। বিশেষ করে E এবং S0 ছায়াপথের জন্য সরাসরি ভর নির্ণয় দুরূহ বিধায় এদের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যিক পদ্ধতি (statistical methods) ব্যবহার করা হয়।

দূরত্ব : ছায়াপথের দূরত্ব নির্ণয় একটি অতীব দুরূহ কাজ। এমনকি আমাদের নিকটবর্তী ছায়াপথদের দূরত্বেও ভুল আছে প্রায় ত্রিশ শতাংশ। দূরবর্তী ছায়াপথদের ক্ষেত্রে অবস্থা আরো নাজুক। এর কারণ হচ্ছে অতিদূর ছায়াপথদের যথেষ্ট সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

দূরবর্তী ছায়াপথদের ক্ষেত্রে অনেকগুলো পরস্পর নির্ভরশীল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথমত স্থানীয় ছায়াপথগুচ্ছের সদস্য হিসেবে কয়েকটি ছায়াপথের দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে লম্বন পদ্ধতির মাধ্যমে দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। এছাড়াও আরো অনেক পদ্ধতি আছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে দূরত্ব নির্ণয় করে তাদের মধ্যে তুলনা করা হয়। এরপর নিকটবর্তী ছায়াপথসমূহকে মানদণ্ড ধরে নিয়ে আরো দূরে অবস্থিত ছায়াপথের দূরত্ব পরিমাপ করা হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে মানদণ্ড স্থির করা হয় এবং এমন সব ছায়াপথের অসম্ভব দূরত্ব নির্ণয় করা যায় যাদের তারাগুলোকে ভালোমতো দেখাও যায় না। যদিও এক্ষেত্রে ভুলের হার অত্যন্ত বেশি (এমনকি নির্ণীত দূরত্ব দ্বিগুণও হতে পারে)।

স্থানীয় ছায়াপথগুচ্ছের সদস্যদের দূরত্ব পর্যায়-প্রভা সম্পর্ক (period-luminosity law) থেকে বের করা যায়। যেমন বড়ো ম্যাজেলানিক মেঘপুঞ্জে আছে প্রায় ৯০০০ সেফালী বিষমতারা। এভাবে এর দূরত্ব নির্ণয় করা গেছে ১.৫ লক্ষ আলোকবর্ষ। অন্যদিকে ফেসেদ

ছায়াপথ উপবৃত্তাকার তাদের কোনো শেফালী বিষমতারা (Cepheid variables) নেই। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় তারাসমষ্টির (পপুলেশন টু) তারা, যেমন RR Lyrae তারা, ব্যবহার করা হয়। এরাও বিশেষ ধরনের বিষমতারা। স্থানীয় ছায়াপথগুচ্ছের বাইরে কেবল M81 এবং ভাস্করমণ্ডলের (Sculptor group) ক্ষেত্রেই পর্যায় প্রভা সম্পর্ক ব্যবহার করে দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। এদের দূরত্ব যথাক্রমে ১০ এবং ১৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ।

পর্যায়-প্রভা সম্পর্ক ছাড়াও দূরত্ব নির্ণয়ের আরো পদ্ধতি আছে। ১৯৬০-এর দিকে বেশ জনপ্রিয় ছিল প্রধানধারায় সংযোজন (main-sequence fitting) পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি তারার তাপমাত্রা আমাদের ছায়াপথের তারাস্তবকে অবস্থিত অনুরূপ তারার তাপমাত্রার সাথে তুলনা করা হতো। অবশ্য এ পদ্ধতিতে লব্ধ দূরত্ব সবসময়ে পর্যায় প্রভা সম্পর্কের মাধ্যমে লব্ধ দূরত্ব থেকে ৩০/৪০ ভাগ কম হতো। দূরত্ব নির্ণয়ের আরো একটি পদ্ধতি হলো নব তারা বিস্ফোরণ (nova phenomenon) (অনুচ্ছেদ ৬.৫ দ্রষ্টব্য)। একটি তারা যখন নব তারায় পরিণত হয় তখনকার সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা এবং এই উজ্জ্বলতার ক্রমান্বয়ে হ্রাসের হার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এভাবে এরা দূরত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠী হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। দূরবর্তী ছায়াপথদের জন্য দূরত্ব নির্ণয়ের আরো যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় সেগুলো হলো : বৃহৎ এইচ-টু (H II) অঞ্চলের ব্যাস, সুপারনোভার দীপ্তি, বর্তুলাকার স্তবকের (globular clusters) প্রভা (luminosities) এবং নক্ষত্র ও আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসের ঘূর্ণন বেগ। প্রত্যেকটি পদ্ধতির আছে নিজস্ব দুর্বলতা। যেমন ছায়াপথের শ্রেণীভেদ, গঠনিক ভিন্নতা, প্রভা এসবের জন্য নানা প্রায়োগিক সমস্যা থাকে। এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে আলাদাভাবে দূরত্ব নির্ণয় করে ক্রস-নিরীক্ষণ (cross check) করা হয়। সুপারনোভার ক্ষেত্রে ধরা হয় যে এদের সর্বোচ্চ দীপ্তি সমান।

১০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষের চেয়ে দূরে অবস্থিত ছায়াপথদের জন্য বিশ্বের প্রসারণ সংক্রান্ত হাব্‌লের ধ্রুবক ব্যবহার করতে হয়। বিশ্বের প্রসারণের ফলে দূরবর্তী ছায়াপথদের একটি অরীয় গতিবেগ (radial velocity) থাকে। হাব্‌ল বিধি (অনুচ্ছেদ ৩.৩ দ্রষ্টব্য) প্রয়োগ করে এদের দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। স্থানীয় ছায়াপথগুচ্ছের নিকটবর্তী অঞ্চলে হাব্‌ল বিধি যথেষ্ট মাত্রায় রৈখিক, ফলে দূরত্ব মোটামুটি সঠিক হয়। তবে নিকটবর্তী ছায়াপথদের জন্য এ পদ্ধতি কার্যকর নয়। কারণ আমাদের স্থানীয় ছায়াপথগুচ্ছ আরো কয়েকটি ছায়াপথগুচ্ছকে সাথে নিয়ে কন্যা স্তবকের দিকে ধাবমান। ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলের গতিবেগ ক্ষেত্রটি (velocity field) যথেষ্ট সুষম নয় (distorted)। একইভাবে কয়েক বিলিয়ন আলোকবর্ষ উপরে অরীয় গতিবেগ দূরত্ব নির্ণয়ে যথেষ্ট নয়। কারণ সে ক্ষেত্রে সময়ের এতো বেশি পেছনে তাকানো হচ্ছে যে সন্দেহ হয় অতো দূরে হাব্‌ল বিধি কতোখানি রৈখিক ছিল। সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে কোনো স্তবকে অবস্থিত উজ্জ্বল (সাধারণত তৃতীয় উজ্জ্বল তারা) ছায়াপথসমূহের পরম উজ্জ্বলতা একই, কারণ জানা দূরত্বে অবস্থিত ছায়াপথ স্তবকে এ ঘটনাটি সত্য দেখা যায়। ফলে দূরবর্তী ছায়াপথদের আপাত উজ্জ্বলতা পরিমাপ করলে তাদের দূরত্ব নির্ণয় সম্ভব। এভাবে সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থিত ছায়াপথদের দূরত্ব জানা গেছে দশ বিলিয়ন আলোকবর্ষ।

অতীব দূরবর্তী ছায়াপথের দূরত্ব নির্ণয়ে সুপারনোভাও ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে type Ia। এসব সুপারনোভা ঠিক কতো সময় ধরে বিস্ফোরিত হয় সেটা জানা গেলে জ্যোতির্বিদরা এদের স্বকীয় উজ্জ্বলতা (intrinsic brightness) প্রায় ১২% সূক্ষ্মতায় পরিমাপ করতে পারেন। যেকোনো ছায়াপথে প্রতি ৩০০ বছরে একটি Ia ধরনের সুপারনোভা বিস্ফোরিত হয় ; কিন্তু আকাশে ছায়াপথের সংখ্যা এতো বেশি যে প্রতি মাসে অন্তত একটি এ ধরনের বিস্ফোরণ দেখা যায়। আকাশের একই অংশের সপ্তাহখানেক পরপর ছবি তুললে সহজেই সুপারনোভা খুঁজে পাওয়া যায়। আজকাল একাজে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের (HST) প্রয়োগ অনেক সূক্ষ্মতা এনে দিয়েছে। তাই ছায়াপথের দূরত্ব নির্ণয়ে সুপারনোভা নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। অতিসম্প্রতি সুপারনোভা সংক্রান্ত বেশ কিছু গবেষণা এমন ইঙ্গিত দিয়েছে বিশ্ব বোধহয় ক্রমবর্ধমান হারে প্রসারমান। কারণ ঐসব দৃষ্ট সুপারনোভাকে প্রত্যাশার তুলনায় অধিকতর ম্লান মনে হয়েছে।[৩]

সবশেষে আমরা আলোচনা করব অ্যালান স্যান্ডাজ ও গুস্তাফ ট্যামান কি করে হাব্‌ল ধ্রুবকের মান বের করেছিলেন। স্যান্ডাজ–ট্যামান প্রথমে ছায়াপথে অবস্থিত বৃহত্তম এইচ–টু (H II) অঞ্চলের ব্যাস বের করলেন শেফালী বিষমতারা ব্যবহার করে। মজার ব্যাপার হলো প্রায় সকল ছায়াপথেই এইচ–টু অঞ্চলের ব্যাস মোটামুটি ২৫ মেগাপারসেক। ফলে এদের দূরত্ব জানা যায়। এবার এইচ–টু অঞ্চলের দূরত্ব ব্যবহার করে ওরা Sc I ছায়াপথদের পরম উজ্জ্বলতা (abs. magnitude) বের করলেন। একই উজ্জ্বলতার সকল Sc I ছায়াপথের পরম উজ্জ্বলতা আবার একই। অতঃপর এ পদ্ধতিতে আরো দূরবর্তী Sc I ছায়াপথদের দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। এভাবে রক্তিমসরণ ও অরীয় গতিবেগের মধ্যের একটি সম্পর্ক (হাব্‌ল বিধি) প্রতিষ্ঠা সম্ভব যার থেকে অতি সহজেই হাব্‌ল ধ্রুবকের (H_0) মান বের করা যায়। ওরা এর মান পেয়েছিলেন ৫৫ ± ৫ কি.মি./সেকেন্ড/মেগাপারসেক। বর্তমানে যেসব মান পাওয়া গেছে সেগুলো এই মান থেকে অনেক বেশি (অনুচ্ছেদ ৩.৩ দ্রষ্টব্য)।

এভাবে ছায়াপথদের দূরত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতিটি এখনো সুসংজ্ঞায়িত হয়নি। বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছায়াপথের দূরত্ব নির্ণয় করে তাদের দূরত্ব তুলনা করে সঠিক মান গ্রহণ করা হয়। মহাকাশে স্থাপিত হাব্‌ল দুরবিন (HST) এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য ইতোমধ্যে করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

৪.৮ সক্রিয় ছায়াপথ কেন্দ্রীন (Active Galactic Nuclei)

এবার একটি বিশেষ ধরনের ছায়াপথের কথা আলোচনা করা হবে। বিশেষ কিছু ছায়াপথের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এদের কেন্দ্র পুরো ছায়াপথের তুলনায় বেশি সক্রিয় ও উজ্জ্বল। এদেরকে সক্রিয় ছায়াপথ কেন্দ্রীন বা অ্যাকটিভ গ্যালাক্‌টিক নিউক্লেই বলে। এদের কৌণিক ব্যাস

---

৩. সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য Hogan *et al* (1999) দ্রষ্টব্য।

০.০০১ আর্কসেকেন্ডের মতো হয়ে থাকে। রেডিও ছায়াপথদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সক্রিয় নিউক্লিয়াস দেখা যায়।

সাধারণত আকৃতিগতভাবে (morphologically) সক্রিয় ছায়াপথের সংজ্ঞা হলো : কোনো ছায়াপথকে তখনই N ছায়াপথ বলা হবে যখন এর কেন্দ্রের দীপ্তি সমগ্র ছায়াপথের দীপ্তির কাছাকাছি হয় এবং কেন্দ্রটিকে তারায় বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। আরেকটু বিস্তৃত, ব্যাখ্যাকারী সংজ্ঞা হলো : সক্রিয় ছায়াপথের কেন্দ্রের থাকে নক্ষত্রসদৃশ চেহারা (শর্ট এক্সপোজার ছবিতে), এদের তারায় বিশ্লেষণ সম্ভব নয় এবং এদের বর্ণালির থাকে নিরবচ্ছিন্ন রেখা যাদের উৎস অ-তাপীয় (non thermal)। এদের দৃশ্যমান উজ্জ্বলতাও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়। বর্ণালি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী নিঃসরণ রেখা সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। এদের ক্ষেত্রে চওড়া বামার অনুক্রম (Balmer Series) দেখা যায় যার উৎস সম্ভবত সিংক্রোটন বা বিপরীত কম্পটন ক্রিয়া।

১৯৪৩ সালে কার্ল সেফার্ট এমন কিছু ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করেন যাদের বর্ণালি অন্যান্য ছায়াপথ থেকে পৃথক এবং এদের কেন্দ্রটি বেশ উজ্জ্বল। বর্ণালির নিঃসরণ রেখার বামার অনুক্রম সুস্পষ্ট দেখা যায়। এদের কেন্দ্রটিও বিশ্লেষণযোগ্য নয়। এদের বলে সেফার্ট ছায়াপথ (Seyfert galaxies)। অন্যান্য ছায়াপথের বর্ণালিতেও চওড়া নিঃসরণ রেখা এবং সরু নিষিদ্ধ রেখা (forbidden lines) দেখা যায়, কিন্তু সক্রিয় ছায়াপথের সাথে এর পার্থক্য হলো এই যে সাধারণ ছায়াপথের কেন্দ্র তারায় বিশ্লেষণযোগ্য এবং বর্ণালিতে অ-তাপীয় নিরবচ্ছিন্ন রেখা থাকে না। সেফার্ট ছায়াপথ রেডিও সক্রিয় নয় এবং এক্স-রশ্মির মতো শক্তিশালী বিকিরণ এদের থেকে পাওয়া যায় না, অথচ অবলোহিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে এরা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং এর উৎস সিংক্রোট্রন বিকিরণ বলেই মনে করা হয়।

অনেক N ছায়াপথ আছে যাদের কেন্দ্র শক্তিশালী নিঃসরণ রেখা দেখায় না। তাই বলা যায়, সেফার্ট ছায়াপথ সংজ্ঞানুযায়ী N ছায়াপথ হলেও বিপরীতক্রমটি সত্য নয়। যেসব N ছায়াপথের কোনো শোষণ বা নিঃসরণ রেখা নেই তাদেরকে BL Lacartae Objects বা BL Lac বস্তু বলে। এরা হলো এমন সব ছায়াপথ-কেন্দ্রীন যাদের ফ্লাক্স পরিবর্তনশীল এবং শক্তিশালী ও দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাবর্তন (polarization) প্রদর্শন করে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এসব অদ্ভুত বস্তুর আড়ালে উপস্থিত ছায়াপথটিকে উপবৃত্তাকার বলেই মনে হয়েছে। এবং এভাবে ক্ষেত্রবিশেষে এদের দূরত্ব নির্ণয়ও সম্ভব হয়েছে।

সক্রিয় ছায়াপথ কেন্দ্রীনের প্রবল কার্যকলাপের (violent activity) সম্ভাব্য দুটি উৎস আছে। প্রথমত, প্রায় ১ মিলিয়ন সূর্যভরের একটি কৃষ্ণবিবরকে ঘিরে পদার্থের বিবৃদ্ধি চাকতি (accretion disk) এর উৎস। এই চাকতির ভেতরের উত্তপ্ততর অংশটি অতিবেগুনি এবং এক্স-রশ্মি তৈরি করে। এই রশ্মি পার্শ্ববর্তী গ্যাস কর্তৃক সামান্য পরিমাণে শোষিত হয়ে পুনরায় অতিবেগুনি ও দৃশ্যমান আলোয় বিকিরণ করে। এই চাকতি যতো উত্তপ্ত হয়, আশপাশের গ্যাসও ততোই উত্তপ্ত হতে থাকে (কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিন) এবং সেটা প্রসারিত হতে শুরু করে। এভাবে যে উজ্জ্বল উচ্চবেগসম্পন্ন অভিঘাত তরঙ্গের সৃষ্টি হয়

তার আকৃতি প্রায় ছায়াপথের সমান হয়ে যায় (কয়েক হাজার আলোকবর্ষ)। এ ধরনের বেশ কিছু ছায়াপথে ক্ষীণ রেডিও জেটও দেখা যায়। বিবৃদ্ধি চাকতির শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র এবং পদার্থ ও গ্যাসের অত্যুচ্চ বেগ এর কারণ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো ছায়াপথের ক্ষেত্রে এদের কেন্দ্রে দ্রুত তারা তৈরি হতে থাকে। অসংখ্য নতুন সৃষ্ট তারাদের থাকে শক্তিশালী নক্ষত্র বায়ু। এ সমস্ত নক্ষত্রের মৃত্যুতে সৃষ্টি হয় সুপারনোভা। এভাবে বিস্ফোরিত গ্যাস আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস ও ধূলিকণাকে কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিনে উত্তপ্ত করে। এই উত্তপ্ত গ্যাসের একটি বাবল বা বুদ্বুদ সৃষ্টি হয় (চাপজনিত কারণে)। এটি বাইরের দিকে প্রসারিত হতে থাকে। বাইরের শীতল গ্যাস ও ধূলিকণার সাথে এর মিলনের ফলে এর গতিবেগ কমতে থাকে। যদি যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি ঐ বুদ্বুদের বিবরে (cavity) প্রবেশ করে তবে স্বভাবতই তা প্রচণ্ড বেগে ছায়াপথ থেকে বাইরের দিকে ধাবিত হয়।

কোন ছায়াপথে কোন প্রক্রিয়া সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তা জানা সম্ভব এই দুই প্রক্রিয়ার কিছু পদ্ধতিগত পার্থক্য থেকে। কৃষ্ণবিবর মডেলে ১০% আপতিত পদার্থ শক্তিতে পরিণত হয়; কিন্তু নক্ষত্র বিস্ফোরণে মাত্র ০.১% বিক্রিয়াকারী পদার্থ শক্তিতে পরিণত হয়। চৌম্বক ক্ষেত্র এবং ঘন বিবৃদ্ধির চাকতির উপস্থিতির ফলে কণাদের উচ্চবেগ থাকে এবং এজন্য শক্তিশালী এক্স ও গামা রশ্মি নির্গত হয়। কিন্তু নক্ষত্র বিস্ফোরণে এক্স-রে এর চেয়ে শক্তিশালী বিকিরণ পাওয়া যায় না, কারণ অভিঘাত তরঙ্গের সংঘর্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে না। তৃতীয়ত, কৃষ্ণবিবর মডেলে একটি ক্ষীণ রেডিও জেট দেখা যায়। সব সময়ে যে সক্রিয় ছায়াপথের সক্রিয়তার জন্য একটি মাত্র পদ্ধতি দায়ী তা কিন্তু নয়। অনেক সময়ে দেখা গেছে, কোনো কোনো ছায়াপথের (যেমন M82) ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতিই উপস্থিত। যাহোক সক্রিয় ছায়াপথের মূল ইঞ্জিনের কার্যকারিতা জানা গেলেও কি কারণে এই পরিস্থিতির উদ্ভব তা জ্যোতির্বিদরা এখনো ঠিক ধরতে পারেননি। কৃষ্ণবিবর আগে তৈরি হয় নাকি কেন্দ্রীয় নক্ষত্রের বিস্ফোরণ আগে শুরু হয় তাও জানা যায় না। বলা হচ্ছে, সক্রিয় ছায়াপথে প্রথমে ঘটেছিল নক্ষত্র বিস্ফোরণ ক্রিয়া, তারপর এসব নক্ষত্রের অবশেষ কৃষ্ণবিবরসমূহ মিলিত হয়ে কেন্দ্রীয় বৃহৎ কৃষ্ণবিবরটি তৈরি করে। এ সম্বন্ধে শেষ কথা এখুনি বলা সম্ভব নয়। প্রয়োজন আরো বেশি তথ্য ও গবেষণার।

এক্স-রে ছায়াপথ : যেহেতু সিংক্রোট্রন বিকিরণ সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বিকিরণ করে তাই এক্স-রে তরঙ্গদৈর্ঘ্যেও বেশ কিছু ক্রিয়াশীল ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য বায়ুমণ্ডলের শোষণের কারণে এক্স রশ্মির পর্যবেক্ষণ উচ্চাকাশে বা মহাশূন্যে করতে হয়। আকাশের অনেক রেডিও ছায়াপথকে এক্স-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যে পর্যবেক্ষণ করা যায়। অনেক ছায়াপথস্তবকের বিস্তৃত উত্তপ্ত গ্যাস সমৃদ্ধ আন্তঃছায়াপথীয় মেঘ এক্স-রশ্মি বিকিরণ করে। অনেক সক্রিয় রেডিও ছায়াপথ তার চারপাশের শীতলতর, অপেক্ষাকৃত স্থির আন্তঃছায়াপথের মেঘের সাথে বিক্রিয়া করে। ফলে একটি উজ্জ্বল উৎস ও তার পেছনে দীর্ঘ লেজ দেখা যায়। এদের Head-tail galaxies বলে।

৪.৯ রেডিও ছায়াপথ

ছায়াপথ শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে রেডিও তরঙ্গ নিঃসরণের উপর নির্ভর করে ছায়াপথের শ্রেণীভেদ করা হয়েছে। আমরা এখন এমন রেডিও ছায়াপথ (radio galaxies) নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

পৃথিবী থেকে বিদ্যুৎ চুম্বকে বর্ণালির রেডিও তরঙ্গ অঞ্চলে ১ গিগাহার্টজ (300GHz) থেকে ১০ মেগাহার্টজ (10MHz) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেতারীয় কম্পাংক দেখা হয়েছে। মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। প্রথম ১৯৩৩ সালে কার্ল জান্‌স্কি (Karl Jansky) রেডিও পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞান উন্নতি করতে শুরু করে। কারণ যুদ্ধকালীন সময়ে রেডার প্রযুক্তির যে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল সেটিকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানে কাজে লাগানো হলো। বর্তমানে রেডিও পর্যবেক্ষণ জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে

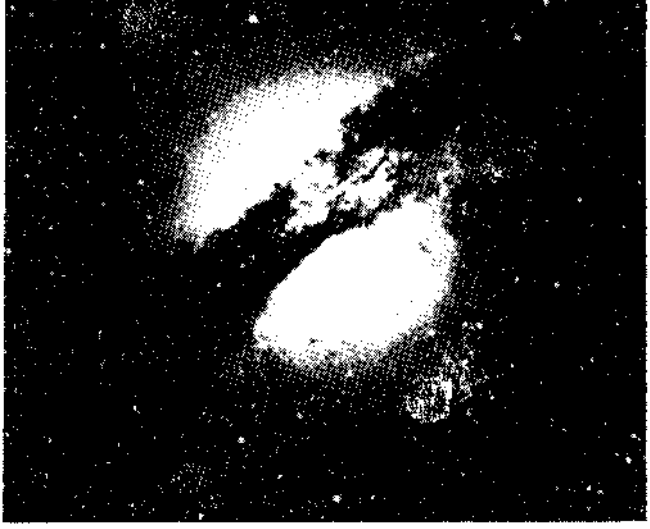

চিত্র ৪.৭ : সেন্টারাস-A

দাঁড়িয়েছে। আসলে মহাকাশের প্রায় প্রতিটি বস্তুই কমবেশি রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করে যেমন- ছায়াপথ, কোয়েসার, নক্ষত্র ইত্যাদি। ছায়াপথসমূহের মধ্যে কুণ্ডলিত ছায়াপথের রেডিও নিঃসরণ খুবই দুর্বল। অথচ এ পর্যন্ত যতো রেডিও ছায়াপথ পাওয়া গেছে তাদেরকেই উপবৃত্তাকার ছায়াপথ।

কোনো রেডিও থেকে নিঃসৃত শক্তির পরিমাণ খুবই নগণ্য। যেমন ১০০ মিটার ব্যাসের একটি রেডিও টেলিস্কোপ ১ বছরে 50MHz ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে একটি তীব্র রেডিও উৎস থেকে, যার ফ্লাক্স ঘনত্ব ১০০০ জানস্কি, মাত্র $১০^{-৩}$ ক্যালরি শক্তি গ্রহণ করে। মজার ব্যাপার হলো এই শক্তি দিয়ে ১ গ্রাম পানির তাপমাত্রা মাত্র ০.০০১° সেন্টিগ্রেড বাড়ানো যায়। আরো মজার ব্যাপার হলো অধিকাংশ রেডিও উৎসের ফ্লাক্স ঘনত্ব ১ জানস্কিরও কম ($১০^{-২৬}$ ওয়াট মিটার$^{-২}$–হার্জ$^{-১}$)।

এছাড়াও রেডিও উৎসকে একটি দৃশ্যমান বস্তুর সাথে একত্র করে তার দূরত্ব নির্ণয় করতে হয়। তাই এমন সব রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহার করতে হবে যাদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা (resolution power) ১০ আর্কসেকেন্ডের কম। এজন্য আজকাল রেডিও ছায়াপথদের VLA (Very Large Array)-এর মতো খুব বড় ও শক্তিশালী ইন্টারফেরোমিটার দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এখনকার রেডিও ইন্টারফেরোমিটারদের ভিত্তিরেখা (base line) ৯০০০ কি.মি. এর মতো সুদীর্ঘ হতে পারে। ষাটের দশকে যখন বড় ইন্টারফেরোমিটার তৈরি হয়নি তখন রেডিও ছায়াপথদের অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চাঁদ কর্তৃক এদের অদৃশ্যকরণের (occultation) উপর নির্ভর করা হতো।

এতো গেল পর্যবেক্ষণের কথা, এবার ভৌত প্রকৃতির কথায় আসা যাক। দেখা যায় রেডিও ছায়াপথের রেডিও নিঃসরণ ঘটে ছায়াপথের বহিস্থ দুটি অঞ্চল থেকে—এদের বলা হয় লোব (lobe)। অধিকাংশ রেডিও ছায়াপথেরই দুই লোববিশিষ্ট কাঠামো (double-lobed structure) আছে। এই লোব দুটি সাধারণত কেন্দ্রীয় ছায়াপথের দুই বিপরীত পাশে প্রতিসমভাবে অবস্থান করে। এই দুই লোবের রেডিও নিঃসরণ তীব্র থাকে এবং এদের ঠিক মাঝখানে দুর্বল একটি রেডিও উৎস থাকে যেটি মূল ছায়াপথের কেন্দ্র নির্দেশ করে। অর্থাৎ মূল ছায়াপথের কেন্দ্রও সক্রিয় (active) এবং একে ঘন রেডিও উৎস (compact radio source) বলে। ছায়াপথের বহিস্থ এই লোব দুটির আয়তন মূল ছায়াপথের তুলনায় অনেকগুণ বড় হয়। যেমন 3C 236 নামের রেডিও ছায়াপথের লোব দুটি মহাবিশ্বের বিস্তৃততম লোব এবং এদের আয়তন $১০^{৬৭}$ ঘনমিটার যা মূল ছায়াপথের ৬০০০গুণ (প্রচলিত মতে অবশ্য যে সমস্ত রেডিও ছায়াপথের রৈখিক আকৃতি ০.১ কিলোপারসেকের বেশি তাদের বিস্তৃত বা এক্সটেন্ডেড রেডিও উৎস বলে)।

রেডিও ছায়াপথের লোব হচ্ছে চুম্বকায়িত প্লাজমার আধার যেখানে কণিকাসমূহের বিশেষ করে ইলেকট্রনের গতি আলোর গতির কাছাকাছি। এই চুম্বকক্ষেত্রে বলরেখা বরাবর স্প্রিঙের মতো প্যাঁচানো গতিপথে প্রায় আলোর বেগে ধাবমান ইলেকট্রন বিকিরণ নিঃসরণ করে। একে সিংক্রোট্রন (synchrotron) বিকিরণ বলে। ১৯৫০ সালে ভিটালি গিঞ্জবার্গ ও জোসেফ শ্ক্লোভ্স্কি প্রমাণ করেন যে রেডিও ছায়াপথের বিকিরণ সিংক্রোট্রন প্রকৃতির। এ সমস্ত প্লাজমার উপস্থিতি প্রমাণ করে যে রেডিও ছায়াপথে প্রতিনিয়ত চলছে

প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া (violent activities)। আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো এই যে রেডিও ছায়াপথের দুটি লোব থেকে কেন্দ্রের দিকে একটি জেট (jet) দেখা যায়। আসলে রেডিও ছায়াপথের প্রকৃত ঘটনা জানতে হলে আমাদেরকে এর প্লাজমার চৌম্বক প্রাবল্য (magnetic intensity), এদের অভ্যন্তরীণ গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। কিন্তু বর্তমানে এ সম্পর্কে সামান্যই তথ্য পাওয়া গেছে (চিত্র ৪.৮)।

আকাশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রেডিও ছায়াপথ হলো : Centaurus A, Cygnus A, Fornax A, Virgo A ইত্যাদি। প্রথম আবিষ্কৃত রেডিও ছায়াপথ হলো সিগনাস এ। এখানে সুপরিচিত কিছু রেডিও ছায়াপথের তালিকা দেয়া হলো :

নাম	বর্ণনা	রেডিও দীপ্তি (আর্গ/সে.)	রেডিও ব্যাসার্ধ	দৃশ্যমান ব্যাসার্ধ	দূরত্ব (মিলিয়ন আলোবর্ষ)
ভার্গো-এ (M87)	উপবৃত্তাকার ছায়াপথ এবং কেন্দ্র থেকে জেট আছে	৫×১০^{৪১}	১০′	১০′	৫০
ফরনাক্স-এ (NGC1316)	SO ছায়াপথ যার ধূলিমেঘ আছে	৬×১০^{৪১}	৩০′ (দ্বৈত)	১৫′	৫০
সেন্টরাস-এ (NGC5128)	বিচিত্র কুণ্ডল (peculiar spiral)	৮×১০^{৪১}	১০° (বহুলোব বিশিষ্ট)	২০′	১৫
সিগনাস-এ	দ্বৈত বা জোড়া ছায়াপথ	৫×১০^{৪৪}	১৩৬″ (জোড়া লোব)	২″	৭১০
হারকিউলিস-এ	ধূলিসমৃদ্ধ বিশাল SO ছায়াপথ	১.৫×১০^{৪৪}	১১০″ (ঐ)	০″.২	২০০০
হাইড্রা-এ	বিশাল SO ছায়াপথ	২×১০^{৪৩}	৫০″	০″.৫	৬৮০
পারসিয়াস-এ (NGC1275)	জটিল SO ছায়াপথ	$১০^{৪২}$	৪ (কেন্দ্রের ১০″)	২′	২৩০

একটি বিখ্যাত রেডিও ছায়াপথ হলো সেন্টরাস–এ (চিত্র ৪.৭)। এটি একটি উপবৃত্তাকার ছায়াপথ যার মাঝ বরাবর অত্যন্ত ঘন ধূলির মেঘ আছে বলে মনে হয়। ধূলিমেঘসমৃদ্ধ উপবৃত্তাকার ছায়াপথ সাধারণত রেডিও নিঃসরণ করে থাকে। এর কেন্দ্রে নতুন তারা সৃষ্টি হচ্ছে। সাধারণভাবে রেডিও উৎসের অক্ষ ছায়াপথের চাকতির (disk) উপর লম্ব হয়। সেন্টরাসের ক্ষেত্রেও এটা দেখা যায়। সেন্টরাস–এ এর দুটি বিস্তৃত লোব (আকাশে এর বিস্তৃতি ৫°–৮°) ছাড়াও আরো দুটি ক্ষুদ্র রেডিও নিঃসারক (emitter) আছে যা মাঝের কালো, ধূলি সমৃদ্ধ, চওড়া ব্যান্ডের উভয় পাশে প্রতিসমভাবে অবস্থিত।

রেডিও ছায়াপথের রেডিও নিঃসরণ সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব আছে। কারো মতে ছায়াপথস্তবকের অন্তর্ভুক্ত একাধিক ছায়াপথের সংঘর্ষের ফলে রেডিও নিঃসরণ হতে পারে।

কিন্তু অনেক রেডিও ছায়াপথের দৃশ্যমান অংশে (optical image) সে রকম কিছুর আলামত দেখা যায় না। তাছাড়া সংঘর্ষ দুই লোববিশিষ্ট কাঠামো এবং সিংক্রোট্রন বিকিরণের জন্ম দেবে না। এ ছাড়াও আরো মডেল প্রস্তাব করা হয়েছে। এক মডেলে বলা হয়েছে যে সুপারনোভা বিস্ফোরণের শৃংখল রেডিও নিঃসরণের কারণ হতে পারে। এই মডেল অনুযায়ী ছায়াপথের ঘন কেন্দ্রীয় অঞ্চলে কোনো একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ কাছাকাছি অন্যান্য তারার সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে একটি শৃংখল স্থাপিত হয় যার ফলে একের পর এক সুপারনোভা

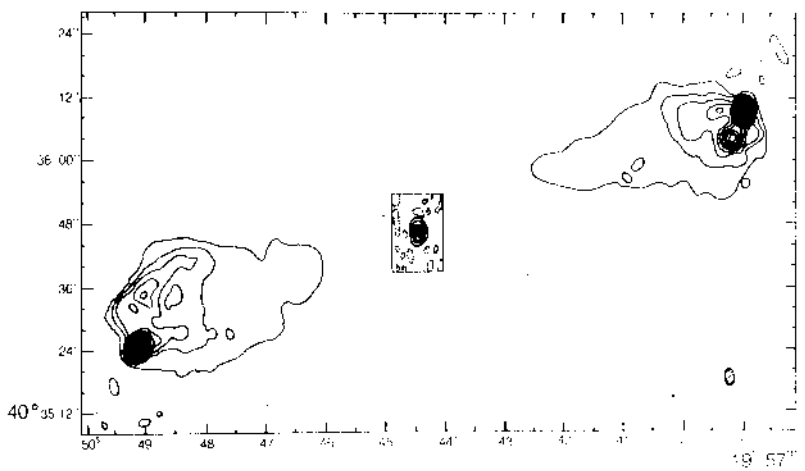

চিত্র ৪.৮ : সিগনাস-এ রেডিও ছায়াপথের ম্যাপ। রেডিও ছায়াপথের দুই পশ্চীয়-লোবের বেতার নিঃসরণের ইন্টেন্সিটি কন্টোর দেখা যাচ্ছে। মাঝখানে ছায়াপথটির দৃশ্যমান অংশ।

বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে শক্তির নিঃসরণ সবদিকেই হবে এবং দুইলোব থাকার কথা না। এছাড়া এল. এম. ওজারনয় কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং ফিলিপ মরিসন কর্তৃক সংশোধিত একটি মডেল অনুযায়ী ছায়াপথের কেন্দ্রে ১০^{8} থেকে সূর্যভরের একটি ঘূর্ণায়মান অংশ থাকে যাকে স্পিনার (spinar) বলে। ছায়াপথের বাইরের অংশের সাথে এই ঘূর্ণায়মান অংশের চৌম্বক মিথস্ক্রিয়ার দরুন রেডিও নিঃসরণ ঘটতে পারে। মার্টিন রীজের মতে ঘূর্ণন অক্ষের দুই মেরু বরাবর উচ্চশক্তির প্লাজমা বিকিরণ আকারে এই শক্তি নিঃসৃত হতে পারে। স্পিনার নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্লাজমা ও শক্তি বিকিরণ করে চলে। স্পিনার হিসেবে ঘূর্ণায়মান, চুম্বকায়িত কৃষ্ণবিবর থাকারও সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রে উত্তপ্ত প্লাজমার উৎস এখনো হেয়ালিই বটে।

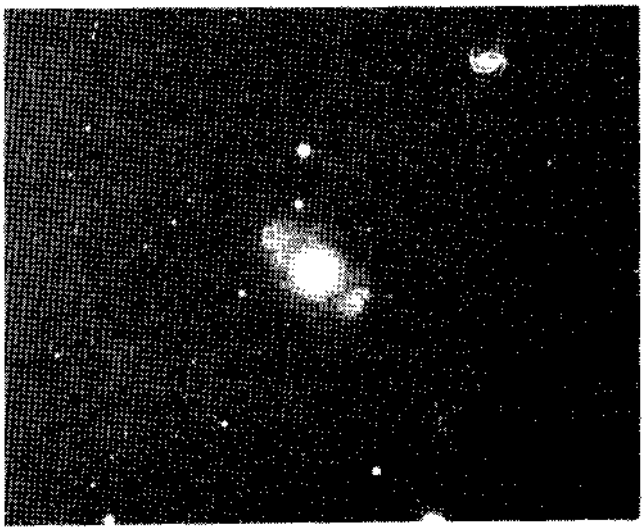

চিত্র ৪.৯ : সেফার্ট ছায়াপথ : NGC4151

৪.১০ 'দূরান্তের দীপ্তি' কোয়েসার

মহাবিশ্বের অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তুদের অন্যতম হলো কোয়েসার। এটি Quasi Stellar Radio Sources শব্দগুচ্ছের সংক্ষিপ্ত রূপ (Quasar)। মূলত এরা হচ্ছে নক্ষত্রের মতো বিন্দু রেডিও উৎস কিন্তু পরে এমন বহু কোয়েসার পাওয়া গেছে যারা রেডিও সক্রিয় নয়। তাই সাধারণভাবে এদেরকে Quasi Stellar Objects বা QSO বলে। এদের কৌণিক ব্যাস ১" এর কম। তাই পৃথিবী থেকে প্রাপ্ত আলোকচিত্রে এদের নক্ষত্রের মতোই অবিশ্লেষিত অবস্থায় দেখা যায়। রেডিও ছায়াপথের সাথে এর সাদৃশ্য হচ্ছে এই যে উভয়েরই রেডিও নিঃসরণ আছে; কিন্তু পার্থক্য হলো রেডিও ছায়াপথের একটি বিস্তৃত থাকে (extended object) অথচ কোয়েসার নক্ষত্র সদৃশ প্রতিকৃতি (starlike images) দেখায় (চিত্র ৪.১০)।

১৯৬১ সালে কোয়েসার আবিষ্কৃত হয়। দেখা গেল যে আকাশের অতি ক্ষুদ্র একটি এলাকা থেকে শক্তিশালী রেডিও বিকিরণ আসছে। অথচ আলোকচিত্রে ঐ স্থানে রয়েছে একটি নক্ষত্রসদৃশ বস্তু। কয়েক আর্ক সেকেন্ডের মধ্যে রেডিও নিঃসরণ ইন্টারফেরোমিটার

অথবা ভেরি লং-বেইসলাইন ইন্টারফেরোমেট্রি (VLBI) ব্যবহার করে রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব। কখনো কখনো আকাশের কোনো রেডিও উৎসের সামনে দিয়ে চাঁদ গমন করে এবং একে অদৃশ্য করে দেয় (occultation) ; আবার চাঁদের পেছন দিক থেকে কয়েক মিনিট পর রেডিও নিঃসরণ পাওয়া যায়। রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে এই দুই সময়কার চাঁদের সংশ্লিষ্ট ধারের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। তারপর জটিল হিসাবের মাধ্যমে রেডিও উৎসের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। ১৯৬৩ সালে মার্টিন শ্মীড 3C 273 নামের কোয়েসারটির নিঃসরণ রেখার সুন্দর ব্যাখ্যা দেন এই বলে যে এর $z = 0.16$ অর্থাৎ এর রক্তিমসরণ ১৬%। এই বিপুল রক্তিমসরণ কেবল অত্যন্ত দূরবর্তী ছায়াপথের পক্ষে সম্ভব। তাছাড়া এটি দেখতে ঠিক নক্ষত্রের মতো। এর দূরত্ব যদি কয়েক হাজার মিলিয়ন আলোকবর্ষ হয়ে থাকে তাহলে সাধারণ নক্ষত্র অপেক্ষা $১০^{১২}$ গুণ বেশি উজ্জ্বল হতে পারে। আসলে এর দূরত্ব ২ বিলিয়ন আলোকবর্ষ।

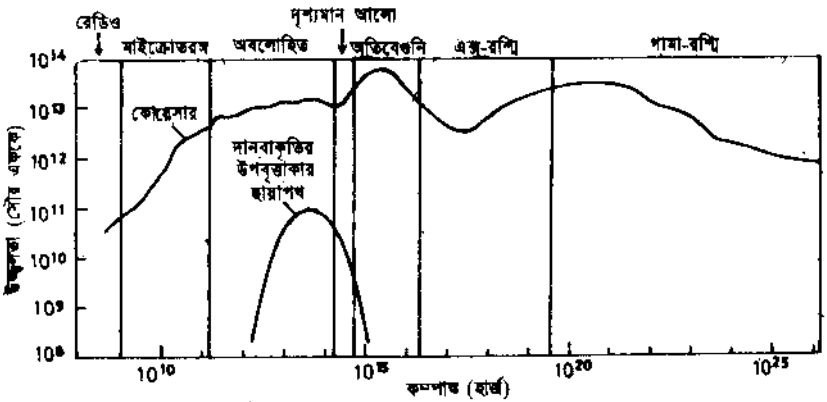

চিত্র ৪.১০ : 3C 273 কোয়েসারের বর্ণালি। একটি সাধারণ দানবাকৃতির উপবৃত্তাকার ছায়াপথের তুলনায় এর বর্ণালি অধিকতর চওড়া। লক্ষণীয় যে, দৃশ্যমান আলোয় কোয়েসারের উজ্জ্বলতা ছায়াপথের তুলনায় কয়েকশ' গুণ বেশি।

বিস্ময়কর সব ধর্ম : কোয়েসারের রয়েছে বিচিত্র সব ধর্ম। এর আকৃতি গবেষণা করে দেখা গেছে যে তা মাত্র ১ বা ২ আলোকবর্ষ চওড়া। কারণ কোয়েসারের দৃশ্যমান আলোর মধ্যে বিষমতা (variable) দেখা যায় ১/২ বছরে। আবার এর এক্স-রশ্মির বিকিরণেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিষমতা দেখা যায়। এসব থেকেই ধারণা করা হয় এদের আকৃতি খুবই ছোট, কারণ এমন সুন্দর সংনমিত বিচলন (coherent fluctuation) ঘটানো ফোটন ছাড়া আর কোরো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ কোয়েসারের সকল প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ থাকা চাই এই বিষমতা ঘটানোর জন্য ; যেহেতু আলোর চেয়ে বেশি বেগে কিছুই যেতে পারে না কাজেই এতো দ্রুত বিষমতা ঘটাতে হলে ফোটনের নিশ্চয় কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। সোজা

কথায়, কোয়েসার প্রায় $১০^{১২}$ সূর্যের সমান শক্তি নির্গমন করছে অথচ এর আকৃতি মাত্র সৌরজগতের সমান। অর্থাৎ কোয়েসারের মধ্যে এমন একটি অংশ আছে যার ব্যাস মাত্র $১০^{৯}$ কি.মি.। কোয়েসারদের রয়েছে নির্গমন রেখা যারা খুব বেশি পরিমাণ রক্তিমসরণ প্রদর্শন করে। এছাড়া সরু শোষণ রেখাও দেখা যায়। কোয়েসারের এই শক্তিশালী অনাক্ষত্রিক (nonstellar) আলোকে যদি কোনোভাবে ঢেকে দেওয়া যায় তাহলে কোয়েসারের চারপাশে একটি অস্পষ্ট কুয়াশামতো অংশ (fuzzy haze) দেখা যায়। এই আলোকে বিশ্লেষণ করলে তার বর্ণ ও বর্ণালি কোনো দানবাকৃতির ছায়াপথের মতোই দেখায়। তাই মনে হয় কোয়েসার আসলে কোনো সাধারণ ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অতি সক্রিয়তাজনিত ঘটনা। যেমন অনেক উপবৃত্তাকার ছায়াপথের রেডিও নিঃসরণ পাওয়া যায়। কোয়েসারের সাথে সাদৃশ্য আছে এমন কিছু বস্তু হলো : N ছায়াপথ, সেফার্ট এবং বিএল ল্যাকারটাই বস্তু (BL Lacartae objects)। কিন্তু এদের কারোরই বিপুল রক্তিমসরণ নেই। অনেক কোয়েসারের আবার সুনির্দিষ্ট জেট দেখা যায়। যেমন 3C 273 এর ২০″ লম্বা জেট আছে। রেডিও সক্রিয় কোয়েসারের রেডিও ছায়াপথের মতো দুই-লোব কাঠামো আছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ কোয়েসার আবিষ্কৃত হয়েছে। PC1247+3406 নামের কোয়েসারটির রক্তিমসরণ সর্বাধিক (z=4.897) অর্থাৎ এটি আলোর দ্রুতির ৯৪% বেগে চলছে। অনেকের মতে আদিতে সারা বিশ্বে এক সময় প্রায় মিলিয়ন কোয়েসার ছিল। কিন্তু এদের শক্তি নিঃসরণের পরিমাণ এতো বেশি যে বর্তমানে মাত্র বোধহয় ৩৫০০০ কোয়েসার আছে, বাকিগুলো আর কোয়েসার নেই। আরেকটি বিষয়, মহাবিশ্বকে যতো গভীরতায় পর্যবেক্ষণ করা যায় ততো বেশি কোয়েসার দেখা যায়। তাই মনে হয় কোয়েসার আদিম বিশ্বেই বেশি ছিল এবং সময়ের সাথে বিশ্বের পরিবর্তনের এ এক প্রমাণও বটে। কোয়েসার কর্তৃক নিঃসৃত রেডিও বিকিরণের শক্তি হলো $১০^{৩৮}$ থেকে $১০^{৪১}$ ওয়াট (যেখানে আমাদের ছায়াপথের বিকিরণ মাত্র $১০^{৩৭}$ ওয়াট)।

কোয়েসারের বিতর্কিত রক্তিমসরণ : কোয়েসারের রক্তিমসরণের সম্ভাব্য কারণ ডপলার ক্রিয়া। সাধারণ ডপলার ক্রিয়া হলো $z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{v}{c}$। যদি $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = ৩.৭৮$ হয় তাহলে দেখা যায় কোয়েসারের বেগ আলোর বেগের ৩.৭৮ গুণ। কিন্তু আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব অনুযায়ী তা অসম্ভব। কাজেই এক্ষেত্রে প্রয়োজন আপেক্ষিকতত্ত্বীয় সংশোধনের। সঠিক আপেক্ষিক তত্ত্বীয় সূত্রটি হলো : $z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \sqrt{\frac{1+\frac{v}{c}}{1-\frac{v}{c}}}$ । এখান থেকে $z = ৩.৭৮$ বসালে পাওয়া যায় $v = 0.92c$। অর্থাৎ কোয়েসারটি আলোর বেগের ০.৯২ গুণ বেগে আমাদের থেকে দূরেও সরে যাচ্ছে। এখন H এর মান ৯০ কি.মি./সে./মেগাপারসেক হলে $d = \frac{v}{H} = 12$ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। অর্থাৎ কোয়েসারের

আলো বিশ্বের বর্তমান বয়সের প্রায় ২/৩ গুণ দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে কোয়েসার আমাদের থেকে বহুদূরে অবস্থিত এবং তাই প্রসারণের কারণে বিপুল রক্তিমসরণ দেখাচ্ছে। এটাই ডপলার ক্রিয়ার মহাজাগতিক উৎস (cosmological origin)। কিন্তু অনেকেই এতে সন্তুষ্ট নন। একমতে এই ডপলার ক্রিয়া মহাকর্ষের কারণে উদ্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ কোয়েসার এতো ভারি যে এর পৃষ্ঠ থেকে আলো বিশাল সরণ ঘটিয়ে নিঃসৃত হয়। কিন্তু হিসাব করে দেখান যায় যে এতো ভারি হলে মহাকর্ষীয় পতন ঠেকানো অসম্ভব, আর তাছাড়াও খুব ঘন হলে এর নিঃসরণ রেখা আরো চওড়া এবং আনুষঙ্গিক আরো কিছু ধর্ম দেখাবে যা কোয়েসারে দেখা যায় না। দ্বিতীয় মতে বলা হয়েছে যে কোয়েসার আসলে আমাদের নিকটবর্তী বস্তু কিন্তু খুব দ্রুতবেগে অপসৃয়মান। অনেকে বলেন ছায়াপথ থেকে বিস্ফোরণের ফলে এদের জন্ম। কিন্তু সেক্ষেত্রে বলা যায় যে অন্তত কিছু কোয়েসার থাকবে যারা আমাদের দিকে গতীয়মান হবে এবং ফলে নীলসরণ দেখাবে। কিন্তু সব কোয়েসারই রক্তিমসরণ দেখায়। অবশ্য একথা বলা যায় যে ছায়াপথ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনাটি অনেক আগেই ঘটেছে এবং সব কোয়েসার এখন আমাদের থেকে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত। সর্বশেষ সম্ভাবনা এই যে এই অদ্ভুত রক্তিমসরণের উৎস একেবারেই অজানা কোনো আইন মেনে চলে।

কিন্তু কোয়েসারদের রক্তিমসরণের উৎস যে মহাজাগতিক রক্তিমসরণ তার অবশ্য কিছু প্রমাণও আছে। যেমন দূরত্বের সাথে সাথে কোয়েসারদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া BL Lac নামক বস্তুটিও বেশ উৎসাহব্যঞ্জক এই বস্তুটির সাথে কোয়েসারের রক্তিমসরণ ছাড়া অন্যান্য ভৌত ধর্মের অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন রেডিও নিঃসরণ, বিষম উজ্জ্বলতা, অত্যুজ্জ্বলতা ইত্যাদি। কিন্তু কোয়েসারদের তুলনায় এরা নিকটবর্তী। তাই এদের নিকটবর্তী কোয়েসার বলা হয়। এরা হাব্‌ল বিধি মেনে চলে। তাই মনে করা যেতে পারে যে কোয়েসারদের ক্ষেত্রেও হাব্‌ল বিধি অনুসৃত হয়। তাছাড়া কম রক্তিমসরণের কোয়েসারও আবিষ্কৃত হয়েছে (QSO 0241+622)। এটি মাত্র ৮০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। কাজেই কোয়েসারদের ডপলার ক্রিয়া মহাজাগতিক কারণেই উদ্ভূত একথা মনে করার অন্তত কোনো জোরালো বিরোধ নেই।

১৯৭৯ সালে প্রথম একই কোয়েসারের দুটি খুব কাছাকাছি প্রতিবিম্ব পাওয়া গেল। কিন্তু একই রক্তিমসরণবিশিষ্ট এবং একই দিকে দুটি ভিন্ন কোয়েসারের উপস্থিতি খুব একটা মেনে নেওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাটি আসলে একটি মনোমুগ্ধকর মহাজাগতিক মরীচিকা। আলোর বেঁকে যাওয়ার দ্বারা এই ঘটনার সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। যদি ঐ কোয়েসার এবং আমাদের মাঝে একটি ভারি ছায়াপথ থাকে তবে তা আলোকে বাঁকিয়ে দেবে। সেভাবেই দুটি প্রতিবিম্ব গঠিত হবে (চিত্র ২.৪)।

হেইল মানমন্দিরের এইচ. আর্প কোয়েসারদের দূরত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ তিনি যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করেছেন তাতে কোয়েসারকে সহজেই ছায়াপথের সাথে সংশ্লিষ্ট করে ফেলা যায়। আর্প এমন অনেক উদাহরণ দেখিয়েছেন যাতে একটি কোয়েসার ও একটি

ছায়াপথ খুব কাছাকাছি অবস্থিত এবং এদের মধ্যে পদার্থের সেতু (bridge of matter) লক্ষ্য করা যায়। অথচ এদের রাডিয়োমাধ্যমে বেশকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এদের বিজ্ঞানী এসব উদ্ভাবনকে আকস্মিক যোগাযোগ (coincidence) বলে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি দেখা গেলেই যে এরা একত্রে জড়িত তা সুনিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

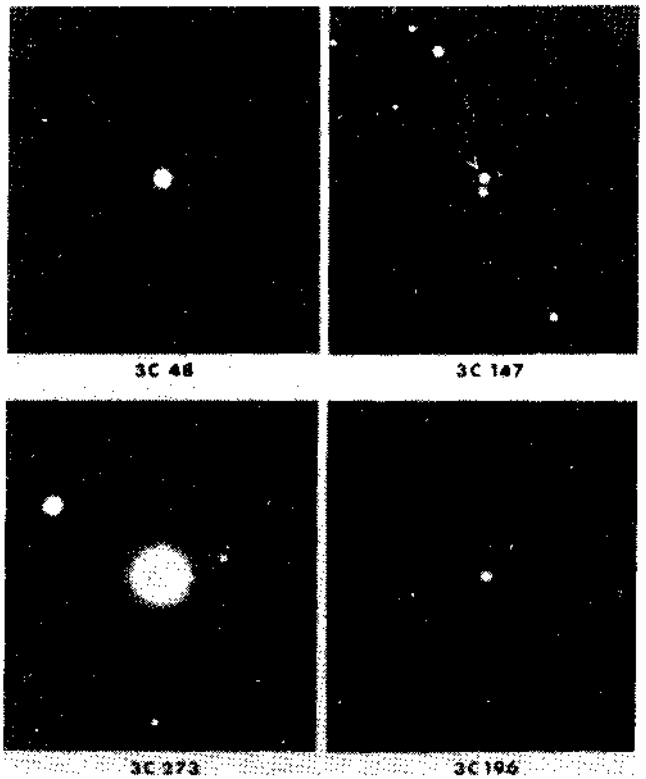

চিত্র ৪.১১ : কোয়েসার কে ঘেরে

তাছাড়া কোনো জটিল মহাকর্ষীয় লেন্স প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও (যেমন পাশের ঐ ছায়াপথ কর্তৃক কোয়েসারের আলোকে বাঁকিয়ে দেয়া যাতে মনে হয় এরা পাশাপাশি) এ ঘটনা ঘটতে পারে।[১]

১. কোনো ভারী বস্তুর পাশে সৃষ্ট পরিবর্তনের মাত্রার পরিমাণ ছোট হয়। কিন্তু কৃষ্ণ গহ্বর ক্ষেত্রে পরিমাণ হয় বড়। যেমন কোনো বস্তুর ব্যাসার্ধ ১ মাইল কিন্তু গহ্বর হলে এর পৃষ্ঠের কোনো পরিবর্তন সম্ভব হতে সময় লাগে ১ সপ্তাহ। পক্ষান্তরে ১ আলোকবর্ষ হলে লাগে ১ বছর।

তত্ত্ব : এবার আসা যাক কোয়েসারে আসলে কি ঘটছে। আমরা আগেই দেখেছি যে কোয়েসার হলো খুব ছোট জায়গায় অবদ্ধ কল্পনাতীত শক্তির আধার। এটা জন্ম গেছে এর দ্রুত পরিবর্তনের হার পর্যবেক্ষণ করে। এই বিপুল শক্তির উৎস কি হতে পারে?

সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা হলো এই যে কোয়েসারের পাওয়ার হাউজ হলো একটি অতিভারি ঘণায়মান কৃষ্ণবিবর (এটি জেট সৃষ্টির ব্যাখ্যাও দেয়)। কোনো ছায়াপথের শৈশবে যে গ্যাস পিণ্ড থেকে সে জন্ম নেয় তার কেন্দ্রে যদি অতিরিক্ত ভর জমা হয় তাহলে তা অতিভারি একটি কৃষ্ণবিবর তৈরি করবে। এর চারপাশে থাকবে পতনশীল পদার্থের এক বিশাল, ঘণায়মান বিবৃদ্ধি (accretion) ডিস্ক। এভাবে এক্স রশ্মি, রেডিও এবং বিপুল শক্তি বিকিরণের সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কোয়েসারের জীবনকাল আনুমানিক ১০^{৮} বছর।

অন্যদিকে কোয়েসার এবং সক্রিয় ছায়াপথ কেন্দ্রীন, যেমন (3C 273) ছায়াপথ, সেফার্ট ছায়াপথ ইত্যাদির সাথে কোয়েসারের রয়েছে আশ্চর্য মিল। তাই অনেকেই মনে করেন সক্রিয় ছায়াপথ কেন্দ্রীন হয়ত কোয়েসারেরই বিবর্তিত দশা। N ছায়াপথের মতো সেফার্ট ছায়াপথের সাথে কোয়েসারের মিলগুলো হলো : উভয়ই রেডিও উৎস, উজ্জ্বল কেন্দ্রবিশিষ্ট, নীলচে বর্ণের প্রায় অভিন্ন নিঃসরণ রেখা প্রদান করে; কিন্তু সেফার্টের জটিল শোষণ রেখা নেই, অবশ্য কোয়েসারের জটিল শোষণ রেখাকে অন্তর্বর্তী ছায়াপথসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। তাই অনেকেই মনে করেন কোয়েসার হচ্ছে নতুন সৃষ্ট ছায়াপথের তারুণ্যে ভরপুর সক্রিয়তা। এভাবে বলা যায় আমাদের ছায়াপথও হয়ত এক সময় সক্রিয় কোয়েসার ছিল। এছাড়া কোয়েসারকে ছায়াপথ স্তবকের সাথেও সংশ্লিষ্ট করা যায় যেমন 3C 273। অর্থাৎ দেখা গেছে কিছু কোয়েসার একই দূরত্বের ছায়াপথ স্তবকের সাথে অবস্থান করছে। অনেক কোয়েসারের আশেপাশে হাল্কা ছায়াপথের রেশও দেখা গেছে বলে মনে করা হয়। তাই কোয়েসারকে নতুন সৃষ্ট ছায়াপথ বললে খুব একটা ভুল হয় না। কিন্তু এটা কোয়েসারের অনেক ধর্মই ব্যাখ্যা করে না।

এছাড়াও আরো কিছু মডেল আছে। যেমন অত্যন্ত ভারি বস্তুসমূহের সুপারনোভা সদৃশ বিস্ফোরণকে কোয়েসার ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়। অনেকে আবার কোয়েসারে প্রতিজড়ের (antimatter) উপস্থিতির কথা কল্পনা করেছেন। এই প্রতিজড় সকল জড়পদার্থের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে শক্তি উৎপাদন করছে। আবার এও বলা হচ্ছে যে কোয়েসার আসলে কৃষ্ণবিবরের বিপরীত শ্বেত বিবর (white hole) কৃষ্ণবিবর সব পদার্থকে টেনে নেয়। ঠিক এর বিপরীত ঘটনা (time reversal) হলো শ্বেত বিবর যা পদার্থকে ঠেলে বের করে দেয়। অনেক সময়ে দুটি ছায়াপথের সংঘর্ষের ফলে কোয়েসার জন্ম নিতে পারে। এক্ষেত্রে দুটি সংঘর্ষমান ছায়াপথের একটির কেন্দ্রস্থিত অতিভারি কৃষ্ণবিবর অপর ছায়াপথের নক্ষত্র ও গ্যাসকে আত্মসাৎ করে। পতনশীল ও ঘূর্ণমান পদার্থ অত্যন্ত জোরালো বিকিরণের জন্ম দেয়। হাবল স্পেস টেলিস্কোপ এ রকম একটি কোয়েসার আবিষ্কার করেছে যার নাম PG1012+008 এবং এর দূরত্ব ১.৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ।

আকারে) যদি ঐ রকম একটি কৃষ্ণবিবরে পতিত হতে থাকে তাহলে শক্তি উৎপাদনের হার বহুগুণ বেড়ে যায়। অধিকাংশ সময়ে ছায়াপথসমূহের সংঘর্ষ বা অনুরূপ প্রক্রিয়া অধিকতর হারে পদার্থের পতনের জন্য দায়ী হয়ে থাকে। এ কারণেই বিশ্ব যখন বয়সে তরুণ ছিল এবং ছায়াপথসমূহ পরস্পরের কাছাকাছি ছিল (প্রায় দশ বিলিয়ন বছর আগে) তখনই ছিল কোয়েসারদের স্বর্ণযুগ। এরপর বিশ্বের প্রসারণের ফলে ছায়াপথসমূহের পারস্পরিক দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় কোয়েসার তৈরির হারও কমে যায়। কন্যাস্তবকের M87 নামের একটি দানবাকৃতির উপবৃত্তাকার ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেছে যার নিউক্লিয়াসটি সক্রিয়। এর দূরত্ব ৫ কোটি আলোকবর্ষ। এটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক প্রশস্ত পরিসরে বিকিরণ করে যা কোয়েসারের অনুরূপ, কিন্তু প্রাবল্য কোয়েসারের হাজার ভাগ। তাই মনে হয় এটি একদা কোয়েসার ছিল।

কোয়েসারদের জীবনকাল সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্বচ্ছ নয়। এরা যদি দীর্ঘজীবী হতো তবে ছায়াপথের অধিকাংশ হাইড্রোজেন গ্যাস আয়নিত হতো যা আদতে কখনোই দেখা যায় না। ছায়াপথের কেন্দ্রস্থিত অতিভারি কৃষ্ণবিবর যদি তরুণ বয়সে কোয়েসারসদৃশ ক্রিয়ার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে তবে (এদের অল্প সংখ্যা – প্রতি ১০০০ ছায়াপথে একটির কেন্দ্রে অতিভারি কৃষ্ণবিবর আছে – নির্দেশ করে যে) কোয়েসারদের জীবনকাল কখনোই ১০ মিলিয়ন বছরের বেশি নয়। এটি সত্যি হলে বলা চলে যে কোয়েসার ক্রিয়া ছায়াপথের দীর্ঘ ১০ বিলিয়ন বছরব্যাপী জীবনকালের এক ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়া। এবং যদিও কোয়েসার ব্যাপক পরিমাণে শক্তি উৎপাদন করে থাকে, তথাপি তা ছায়াপথের সমগ্র জীবনকালে বিকিরিত মোট শক্তির মাত্র ১০%।[৫]

৪.১১ ছায়াপথস্তবক

মহাবিশ্বে ছায়াপথসমূহ ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো বলে মনে করা হতো। আসলে ছায়াপথও যে একত্র হয়ে স্তবক (cluster) তৈরি করতে পারে তা ছিল অভাবনীয়। আমাদের চারপাশে যতোদূর দৃষ্টি যায় (অর্থাৎ টেলিস্কোপের দৃষ্টি সীমায়) আমরা দেখি ছায়াপথসমূহের বণ্টন সুষমও নয় আবার একেবারে নির্বিচারেও (random) নয় (চিত্র ১.১)। অধিকাংশ ছায়াপথই কোনো না কোনো স্তবকের সাথে যুক্ত থাকে।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে পালোমার মানমন্দিরে গবেষণা করে ফ্রিটজ জুইকি (Fritz Zwicky) দেখতে পেলেন যে ছায়াপথগুলো প্রকৃতপক্ষে কোটি কোটি আলোকবর্ষ ব্যাসবিশিষ্ট এক একটি স্তবকে অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৮ সালে তিনি প্রস্তাব করেন যে আসলে ছায়াপথ বিশ্বের একক নয়, বরঞ্চ ছায়াপথস্তবকই পরম একক। ছায়াপথস্তবক নিয়ে আধুনিক গবেষণা শুরু হয় ১৯৫১–৫২ সালে। জেরার্ড ডি ভোকোলের যখন দক্ষিণাকাশের (southern sky) ছায়াপথগুলোকে পুনঃসজ্জিত করেন (এ কাজ অবশ্য শেপলী-অ্যামেস আগেই করেছিলেন) তখন তিনি দেখতে পেলেন যে উজ্জ্বল ছায়াপথসমূহ একটি বিশাল বৃত্ত বরাবর

---

৫. সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : M. Disney, "A New Look at the Quasars", *Scientific American*, June 1998, Vol. 278, No. 6.

লক্ষণীয়ভাবে সজ্জিত। দুই আকাশেই এ ধরনের ছায়াপথ সমাবেশ দেখা যায় তবে দক্ষিণাকাশেই তা প্রকট। আসলে এটি ছায়াপথসমূহের এক বিস্তৃত, সমান (flattened) সুপারসিস্টেম। একেই বলা হয় মহাছায়াপথ বা সুপারগ্যালাক্সি।

এই মহাছায়াপথের মধ্যেই আছে আমাদের স্থানীয় ছায়াপথগুচ্ছ (local clusters of galaxies) এবং আমাদের অতিপ্রিয় আকাশগঙ্গা ছায়াপথ। দেখা যায়, এই মহাছায়াপথের কেন্দ্রটি কন্যারাশির (Virgo) দিকে। তাই এর নাম Virgo Cluster বা কন্যাস্তবক।

ছায়াপথস্তবক নানাভাবে তৈরি হতে পারে। যেমন এরা গুচ্ছাকারে (in groups) থাকতে পারে। এ রকম একেকটি ছায়াপথগুচ্ছে থাকতে পারে দুই থেকে একশতটি ছায়াপথ। গড়ে এ ধরনের ছায়াপথগুচ্ছে থাকে ১০ থেকে ৫০টি ছায়াপথ যা ৫০ লক্ষ আলোকবর্ষ এলাকাব্যাপী ছড়িয়ে থাকে। আমাদের ছায়াপথও এ রকম একটি ছায়াপথগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত। এর নাম স্থানীয় ছায়াপথগুচ্ছ (Local Group of Galaxies)। এখানে আছে আমাদের ছায়াপথ, অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথসহ প্রায় ৩৫টি মিশ্র আকারের বামন ছায়াপথ। এদের সবাই অবশ্য এই ছায়াপথগুচ্ছের খাঁটি সদস্য নয়। এছাড়া ছায়াপথদের অনিয়মিত স্তবক হতে পারে যারা আকৃতিতে বিশাল এবং সুদৃঢ় কাঠামোর নয়। এ ধরনের স্তবকে প্রায় এক হাজার ছায়াপথ ১ থেকে ৫ কোটি আলোকবর্ষ ব্যাপী ছড়িয়ে থাকে। কন্যা এবং হারকিউলিস স্তবক এর উদাহরণ। এছাড়া আছে বর্তুলাকার (spherical) স্তবক যারা ঘন এবং মূলত উপবৃত্তাকার ও SO ছায়াপথ দিয়ে তৈরি। এ ধরনের স্তবকে থাকে প্রায় ১০,০০০ ছায়াপথ এবং এর প্রায় ৫ কোটি আলোকবর্ষ ব্যাপী ছড়িয়ে থাকে।[৬]

কন্যাস্তবকই একমাত্র ছায়াপথস্তবক নয়। আমাদের বিশ্বে রয়েছে অসংখ্য ছায়াপথস্তবক। ১৯৫৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি'র জর্জ আবেল কয়েক হাজার (২৭১২) বিশাল ছায়াপথস্তবকের গবেষণালব্ধ তথ্য দিয়েছেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. জে. ই. পিবল্স (P.J.E. Peebles) ছায়াপথের গুচ্ছকরণকে (clustering) একটি সহভেদী অপেক্ষক (covariance function) দিয়ে প্রকাশ করলেন। আসলে এই অপেক্ষকটি r দূরত্বে দুটি ছায়াপথ পাবার (নির্বিচারে পাবার সম্ভাবনার উপরে) অতিরিক্ত সম্ভাবনা ব্যক্ত করে। অপেক্ষকটির মান $r^{-1.8}$। এতে মনে হয় যে ছায়াপথস্তবক তৈরি হয়েছে আদিম নির্বিচারী ঘনত্ব বিচলনের (random density fluctuation) মহাকর্ষীয় পরিবর্ধনের মাধ্যমে। নক্ষত্রস্তবকে নক্ষত্রসমূহ যেমন পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণে চলাফেরা করে তেমনি ছায়াপথস্তবকে ছায়াপথসমূহও মহাকর্ষীয় আকর্ষণে চলাফেরা করে। দেখা গেছে কুণ্ডলিত ছায়াপথের তুলনায় E এবং SO ছায়াপথ বিশাল স্তবকে একত্র থাকে বেশি পরিমাণে। অবশ্য এটি কেন হয় জানা নেই। ছায়াপথস্তবকে থাকে অত্যুষ্ণ কিন্তু অত্যন্ত হাল্কা ঘনত্বের গ্যাস। ছায়াপথগুলো এই গ্যাসের সমুদ্রে মনে হয় যেন ভাসতে থাকে।

---

৬. এ ধরনের স্তবকের কেন্দ্রে থাকে একটি অতিদানব উপবৃত্তাকার cD ছায়াপথ। এ স্তবকের ভর প্রায় $১০^{১৪}$ সূর্যভর হতে পারে। কোমা স্তবক এর উদাহরণ। অন্যদিকে অনিয়মিত ছায়াপথের স্তবকের ভর $১০^{১২}$—$১০^{১৩}$ সূর্যভর হতে পারে। কন্যাস্তবক একটি অনিয়মিত স্তবক।

সাধারণভাবে কোনো ছায়াপথগুচ্ছ (group of galaxies) সূর্যের তুলনায় ৫০ ট্রিলিয়ন গুণ ভারি বিশিষ্ট হয় এবং এদের তাপমাত্রা থাকে ১০ মিলিয়ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আবার কোনো ছায়াপথ স্তবক (cluster of galaxies) সূর্যের ১০০০ ট্রিলিয়ন গুণ ভারি হয় এবং এদের তাপমাত্রা থাকে ৫০ মিলিয়ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে ভারি ছায়াপথ স্তবক এর তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি ভারি এবং তিনগুণ বেশি উত্তপ্ত দেখা গেছে।

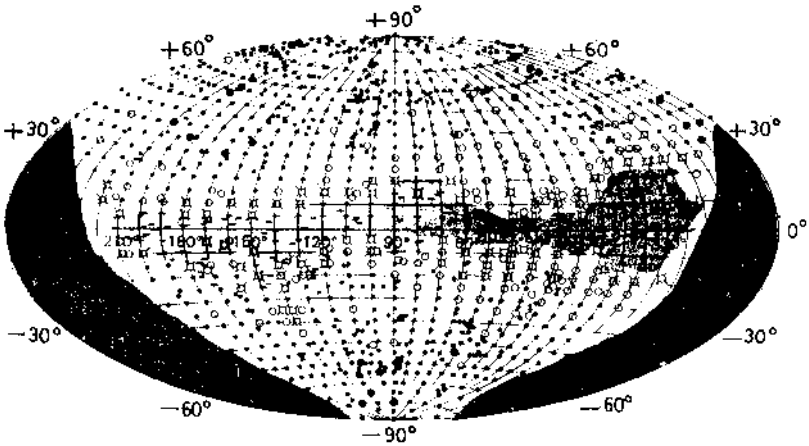

চিত্র ৪.১১ : ছায়াপথের বণ্টন। মাঝে [illegible] ছবিটি [illegible] নির্দেশ করছে [illegible] পাশু ছায়াপথের সংখ্যা। [illegible] ছায়াপথ নির্দেশ করে। [illegible] অঞ্চল দেখা যাচ্ছে [illegible] ছায়াপথের উপস্থিতি নির্দেশ করে। এই অঞ্চলে [illegible] পর্যবেক্ষণ করা যায় না। একে zone of avoidance [illegible] নির্দেশ করছে সেসব অঞ্চল যা [illegible] ছায়াপথীয় স্থানাঙ্ক (galactic coordinates) নির্দেশ করে।

আমাদের বিশ্বে অজস্র ছায়াপথ স্তবক আছে আগেই বলেছি। কিন্তু এগুলো পর্যবেক্ষণ করা দুঃসাধ্য। কারণ আমাদের ছায়াপথের ধার বরাবর (edge on) অত্যন্ত পুরু ধূলিকণার স্তর রয়েছে। এই অন্ধকার অঞ্চলে যে সামান্য ফাঁক পাওয়া যায় তাতেও ছিটে ফোঁটা ছায়াপথ স্তবক দেখতে পাওয়া যায়। আতসকাঁচ এরকম একটি 'ফুটো' দিয়ে আমাদের

ছায়াপথের ঠিক পেছনে একটি বিশাল দণ্ডাকৃতির ছায়াপথ দেখা গেছে। দেখা যায় যে ছায়াপথস্তবকগুলো অনেকে একত্রে মিলে মহাস্তবক তৈরি করে। এ রকম একটি সুপারক্লাস্টারের বা মহাস্তবকে থাকে প্রায় ১০টি ছায়াপথস্তবক যারা ২০ কোটি আলোকবর্ষ বেশি ছড়িয়ে থাকে। বিশের দশকের শেষের দিকে আবিষ্কৃত হলো যে দক্ষিণাকাশের হাইড্রা-সেন্টাউরাস মহাস্তবকের দিকে স্থানীয় স্তবকের অন্তর্ভুক্ত বা এর কাছাকাছি ছায়াপথসমূহের একটি স্রোতময় গতি (streaming motion) আছে। বলা হচ্ছে, ঐ দিকে কয়েক হাজার লক্ষ ছায়াপথের এক সুবিশাল সংগ্রহের আকর্ষণে এই গতির উদ্ভব হয়। এর নাম মহা আকর্ষক (the Great Attractor)। এই রহস্যময় ছায়াপথসমূহের অবস্থান সেন্টরাসের দিকে (ছায়াপথীয় স্থানাংকে) $l=307^0$ এবং $b=0^0$। এর দূরত্ব $r \approx 5000$ km.s^{-1}। যে প্রসঙ্গ কসমোয় পটভূমি বিকিরণ দিক নিরপেক্ষ, তার সাপেক্ষে স্থানীয় স্তবকের অভ্যন্তরে মহা আকর্ষকের দিকে বিচিত্র গতির (peculiar velocity) মান 570±60 km s^{-1}। এর আয়তন 10^6Mpc^3 পর্যন্ত হতে পারে এবং বিশ্বের অন্যত্র এরকম অতিভারি বিস্তৃত কাঠামোর অস্তিত্ব অসম্ভব নয়।

ছায়াপথ যে স্তবকভুক্ত থাকে তার অস্পষ্ট প্রমাণ অনেক আগেই পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত ড্রেয়ারের 'নিউ জেনারেল ক্যাটালগ অব নেবুলাই অ্যান্ড ক্লাস্টারস অব স্টারস' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১৩২২৬টি বস্তুর মধ্যে প্রায় হাজার খানেক ছায়াপথেরই এই ধর্ম দেখা গিয়েছিল। বিশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই ছায়াপথের স্তবকদের নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। তখন থেকেই বেশ কিছু সমৃদ্ধ ছায়াপথস্তবকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তখন মনে করা হতো যে অধিকাংশ ছায়াপথই পৃথক সত্তা হিসেবে বিরাজ করে এবং এদেরকে বলা হতো ফিল্ড গ্যালাক্সি। খুব কম ছায়াপথই ছায়াপথস্তবক গঠন করে বলে মনে করা হতো। কিন্তু পর্যবেক্ষণের উন্নতি এবং তত্ত্বের চমকপ্রদ ব্যবহারের মাধ্যমে এখন আমরা জানতে পেরেছি যে অধিকাংশ ছায়াপথই কোনো না কোনো স্তবকের সদস্য এবং খুব কম সংখ্যকই আলাদা থাকে। বর্তমানে প্রায় ১০০০০ ছায়াপথ স্তবক আবিষ্কৃত হয়েছে। অবশ্য কোনো একদল ছায়াপথপুঞ্জ সত্যিই কোনো স্তবক গঠন করে কিনা সেটা জানতে হলে আমাদেরকে পরিসংখ্যানের সংশ্লেষ অপেক্ষক (correlation function) ব্যবহার করতে হয়। এ তত্ত্বের মূলভিত্তি হলো এই যে যদি ছায়াপথসমূহ স্তবকভুক্ত থাকে তাহলে এদের মধ্যকার দূরত্ব, সুষমভাবে বণ্টিত হলে যে দূরত্বে থাকা উচিত ছিল তার চেয়ে কম হবে। এভাবে শেন ও ভিরটানেন ১৬ হাজার উজ্জ্বলতর বেশি ছায়াপথদের জন্য তালিকা প্রণয়ন করেছেন। এখানে দেখা যায় যে, কোনো একটি ছায়াপথের কাছে আরেকটি ছায়াপথ পাবার সম্ভাবনা বেশি, একইভাবে একজোড়া ছায়াপথের কাছে একটি নতুন ছায়াপথ পাবার সম্ভাবনা আরো বেশি এবং এই অনুক্রম চলতেই থাকে। শেন-ভিরটানেন তালিকা থেকে আরো দেখা যায় যে স্তবক ভুক্তির প্রবণতা ২০ মেগাপারসেকের বেশি দূরত্বে কমতে থাকে। আমাদের ছায়াপথের নিকটবর্তী দুটি স্তবক হলো ২০ মেগাপারসেক দূরবর্তী কন্যা স্তবক এবং ১০০ মেগাপারসেক দূরের কোমা বেরেনিসিস মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত কোমাস্তবক। আমরা আগেই

বলেছি, আমাদের ছায়াপথ স্থানীয় ছায়াপথগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ভোকোলের দেখিয়েছিলেন যে কন্যাস্তবককে কেন্দ্রে রেখে ৫০টির মতো ছায়াপথস্তবকের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে স্থানীয় মহাস্তবক (Local Supercluster)। দূরবর্তী স্তবকদের ক্ষেত্রে রক্তিমসরণ ও হাবল ধ্রুবকের মাধ্যমে প্রাপ্ত অপসরণ গতিবেগ হচ্ছে ১ লক্ষ কি.মি./সে.।

১৯৫০ ও ১৯৫৪ সালের মধ্যে পালোমার মানমন্দিরের ১.২ মিটার শ্মিড টেলিস্কোপ ব্যবহার করে জর্জ আবেল প্রায় ২৭১২টি সমৃদ্ধ স্তবক (যাদের আপাত উজ্জ্বলতা ২১) তালিকাভুক্ত করেন। এ তালিকা থেকেই মহাস্তবকদের অস্তিত্ব প্রকট হয়ে পড়ে। কিন্তু জুইকি প্রণীত তালিকায় স্তবকের উপরে কাঠামোর অস্তিত্ব সন্দেহজনক মনে হয়। মহাবিশ্বের প্রসারণের দরুন সৃষ্ট ছায়াপথের অরীয় গতি (radial motion) এবং এদের স্বগত গতি (proper motion) থেকে স্তবকের গতিবিদ্যা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। বলা হচ্ছে, স্তবক আসলে মহাকর্ষীয় আকর্ষণে আবদ্ধ একটি সিস্টেম। মনে হয় প্রায় ১০ কোটি বছরের ব্যবধানে এই স্তবকগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে যদি না এরা মহাকর্ষের আকর্ষণে বাঁধা থাকে। অন্যদিকে ১০০ মেগাপারসেক স্কেলে মহাস্তবকের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত হতে পেরেছি। এর উদাহরণ আমরা আগেই দেখেছি। দীর্ঘ গবেষণায় দেখা গেছে, মহাস্তবকগুলির বিস্তৃতি কোষ–আকৃতির যাদের মাঝে রয়েছে বিশাল শূন্যস্থান (void) যেখানে অনুজ্জ্বল ও কম উজ্জ্বল অতি সামান্য সংখ্যক ছায়াপথ থাকে। এসব শূন্যস্থানের ব্যাসার্ধ প্রায় ১০০ মেগাপারসেক হয়ে থাকে। এভাবে পুরো মহাবিশ্বের আকৃতি অনেকটা স্পঞ্জের মতো (অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত) বলে মনে হয়।

অনেক সময়ে, বিভিন্ন স্তবকের মধ্যে পদার্থের সেতু দেখা যায় — যা স্তবকদের মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক নির্দেশ করে। এভাবেই জ্যোতির্বিদরা মহাস্তবকসমূহের সুতাকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। এ রকম সবচেয়ে বড় একটি সুতাকৃতির বাহু হলো পারসিয়াস-পেগাসাস বাহু। এই মহাবাহুটি নিয়ে কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করেছেন ডেভিড বার্টুস্কি এবং জ্যাক বার্নস। ওঁরা ৬৫২টি আবেল তালিকাভুক্ত স্তবক নিয়ে গবেষণা করে প্রায় ১০২টি সম্ভাব্য মহাস্তবকের সন্ধান পেয়েছিলেন। ওঁরা একটি বিশেষ কম্পিউটার অ্যালগোরিদম ব্যবহার করে মহাস্তবকদের সম্ভাব্য সদস্য খুঁজে বার করেছিলেন। একইভাবে আরেকটি ভিন্ন অ্যালগোরিদম ব্যবহার করে ওঁরা শূন্যস্থানের সম্ভাব্য সদস্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। এ রকম প্রায় ২৯টি সম্ভাব্য শূন্যস্থান পাওয়া যায় যেখানে প্রায় ১৬ কোটি আলোকবর্ষ ব্যাসের মধ্যে কোনো আবেল-স্তবক নেই। এদের আকৃতি বর্তুলাকার বা উপবৃত্তাকার। মহাস্তবকদের চিহ্নিত করার পর ওঁরা পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন যে স্তবকদের মধ্যে কোনো রৈখিক সম্পর্ক আছে কিনা। ওঁরা দেখলেন যে পারসিয়াস মহাস্তবক থেকে শুরু করে একটি রৈখিক সুতাকৃতির বাহু (linear string) হাল্কাভাবে দক্ষিণে বেঁকে পেগাসাসে শেষ হয়েছে। অবশ্য অনেকে মনে করেন যে পেগাসাস মহাস্তবক আবার আরো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আসা মেজরিস মহাস্তবকে প্রবেশ করেছে। এই সুদীর্ঘ বাহুর দৈর্ঘ্য এক বিলিয়ন আলোকবর্ষেরও বেশি। এখানে ১৬টি

সুদীর্ঘ স্তবক দেখা গেছে এবং স্বভাবতই অসংখ্য ছায়াপথে ভর্তি। এই বাহুকে ঘিরে আছে ৩টি বিশাল শূন্যস্থান, প্রতিটির ব্যাস ৩০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। এই শূন্যস্থান যে ছায়াপথের তল বরাবর উপস্থিত পুরু ধূলিকণার বাধার জন্য হয়নি সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। কারণ অধিকাংশ মহাস্তবক ও শূন্যস্থানের উপস্থিতি আমাদের ছায়াপথের তল থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এই সুদীর্ঘ বাহুকে তাই অনেক সময়ে **'মহাপ্রাচীর'** (Great Wall) বলা হয় (চিত্র ৪.১৩)। চীনের মহাপ্রাচীরের এ এক মহাজাগতিক সংস্করণ বটে। এই মহাপ্রাচীর হলো একটি বিশাল ভরের অতিবৃহৎ কিন্তু পাতলা শিট। এর দূরত্ব ~70 h^{-1} Mpc। চিত্র ৪.১৩-এর তিনটি প্যানেলে এই প্রাচীরটিকেই দেখানো হয়েছে। ছবিতে যেখানে বেশি ঘনত্ব দেখা যায় সেখানেই এই প্রাচীরের অস্তিত্ব আছে। চিত্রে এর বিস্তৃতি $\alpha = 17^h$ তে cz~10000 km.s^{-1} থেকে $\alpha = 8^h$ তে cz~7000 km.s^{-1} দূরত্ব পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ এর আয়তন প্রায় ৬০ মেগাপারসেক × ১৭০ মেগাপারসেক এবং এর পুরুত্ব মাত্র ৫ মেগাপারসেক। মনে হয় এটি একটি একক গাঠনিক সত্তা (single entity) যার বিস্তৃতি অন্তত 100 h^{-1} Mpc।

নিকটবর্তী মহাস্তবকসমূহ, যেমন—স্থানীয় মহাস্তবক, সাদার্ন সুপারগ্যালাক্সি, পারসিয়াস সুপারগ্যালাক্সি, অনেকটা সরলরেখা বরাবর সাজানো মনে হয়। অর্থাৎ একটা রৈখিক গঠন (elongated structure) আছে বলে মনে হয়। এস্টোনিয়ার জন অইনাস্টো এমন সব উদাহরণ দেখিয়েছেন যাতে বিজ্ঞানীরা মানতে বাধ্য হচ্ছেন যে স্তবক ও মহাস্তবকগুলো একটা ষড়ভুজাকৃতির কোষ (cell) কাঠামোর পৃষ্ঠ বরাবর, বিশেষ করে পৃষ্ঠের ছেদ অংশ (intersections) বরাবর, সজ্জিত থাকে। কোষের মাঝে খুবই কম সংখ্যক ছায়াপথ দেখা যায় এবং মনে হয় এগুলো একেবারেই রিক্ত অর্থাৎ অনেকটা জীবকোষের অ্যালভিওলির মতো। পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে (আসলে ছায়াপথের রক্তিমসরণ এবং দিক যদি গ্রাফে প্লট করা যায় তবে এমন রেখাচিত্র পাওয়া যায় যা থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া যায়) যে, ছায়াপথসমূহের ঘনীভবন (concentration) ঘটে অনেকটা সুতার কাঠামো (filamentary structure) বরাবর এবং এদের মধ্যে রয়েছে বিশাল শূন্যস্থান যাদের বলা হয় Void। ব্যাপক পটভূমিতে ছায়াপথসমূহের এই সুতাকৃতির সজ্জা পিবলস অনেক আগেই দেখিয়েছিলেন। ছায়াপথের এই বিন্যাস অনেকটা সাবান পানির মতো যেখানে অসংখ্য বুদবুদকে ঘিরে থাকে সাবানের দল (চিত্র ৪.১৩)।

এই চমকপ্রদ এবং অভিনব কোষাকৃতির কাঠামো কি করে তৈরি হলো সেটা একটা প্রশ্নের বিষয়। রুশ বিশেষজ্ঞ ইয়াকভ বরিসভিচ জেলদোভিচ একটি অনুকল্প দিয়েছেন যাতে বলা হয়েছে যে আদি বিশ্বের ছোট ছোট ঘনত্ব বিক্ষোভ (perturbation) পরবর্তীতে এ রকম কোষ কাঠামো তৈরি করতে সক্ষম। অবশ্য এ সম্পর্কে এখনো প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন আছে।

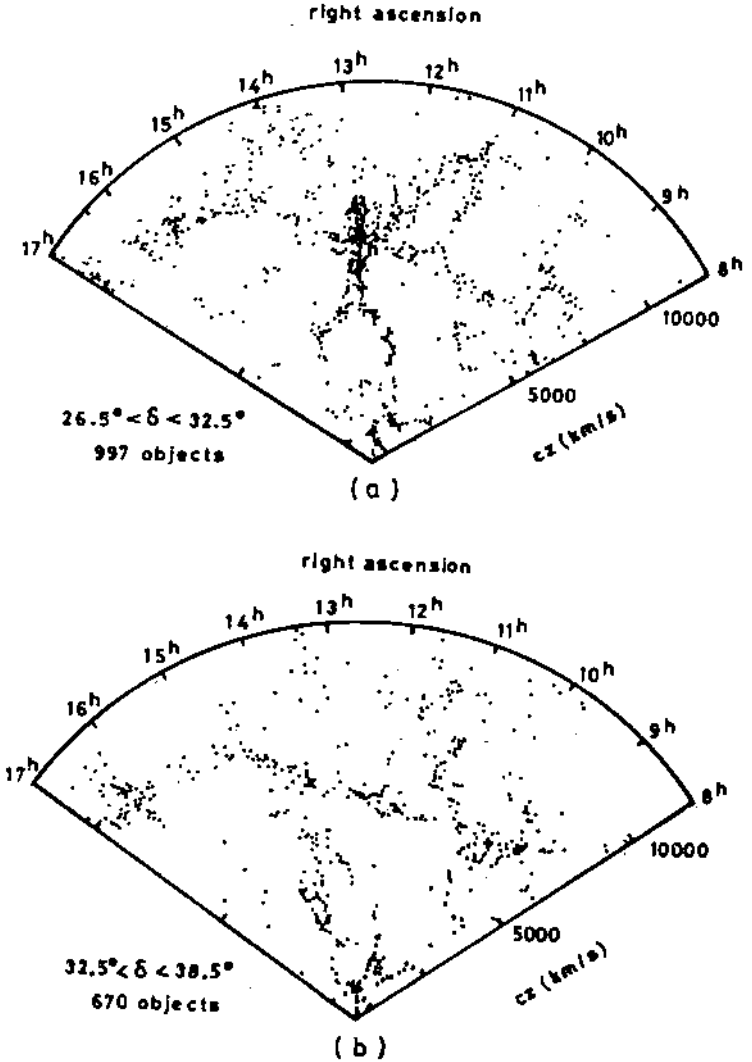

চিত্র ৪.১৩ : $cz < ১২০০০$ কি.মি. সে.$^{-১}$ পরিমাণ রক্তিমসরণ দূরত্বে ছায়াপথের বন্টন। চিত্রে খাড়ীয় স্থানাংক বণ্টনসরণ এবং কৌণিক স্থানাংক আকাশের নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছায়াপথের কৌণিক অবস্থান নির্দেশ করছে। এই তিনটি চিত্র আকাশের পাশাপাশি তিনটি অংশ নির্দেশ করে যাদের বিষুবলম্বের (declination) গভীরতা ৬° ও বিষুবাংশের (right ascension) দিকে ~১০০° চওড়া। এই তিনটি স্লাইসে প্রায় ১৫০০ ছায়াপথ আছে। এই তিনটি স্লাইসকে যদি পরস্পরের উপর উপরিপাতন করা যায় তবে চমৎকার ছবি পাওয়া যায় দেখুন

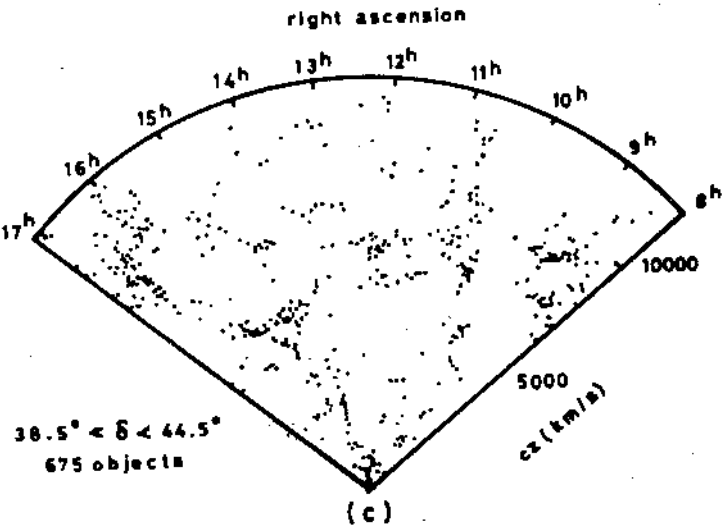

Cambridge Atlas of Astronomy (1994), পৃ. ৩৯৮)। এই উপরিপাতনের ফলে প্রথম স্লাইসের মানুষাকৃতির অদ্ভুত অবয়বটি প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথম স্লাইসে দৃষ্ট অবয়বটির 'কবন্ধ' (torso) (ছবির মাঝামাঝি 13h বিষুবাংশ বরাবর) কোমস্তবক নির্দেশ করে। 'মানুষ'টির বস্তুগুলো মহাপ্রাচীর নির্দেশ করছে। প্রতিটি স্লাইসের নিচের সরু ডগায় সূর্যের অবস্থান।

আমরা দেখেছি যে গুচ্ছকরণের (clustering) একের পর এক পর্যায় আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। পরমাণু স্কেলে আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম অবিভাজ্য পরমাণু। এই পরমাণুও যে আবার ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি সেটি আমরা বর্তমানে আবিষ্কার করলাম। অতিসম্প্রতি বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে ভারি কণা (যেমন প্রোটন, নিউট্রন) আবার কোয়ার্ক সমাবেশ দিয়ে তৈরি। পতি-সালাম প্রমুখের তাত্ত্বিক গবেষণা আরো মৌলিক প্রিয়ন কণার ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। এতো গেল কাঠামোর একদিকের চিত্র। অন্যত্র আমরা দেখি অসংখ্য তারার সমন্বয়ে গঠিত হয় বিশাল সব ছায়াপথ। আবার ছায়াপথসমূহ স্তবকে গুচ্ছাকারে দলবদ্ধ থাকে। এরপরও যে কাঠামো আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় অসংখ্য সুপারগ্যালাক্সি বা ছায়াপথদের মহাস্তবকের উপস্থিতি থেকে। অতিসম্প্রতি প্রশ্ন উঠছে তৃতীয় পর্যায়ের গুচ্ছকরণ কি সম্ভব? অর্থাৎ ছায়াপথদের মহাস্তবকের স্তবক কি সম্ভব? বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীর গবেষণায় এ সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। অ্যাবেল কর্তৃক তালিকাভুক্ত (catalogued) ছায়াপথস্তবকদের স্থানিক ঘনত্বকে (space densities) যদি তাদের ব্যবধানের (separation) বিপরীতে গ্রাফ কাগজে প্লট করা হয় তবে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে ধনাত্মক সংশ্লেষ (positive correlation) বিদ্যমান (বিশেষ করে 50 Mpc ও 100 Mpc ঘনকের ভেতরে এবং দেখা যায় 100 Mpc ঘনকে 300 Mpc ব্যবধানের জন্য ধনাত্মক সংশ্লেষ বিদ্যমান। সংশ্লেষ অপেক্ষকটি খুবই প্রয়োজনীয় একটি গাণিতিক পদ্ধতি যা ছায়াপথদের

গুচ্ছকরণ ব্যাখ্যা করতে কাজে লাগে। যদি একগুচ্ছ ছায়াপথ কোনো স্তবকে থাকে তবে তাদের পারস্পরিক গড় দূরত্ব, যদি তারা সুষমভাবে ছড়ানো থাকে তার দূরত্বের তুলনায়, কম হবে। সংশ্লেষ অপেক্ষক (correlation function) এই মানটিই প্রদান করে। এই অপেক্ষক পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। তথাপি এই কাজ করা হয়েছে এবং ফলাফল হলো এই যে, আকাশে কোনো ছায়াপথ পাবার সম্ভাবনা কোনো স্তবকেই বেশি এবং একজোড়া ছায়াপথের কাছে এই সম্ভাবনা আরো বেশি। সহজ কথায় এর অর্থ হচ্ছে যে সাধারণ মহা ছায়াপথস্তবকের স্কেলের চেয়ে অনেক বেশি স্কেলেও কাঠামো আছে। তবে অধিকাংশ বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। প্রশ্ন দাঁড়ায় তৃতীয় পর্যায়ের ওপারেও কি কাঠামোর স্তর আছে? বিশেষজ্ঞদের মতে নেই। তবে গবেষণা থেমে নেই। নিত্য নতুন তথ্য আমরা পাবোই।

ছায়াপথস্তবকদের থাকে অত্যুষ্ণ গ্যাস এবং শক্তিশালী এক্স রে উৎস। ছায়াপথস্তবকের আরেকটি সমস্যা হলো লুকানো ভর (hidden mass) সমস্যা। একটি স্তবকের ভর দুভাবে মাপা যায়. প্রথমত, স্তবকের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে ছায়াপথের গতি পরিমাপ করা হয় এবং তারপর শক্তির সমবন্টনের (equipartition of energy) ফলে একটি গতীয় ভর পাওয়া যায়। এই ভরই সেই ভর যা উষ্ণ আন্তঃস্তবক (intracluster) পদার্থকে আটকে রাখে। কাজেই এটাই স্তবকের সবচেয়ে সঠিক ভর। দ্বিতীয়ত, একটি স্তবকে কয়টি ছায়াপথ আছে তা জানা থাকলে ছায়াপথের জন্য ভর প্রভা (mass-luminosity) সম্পর্ক থেকে ছায়াপথের দৃশ্যমান ভর বের করা সম্ভব। দেখা যায় দৃশ্যমান ভর সবসময়ে গতীয় ভরের তুলনায় কম। এটাই 'লুকানো ভর' সমস্যা। এর জন্য নানা প্রস্তাবিত সমাধান আছে। যেমন আন্তঃছায়াপথীয় পদার্থ ভর বাড়িয়ে দিতে পারে। নিউট্রিনো কণার একটা জড়ভর থাকতে পারে অথবা স্তবকের কেন্দ্রে অবস্থিত cD অতিদানব ছায়াপথরা আরো ভারি হতে পারে ইত্যাদি।

অসংখ্য ছায়াপথ আমাদের বিশ্বে আছে। অথচ এরা কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে নেই। ছোট ছোট ছায়াপথ গুচ্ছাকারে, অনেকগুলো গুচ্ছ স্তবকাকারে, অনেকগুলো স্তবক মহাস্তবকাকারে, আবার (প্রায় ১০০ কোটি আলোকবর্ষ স্কেলে) মহাস্তবকগুলো মহা মহাস্তবকাকারে সজ্জিত আছে। অনেকে বলেন কাঠামোর স্তরবিন্যাসের এখানেই শেষ; এভাবে ব্যাপক পটভূমিতে বিশ্ব সমসত্ত্ব ও দিকনিরপেক্ষ হবে। অনেকে আবার কাঠামোর অসীম অনুক্রমের পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন যে ছায়াপথদের রয়েছে এক অসীম সাংগঠনিক পারম্পর্য (hierarchy)। পরস্পর বিরোধী মতামতের মীমাংসা হয়ত ভবিতব্যই নির্ধারণ করবে।

৪.১২ মহাবিশ্বে ব্যাপক কাঠামোর উদ্ভব

তাত্ত্বিক সৃষ্টিতত্ত্বে ছায়াপথ এবং ছায়াপথস্তবকের উদ্ভব অন্যতম কঠিন সমস্যা এবং এর কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধান নেই। আমরা দেখেছি কিভাবে মহাবিশ্বের ব্যাপক কাঠামো (very large scale structure) সুসজ্জিত রয়েছে। এখানে রয়েছে নক্ষত্রস্তবক (star clusters), অসংখ্য নক্ষত্রবীথির সমাহারে রচিত ছায়াপথ (galaxies), অসংখ্য ছায়াপথের সমন্বয়ে রচিত

ছায়াপথস্তবক, এবং দুই বা ততোধিক ছায়াপথস্তবকের সমাহারে সুতাকৃতির মহাস্তবক (filamentary supercluster)। কিন্তু আমরা জানি মহাবিশ্ব সৃষ্টির পরমুহূর্তে ছিল পদার্থ ও বিকিরণের সুষম এক মহাসমুদ্র। সেখান থেকেই বিশ্বের দৃশ্যমান বিশাল কাঠামোর যাবতীয় বীজ উপ্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

মহাকর্ষীয় অস্থিতি : পদার্থ ও বিকিরণের সুষম মিশ্রণ থেকে কি করে কাঠামোর জন্ম হলো তা বোধহয় মহাকর্ষ বলের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে। মহাকর্ষের জন্য প্রতিটি বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করছে এবং এ কারণেই পদার্থ ঘনীভূত হয়ে কাঠামোর সৃষ্টি করেছে। এই ধারণার প্রাচীনতম সমর্থন মেলে জার্মীয় চিন্তাবিদ রিচার্ড বেন্টলীকে লেখা নিউটনের একটি চিঠিতে :

"আমার মনে হয় যে, যদি সূর্য ও গ্রহসমূহের পদার্থ এবং বিশ্বের অপরাপর সকল পদার্থ মহাশূন্যে সুষমভাবে ছড়ানো থাকত এবং প্রতিটি কণা অন্য সকল বস্তুর দিকে মহাকর্ষের দরুন আকৃষ্ট হতো এবং যে স্থানব্যাপী এই পদার্থ ছড়িয়ে আছে তা যদি সসীম হতো তাহলে এই স্থানের বহির্ভূত সকল পদার্থ ভেতরের পদার্থের দিকে মহাকর্ষের দরুন আকৃষ্ট হতো এবং ফলত স্থানের মাঝে সব গিয়ে পতিত হতো এবং এক বিশাল বর্তুলীয় ভরপিণ্ডে (spherical mass) পরিণত হতো। কিন্তু যদি অসীম স্থানব্যাপী এ সকল পদার্থ সুষমভাবে বিস্তৃত থাকত তবে এরা কখনই একটি ভরপিণ্ডে জড়ো হতো না ; বরঞ্চ এদের কিয়দংশ একটি পিণ্ডে, অন্য অংশ অন্য পিণ্ডে এভাবে অসীম সংখ্যক বস্তুপিণ্ডে জড়ো হতো যারা বিশাল দূরত্বে থেকে অসীম স্থানব্যাপী ছড়ানো থাকত। এবং এভাবেই বোধহয় সূর্য এবং অন্যান্য স্থির তারা জন্ম নিয়েছে, ধরে নিচ্ছি পদার্থের প্রকৃতি (যথেষ্ট) সহজ ও স্পষ্ট (lucid) ছিল।"

নিউটনের এই চিঠিতে আমরা মহাকর্ষীয় অস্থিতির (gravitational instability) মূলভিত্তির সন্ধান পাই। বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম দিকে যদি এই প্রসারমান পদার্থ ছোট ছোট অংশে (clumps) বিভক্ত হয়ে পড়ত তাহলে কখনই ছায়াপথ গঠিত হতে পারত না। কারণ আদি মুহূর্তে পদার্থের ঘনত্ব অনেক বেশি ছিল। তাই যদি সেই মুহূর্তে কোনো সংকোচমান (contracting) পদার্থপিণ্ডের উদ্ভব হতো তাহলে তার ঘনত্ব কোনক্রমেই ঐ সময়কার বিশ্বের গড় ঘনত্বের কম হবে না। অথচ বর্তমানে দৃষ্ট ছায়াপথসমূহে পদার্থের ঘনত্ব $১০^{-২৪}$ গ্রাম/সে.মি.^{৩} – যা অবশ্যই বিশ্বের এখনকার গড় ঘনত্বের তুলনায় বেশি। তাছাড়া পটভূমি বিকিরণের উষ্ণমাত্রার সুষমতা (high degree of uniformity) দেখে মনে হয় যে পদার্থ ও বিকিরণের পৃথকীকরণের (decoupling) পূর্বে কোনো কাঠামোর জন্ম হয়নি। যা কিছু হয়েছে তা সবই মহাবিশ্বের পরবর্তী পরিবর্তিত দশায়ই ঘটেছে।

আমরা দেখেছি, সুষমভাবে বিস্তৃত পদার্থজোট থেকে কি করে পদার্থের পৃথক পৃথক জোট তৈরি হয় তা নিউটনের মতে একান্তভাবেই মহাকর্ষ নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯০২ সালে এই ধারণাকে গাণিতিক রূপ দেন জেমস জীন্স (James Jeans) তাঁর *অ্যাস্ট্রনমি অ্যান্ড কসমোগনি* বইটিতে। ধরা যাক, কোনো সুষম মাধ্যমের কোনো অংশের ঘনত্ব বেড়ে গেল। এর ফলে মহাকর্ষ শক্তিশালী হয়ে একে সংকুচিত করে এর ঘনত্ব আরো বাড়িয়ে দেবে। ঘনত্ব

বেড়ে যাওয়ায় মহাকর্ষ আরো দৃঢ় হবে। এটি এক ধরনের ক্যাসকেড প্রক্রিয়া। এভাবে সুষম মাধ্যম থেকে ক্রমবর্ধমান ঘনত্ব পার্থক্যের (density deviation) সৃষ্টি হয়। এটাই ইন্‌স্ট্যাবিলিটি বা অস্থিতি। জীন্‌স দেখলেন যে সুষম তাপমাত্রার ও অসীম আকৃতির সমসত্ত্ব স্থির গ্যাসের মধ্যে একটি সাইনধর্মী বিক্ষোভকে (sinusoidal fluctuation) অভ্যন্তরীণ চাপের বিরুদ্ধে ঘন থেকে ঘনতর হতে হলে অর্থাৎ মহাকর্ষীয় অস্থিতির সূচনা করতে হলে ঘনত্ব বিচলনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে অবশ্যই একটি ন্যূনতম দৈর্ঘ্যের বেশি হতে হবে। এটাই জীন্‌সের দৈর্ঘ্য (Jeans' length) নামে পরিচিত। জীন্‌সের দৈর্ঘ্য কিভাবে নির্ধারণ করতে হয় সেটাই এখন আমরা দেখব।

মহাকর্ষীয় অস্থিতির গতিকে বাধা দান করে গ্যাসের স্থিতিস্থাপকতা (elasticity)। গ্যাসের এই বিশেষ ধর্ম গ্যাসের চাপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মহাকর্ষ যেখানে গ্যাসকে ঘনীভূত করতে চায় চাপ এই ঘনীভূত গ্যাসকে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে। ছোট অংশে চাপ এবং বড়ো অংশের জন্য মহাকর্ষ প্রাধান্য বিস্তার করে। ধরা যাক r ব্যাসার্ধের কোনো গোলকের ঘনত্ব হলো ρ। এই ঘনত্ব $\Delta\rho$ পরিমাণ বাড়লে চাপ Δp পরিমাণ বাড়বে। এই চাপ প্রসারণের জন্ম দেয়। প্রসারণ বলের মান হলো $F_p = \Delta p/r$। স্পষ্টতই, r যতো ছোট প্রসারণ বল ততো বড়ো হয়। কাজেই ছোট অঞ্চলের বিচলন স্থায়ী হয় না। অন্যদিকে মহাকর্ষের ঘনীভবন প্রক্রিয়া নিউটনের নিয়মানুযায়ী ঘটে। গোলকের গ্যাসের ভর যদি M হয় তবে সংকোচন বল :

$$F_g = -GM(\rho+\Delta\rho)/r^2 \qquad (৪.১২.১)$$

উভয়ক্ষেত্রে বল দুটি বর্তুলীয় গ্যাসপিণ্ডের ধার বরাবর এক ঘন সে.মি. গ্যাসের উপর ক্রিয়া করে। ρ হচ্ছে ঘনীভূত এলাকার বাইরের গ্যাসের ঘনত্ব। কিন্তু আমরা জানি, $M = \frac{4}{3}\pi(\rho+\Delta\rho)r^3$। ফলে আমরা পাই :

$$F_g = -\frac{4}{3}\pi Gr\rho^2 - \frac{8}{3}\pi Gr\rho\Delta\rho - \frac{4}{3}\pi Gr(\Delta\rho)^2 \qquad (৪.১২.২)$$

এখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে ঘনত্ব বিচলনের (density perturbation) বিবর্ধন নির্ভর করে অতিরিক্ত ঘনত্ব $\Delta\rho$ এর উপর এবং যেহেতু $^4/_3\pi G\rho^2 r$ রাশিটি ঘনত্ব বিচলন বিবর্ধনে কোনো সাহায্যই করে না বরঞ্চ তা মহাজাগতিক প্রসারণকেই কেবল মন্দীভূত (decelerate) করে এবং যেহেতু $(\Delta\rho)^2$ পদটি খুবই ছোট বিধায় অগ্রাহ্য করা যায় ; তাই ঘনত্ব বিচলনের জন্য প্রয়োজনীয় সমীকরণ হলো :

$$\widetilde{F_g} = \frac{8}{3} Gr\rho\Delta\rho \qquad (৪.১২.৩)$$

আমরা এখানে $\widetilde{F_g}$ বলের ব্যাপারে আগ্রহী যা উপরিউক্ত F_g (সমীকরণ ৪.১২.২) এবং অবিচলিত অঞ্চলের উপর ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বলের পার্থক্য নির্দেশ করে। আমরা দেখছি যে একটি সমসত্ত্ব মাধ্যমে স্থানীয় অসমসত্ত্ব (local inhomogeneity) অঞ্চলের বিবর্ধন ঘটায়

F_g বল যা বিচলনের অভিমুখ r এর উপর নির্ভরশীল। প্রবন্ধে লক্ষণীয় যে, ছোট অঞ্চলের জন্য এই বল অগ্রাহ্য করা যায়। যে দৈর্ঘ্যে কোনো ঘনত্ব বিচলনের দুই বিরুদ্ধ বল পরস্পরকে নাকচ করে দেয় সেটাই জীনসের দৈর্ঘ্য নামে পরিচিত। F_g এবং F_p সমীকরণ থেকে আমরা লিখতে পারি : $\Delta P/r = 8/3\pi G\rho\Delta\rho r \Rightarrow r_J = (\Delta P/\Delta\rho)^{1/2}\left(\frac{1}{8/3\pi G\rho}\right)^{1/2}$।

কিন্তু $\sqrt{\Delta P/\Delta\rho}$ রাশিটি গ্যাসে শব্দের রুদ্ধতাপীয় বেগ (adiabatic velocity) নির্দেশ করে। কাজেই জীনসের সংকট দৈর্ঘ্য হলো :

$$r_J = v/\sqrt{8/3\pi G\rho} \qquad (8.13.8)$$

$r < r_J$ হলে গ্যাসের চাপ প্রাধান্য পায় এবং কোনো বিচলনের জন্ম হলে তা দূরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু $r > r_J$ হলে মহাকর্ষ প্রাধান্য বিস্তার করে এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী মহাকর্ষীয় অস্থিতি সূচিত হয়। যদি মাধ্যমের ঘনত্ব 3×10^{-22} গ্রাম/সি.সি. হয় এবং ঐ মাধ্যমে শব্দের বেগ ১কি.মি./সে. হয় (পদার্থ ও বিকিরণের ঘনীভূত থাকার সময়ে মহাবিশ্বে ঐ অবস্থাই বিরাজ করছিল) তাহলে জীনসের দৈর্ঘ্য হয় 2×10^{22} সে.মি.। এই ব্যাসার্ধের একটি গোলকের ভর (জীনসের ভর) প্রায় এক মিলিয়ন সূর্যভরের সমান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রসারণের শুরুতেই কেন বিচলিত অঞ্চলসমূহের বিবর্ধনের ফলে (growth of perturbed clumps) পৃথক পৃথক অংশ তৈরি হলো না? আমাদের মনে রাখতে হবে মহাকর্ষীয় অস্থিতি সূচিত হলেও বিশ্বের প্রসারণ চলছিল পুরোদমে। এই প্রসারণের ফলে বিচলিত অঞ্চলের ঘনত্ব, এবং সে কারণে r_J পরিবর্তিত হচ্ছিল। ফলে বিবর্ধনের হারও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছিল।

এখন সমসত্ত্বের মাধ্যমে তিন ধরনের বিচলন সূচিত হতে পারে। প্রথমত, এতোক্ষণ যা আলোচিত হলো সে ধরনের বিচলন অর্থাৎ পদার্থ ও বিকিরণের একত্র বিচলন ; একে রুদ্ধতাপীয় বিচলন (adiabatic perturbation) বলে। দ্বিতীয়ত, বিকিরণ ক্ষেত্রের কোনো বিক্ষোভ ছাড়াই পদার্থের বিক্ষোভ ঘটতে পারে যার ফলে সর্বত্র তাপমাত্রা একই রকম থাকে। একে সমতাপীয় (isothermal) বা এনট্রপি বিচলন বলে। শেষত, পদার্থের ঘূর্ণিবেগের (vortex motion) দরুন ঘূর্ণি বিচলনের জন্ম নিতে পারে। ঘূর্ণিবেগ যদি অতি দ্রুত হয় এবং খুব বড় অঞ্চল ব্যাপী হয় তাহলে তা সম্ভাবনাময় মহাকর্ষীয় প্রক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে। ঘূর্ণি বিচলন তেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে এটি আমরা আলোচনা করব না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এই বিক্ষোভগুলো সময়ের সাথে কি রূপে বিবর্তিত হয়েছে? এটি জানা হলে খুব সহজেই মহাবিশ্বে ব্যাপক কাঠামোর উদ্ভব সমস্যার সমাধান নীতিগতভাবে করে ফেলা যায়। ছোট আকৃতির বিচলন ও তার বিবর্তন গাণিতিকভাবে সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে খুব বড় অসমসত্ত্বতা (inhomogeneity) নিয়ে যা থেকে পৃথক ঘনীভূত অঞ্চল তৈরি হয়, যারা আবার পরবর্তীতে নিজেদের সাথে মিথস্ক্রিয়া (interaction) ঘটায়। কিন্তু এই বিচলনসমূহ বিশ্বের প্রসারণের শুরুর দিকে কেমন ছিল

অর্থাৎ এদের প্রারম্ভিক শর্তাবলিই (initial conditions) আমাদের অজানা। কাজেই একমাত্র করণীয় হচ্ছে প্রারম্ভিক বিচলনসমূহের বিভিন্ন প্যারামিটারের বিভিন্ন অনুকল্পিত মান গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন অনুমান পরখ করে দেখা। অতিসম্প্রতি এ ব্যাপারে অ-সংঘর্ষমান (non-colliding) তথা মিথস্ক্রিয়া করে না এমন কণাদের মাধ্যম বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আপাত ভরহীন নিউট্রিনো কণার যদি কিছু পরিমাণ অশূন্য নিশ্চল ভর (non-zero rest mass) থেকে থাকে তাহলেও বিজ্ঞানীদের কাছে অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে।

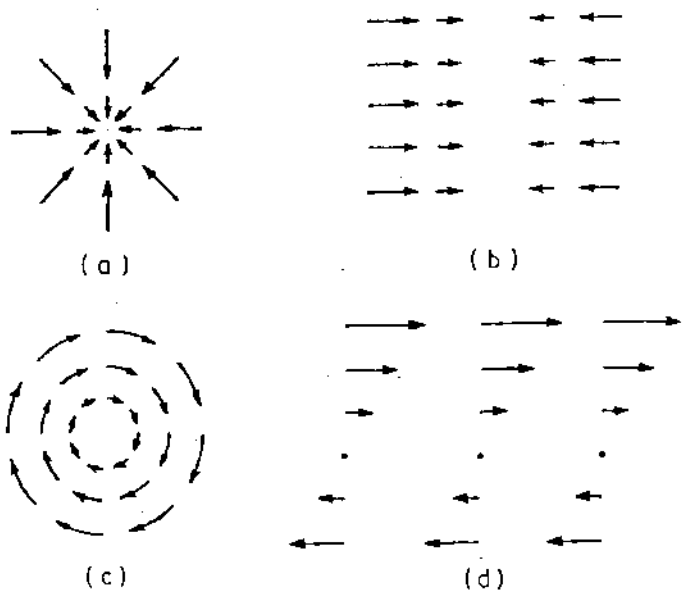

চিত্র ৪.১৪ : বিভিন্ন ধরনের বিক্ষোভে পদার্থের গতিবেগের প্রকৃতি (a) ও (b) হলো পদার্থের ঘনত্বের বিক্ষোভের ফলে সৃষ্ট বেগের প্রকৃতি। (c) ও (d) হলো ঘূর্ণিগতি (vortex) যা ঘনত্বের কোনো বিচলন ঘটায় না।

রুদ্ধতাপীয় বিচলনের বিবর্তন : আমরা আগেই বলেছি, এ ধরনের বিচলন পদার্থ তথা প্লাজমা ও বিকিরণ উভয়ের মিলিত ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। উত্তপ্ত বিশ্বে রুদ্ধতাপীয় বিচলনের আচরণ ও এর বিবর্ধন (growth) নিয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানী ইয়াকভ বরিসোভিচ জেলদোভিচ (Zel'dovich) ও তাঁর সহকর্মীরা অনেক গবেষণা করেছেন।

আমরা আগেই দেখেছি জীনসের সংকট দৈর্ঘ্য মাধ্যমের ঘনত্ব এবং ঐ মাধ্যমে শব্দের বেগের উপর নির্ভরশীল। মহাবিশ্বের প্রাথমিক যুগে যখন পদার্থ ও বিকিরণ দৃঢ়ভাবে যুগলায়িত

(strongly coupled) ছিল তখন কার্যকর চাপ ছিল বিকিরণ বা ফোটন চাপ। ফলে শব্দের বেগও ছিল অত্যুচ্চ ($u = c/\sqrt{3}$)। ফলে জীন্সের দৈর্ঘ্য ছিল অনেক বড়। দেখানো যায় যে, এই দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান দৈর্ঘ্যের সমান ছিল অর্থাৎ সৃষ্টির পর থেকে আলো যতোখানি দূরত্ব অতিক্রম করেছিল জীন্সের দৈর্ঘ্য ছিল তারই সমান।[1] দৃশ্যমান দিগন্তের সাথে জীন্সের দৈর্ঘ্যের সমান হয়ে যাওয়ার তাৎপর্য এই যে, তখন আর আদি ক্ষুদ্র বিচলনগুলো মাধ্যমের খণ্ডীকরণ (fragmentation) ঘটাতে পারে না। এবার আমরা দেখব কিভাবে রুদ্ধতাপীয় বিচলনগুলো সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। আদিম বিশ্বে মহাকর্ষীয় অস্থিতির আচরণ পরখ করতে হলে আমাদের জানতে হবে জীন্স ভর (r_J ব্যাসার্ধের গোলকের ভর) কিভাবে সময়ের সাথে রূপান্তরিত হয়। কাজেই সে সময়ে ফোটন চাপের প্রাধান্যের কারণে ঘনীভূত এলাকা (যার আকৃতি দৃশ্যমান দিগন্তের চেয়ে বেশি ছিল কারণ অস্থিতির জন্য $r > r_J$ প্রয়োজন) যদিও নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত হচ্ছিল, কিন্তু খণ্ডিত হতে পারছিল না। এর কারণ বাইরের অবিচলিত এলাকার চেয়ে ঐ এলাকার অতিরিক্ত ঘনত্ব, বেগ এবং সর্বোপরি স্থানের বক্রতা ছিল কম। অন্যদিকে r_{hor} সময়ের সাথে বাড়ছিল এবং এক সময়ে এটা আমাদের আলোচনাধীন ঘনীভূত এলাকার চেয়েও বড় হয়ে ওঠে। এরপর কি ঘটে?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের চিত্র ৪.১৫-এর গ্রাফের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। এখানে ভূমির সমান্তরাল অক্ষে সৃষ্টির পর থেকে অতিবাহিত সময় এবং লম্বদিকে জীন্সের ভর প্লট করা হয়েছে। এখানে গাঢ়, আনত রেখা M_{Jeans} নির্দেশ করছে। লক্ষণীয় যে, যেসব ঘনীভূত এলাকার ভর M_{Jeans} এর চেয়ে বেশি তারাই সময়ের বিবর্তনে বিবর্ধিত হয় (এবং এরা M_{Jeans} রেখার উপরের ভাগটি নির্দেশ করছে ; M_{Jeans} এর নিচে যাদের অবস্থান তাদের কখনো বিবর্ধন ঘটে না)। এই রেখা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বের বয়স যখন মাত্র এক সেকেন্ড তখন M_{Jeans} সূর্যের চেয়ে কম ভারি ছিল। প্রসারণের সাথে সাথে এর বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং যেকোনো সময় t_1 এ পৌঁছে। এ পর্যন্ত এই বিচলনের বিস্তার (amplitude) ছোট এবং চতুষ্পার্শ্বের মাধ্যম থেকে এটি বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। t_1 সময় পর যদি কোনো বস্তুপিণ্ডের ভর C রেখা বরাবর হয় তাহলে সেটি M_{Jeans} এর কম হয়ে যায়। ফলে কোনো বিবর্ধন ঘটে না। এবং বিবর্ধনটি একটি শব্দতরঙ্গে (acoustic wave) পরিণত হয়। যদি সান্দ্র অবদমন (viscous damping) অগ্রাহ্য করা যায় তাহলে দেখা যায় এই শব্দতরঙ্গের বিস্তার অভিন্ন থাকে। এর কারণ ঘনীভূত পদার্থ ফোটনের কাছে অনচ্ছ থাকা

---

[1] যদি তাবল হুবল H এবং বিশ্বের সংকট ঘনত্ব হয় ρ_{crit} তাহলে : $H^2 = 8\pi G\rho_{crit}/3$ ফ্রিডমানের তত্ত্ব অনুযায়ী এই সূত্র সত্য। যদি পদার্থের ঘনত্ব সংকট ঘনত্বের সমান হয় তাহলে শুধু ρ লিখলেই চলে এবং আদি মুহূর্তে এই অবস্থাই ছিল। আমরা আরো জানি যে, বিশ্বের বয়স $t = \frac{1}{H}$ তাহলে লেখা যায়। $= \{3/(8\pi\rho G)\}^{1/2}$। এখন যেহেতু $u=c$ কাজেই $r_J = u/(\frac{8}{3\pi\rho G})^{1/2} = ct = r_{hor}$। অর্থাৎ জীন্সের দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান দিগন্তের সমান হয়।

সত্ত্বেও কিছু ফোটন বেরিয়ে যায় এবং এর ফলে তরঙ্গ স্পন্দন শক্তি হারায়। ছোট বিচলন সাধারণত অপচয়ী (dissipative) হয়ে থাকে ; কিন্তু ব্যাপক কাঠামোর বিচলনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

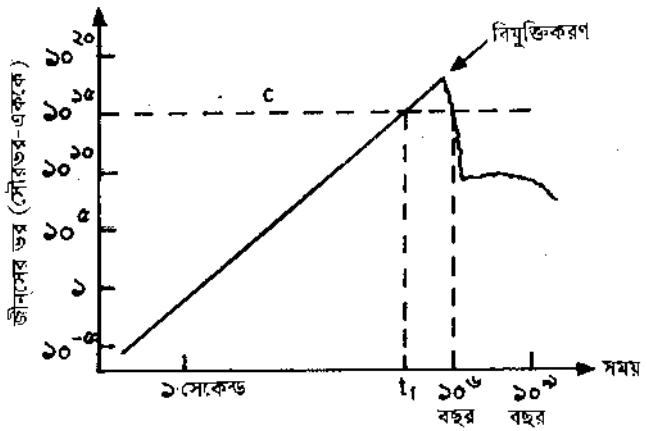

চিত্র ৪.১৫ : রুদ্ধতাপীয় বিচলনের অধীনে বিশ্বের বিবর্তনের বিভিন্ন দশা নির্দেশকারী গ্রাফ।

যাহোক প্রসারমান বিশ্বের তাপমাত্রা যখন ৪০০০ কেলভিনের নিচে নেমে আসে তখন ঘটে এক নাটকীয় পরিবর্তন। এ সময়ে আয়নিত প্লাজমা ও বিকিরণের মধ্যবর্তী মিথস্ক্রিয়া ভেঙে পড়ে এবং বিশ্ব স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্ত মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারিত হতো ফোটন চাপ দ্বারা, কিন্তু এখন আর তা সম্ভব হয় না। ফলে কার্যকর চাপ হয় শুধু সাধারণ গ্যাসের চাপ যার শব্দের বেগ অনেক কম। ফলে M_{Jeans} হঠাৎ করে কমে যায় (গ্রাফ দ্রষ্টব্য)। পদার্থ ও বিকিরণের বিযুক্তকরণের যুগে গ্যাসের চাপ ফোটন চাপের ১০^৯ কম হয় (অন্যদিকে ফোটন সংখ্যা ও প্রশম পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত, $n_\gamma/n_a = 10^9$)। ফলে শব্দের বেগ $\sqrt{১০^৯}$ গুণ কমে যায়। এতে করে জীনসের দৈর্ঘ্য একই অনুপাতে কমে কিন্তু M_{Jeans} কমে এর তৃতীয় ঘাতে, অর্থাৎ $(১০^৯)^{৩/২}$ গুণ। ফলে বিযুক্তকরণের পর $M_{Jeans} \approx 10^5$ সূর্যভর হয়।

মহাকর্ষীয় অস্থিতির কারণে যাদের ভর ১০^৫ সূর্যভরের চেয়ে বেশি তাদের বিবর্ধন হতে থাকে। আগেই বলেছি, শক্তির অপচয়নের ফলে ক্ষুদ্র বিচলনসমূহ মিলিয়ে যায় এবং আরো দেখানো যায় যে এভাবে ১০^১৩ থেকে ১০^১৪ সূর্যভরের কম ভরের বিচলনসমূহও মিলিয়ে যায়। জোসেফ সিল্ক এবং জি. চিবিশভ এসব গণনা করে দেখিয়েছেন। এভাবে দেখা যায় বিশ্বে প্রসারণের প্রথম ১ মিলিয়ন বছরে ব্যাপক কাঠামো (যেমন ছায়াপথের স্তবক ও মহাস্তবক) তৈরির মতো ঘনত্ব বিচলন তৈরি হয়েছিল। এই অনুমানের প্রধান কল্পনা হলো প্রারম্ভিক রুদ্ধতাপীয় বিচলনের উপস্থিতি।

এনট্রপি বিচলনের বিবর্তন : এ ধরনের বিচলনে শুধু পদার্থই বিক্ষুব্ধ (fluctuated) হয়, বিকিরণ সর্বত্র সুষম থাকে। অর্থাৎ বিকিরণ সমুদ্রে প্লাজমার ঘনীভবন ও লঘুকরণ (condensation and rarefaction) এনট্রপি বিচলনের কারণ ঘটায়। যেহেতু ফোটন ও প্রোটন সংখ্যার ঘনত্বের অনুপাতকে (আপেক্ষিক) এনট্রপি বলে এবং যেহেতু স্থানভেদে প্রোটনের সংখ্যাঘনত্বের তারতম্য ঘটে তাই এর নাম এনট্রপি বিচলন। মজার ব্যাপার হলো, প্লাজমা বিচলনসমূহ পটভূমির বিকিরণের মাঝে অবিচলিত অবস্থায় থাকে এবং এদের শক্তির অপচয় অথবা প্রাবল্য বৃদ্ধি কোনোটাই ঘটে না। যেহেতু ফোটনের ঘনত্ব সর্বত্র একই ছিল সেহেতু তাদের পরিবর্তন ঘটারও কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সূর্যভরের সমান প্লাজমা ঘনীভবনসমূহ মিলিয়ে গেলেও বড় আকৃতির ঘনীভবনসমূহ বিযুক্তকরণ কাল পর্যন্ত টিকে থাকে। বিযুক্তকরণের পরে মহাকর্ষীয় অস্থিতির কারণে যে সমস্ত অঞ্চলের ভর প্রায় ১ মিলিয়ন সূর্যভরের বেশি থাকে তারা বিবর্ধিত হতে শুরু করে। এদের আকৃতি অনেকটা গোলকাকার। সময়ের সাথে এদের তাপমাত্রাও কমতে থাকে। এই শীতলীকরণের ফলে গ্যাসমেঘ ছোট ছোট ঘনীভূত অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরাই ভ্রূণনক্ষত্র গঠন করে। এরপরে এ সমস্ত ভ্রূণতারামেঘ একত্র হয়ে নক্ষত্রের (গুচ্ছ)স্তবকের সৃষ্টি করে।

১৯৬৮ সালে পিবল্‌স এবং ডিকি এই অনুমান প্রস্তাব করেন। এই মত অনুযায়ী প্রথমে তারার গুচ্ছস্তবক, তারপর ছায়াপথ, ছায়াপথস্তবক ইত্যাদি তৈরি হয়। আবার গুচ্ছস্তবকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এরাই ছায়াপথের প্রাচীনতম তারা। তাছাড়া বিভিন্ন ছায়াপথের গুচ্ছস্তবকের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট মিল। এনট্রপি বিচলনের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র গুচ্ছস্তবকদের বন্টন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু অব্যাখ্যাত সমস্যাও আছে : ছায়াপথের বিপুল ভর ও ঘনত্ব ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না ; তাছাড়া বিভিন্ন গুচ্ছস্তবকের প্রকৃতির মধ্যেও যথেষ্ট অমিল লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া গুচ্ছস্তবকদের কেবল ছায়াপথের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এনট্রপি বিচলন অনুযায়ী গুচ্ছস্তবকদের কেবল ছায়াপথের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এনট্রপি বিচলন অনুযায়ী গুচ্ছস্তবকদের আন্তঃছায়াপথীয় স্থানেও দেখা যাবার কথা[৮]। ঘনত্ব বিচলনের প্রকৃত রূপটি রুদ্ধতাপীয় না এনট্রপির তা সুস্পষ্ট জানতে হলে আমাদের যথেষ্ট সূক্ষ্মতায় পটভূমি বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কারণ রুদ্ধতাপীয় বিচলনের ফলশ্রুতি হিসেবে পটভূমি বিকিরণে অবশ্যই অসমতা থাকতে হবে। কিন্তু মনে হয় পটভূমি বিকিরণ একেবারেই কাঠামোবিহীন (প্রায় $১০^{-৪}$ ভাগ পর্যন্ত)। এর অর্থ এই যে, বিযুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত বিচলনসমূহ খুবই ক্ষুদ্র ছিল। কারণ তা না হলে এদের মধ্যে আবদ্ধ তাপের জন্য বর্তমানে দৃষ্ট পটভূমি বিকিরণের মান স্থানবিশেষে বেশি হতো।

---

৮. লক্ষণীয়, যে কোনো ঘনত্ব বিচলনের আকৃতি জীন্‌সের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল। একে বিচলন বর্ণালি (perturbation spectrum) বলে। যদি বড়ো স্কেলের বিচলন ক্ষুদ্র স্কেলের চেয়ে দুর্বল হয় তাহলে তাকে নিম্নমুখী (falling) বর্ণালি বলে। এনট্রপি বিচলন মূলত নিম্নমুখী বর্ণালির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ছায়াপথের স্তবক বা মহাস্তবকের মতো বিশাল ভর বিশিষ্ট ঘনত্ব বিচলনও অনুমান করা যেতে পারে।

সংক্ষেপে যা জানা গেল তা হলো এই যে, বিযুক্তকরণের পর রুদ্ধতাপীয় বিচলনের বিবর্ধনের ফলে ন্যূনতম খণ্ডের ভর একটি বড় ছায়াপথ বা ছায়াপথস্তবক হতে পারে। অন্যদিকে এনট্রপি বিচলনের দরুন সৃষ্ট ন্যূনতম খণ্ডের ভর গুচ্ছস্তবকের সমান হয়।

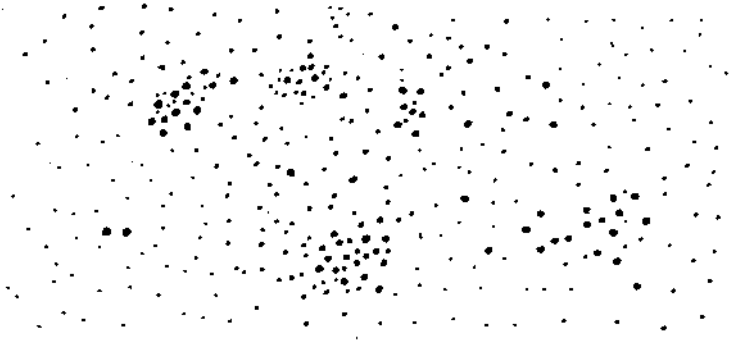

চিত্র ৪.১৬ : এনট্রপি বিচলন : ছোট ফুটকি দিয়ে ফোটন বুঝানো হয়েছে যা সুষমভাবে বণ্টিত। বড় ফুটকি দিয়ে পদার্থের উপস্থিতি বুঝানো হয়েছে যা বিক্ষিপ্তভাবে জড়ো হয়েছে।

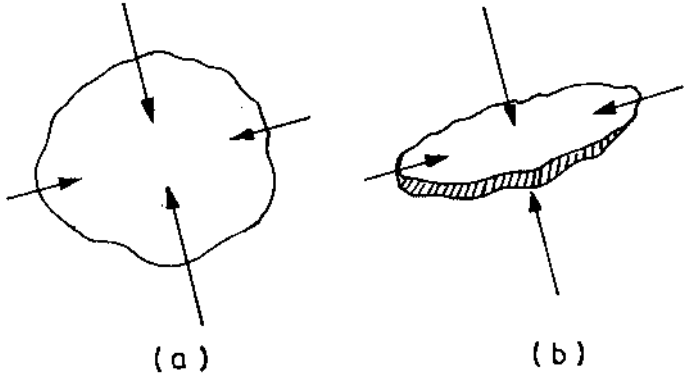

চিত্র ৪.১৭ : রুদ্ধতাপীয় তত্ত্বানুযায়ী কোনো ভরপিণ্ডের সংকোচন. (a) সংকোচনের প্রাথমিক দশা. বিভিন্ন দিকে বেগের প্রকৃতি বিভিন্ন (b) পরিণত প্যানকেক।

'প্যানকেক' তত্ত্ব : আমরা দেখেছি যে বিযুক্তকরণ কালের পর $১০^{১৬}$ সূর্যভরের কম বিচলিত অঞ্চলকে অবদমন প্রক্রিয়া মসৃণ করে ফেলে। উপস্থিত ঘনীভূত এলাকাসমূহের ভর $১০^{১৬}$ সূর্যভরের কাছাকাছি ছিল। যেহেতু এ সকল ভরপিণ্ডের ভর $১০^{৫}$ সূর্যভরের অনেক বেশি তাই চাপের প্রাধান্য বজায় থাকতে পারেনি। এই শর্তসমূহের অধীনে বিশ্বের প্রথম বস্তুসমূহ আকৃতি পায়। মজার ব্যাপার এই যে, এইসব ঘনীভূত খণ্ডের আকৃতি মোটেই বর্তুলাকার (spherical) ছিল না ; বরঞ্চ এরা ছিল দুই মাত্রার চ্যাপ্টা আকৃতির 'প্যানকেক'

(two dimensional oblate 'pancakes')[৯]। সংকোচনশীল, ঘনীভূত একখণ্ড ভরপিণ্ডের কথা চিন্তা করা যাক। সাধারণভাবে এই ভরপিণ্ডের বিভিন্ন অংশের সংকোচন বেগের উপাংশগুলো সমান থাকে না। এর কোনো অংশে চলে ঘনীভবন, কোনো অংশে আবার প্রসারণ প্রাধান্য পায়। যাহোক কোনো একটি নির্দিষ্ট দিকে সংকোচনের বেগ সর্বাধিক থাকে। এখন যদি হঠাৎ মহাকর্ষ বন্ধ করে দেওয়া যায় তাহলে যেহেতু চাপজনিত কোনো বাধা নেই সেহেতু সংকোচন চলতেই থাকে। কারণ গ্যাসকণাগুলো তাদের জড়তার জন্য গতীয়মান থাকে এর ফলে গ্যাসমেঘের আকৃতি চ্যাপ্টা প্যানকেকের মতো হয়ে যায় (অপ্রতিসম বেগ বন্টনের জন্য)। এখন মহাকর্ষকে পুনরায় চালু করলেও এটা ঐ চ্যাপ্টা আকৃতির সামান্যই পরিবর্তন আনতে পারবে। কারণ সুষম বর্তুলাকার বন্টনের ক্ষেত্রে মহাকর্ষ যেমন বাধাহীনভাবে বাড়ে, একমাত্রিক পতনের ক্ষেত্রে তেমনটি হয় না। এটা শুধু সংকোচন বেগকে কিছুটা বাড়িয়ে তুলতে পারে। পদার্থ-বিকিরণ বিযুক্তকরণের পর বিশ্ব যথেষ্ট শীতল হয়ে আসে এবং ইলেকট্রন পরমাণুর কক্ষে আবদ্ধ হয়ে প্রশম পরমাণু গঠন করে। প্রবাহীর (fluid) পদ্রতা হঠাৎ করে দ্রুত কমে আসে এবং বিকিরণযুগের বিক্ষোভগুলি বিবর্ধিত হতে থাকে। এখান থেকে মহাকর্ষীয় অস্থিতি পুরোদমে চলতে থাকে। বিকিরণ চাপের হঠাৎ অনুপস্থিতি বিশ্বে আবির্ভূত প্রথম কাঠামোর আকৃতি নির্ধারণে সাহায্য করে। তাপীয় চাপ দিক নিরপেক্ষ থাকে, অর্থাৎ সকল দিকেই এটা সমান চাপ দেয়। তাই তাপীয় চাপ ও মহাকর্ষ সমানে সমান থাকলে একটি ঘনকাকার (cube) পদার্থ ঘনীভূত হয়ে গোলকের সৃষ্টি করবে। কিন্তু বিচলনসমূহের বিশাল ব্যাপ্তির কারণে চাপের প্রাধান্য বজায় থাকে না। এ কারণে মহাকর্ষ পদার্থকে বিনা বাধায় সংকুচিত এবং ঘনীভূত করতে সক্ষম হয়। ধরা যাক স্থানের তিন অক্ষের যেকোনো একটি অক্ষ বরাবর পদার্থকে সংকুচিত বা লঘুকৃত করা যায়। আরো ধরা যাক যেকোনো একটি অক্ষ বরাবর পদার্থের সংকুচিত হবার সম্ভাবনা ১/২। তাহলে কোনো অক্ষ বরাবর গ্যাসের বা পদার্থের সংকুচিত না হবার সম্ভাবনা $(^1/_2)^3 = {}^1/_8$। কাজেই যে সমস্ত অঞ্চল ঘনীভূত হবে সেখানে সকল পদার্থের ৭/৮ অংশ থাকে। এই অঞ্চলসমূহ পদার্থের ক্ষুদ্র বুদবুদকে (bubble) ঘিরে থাকে এবং ঐ বুদবুদের পদার্থ কখনোই সংকুচিত হবে না। এই বুদবুদগুলোই পরবর্তীতে শূন্যস্থানে (void) পরিণত হয়। মহাকর্ষীয় আকর্ষণে ঘনীভূত অঞ্চলসমূহ সমগ্র আয়তনের মাত্র ১/৮ অংশ অধিকার করে থাকে এবং ঐ বুদবুদগুলো, যাতে পদার্থের মাত্র ১/৮ অংশ থাকে, সমগ্র পদার্থের ৭/৮ অংশ দখল করে ফেলে। ফলে প্রাথমিক অবস্থার টপোলজি অক্ষুণ্ণ থাকে। এবং এভাবে মহাবিশ্বে সুন্দর কোষ-কাঠামোর উদ্ভব হয়। এভাবে দেখানো যায় কোনো ঘনকাকার পদার্থ-সংগ্রহ প্রথমে নির্বিচারে চয়িত কোনো একটি অক্ষ বরাবর সংকুচিত হওয়া শুরু করে। অন্য দুই অক্ষ বরাবর এটি সংকুচিত বা প্রসারিত হতে পারে, তবে তা বেশ ধীর গতিতে হয়ে থাকে। এভাবে 'প্যানকেক' আকৃতির পদার্থ-সংগ্রহের সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে সৃষ্ট প্যানকেকগুলো পৃথক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ

৯. প্যানকেক চ্যাপ্টা পিঠা বিশেষ। অনেকটা আমাদের দেশের পাটিসাপটার মতো।

থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে এদের বিবর্ধনের ফলে এরা পরস্পরের সাথে মিলিত হতে শুরু করে। এরা পরস্পরকে যেখানে ছেদ করে সেখানেই ঘনীভবন শুরু হয় এবং অন্যত্র শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়। এভাবে এ তত্ত্বমতে দেখা যায় যে মহাবিশ্বে কোষকাঠামোর সৃষ্টি অনেক পরে হয়েছে এবং দূর-ভবিষ্যতে পদার্থ আরো ঘনীভূত অংশে জমা হতে পারে, ফলে কোষকাঠামো তখন হয়ত আর থাকবে না।

কাজেই বিশ্বে প্রথম সৃষ্ট বস্তু ছিল $১০^{১৬}$ সূর্যভর বিশিষ্ট প্যানকেক আকৃতির বস্তু। পরবর্তীতে এই প্যানকেকের ভেতরে সংকোচনের ফলে চাপ যথেষ্ট বেড়ে যায়। এই চাপ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠার আগেই বিশেষ একটি ঘটনা ঘটে। যখন ভেতরের গ্যাসের পতন বেগ কণার তাপীয় বেগের সমান হয় অর্থাৎ ঐ মাধ্যমের শব্দের বেগের সমান হয় তখন অভিঘাত তরঙ্গের (shock wave) সৃষ্টি হয়। সমগ্র গ্যাসের মধ্য দিয়ে এই তরঙ্গ সঞ্চালিত হতে থাকে যার ফলশ্রুতিতে গ্যাসের চাপ, তাপমাত্রা ও ঘনত্ব হঠাৎ কমে যায়। সংকোচনের ফলে প্যানকেকের কেন্দ্র বেশি ঘনীভূত হয়ে পড়ে এবং এখানে সংকোচন ধীর হয়ে যায়। অন্যদিকে বাইরের দিকের পদার্থের ভেতরের দিকে পতন আগের মতো চলতেই থাকে। ফলে বহির্ভাগ ভেতরের দিকে বেশ চেপে আসে। ফলে স্তর থেকে স্তরে ঘনত্বের ও বেগের তারতম্য হয়। এতে ভেতরের স্তর অভিঘাত তরঙ্গ দ্বারা বাইরের স্তর থেকে আলাদা হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এই অভিঘাত তরঙ্গের মধ্য দিয়ে ভেতরের গ্যাস বাইরে বেরিয়ে যায়। গ্যাসের গতিশক্তি তাপে পরিণত হয় এবং তা বহির্ভাগে বাহিত হয়। তাছাড়া গ্যাসের প্রকৃতি অনিয়মিত (turbulent) হয়ে পড়ে। এভাবে প্যানকেকের কেন্দ্রীয় অংশ শীতল হয়ে খণ্ডিত হয়ে যায় এবং এভাবে তারার জন্ম হতে পারে। কিন্তু বহির্ভাগের উত্তপ্ত গ্যাস শীতল হবার সময় পায় না বলে এরাই বর্তমানে দৃষ্ট উত্তপ্ত আন্তঃস্তবক গ্যাস তৈরি করে। রুদ্ধতাপীয় বিচলনে প্রাথমিকভাবে কোনো ঘূর্ণন না থাকলেও প্যানকেকের অভিঘাত তরঙ্গের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকালে গ্যাস অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এভাবেই বোধহয় ছায়াপথের ঘূর্ণন ব্যাখ্যা করা যায়। প্যানকেক এবং তা থেকে ছায়াপথের উদ্ভবকালে খুব সম্ভবত রক্তিমসরণের মান ১০ থেকে ৪ এর মধ্যে ছিল।

প্যানকেক তত্ত্বটি মূলত জেলদোভিচের অবদান। একে সম্প্রসারিত করে দেখানো যায় যে এটি মহাস্তবকের সূতাকৃতি এবং কোষ-কাঠামোর (cell-structure) সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। মূল তাত্ত্বিক মডেলটি জটিল গণিত এবং কম্পিউটার সিমুলেশন ব্যবহার করে করা হয়। এখানে নিউট্রিনোর অশূন্য ভর কল্পিত হয়েছে। প্যানকেক তত্ত্বের প্রথম দিককার রূপরেখায় কিছু অসঙ্গতি ছিল। প্রথমত, বিকিরণ যুগের পরে অবশিষ্ট থাকবে এ রকম বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের ভর সূর্যের $১০^{১৬}$ গুণের মতো হবে। কিন্তু ছায়াপথসমূহের কাঠামো এর চেয়েও বড় স্কেলে দেখা গেছে এবং কম্পিউটারে করা নিউমেরিকাল সিমুলেশনে প্রাপ্ত বিক্ষোভের ন্যূনতম ভর সূর্যের $১০^{১৫}$ থেকে $১০^{১৬}$ গুণ হবে। দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক তত্ত্বমতে পটিভূমি বিকিরণে যে পরিমাণ বিচ্যুতি থাকার প্রয়োজন ছিল পর্যবেক্ষণে তা পাওয়া যায়নি। তাই প্যানকেক তত্ত্বের সংশোধনের জন্য অদৃশ্য বস্তুর উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আর তাই প্যানকেক তত্ত্বে নিউট্রিনোর অশূন্য ভরের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। আশার কথা এই যে, আজকাল বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে নিউট্রিনোর $১০^{-১১}$ জি.ই.ভি. (GeV) এর সমান নিশ্চল ভর আছে। অবশ্য সুনিশ্চিত প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। নিউট্রিনোর ভরযুক্ত হওয়ার একটি সুন্দর প্রতিক্রিয়া আছে। যেহেতু নিউট্রিনো অধিকাংশ কণার সাথে কোনো বিক্রিয়া করে না, তাই এরা ফোটনেরও আগে পদার্থ–বিকিরণ ফ্লুইডের মধ্য দিয়ে অবাধে (আলোর বেগে) ছুটতে শুরু করে। ফলে এরা ফোটনদের চেয়েও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে। বিকিরণ যুগের পর এরা বড় স্কেলের বিক্ষোভকে অবদমিত করে

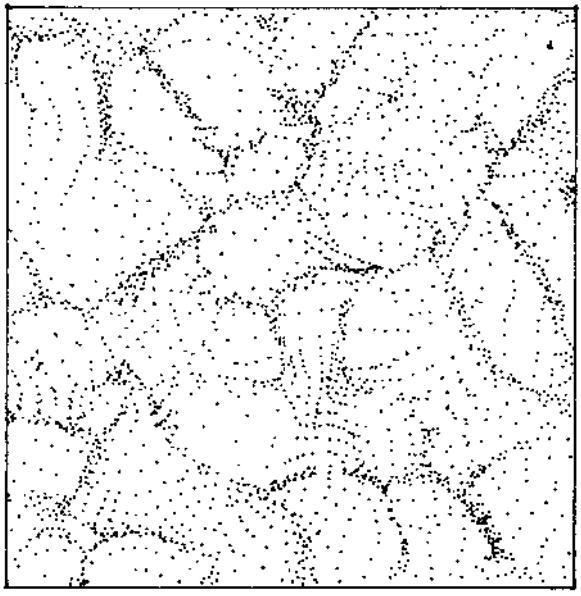

চিত্র ৪.১৮ : কম্পিউটার সিমুলেশনে দেখা প্যানকেক, এখানে প্যানেককসমূহের ধার বরাবর দেখা যাচ্ছে, যেখানে পদার্থ কণাসমূহ জড়ো হয়েছে।

ফেলে। কিন্তু ভরযুক্ত নিউট্রিনোর পক্ষে এভাবে অবাধে ছুটে চলা সম্ভব নয়। ফোটনের শক্তি-ঘনত্ব যখন নিউট্রিনোর নিশ্চল ভরের নিচে নেমে যায় তখন এদের গতি ধীর হতে থাকে। এভাবে এরা ছোট অঞ্চলের বিক্ষোভ দূর করে দিলেও খুব বড় অঞ্চলের বিক্ষোভ দূর করতে পারে না। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে নিউট্রিনো ফাঁদে পড়ার আগেই সর্বোচ্চ যে দূরত্ব অতিক্রম করে (এটাই অদৃশ্যীভূত বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের ন্যূনতম স্কেল) তাহলো প্রায় ১০ কোটি আলোকবর্ষ এবং এ অঞ্চলের ভর হলো $১০^{১৫}$ থেকে $১০^{১৬}$ সূর্যভর। এভাবে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ছায়াপথের মহাস্তবকসমূহের দৃশ্যমান ভর ও আকৃতির সাথে তাত্ত্বিক হিসাব মিলে গেছে। প্যানকেক তত্ত্বের এই নতুন রূপটি ছায়াপথে অদৃশ্য বস্তুর উপস্থিতির সুন্দর

ব্যাখ্যা দেয়। প্যানকেকের মহাকর্ষীয় পতনের ফলে অধিকাংশ নিউট্রিনো আন্তঃছায়াপথীয় স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, কারণ মহাকর্ষীয় পতনের ফলে নিউট্রিনো কণিকার বেগ প্রায় ১০০০ কি.মি./সে. হয়। অন্যদিকে প্যানকেকের কেন্দ্রীয় তলের কাছাকাছি অবস্থিত নিউট্রিনোগুলো ধীরবেগসম্পন্ন হয় (কারণ মহাকর্ষীয় পতনজনিত ত্বরণ এখানে কম)। প্যানকেকের এই অংশে ভ্রূণছায়াপথের সৃষ্টি হয় এবং পদার্থের জোট কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে নিউট্রিনোগুলো জড়ো হতে থাকে। ভ্রূণছায়াপথের প্রান্তস্থিত নিউট্রিনোগুলো ঘনীভূত হয় না, এরাই ছায়াপথের ভারি কিরীটের অদৃশ্য বস্তু তৈরি করে। প্যানকেক তত্ত্বের একটি সমস্যা হলো এই যে, যদি ধরে নেওয়া হয় যে স্থানীয় ছায়াপথদের সৃষ্টি হয়েছে কোনো প্যানকেক থেকে তবে স্থানীয় ছায়াপথগুচ্ছকে একটি সাম্প্রতিক কাঠামো হতে হবে ; অর্থাৎ গুচ্ছটি নতুন সৃষ্ট এবং খুব একটা প্রাচীন নয়। কিন্তু তাহলে ছায়াপথগুচ্ছের সদস্য অধিকাংশ প্রাচীন ছায়াপথগুলোর উদ্ভবের কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। অনেকে মনে করেন, প্রথম প্রজন্মের পর সম্ভবত আরেকটি দ্বিতীয় প্রজন্মের প্যানকেকও তৈরি হয়ে থাকতে পারে। এ সমস্ত সমস্যার কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধান এখনো পাওয়া যায়নি।

এতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে প্রারম্ভিক বিচলন যদি রুদ্ধতাপীয় হয় তবে প্যানকেক আকৃতির ভরপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। এরা পরে ছায়াপথস্তবক এবং মহাস্তবক তৈরি করে। এরপর খণ্ডীকরণের ফলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর কাঠামোসমূহ তৈরি হয়। একে বলে টপ ডাউন মডেল। অন্যদিকে এনট্রপি বিচলনে প্রথমে সৃষ্ট বস্তু হলো গুচ্ছস্তবক ; পরবর্তীতে একীভবনের মাধ্যমে এ থেকেই ছায়াপথ, ছায়াপথস্তবক তৈরি হয়। একে বটম আপ মডেল বলে। সম্প্রতি দেখা গেছে, ছায়াপথসমূহ বটম-আপ মডেল অনুযায়ী বিবর্তিত হয়েছে। আমাদের সবচেয়ে কাছের মহাস্তবক ভার্গো থেকে যদি অন্যান্য ক্ষুদ্রতর ছায়াপথসমূহ তৈরি হতো তবে বর্তমানে দেখা যেতো যে অন্যান্য ছায়াপথ ভার্গো থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাছাড়া আমাদের ছায়াপথে বয়স্ক লাল তারার উপস্থিতি দেখে মনে হয় যে এটি অনেক আগেই, বিশেষ করে স্থানীয় স্তবকটি তৈরির আগেই তৈরি হয়েছে। এবং দেখা গেছে যে বর্তমানে এই স্তবকটি তৈরির পথে। এসবই বটম-আপ মডেলের সপক্ষে রায় দেয়। এই মডেল অনুযায়ী কয়েকটি নক্ষত্রস্তবক মিলিত হয়ে ছায়াপথ সৃষ্টি করেছে ; অতঃপর কয়েকটি ছায়াপথ একত্রিত হয়ে গঠন করেছে ছায়াপথগুচ্ছ ; এবং তারপর ছায়াপথগুচ্ছ মিলিত হয়ে তৈরি করেছে ছায়াপথস্তবক। অধিকাংশ জ্যোতির্বিদই এই মত সমর্থন করছেন। কাজেই টপ-ডাউন মডেল এবং সেই সাথে রুদ্ধতাপীয় উষ্ণ অদৃশ্য বস্তুর অনুকল্পকেও বাদ দিতে হচ্ছে বলে মনে হয়।[১৬] মহাবিশ্বে ব্যাপক কাঠামো তৈরির ব্যাপারে আমাদের অদৃশ্য বস্তুর (dark matter) কথাও বিবেচনা করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৭.৫ দ্রষ্টব্য)। এই অদৃশ্য বস্তু বা লুকানো ভর খুব সম্ভবত বিশেষ ধরনের মৌলিক কণারূপে বিদ্যমান বলে মনে হয়। কাজেই বিকিরণ

১৬. দেখুন Peebles (1993) ও Henry *et al* (1998)।

ক্ষেত্র থেকে এরা কিভাবে বিযুক্ত হলো তা জানা দরকার। অদৃশ্য বস্তু আবার দুরকমের- উষ্ণ বস্তু (Hot/Warm Dark Matter, HDM) এবং শীতল বস্তু (Cold Dark Matter, CDM)। উষ্ণ বস্তু হলো অপেক্ষাকৃত নিশ্চল ভরের নিউট্রিনো। অন্যদিকে শীতল বস্তু হলো এমনসব কণা যারা পদার্থ ও বিকিরণের সাথে দুর্বল ভাবে মিথস্ক্রিয়া করে। কাজেই এরা প্লাজমা ও বিকিরণ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে (random) তাপীয় গতির সৃষ্টি করে এবং এভাবে এনট্রপি বিক্ষোভের সদৃশ চলন সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে নিউট্রিনোগুলো বেশ কিছুটা আগেই বিকিরণ থেকে বিযুক্ত হয়ে যায়। ফলে এরা একটি নির্দিষ্ট সংসক্ততার দৈর্ঘ্যের (coherent length) চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের বিক্ষোভ (fluctuation) দূর করে দেয়। এখন গণনায় এসব লুকানো ভর যোগ করলে উষ্ণবস্তু টপ ডাউন এবং শীতলবস্তু বটম আপ মডেল সমর্থন করে।

এ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করলাম তাহলো অর্থোডক্স বা রূপদী তত্ত্ব। এছাড়াও আরো অনেক অপ্রচলিত তত্ত্ব আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হচ্ছে মহাজাগতিক সূতা তত্ত্ব (cosmic strings)। এরা হচ্ছে ভর শক্তির সুদীর্ঘ লুপের মতো সংগঠন। এদের চারপাশে বিবৃদ্ধির (accretion) ফলে ছায়াপথস্তবক, মহাস্তবক ইত্যাদি তৈরি হয়। এ সমস্ত সূত্রের আবির্ভাব ঘটে আদি বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিশেষ ধরনের দশা পরিবর্তনের (phase transition) মধ্য দিয়ে। কিন্তু এরা মৌলিক কণা পদার্থবিজ্ঞানের বিশেষ ধরনের তত্ত্ব মেনে চলে এবং এরা একক চুম্বক মেরু (magnetic monopole) সৃষ্টি করে। বিশ্বে এদের এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সমস্যা এই যে, আমরা ঘনত্ব বিচলন থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রমাণ বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এসব ঘনত্ব বিচলনই বা জন্ম নিল কি করে? ধারণা করা হয়, মহাবিশ্বের সূচনার দশায় উদ্ভূত কোনো কোয়ান্টাম বিক্ষোভ বা কসমিক স্ট্রিং এজন্য দায়ী। কিন্তু কোয়ান্টাম বিক্ষোভের কোনো প্রমাণ পরবর্তীতে পাওয়া যায় না; অথচ কসমিক স্ট্রিং তার স্বাক্ষর রেখে যাবে পটভূমি বিকিরণের অসুষম স্তরে মাঝে। কসমিক স্ট্রিংের সম্ভাবনা নিয়ে বিশদ আলোচনার জন্য F. Bouchet *et al* (1988)। এছাড়া বিশ্বে কাঠামো তৈরির অন্যান্য তত্ত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত, সুন্দর, পাণ্ডিত্যিক আলোচনার জন্য Peebles & Silk (1988) দ্রষ্টব্য।

এতক্ষণ ছায়াপথসমূহের মধ্যে মহাকর্ষীয় মিথস্ক্রিয়ার ফলে কোনো ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে কুণ্ডলীত বাহু নিকটবর্তী অন্য কোনো ছায়াপথের আকর্ষণের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। যদিও আজকাল দেখা গেছে এ সমস্ত মিথস্ক্রিয়া যথেষ্ট দুর্লভ হয় ফলে প্রচুর কুণ্ডলীত ছায়াপথ সৃষ্টি হতে পারে। দুজন মার্কিন জ্যোতির্বিদ জুরি টুমর এবং অ্যালার টুমর কম্পিউটার ব্যবহার করে দুটি ঘূর্ণ নিকটবর্তী ছায়াপথের মাঝের মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল তিসব করেছেন। ওরা সাধারণ ভর খাটিয়ে ধরে নিয়েছেন যে মাধ্যাকর্ষীয় ভর কেন্দ্রে ঘনীভূত থাকে এবং পৃথক পৃথক কণাদের মিথস্ক্রিয়া যে হয় তা দেখা গেছে জোয়ার বলের (tidal force) কারণে এদের

দীর্ঘ বাহু নির্গত হয় এবং মূল কৌণিক ভরবেগই বক্রতার কারণ ঘটায়। মজার ব্যাপার হলো কম্পিউটার সিমুলেশনে ঠিক যেমন দুটি প্রলম্বিত, বাঁকা শুঁড় দেখা যায়; দুটি ছায়াপথ NGC 4038 ও NGC 4039 এর মিথস্ক্রিয়ায় ঠিক একই রকম শুঁড় দেখা গেছে। এদের একত্রে নাম : The Antennae (চিত্র ৪.১৮ দ্রষ্টব্য)। এক্ষেত্রে ছায়াপথ দুটির ভর প্রায় কাছাকাছি ছিল। আবার খুব ভারি ছায়াপথের সাথে কমভারি ছায়াপথেরও সংঘর্ষ ঘটতে পারে এবং সম্ভাব্য ফলাফল হিসেবে তেঁতিকে বড় ছায়াপথটি আত্মসাৎ করে ফেলে। যেমন সেন্টরাস-এ। এই

চিত্র ৪.১৯ : (ক) মিথস্ক্রিয়াশীল ছায়াপথজোড় (the Antennae) : NGC 4038, 4039

ঘটনাকে Galactic Cannibalism বলে। এ সম্পর্কে আধুনিক গবেষণা চলছে। ছায়াপথের কুণ্ডলিত বাহু বরাবর চৌম্বকক্ষেত্রও লক্ষ্য করা যায়। আমাদের ছায়াপথের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ম্যাজেলানিক মেঘপুঞ্জ দুটির উপস্থিতি কুণ্ডলিত বাহু সৃষ্টির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করা হয়।

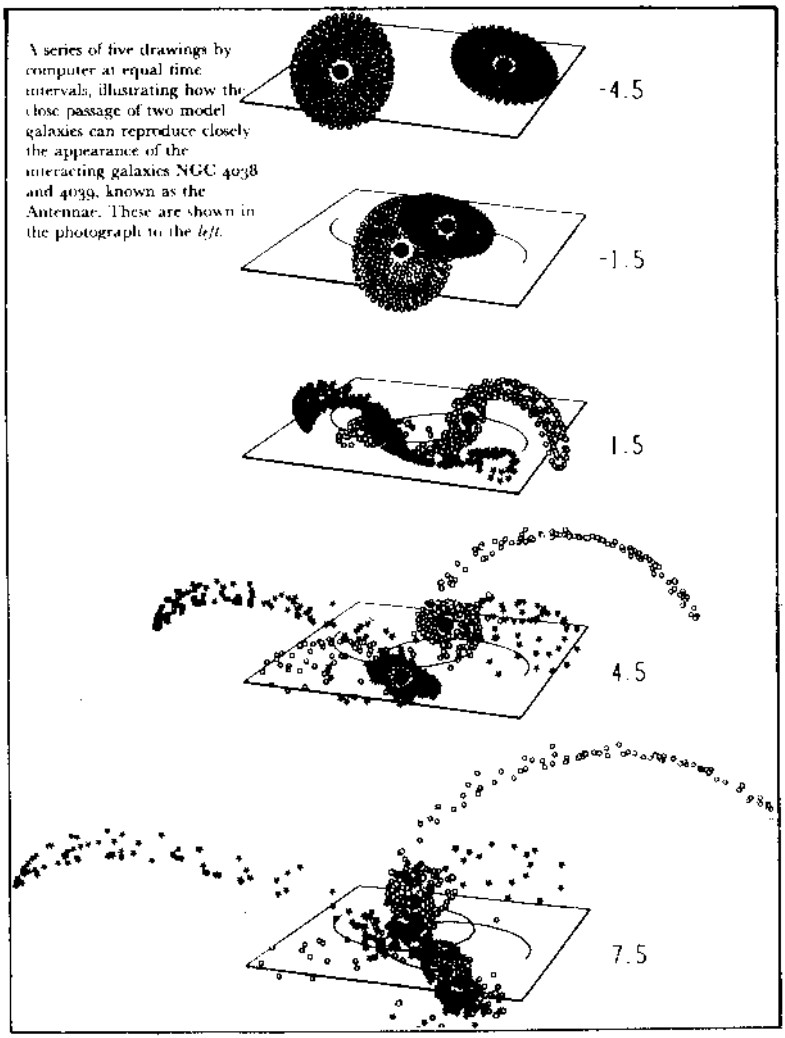

চিত্র 8.২৯ : দেখা মিথস্ক্রিয়াশীল ছায়াপথের ছবি (the Antennae) : NGC4038, 4039

এ অধ্যায়ে আমরা ছায়াপথের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান আলোচনা করেছি। মহাবিশ্বে যে কতো কোটি কোটি ছায়াপথ দেখা যায় তার শেষ নেই। কিন্তু আকৃতি প্রকৃতির দিক দিয়ে এদেরকে কতোটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ছায়াপথসমূহের ভর, ঘনত্ব ও দূরত্ব আমরা নির্ণয় করতে

পেরেছি। তাছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ছায়াপথের উদ্ভব। কি করে ছায়াপথের জন্ম হলো তা এক বিশাল কাহিনী, যদিও এটি এখনো অনিশ্চিত রয়ে গেছে। ছায়াপথসমূহের রয়েছে আবার স্তবক ও মহাস্তবক। কাঠামো'র এমন শৃংখলাপূর্ণ বিন্যাস বিশ্বের নন্দনতত্ত্বকে চমৎকারীত্ব দান করেছে। ভাবতে অবাক লাগে, অণু-পরমাণুর জগতে যেমন সুশৃংখল কাঠামো দেখা যায় তেমনি ছায়াপথের জগৎও শৃংখলাপূর্ণ। এ এক রোমাঞ্চকর জগৎ! একই সাথে এটা বিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্রও বটে। প্রতিটি বস্তুই এখানে ভৌত আইন মেনে চলছে এবং এর কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তাই মহাকাশের কাছে আমাদের মিনতি :

খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা–
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে নামে পৃথ্বী পরে
শ্রাবণের সায়াহ্নযূথিকা–
যেথা হতে পড়ে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টীকা।।

বইপত্র

'অনন্ত ছায়াপথরাজির' উপর ভালো সাধারণ আলোচনার জন্য প্রচুর বই রয়েছে। যেমন *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার* Galaxies এবং Cosmos প্রবন্ধদ্বয় এবং *ম্যাকগ্র'হিল এনসাইক্লোপিডিয়া অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি'র* বিভিন্ন অন্তর্ভুক্তি দেখা যেতে পারে। *কেমব্রিজ অ্যাটলাস অব অ্যাস্ট্রনমিও* উল্লেখ করার মতো একটি বই। ছায়াপথের শ্রেণীবিভাগ, তাদের সাধারণ ধর্ম, তাদের ভর ও দূরত্ব— এসব বিষয়ে উপরিউক্ত বইগুলো দেখা যেতে পারে। ছায়াপথস্তবকের উপর আলোচনার জন্য de vaucouleur (1987), Gurevich (1987), Gregory & Thompson (1982), Burns (1986) ও Henry Ital (1998) দ্রষ্টব্য। মহাবিশ্বে ব্যাপক কাঠামোর উদ্ভবের উপর Peebles (1993), Novikov (1979), Silk *et al* (1983) দেখা যেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

আকাশগঙ্গা ছায়াপথ

There is a way on high, conspicuous in the clear heavens, called the Milky Way, brilliant with its own brightness. By it the Gods go to the dwelling of the great Thunderer and his royal abode ... here the famous and mighty inhabitants of heaven have their homes. This is the region which I might make bold to call the Palatine (Way) of the Great Sky.

Ovid, *Metamorphoses*, 1st Century.

৫.১ প্রারম্ভিক

চাঁদহীন অন্ধকার রাতে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে অসংখ্য তারার এক মনোমুগ্ধকর, স্বর্গীয় সমাহার দেখা যায়। শহুরে আকাশ থেকে অবশ্য এতো কিছু দেখা যায় না। কারণ এখানকার বায়ুমণ্ডলে ধুলোবালির পুরু স্তর থাকে এবং শহরের উজ্জ্বল আলো নক্ষত্রের মৃদু আলোকে ঢেকে দেয়। তারাখচিত আকাশ দেখতে হলে মফস্বল শহর বা গ্রামাঞ্চলে, প্রকৃতির নিভৃত কোলে যেতে হবে। তবেই শোনা যাবে প্রকৃতির সঙ্গীত, যে সঙ্গীত যুগ যুগ ধরে মৃদুমন্দ সুরে বেজে চলেছে। এই সঙ্গীত সুন্দর নিয়মতান্ত্রিকতার সঙ্গীত। কবিগুরুর কথায় "সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত"। এখানে রাতের আকাশের কাব্যিক সৌন্দর্যই বলা হয়েছে। যাহোক এ রকম অন্ধকার রাতের তারাখচিত আকাশে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আকাশের মধ্য দিয়ে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে আলোর এক সরু অস্পষ্ট কুয়াশার মতো ধারা চলে গিয়েছে। একে ইংরেজিতে 'মিল্কি ওয়ে' এবং বাংলায় 'ছায়াপথ' বলে। অবশ্য এর আরো কয়েকটি সুন্দর নাম আছে। যেমন 'আকাশগঙ্গা', 'সুরগঙ্গা', বা 'স্বর্গগঙ্গা'। স্মরণাতীত কাল থেকেই এ ছায়াপথকে পর্যবেক্ষণ করে আসা হচ্ছে। আধুনিক জ্যোতির্বিদরা যখন টেলিস্কোপ দিয়ে ছায়াপথ দেখেন তখন তারা সেখানে অসংখ্য নক্ষত্রের সমাহার লক্ষ্য করেন। এর সবচেয়ে পরিচিত আকৃতিটি হলো একটা আঁকাবাঁকা পথ, যা নদীর মতো। পুরাণমতে, দেবী জুনো যখন শিশু হারকিউলিসকে স্তন্যপান করাচ্ছিলেন তখন জুনোর বুক থেকে ছিটকে পড়া দুধের থেকেই এই ছায়াপথের জন্ম। তাই নাম Via Lactea বা মিল্কি ওয়ে।

সপ্তদশ শতকে গ্যালিলিও ছায়াপথকে টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। ইমানুয়েল কান্ট মনে করতেন ছায়াপথ হলো নক্ষত্রজগতের একটি সুবিশাল বিস্তৃতি যার মাঝে আমাদের

বাস। ছায়াপথ সম্পর্কে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্যার উইলিয়াম হার্শেল শুরু করেন। তিনি দেখালেন যে, ছায়াপথের তলেই তারার সংখ্যা সর্বাধিক এবং তল থেকে যতই দূরে যাওয়া যায় তারার সংখ্যা তত কমতে থাকে। আমরা এখন জানি যে, তিনি আংশিক সঠিক ছিলেন। তিনি একে লেন্সের আকৃতির মতো বলে বর্ণনা করেছেন। আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ একটি বিশাল কুণ্ডলিত ছায়াপথ (spiral galaxy) যার কেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরত্ব ... কিলোপারসেক। ছায়াপথটি সম্ভবত Sb শ্রেণীর।

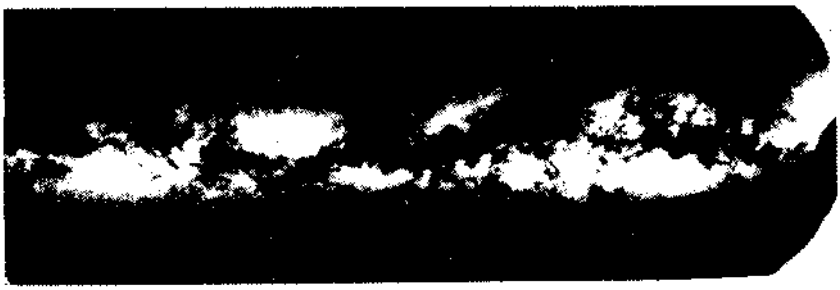

চিত্র ৫.১ : আকাশগঙ্গা ছায়াপথ।

৫.২ ছায়াপথের ভৌত কাঠামো

ভর : আকাশগঙ্গা ছায়াপথের দৃশ্যমান বস্তুর ভর হলো প্রায় ২×১০^{১১} সৌরভর। এর ... নক্ষত্র, বাকি ৩% আন্তঃনক্ষত্রিক গ্যাসসমৃদ্ধ। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে অথবা আন্তঃনক্ষত্রিক স্থানে ব্যাপ্ত গ্যাসের ৮৭-৯০% হাইড্রোজেন, ১০% হিলিয়াম, বাকি ০–৩% সামান্য ভারি মৌল (শতাংশ পরমাণুর সংখ্যায় গণনাকৃত)। ধূলিকণার ভর আন্তঃনক্ষত্রিক গ্যাসের ... কিন্তু ছায়াপথের সমতলে (plane) এই ধূলিকণার পুরু উপস্থিতির কারণেই কেন্দ্রীয় অঞ্চল ... দৃষ্টিগোচর নয়।

কাঠামো ও আকৃতি : ছায়াপথের কাঠামোকে ৬টি অংশে ভাগ করা যায়। ১. নিউক্লিয়াস, ২. কেন্দ্রীয় স্ফীত অংশ, ৩. ডিস্ক, ৪. কুণ্ডলিত বাহু, ৫. বর্তুলাকার অংশ, ৬. ভারি কিরীট। এদের অনেকেই একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকে বিধায় সুস্পষ্ট ... পার্থক্য করা মুশকিল।

১. নিউক্লিয়াস : ছায়াপথের নিউক্লিয়াস দৃশ্যমান আলোয় দেখা যায় না। কিন্তু এর রেডিও, অবলোহিত, গামা বিকিরণ যথেষ্ট শক্তিশালী। এই রেডিও উৎসটি সাজিটারিয়াস-এ নামে পরিচিত। নিউক্লিয়াসটির বিস্তৃতি ছায়াপথের ভরকেন্দ্রের আশেপাশে ১০ পার্সেক এলাকাব্যাপী। অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন এখানে আছে একটি ৪ মিলিয়ন সূর্য ...

[illegible] কৃষ্ণবিবরে পড়ে। তবে এথেকে বোঝা যায় যে সতুষ্পার্শ্বের পদার্থ কৃষ্ণবিবরের চারপাশে একটি ঘূর্ণায়মান চাকতি (accretion disk) তৈরি করে। এই চাকতির বাসার্ধ [illegible] হতে পারে। এই পদার্থ সবেগে কৃষ্ণবিবরে পতিত হচ্ছে। কেন্দ্র থেকে [illegible] দূরে ধূলার একটি রিঙ দেখা যায়। এই গ্যাস হলো আণবিক H_2। ছায়াপথের কেন্দ্রীয় কক্ষীয় অঞ্চলে কম তাপমাত্রার ও উচ্চ ঘনত্বের প্রচুর আণবিক হাইড্রোজেনের মেঘ দেখা যায়।

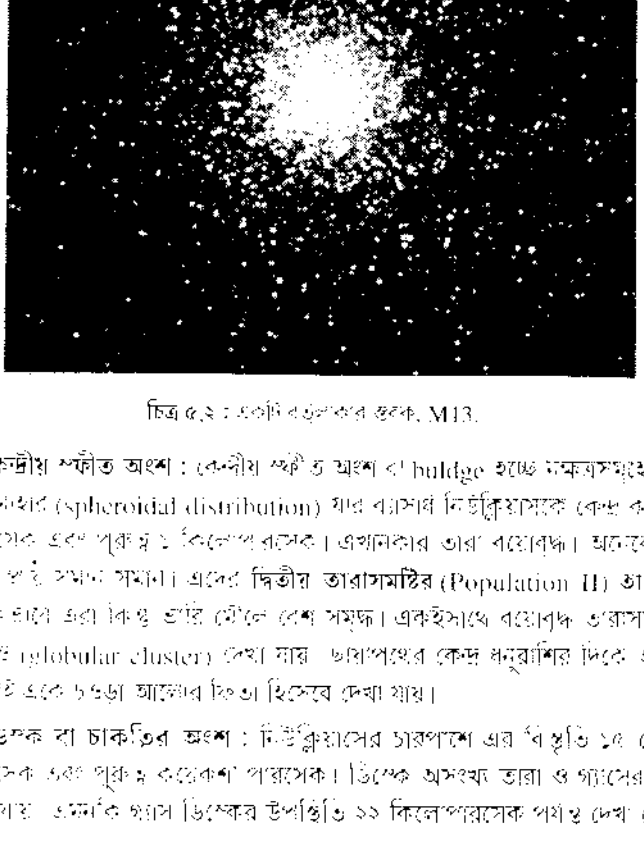

চিত্র ৫.২ : একটি বর্তুলাকার গুচ্ছ, M13.

২. কেন্দ্রীয় স্ফীত অংশ : কেন্দ্রীয় স্ফীত অংশ বা bulge হচ্ছে নক্ষত্রসমূহের একটি বর্তুলীয় সমবণ্টন (spheroidal distribution) যার ব্যাসার্ধ নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ৩–৬ কিলোপারসেক এবং পুরুত্ব ২ কিলোপারসেক। এখানকার তারা বয়োবৃদ্ধ। অনেকের বয়স ছায়াপথের বয়সের সমান সমান। এদের দ্বিতীয় তারাসমষ্টির (Population II) তারা বলে। তুলনামূলক হারে এরা কিন্তু ভারী মৌলে বেশ সমৃদ্ধ। একইসাথে বয়োবৃদ্ধ তারাসমৃদ্ধ কিছু গুচ্ছাকার গুচ্ছ (globular cluster) দেখা যায়। ছায়াপথের কেন্দ্র ধনুরাশির দিকে অবস্থিত। খালি চোখে একে চওড়া আলোর ফিতা হিসেবে দেখা যায়।

৩. ডিস্ক বা চাকতির অংশ : নিউক্লিয়াসের চারপাশে এর ব্যাসার্ধ ১৫ থেকে ১৭ কিলোপারসেক এবং পুরুত্ব কয়েকশ পারসেক। ডিস্কে অসংখ্য তারা ও গ্যাসের সমাহার লক্ষ্য করা যায়। এমনকি গ্যাস ডিস্কের উপস্থিতি ২২ কিলোপারসেক পর্যন্ত দেখা গেছে। এ

অঞ্চলে আয়নিত হাইড্রোজেনের H II অঞ্চল পাওয়া যায়। এখানকার তারা প্রথম তারাসমষ্টির তারা এবং এদের বেগও কম। ডিস্ক আসলে বেশ সরু ও ক্ষীণ এবং এর আকৃতি একটি প্রমাণ সাইজের লঙ-প্লের ডিস্কের মতো হলে এর কেন্দ্রীয় স্ফীত অংশের আকৃতি একটি টেনিস বলের মতো হবে। এই ডিস্কেই রয়েছে ছায়াপথের কুণ্ডলিত বাহু সিস্টেম। এই ডিস্কটি বাঁকা (warped) এবং বাইরের দিকে সঠিক তল থেকে এর বিচ্যুতি ৩ কিলোপারসেক। এই বক্রতা অন্যান্য কুণ্ডলিত ছায়াপথেও দেখা যায়। ম্যাজেলানীয় মেঘপুঞ্জের সাথে এর একটি গ্যাসসেতু আছে। এই সেতুটির সৃষ্টি হয়েছে খুব সম্ভবত ছায়াপথের জোয়ার বলের (tidal force) কারণে।

৪. **কুণ্ডলিত বাহু** : ১৯৫৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত জ্যোতির্বিদের কুণ্ডলিত বাহু সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। কারণ ছায়াপথের একই তলে আমাদের অবস্থিতি এবং পুরু ধূলিকণার জন্য কুণ্ডল বাহুগুলো দৃশ্যত পর্যবেক্ষণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু রেডিও তরঙ্গে প্রথম H_2 বা আণবিক মেঘের বিকিরণ থেকে সহজেই একে শনাক্ত করা যায়। আসলে ছায়াপথের ভেতরে একই তলে থেকে একে পর্যবেক্ষণ করা আর কোনো শহরতলীতে বসে করে কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে একটি বড়ো শহরকে বোঝাবার চেষ্টা করা একই কথা। আমাদের ছায়াপথের রয়েছে ৫টি দৃশ্যমান কুণ্ডলিত বাহু। দেখা যায় যে, ছায়াপথের বাহুগুলো সাধারণভাবে লগারিদমের আইন মেনে চলে : $\log r = a - b\varphi$। φ হচ্ছে কেন্দ্র থেকে পরিমাপিত বাহুর দূরবর্তী অংশের মধ্যের কোণ। এই পিচ কোণের মান অন্যান্য ছায়াপথের জন্য ৫০°–৮৫°। আমাদের ছায়াপথের ক্ষেত্রে এই মান বোধহয় ৭৫°। কুণ্ডলিত বাহুগুলিতে প্রায় ৫×১০^{৬} সূর্যভরের

বাহুর সংখ্যা	নাম	ছায়াপথীয় দ্রাঘিমা	দূরত্ব
+ I	পারসিয়াস	১০৩–১৯০°	১২০° এর দিকে ১০০০ আ.বর্ষ
O	ওরায়ন	৬০–২৫০°	১৮০° এর দিকে ১৫০০ আ.বর্ষ
-I	স্যাজিটারিয়াস	২৭৫–৩০°	৩৩০° এর দিকে ৫০০০ আ.বর্ষ
-II	নরমা	৩০০–৩৩০°	৩৩০° এর দিকে ১০,০০০ আ.বর্ষ
III	3 kpc বাহু	৩৩০–৩০°	০° এর দিকে ২০০০০ আ.বর্ষ

পদার্থ উপস্থিত। এ অঞ্চলে নতুন তারা তৈরির প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। তাই এ অঞ্চলে উত্তপ্ত O এবং B তারার আধিক্য লক্ষ্য করা গেছে।

আশির দশকে ছায়াপথের কুণ্ডলিত বাহুর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আলোচিত হয়। এই কুণ্ডলিত প্যাটার্নটির উদ্ভব হয়েছে ঘনত্ব–তরঙ্গের (density wave) সাধারণ গতির ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে। দেখা গেছে, ছায়াপথের ডিস্কে নক্ষত্রের ঘনত্বজনিত বণ্টনের ব্যাপক কাঠামোর বিচলনের ফলে কুণ্ডলাকৃতির ঘনত্ব তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। নক্ষত্রদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার দরুন উদ্ভূত ঘনত্ব বণ্টনের (density distribution) আকৃতি কুণ্ডলিত হয়। কিন্তু এটা

নক্ষত্রদের সাথে নিয়ে ঘোরে না, বরঞ্চ নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ধীরে ঘোরে। নক্ষত্রসমূহ পৃথকভাবে এই কুণ্ডলিত ঘনত্ব-তরঙ্গের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বাহু বরাবর ধীর গতির হয়ে যায় এবং এভাবে ঘনত্ব বাড়ায়। আমাদের ছায়াপথের জন্য এই ঘনত্ব কাঠামোর বেগ ১০০০ আলোকবর্ষ প্রতি ৪ কি.মি./সে.। ঘনত্ব-তরঙ্গ ছাড়াও ছায়াপথের বিভিন্ন অংশের পৃথক গতিবেগের (differential rotation) ফলেও কুণ্ডলিত বাহুর সৃষ্টি হতে পারে

৫. **বর্তুলীয় অংশ :** ছায়াপথের ডিস্কের উপরে ও নিচে কেন্দ্রীয় স্ফীত অংশের কিছু উপাদান দ্বারা হাল্কাভাবে সমৃদ্ধ। একে বর্তুলীয় অংশ বা spheroidal component বলে। এর আকৃতি প্রায় গোলকাকার। এখানে বহিঃস্থ গুচ্ছস্তবকদের দেখা যায়। এছাড়া কম ভারি মৌলসমৃদ্ধ বামনতারা কিংবা RR Lyrae বিষমতারা ইত্যাদি দ্বিতীয় তারাসমষ্টির তারা দেখা যায়। কাঠামোর দিক দিয়ে এ অংশটি উপবৃত্তাকার ছায়াপথের অনুরূপ।

৬. **ছায়াপথের কিরীট :** ছায়াপথের কেন্দ্রীয় স্ফীত অংশের (buldge) চতুর্দিকে বর্তুলাকারে এই রহস্যময় কিরীট বা halo অবস্থিত। এর বিস্তৃতি 15 kpc হতে পারে। কিন্তু 40 kpc দূরেও গুচ্ছস্তবক দেখা যায়। ছায়াপথের বহিঃস্থ ঘূর্ণনরেখা (outer rotation curve) থেকে তথা গতির ধর্মাবলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই কিরীটের ভর ছায়াপথের দৃশ্যমান ভরের ৫ থেকে ১০ গুণ হতে পারে। এখানে যে পদার্থ আছে, মনে করা হয় তার কোনো উজ্জ্বলতা নেই (non luminous)। এদের প্রকৃতি এখনো রহস্যময়।

৫.৩ ছায়াপথের ভৌত ধর্মাবলি

আমাদের ছায়াপথের সংশ্লিষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য খুবই ক্ষীণ। তাই অনেকে যেমন মনে করেছিলেন কুণ্ডলিত বাহু সৃষ্টির ক্ষেত্রে চৌম্বকক্ষেত্রের কোনো প্রভাব থাকতে পারে তা আসলে সম্ভব নয়। ছায়াপথের চৌম্বক ক্ষেত্রে শক্তি পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রাপ্ত চৌম্বক প্রাবল্যের 0.000001 গুণ। অবশ্য এ চৌম্বকক্ষেত্র আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানের ধূলিকণাকে সজ্জিত করার (alignment) জন্য যথেষ্ট, আর এ জন্যেই নক্ষত্রের আলোর সমবর্তন (polarisation) ধূলিকণার উপর ছায়াপথের চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত করে।

ছায়াপথের ঘূর্ণন : বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে সুইডিশ জ্যোতির্বিদ বার্টিল লিন্ডব্লাড প্রস্তাব করেন যে, নাক্ষত্রিক গতিসমূহে দৃষ্ট আপাত অপ্রতিসাম্য নাক্ষত্রিক কক্ষসমূহের বহুমুখী প্রকৃতির (multiple nature) ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ নাক্ষত্রিক জগতে নক্ষত্রসমূহের দৃষ্ট গতিবেগকে দূরবর্তী ছায়াপথের নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান সাধারণ তারাসমষ্টির ঘূর্ণন গতি এবং এর সাথে মিশ্রিত এমন সব নক্ষত্র যাদের গতিবেগ উচ্চ এবং কক্ষপথ উপবৃত্তাকার--এসবের মিলিত ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। ছায়াপথের ডিস্ক বা চাকতি অংশটি (disc component) ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে সূর্যকে ঘিরে গ্রহদের মতো ঘোরে। কিন্তু বিভিন্ন স্তরের গতিবেগ আবার বিভিন্ন। এ কারণে ছায়াপথের বিভিন্ন অংশে পরিমাপিত নক্ষত্রের বেগ বিভিন্ন প্যাটার্ন দেখায়। উর্ট নক্ষত্রের অরীয় গতিবেগ সংক্রান্ত এ রকম একটি প্যাটার্নের সুন্দর গাণিতিক সূত্র দিয়েছেন। এটি

হলো : অরীয় বেগ (radial velocity) = $Ar \sin 2l$; r নক্ষত্রের দূরত্ব, l ছায়াপথীয় স্থানাংক এবং A উর্টের ধ্রুবক (১৫ কি. মি./সে./kpc)। একইভাবে নক্ষত্রের সঠিকগতির (proper motion) ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফর্মুলা লেখা যায়। ডিস্কের ভেতরের অংশে এবং বহিঃপ্রান্তে ব্যাপক কাঠামোয় বিস্তৃত ক্ষুদ্রমানের অবৃত্তীয় (non circular) ঘূর্ণনবেগ ছায়াপথের অন্তঃস্থ অঞ্চলে একটি দণ্ডাকৃতির (bar) কাঠামোর উপস্থিতি নির্দেশ করে। এই অংশে নক্ষত্রদের সমাহার একটা দণ্ডের আকৃতি নিয়েছে এবং এদের সার্বিক ঘূর্ণন একটি কঠিন দণ্ডবস্তুর মতোই দেখা যায়। অন্যান্য ছায়াপথের ক্ষেত্রেও এটা দেখা গেছে।

ছায়াপথের অবস্থিতি : আমাদের ছায়াপথ স্থানীয় ছায়াপথগুচ্ছের অন্যতম প্রধান সদস্য। এই স্থানীয়গুচ্ছে আছে অ্যান্ড্রোমিডাসহ আরো প্রায় ১৮টি অনিয়মিত আকৃতির ছায়াপথ। স্থানীয়গুচ্ছ আবার কন্যারাশির মহাগুবকের সদস্য যেখানে প্রায় ১০০০টি ছায়াপথ আছে।

৫.৪ ছায়াপথে নক্ষত্রের গতি

ছায়াপথে নক্ষত্রের প্রকৃত গতি জানতে হলে এর সরল গতি (proper motion) এবং অরীয় গতি (radial velocity) জানতে হবে। সরল গতি হচ্ছে যে হারে কোনো খ-বস্তুর (celestial object) অবস্থান আকাশে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ দর্শকের দৃষ্টিরেখার (line of sight) সাথে আড়াআড়ি (across) যে বেগ লক্ষ্য করা যায়। তারার অরীয় বেগ হচ্ছে দর্শকের দৃষ্টিরেখা বরাবর সামনে-পিছনে তারার যে বেগ দেখা যায়। প্রথমটি মাপা হয় প্রতি বছরে কৌণিক সেকেন্ডে এবং দ্বিতীয়টি কি.মি./সে.-এ এবং ধনাত্মক (দর্শকে দিকে হলে) চিহ্নযুক্ত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা সূর্যের কাছাকাছি তারাদের জন্য এ দুই ধরনের গতিবেগই মাপতে পেরেছেন ; কিন্তু ছায়াপথের দূরবর্তী অংশের তারাদের জন্য কেবলই অরীয় বেগ মাপা সম্ভব।

সূর্যের ১৭ আলোকবর্ষের মধ্যে অবস্থিত নক্ষত্রদের সরলগতি ০.৪৯ থেকে ১০.৩১ আর্কসেকেন্ড/বছর এর মধ্যে হয়ে থাকে। শেষ মানটি বার্নার্ডের তারার সরল গতি। এর অরীয় বেগ –১০৮ কি. মি./সে. এবং দূরত্ব ৬ আলোকবর্ষ—এ থেকে এর মহাশূন্যে গতিবেগ (space velocity–সূর্যের সাপেক্ষে মোট বেগ) ১৪০ কি.মি./সে. দাঁড়ায়। ১১,৮০০ খ্রিষ্টাব্দে সূর্য থেকে এর দূরত্ব ৩.৫ আলোকবর্ষ হবে।

অন্যদিকে অরীয় গতি নির্ণয় করা হয় নক্ষত্রের আলোর ডপলার সরণ থেকে। ১৭ আলোকবর্ষের মধ্যে অবস্থিত ৪৫টি তারার ৪০টিরই অরীয় গতি জানা গেছে। বামনতারাদের অরীয় বেগ নির্ণয় করা বেশ কষ্টসাধ্য (খুব চওড়া ক্ষীণ বর্ণালি রেখার জন্য) ; উপরিউক্ত ৪০টি তারার অরীয় বেগ –১৯ কি. সি./সে. থেকে +২৪৫ কি.মি./সে. এর মধ্যে থাকে।

ত্রিমাত্রিক স্থানে (space) নক্ষত্রের গতিবেগ নির্ণয় করার জন্য এর একাধিক উপাংশ ঠিক করা হয় ; ছায়াপথের কেন্দ্র হতে বাইরের দিকের উপাংশ U, ছায়াপথের ঘূর্ণনের

দিকে V, ছায়াপথের উত্তর মেরুর দিকে W। নিকটবর্তী তারাদের জন্য এদের গড় মান : U =–৮ কি.মি./সে. ; V= –২৬. কি.মি./সে.; W= –১২ কি.মি./সে.। সূর্যের কাছাকাছি অবস্থিত একটি উচ্চবেগসম্পন্ন তারার (Kapteyn's star) অরীয় বেগ –২৪৫ কি. মি./সে. এবং মহাশূন্য বেগের উপাংশগুলো হলো, U=১৯ কি.মি./সে ; V= –২৮৬. কি. মি./সে; W= –৫১ কি. মি./সে.। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ছায়াপথের চারদিকে সূর্যের ঘূর্ণনবেগ – ২৩০ কি. মি./সে.। হবল দেখিয়েছিলেন যে স্থানীয়গুচ্ছের (Local Group) বাইরে অবস্থিত ছায়াপথের সাপেক্ষে সূর্যের বেগ ৩০০ কি. মি./সে. এবং এর দিক ১২০° ছায়াপথের দ্রাঘিমা (galactic longitude) এবং অক্ষাংশ +৩৫°। এই বেগ সূর্যের সরল বৃত্তীয় গতি (proper circular motion), ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে বৃত্তীয় গতি, স্থানীয়গুচ্ছের সাপেক্ষে আমাদের ছায়াপথের গতি এবং নিকটবর্তী ছায়াপথের সাপেক্ষে স্থানীয়গুচ্ছের গতিবেগ—এসবের মিলিত ফল।

৫.৫ ছায়াপথের সদস্যসমূহ

নক্ষত্রসমূহ : ১৯৪৪ সালে ওয়াল্টার বাড যখন অ্যান্ড্রোমিডা পর্যবেক্ষণ করছিলেন তখন তিনি দেখলেন যে ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অংশ এবং এর উপছায়াপথ দুটিতে (এরা উপবৃত্তাকার) উজ্জ্বল তারাসমূহ হলো লাল দানবতারা, অথচ কুণ্ডলিত বাহুগুলোতে প্রধানধারার উজ্জ্বল নীলচে তারার আধিক্য। তিনি ধারণা করলেন যে, এই পরিস্থিতি আমাদের ছায়াপথের জন্যেও প্রযোজ্য এবং তিনি ছায়াপথের ডিস্ক অঞ্চলের তারাদের নামকরণ করলেন প্রথম তারাসমষ্টির তারা (Population I) এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলে তারাদের নাম দিলেন দ্বিতীয় তারাসমষ্টির তারা। আধুনিক সংজ্ঞানুযায়ী প্রথম তারাসমষ্টির তারাগুলো ছায়াপথের ডিস্ক সিস্টেমে বেশি ছড়িয়ে আছে। এছাড়াও উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত O এবং B তারা, শেফালী বিষমতারা, মুক্ত স্তবক, নিঃসরণ নীহারিকা এবং প্রশম হাইড্রোজেন এর সদস্য। অন্যদিকে দ্বিতীয় তারাসমষ্টির তারা হলো উচ্চ গতিবেগসম্পন্ন তারা[১], গুচ্ছস্তবক, আর.আর.লাইরী বিষমতারা ইত্যাদি এবং এরা মূলত ছায়াপথের বৃত্তীয় অংশেই প্রধানত অবস্থান করে। ১৯৫৭ সালের ভ্যাটিকান কনফারেন্সের সিদ্ধান্তক্রমে তারাদের এই শ্রেণীকে আরো সূক্ষ্ম বিভাগ করা হয়েছে যেমন 'কিরীটের দ্বিতীয় তারাসমষ্টি' (halo population II) বা প্রান্তিক প্রথম তারাসমষ্টি (extreme pop. I) ইত্যাদি। আর.আর.লাইরী (RR Lyrae) তারাদের বিষমতার পর্যায় যদি ০.৪ দিনের বেশি হয় তবে তারা 'কিরীটের দ্বিতীয় তারাসমষ্টি'; কিন্তু এর কম হলে তাদের 'ডিস্কের তারাসমষ্টি' বলে। যে সমস্ত দীর্ঘমেয়াদি বিষমতারার বিষমতা ২৫০ দিনের কম (বর্ণালি শ্রেণী M5e এর পূর্ববর্তী) তারা 'মধ্যবর্তী দ্বিতীয় তারাসমষ্টি' (intermediate pop.II) এবং এর বেশি হলে 'বয়োবৃদ্ধ প্রথম তারাসমষ্টি' (older pop.I) গঠন করে। এছাড়া আনুষঙ্গিক কিছু বর্ণালিগত কারণও আছে।

---

১. সূর্যের নিকটবর্তী কিছু উচ্চগতিসম্পন্ন নক্ষত্রও দ্বিতীয় তারাসমষ্টির তারা। বাডের মতে এরা ঘটনাক্রমে ছায়াপথের ডিস্কে চলে এসেছে।

তারাসমষ্টির এই পার্থক্যের ভৌত কারণ তারার বিবর্তনের পদ্ধতির মাঝে আংশিক নিহিত। দেখা গেছে, দানব এবং অতিদানব তারা প্রধানধারার তারারই বিবর্তিত দশা। এ অবস্থায় তাদের উজ্জ্বলতা (প্রধানধারার মতো) শুধু ভরের উপর নির্ভর না করে বরঞ্চ তারার অভ্যন্তরে মৌলের উপস্থিতির উপরও নির্ভর করে। এভাবে বিভিন্ন তারাসমষ্টিতে দানবতারাদের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা যায়। তাছাড়া দেখা গেছে দ্বিতীয় তারাসমষ্টির তারাদের মধ্যে ভারি মৌলের প্রাধান্য কম। কিন্তু গুচ্ছস্তবক ও প্রথম তারাসমষ্টির ক্ষেত্রে এটি বেশি। দ্বিতীয় তারাসমষ্টির তারাদের আয়ুষ্কাল 10^8 থেকে 10^{10} বছর। কিন্তু প্রথম তারাসমষ্টির তারাদের আয়ুষ্কালের মধ্যে বিরাট ফারাক দেখা যায়। এদের আয়ুষ্কাল প্রায় 10^9 বছর হতে পারে। তবে গুচ্ছস্তবকের সমবয়স্ক বা তার চেয়ে বেশি বয়স্ক কোনো তারা বা স্তবক ছায়াপথে পাওয়া যায়নি। কাজেই দেখা যায় গুচ্ছস্তবক ও দ্বিতীয় তারা সমষ্টির তারাই ছায়াপথের সবচেয়ে বয়স্ক তারা। প্রথম ও দ্বিতীয় তারাসমষ্টির তারাদের গবেষণায় ৪টি প্যারামিটারের প্রয়োজন হয়। এরা হলো : বয়স, রাসায়নিক গঠন, গতিবিদ্যা (kinematics) এবং স্থানিক বণ্টন (spatial distribution)।

নক্ষত্রস্তবক : যদিও ছায়াপথের অধিকাংশ তারাই (সূর্যের মতো) হয় নিঃসঙ্গ নয়তো জোড়াতারা হিসেবে থাকে তথাপি অনেক তারাকেই স্তবকের সদস্য হিসেবে দেখা যায়। এদের সদস্য সংখ্যা কয়েক হাজার হতে পারে। এ রকম স্তবক ৩ রকমের হতে পারে : মুক্ত, গুচ্ছ বা তারাদল।

ছায়াপথের সদস্যসমূহ

	প্রথম তারাসমষ্টি		ডিস্কের তারাসমষ্টি	দ্বিতীয় তারাসমষ্টি	
	প্রান্তিক প্রথম তারাসমষ্টির তারা	বয়োবৃদ্ধ প্রথম তারাসমষ্টির তারা		মধ্যবর্তী দ্বিতীয় তারাসমষ্টির তারা	কিরীটের দ্বিতীয় তারাসমষ্টির তারা
সদস্য	গ্যাস	A শ্রেণীর তারা	ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তারা	উচ্চ গতিকেন্দ্রসম্পন্ন তারা	উপবামনতারা
	কুণ্ডলিত বাহু সংশ্লিষ্ট নবীন তারা	শক্তিশালী বর্ণালি রেখাবিশিষ্ট তারা	গ্রহ নীহারিকা		গুচ্ছস্তবক আর আর লাইরী তারা (পর্যায় >০.৪ দিন)
		Me বামনতারা	নোভা	দীর্ঘ পর্যায়ী বিষম তারা বিষমতার পর্যায় <২৫০ দিন	
	অতিদানবতারা	আর. আর. লাইরী তারা (পর্যায় কাল <০.৪ দিন)			

	শেফালী বিষমতারা টি-টরি তারা	দুর্বল বর্ণালিরেখার তারা			
ছায়াপথের তল থেকে গড় উচ্চতা (পার্সেক)	১২০	১৬০	৪০০	৭০০	২০০০
বয়স (১০^{৯} বছর)	০.১	০.১ থেকে ১.৫	১.৫ থেকে ৫.০	৬.০ থেকে ৫.০	৬.০
মোট ভর (১০^{৯} সূর্যভর)	১	৫	৪৭ (ডিস্ক ও মধ্যবর্তী তারাসমষ্টির মিলিত ভর)		১৬

সবচেয়ে ভারি এবং বড় হচ্ছে গুচ্ছ বা বর্তুলাকার (globular cluster) স্তবক। আমাদের ছায়াপথে এদের সংখ্যা প্রায় ১৩০। এদের অধিকাংশই ছায়াপথের কেন্দ্রে ঘনীভূত থাকে এবং এরা একটি বর্তুলীয় কিরীট (spherical halo) গঠন করে। অবশ্য ছায়াপথের তলেও (plane) ছিটেফোঁটা গুচ্ছস্তবক দেখা যায়। এরা অত্যন্ত উজ্জ্বল (গড়ে ২৫০০০ সূর্যের সমান) হয়ে থাকে। এদের ভর কয়েক হাজার থেকে ১ মিলিয়ন সৌরভরের সমান হতে পারে। এদের ব্যাস ১০ থেকে ৩০০ আলোকবর্ষ হয়ে থাকে। গুচ্ছস্তবকের তারাদের স্তবকের কেন্দ্রেই বেশি ঘনীভূত থাকতে দেখা যায়। এদের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের সুদীর্ঘ আয়ুষ্কাল। এদের বয়স ১.০ থেকে ১.২ × ১০^{১০} বছর হতে দেখা যায়। ছায়াপথের অন্যান্য তারার তুলনায় এদের ভারি মৌলের পরিমাণ কম। আকাশে গুচ্ছস্তবকরা অত্যন্ত সুন্দর টেলিস্কোপিক দৃশ্যের অবতারণা করে (চিত্র ৫.২)।

ছায়াপথের তলে অপেক্ষাকৃত কম ভারি ও ছোট মুক্তস্তবক (open clusters) দেখা যায়। এদের মধ্যে তারাদের বণ্টন অত্যন্ত স্থূল এবং শিথিল। এরা নবীনতারার সমাহারে গঠিত। এদের পর্যবেক্ষণ করা খুবই দুরূহ, কারণ ছায়াপথের তল বরাবর পুরু ধূলির স্তর থাকে। এদের গড় উজ্জ্বলতা সূর্যের ৫০০ গুণ। ভরও মাত্র ৫০ সৌরভরের সমান। এদের ব্যাস সাধারণত ৩ থেকে ২০ আলোকবর্ষ। এদের কম ভর এবং কেন্দ্রীয় শিথিলতার কারণে এদের পক্ষে ছায়াপথের জোয়ার বলের (tidal force) বিরুদ্ধে টিকে থাকা সম্ভব, আর তাই আয়ুষ্কালও এদের কম। এদের অধিকাংশেরই বয়স ২×১০^{৮} বছর। আমাদের ছায়াপথে এদের সংখ্যা প্রায় ১০০০। এদের নবীন বয়সের কারণে এদের মধ্যে ভারি মৌলের পরিমাণ বেশি।

মুক্তস্তবকের চেয়েও নবীন বয়সের কিছু তারা আছে যাদের একই স্থানে থাকতে দেখা যায় এবং এরা সমসাময়িক। এরা শিথিল ধরনের একটি তারাদল (association) গঠন করে। প্রধানত এদের কুণ্ডলিত বাহুতে দেখা যায় যেখানে নিত্য নতুন তারা সৃষ্টি চলছে। এরা খুব উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এমনকি অনেক তারাদলের অন্তর্ভুক্ত উজ্জ্বল তারাদের অধিকাংশই O

এবং B তারা। এদের আয়ুষ্কাল খুব কম মাত্র কয়েকশ' থেকে কয়েক হাজার সূর্যভর। এদের আকৃতি বেশ বড়। এদের গড় ব্যাস ৭০০ থেকে ২০০ আলোকবর্ষ। এদের শিখিল মহাকর্ষের জন্য কয়েক মিলিয়ন বছরের মধ্যেই সদস্যরা একে অপর থেকে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে যায়।

ছায়াপথে এমন কিছু তারা দেখা যায় যাদের সাধারণ একটি গতি থাকে, কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট স্তবক গঠন করে না। এরা চলমান স্তবক (moving cluster)। যেমন কৃত্তিকা (Pleiades) এবং Hyades এর নক্ষত্রসমূহ।

নীহারিকা : নীহারিকা হচ্ছে বিশাল, উজ্জ্বল, ব্যাপ্ত গ্যাসের মেঘ। এদের মধ্যে উজ্জ্বল অঞ্চলগুলোকে নিঃসরণ নীহারিকা (emission nebula) বলে। এরা হচ্ছে আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসের বিশাল সব সংগ্রহ যারা আয়নিত অবস্থায় থাকে। এর কারণ হচ্ছে গ্যাসের আড়ালে উপস্থিত উত্তপ্ত তারার তাপে গ্যাসকণারা উত্তপ্ত হয়ে থাকে। তাছাড়া নক্ষত্রের অতিবেগুনি বিকিরণও এদের উত্তেজিত করে তোলে। এরা মূলত আয়নিত H_2 ধারণ করে বলে এদের এইচ–টু (H-II) অঞ্চল বলে। এইচ টু অঞ্চল সাধারণত ছায়াপথের তলে নবীন তারাদের সাথে মিলেমিশে থাকে। এই ঘন, উত্তপ্ত গ্যাস ও ধূলির ঘন সংগ্রহে নতুন তারা তৈরির প্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত চলছে। কুণ্ডলিত বাহুগুলোয় এদের বেশি দেখা যায়। এদের বৈশিষ্ট্যমূলক বর্ণালি থেকে দেখা যায় এদের তাপমাত্রা প্রায় ১০০০০ কেলভিন। এদের ভর ১/১ থেকে কয়েক হাজার সৌরভরের সমান হতে দেখা যায়। একটি বিখ্যাত নীহারিকা হচ্ছে ৫০ আলোকবর্ষ দূরের কালপুরুষ নীহারিকা (M 42)।

এছাড়া ছায়াপথে অসংখ্য সুপারনোভা অবশেষ, গ্রহ নীহারিকা ইত্যাদি প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়। এরা বিভিন্ন নক্ষত্রের অন্তিম দশা নির্দেশ করে। এছাড়া, আগেই বলেছি, পুরু ধূলিকণার স্তরের কথা। এরা ছায়াপথের তলেই সীমাবদ্ধ। সূর্যের কাছাকাছি দেখা একটি ধূলিমেঘের (dust clouds) ভর প্রায় কয়েকশ' সৌরভর এবং বিস্তৃতি ২০০ আলোকবর্ষের মতো। ক্ষুদ্রতম ধূলিমেঘদের বক বর্তুল (Bok globules) বলে। যেহেতু এসব ধূলিমেঘ আশপাশের তারাদের দ্বারা বেশ উত্তপ্ত হয় তাই এদের অবলোহিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ভালো পর্যবেক্ষণ করা যায়। এদের মাঝে প্রায় ৫০টির মতো বিভিন্ন যৌগ পাওয়া গেছে। অনেক পণ্ডিতের মতে এখানেই প্রাণ সৃষ্টির উপযোগী ভারি যৌগ (এমনকি জটিল অ্যামিনো অ্যাসিড পর্যন্ত) সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

আন্তঃনাক্ষত্রিক মাধ্যম : ছায়াপথের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থান (interstellar space)। সূর্যের নিকটবর্তী তারাদের উজ্জ্বলতা প্রতি ৩০০০ আলোকবর্ষ দূরত্বে ২ গুণ কমে যায় এই আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসের উপস্থিতির কারণে। এছাড়া এদের উপস্থিতির জন্য নক্ষত্রের আলোর সমবর্তন ঘটে। আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসে প্রধানত প্রশম H_2 থাকে। সূর্যের কাছে এই স্থানের ঘনত্ব $১০^{-২১}$ গ্রাম/ঘন সে.মি. অর্থাৎ প্রতিঘন সে.মি.এ একটি H_2 পরমাণু। এই গ্যাসে উপস্থিত সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকশোষণ

করে নেয়। তাই নক্ষত্রের বর্ণালিতে বিশোষণ রেখা দেখা যায়। আন্তঃনক্ষত্রিক স্থানের গ্যাস নানা ধরনের মৌলসমৃদ্ধ। সম্পূর্ণ তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য : p. 124., Ronan (editor) (1980)।

৫.৬ ছায়াপথের উদ্ভব

আমরা দেখেছি (অনুচ্ছেদ ৪.১৯) কিভাবে ঘনত্ব বিচলন থেকে মহাবিশ্বে কাঠামোর সৃষ্টি হয়। এই কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হলো নক্ষত্র (~১ সূর্যভর), নক্ষত্রস্তবক (~10^6 সূর্যভর), ছায়াপথ (10^{11} থেকে 10^{13} সূর্যভর), ছায়াপথস্তবক (10^{14} থেকে 10^{15} সূর্যভর) এবং মহাস্তবক ইত্যাদি। মনে হয় ছায়াপথসমূহের জন্ম হয়েছে প্রায় 10^{10} বছর আগে। আগেই বলেছি, ঘনত্ব বিক্ষোভ জন্ম দিয়েছে বিশাল আকৃতির গ্যাসপিণ্ডের। কিন্তু প্রথমে পৃথক পৃথকভাবে ছায়াপথ সৃষ্টি হয়ে তারপর একত্র হয়ে স্তবক তৈরি করেছে, নাকি উল্টোটি সত্য তা সুনিশ্চিত নয়। এবার আমরা ছায়াপথ তৈরির ঘটনা পরম্পরা আলোচনা করব। যেহেতু আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ (Milky Way Galaxy) একটি টিপিক্যাল ছায়াপথ তাই এই সৃষ্টিকাহিনী সাধারণভাবে সকল ছায়াপথের জন্য প্রযোজ্য ধরে নেয়া যায়। তাই এখানে আমাদের ছায়াপথের সৃষ্টিকাহিনী বর্ণিত হলো।

আদিতে আমাদের ছায়াপথ ছিল একটি সূক্ষ্ম গ্যাসের প্রায় বর্তুলাকার সংগ্রহ যার ঘনত্ব ছিল প্রতি ঘন সে.মি. এ একটি পরমাণু (10^{-24} কি.গ্রাম মিটার$^{-3}$)। একে আমরা বলব ভ্রূণছায়াপথ বা Protogalaxy। প্রথমদিকে এটি মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে প্রসারিত হচ্ছিল যতক্ষণ না এটি পার্শ্ববর্তী ভ্রূণছায়াপথদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলো। এই পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে ধীর ঘূর্ণনবেগের সৃষ্টি হলো এবং এর ভেতরের গ্যাসে অনিয়মিত গতির সৃষ্টি হলো। এই ভ্রূণছায়াপথের সর্বোচ্চ ব্যাস সম্ভবত ১০০ কিলোপারসেক ছিল। এরপর মহাকর্ষীয় ঘনীভবনের কারণে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে গ্যাসের ঘনত্ব ও বেগ বেড়ে যায় এবং সম্ভবত প্রথম প্রজন্মের নক্ষত্র জন্ম নেয়। এই তারাগুলো শুধুই H_2 ও He এর সমন্বয়ে গঠিত এবং দেখতে এখনকার তারা থেকে ভিন্ন। এদের অনেকের ভর ছিল সূর্যের ১০০ গুণ। এ সমস্ত তারার অভ্যন্তরে ও সুপারনোভা বিস্ফোরণে ভারি মৌল সংশ্লেষিত হয়ে আন্তঃনক্ষত্রিক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে ভ্রূণছায়াপথের বহিঃপ্রান্তে 10^5 থেকে 10^6 সূর্যভরের গ্যাসমেঘ খণ্ডীকৃত হয়ে গুচ্ছস্তবক তৈরি করেছিল। এদের অন্তর্ভুক্ত তারা সাধারণ আকৃতির ছিল। বহিঃপ্রান্তের ধীর ঘূর্ণন ও কম গতিবেগ থাকায় অথবা কমসংখ্যক তারার জন্ম হওয়ায় (যারা নতুন তারা সৃষ্টির জন্য গ্যাসমেঘকে উত্তপ্ত করে তোলে) এ স্থানে গুচ্ছস্তবকই বেশি তৈরি হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে কেন্দ্রের ঘনীভবন দ্রুততর হওয়ায় বাইরের গ্যাস ভেতরে পড়তে থাকে এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল খুব জোরে ঘুরতে থাকে। এবং এভাবে কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার কারণে কেন্দ্রে একটি স্ফীত অংশ (buldge) তৈরি হয়। এই পর্যায়ে যদি তারা তৈরির প্রক্রিয়া দ্রুততর হতো তাহলে আমাদের ছায়াপথ উপবৃত্তাকার রয়ে যেতো। কিন্তু আমাদের ছায়াপথের অনেক অতিরিক্ত গ্যাস অবশিষ্ট ছিল। আরো ঘনীভবনের

ফলে ছায়াপথের ঘূর্ণনবেগ আরো বেড়ে যায় এবং গ্যাসের অভ্যন্তরে তাপীয় গতি (তথা সংঘর্ষ) বৃদ্ধির ফলে এরা শক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে কেন্দ্রীয় স্ফীত অংশের চারপাশে এরা ঘূর্ণায়মান চাকতি বা ডিস্কের সৃষ্টি করে। প্রণছায়াপথ থেকে ডিস্ক সিস্টেমে বিবর্তিত হতে সময় লেগেছে কয়েকশ' মিলিয়ন বছর। তখন থেকেই এই চাকতি বা ডিস্ক প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের শিকার হচ্ছে, নতুন তারা জন্ম নিচ্ছে, পুরনো তারা মারা যাচ্ছে। কিন্তু ছায়াপথের কিরীটে (halo) এরকম কোনো গতীয় পরিবর্তন দেখা যায় না। এরাই আমাদের ছায়াপথের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সযত্নে সংরক্ষণ করছে। কি আশ্চর্য ছায়াপথীয় জাদুঘর।

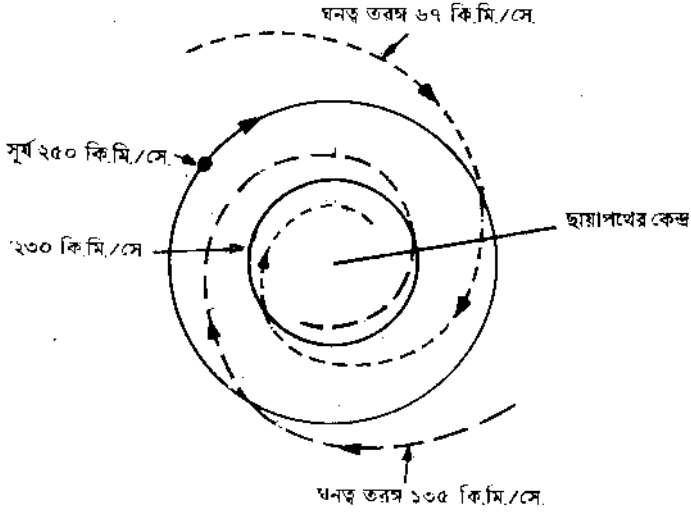

চিত্র ৫.৩ : কুণ্ডলিত বাহু সৃষ্টির পরিকল্পনা। দুটি এককেন্দ্রিক বৃত্ত ভরার কক্ষপথ নির্দেশ করছে। বাইরেরটি সূর্যের, ভেতরেরটি সূর্য থেকে কেন্দ্রের ঠিক মাঝে অবস্থিত আরেকটি তারা। কুণ্ডলিত বাহুর পরিবেশে এই দুই কক্ষ বরাবর যথাক্রমে ২৩০ সূর্যের ক্ষেত্রে এবং ৬৭ কি.মি./সে.। কিন্তু কুণ্ডলিত বাহুর বেগ পদার্থের বেগের চেয়ে অনেক কম। গতিবেগের এই বিশাল পার্থক্যের কারণে গ্যাসে সংকোচনের সৃষ্টি হয়।

সব ছায়াপথই প্রায় একই সময়ে জন্ম নেয় বলে ধরে নেওয়া হয়। যা কিছু পার্থক্য দেখা যায় তা সবই পৃথক পৃথক বিবর্তন পদ্ধতির ফলমাত্র। ছায়াপথসমূহের আকৃতিগত পার্থক্যকে কৌণিক ভরবেগের রক্ষণশীলতার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। উপবৃত্তাকার ছায়াপথসমূহ যে গ্যাস থেকে জন্ম নিয়েছে তাদের কৌণিক ভরবেগ কম ছিল, কুণ্ডলিত ছায়াপথের অতিরিক্ত কৌণিক ভরবেগ কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) বলের জন্ম দিয়েছে যা একটি তলে অন্তর্মুখী মহাকর্ষকে মোকাবিলা করে, কিন্তু এর লম্বাদিকে কোনো কেন্দ্রাতিগ বল নেই, এ কারণেই ডিস্ক আকৃতির সৃষ্টি হয়।

এবার আলোচনা করা যাক কি করে কুণ্ডলিত বাহুর সৃষ্টি হয়। সুইডিশ জ্যোতির্বিদ বি. লিন্ডব্লাড, এম. আই.টি.র সি. সি. লিন এবং বার্কলের ফ্রাঙ্ক শু কুণ্ডলিত বাহুর ঘনত্ব

তরঙ্গ-তত্ত্ব (density wave theory) প্রদান করেন। এ তত্ত্বমতে কুণ্ডলিত বস্তুর জন্য দায়ী এক ধরনের কুণ্ডলাকার ঘনত্ব তরঙ্গ যা ছায়াপথের নক্ষত্র ও গ্যাসের মধ্য দিয়ে বেশ ধীর বেগে গমন করে (চিত্র ৫.৪)। এটি আসলে একটি সংনমন তরঙ্গ (compression wave)। কিন্তু এটি কখনো বস্তু বহন করে না। এটি যখন গ্যাসের মধ্য দিয়ে গমন করে তখন পদার্থের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। একইসাথে অভিঘাত তরঙ্গেরও সৃষ্টি হয় যা গ্যাসকে উত্তপ্ত করে তোলে। এই মডেল অনুযায়ী আমরা যেমন দেখি, কুণ্ডলিত বস্তু আসলে সে রকম কোনো প্রকৃত ঘূর্ণনবেগ নির্দেশ করে না। শকওয়েভের কারণে গ্যাস সংনমিত হয় এবং এ কারণে উত্তপ্ত হয়। এভাবে ভূগর্ভের তরঙ্গ যার আর নাম দিল তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে যায়; যদিও পদার্থগুলোর কোনো গতি নেই এবং ঐ সমস্ত স্থানে গ্যাস উত্তপ্ত ও ঘনীভূত হয়ে তারা তৈরি করে। পর্যবেক্ষণ করলে সাতটি কুণ্ডলিত বস্তু বরাবর নতুন সৃষ্ট তারা ও উত্তপ্ত গ্যাস দেখা যায়। কিন্তু ঘনত্ব তরঙ্গের সৃষ্টি হয় কি করে তা-ই জানা নেই। তাই অনেক জ্যোতির্বিদ মনে করেন, প্রথমে শৃঙ্খল বিক্রিয়ার মতো একের পর এক তারার সৃষ্টি হয়েছে আবার মরেছে এবং তারপর তারাগুলো ছায়াপথের বিভিন্ন স্তরের পৃথক ঘূর্ণনবেগের (differential rotation) জন্য কুণ্ডলিত আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বিভিন্ন স্তরের পৃথক বেগ থাকায় দীর্ঘকাল পরে কিভাবে কুণ্ডল কাঠামোর সৃষ্টি হয় তা চিত্রে দেখানো হলো। এ ভাবে স্ট্যান্ড মডেলটির কম্পিউটার সিমুলেশন করে যে রেজাল্ট পাওয়া যায় তার সাথে কুণ্ডলিত ছায়াপথের পর্যবেক্ষিত বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। কুণ্ডলিত বাহুর প্যাঁচের মাত্রা (degree of winding) সম্পর্কে ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। ঘনত্ব-তরঙ্গের সমস্যা হচ্ছে এটি সহজেই দণ্ডাকৃতির কাঠামো (barred structure) প্রদর্শন করলেও দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী কুণ্ডলিত কাঠামো সৃষ্টি সম্ভব নয়।

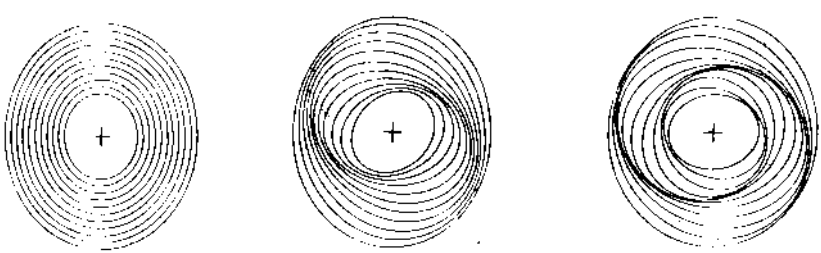

চিত্র ৫.৪ : [illegible] একই সেট [illegible] হয়েছে, পার্থক্য শুধু তারের অক্ষের বা তার [illegible] অক্ষরেখার ঘূর্ণন। [illegible] এর ফলে সমস্ত কুণ্ডলিত বস্তুর প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে। [illegible] কুণ্ডলিত বস্তু নয়; [illegible] কেবল [illegible] সংকেত।

দেখা যাচ্ছে, আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ মহাবিশ্বে তেমন কোনো কেন্দ্রীয় বা মুখ্য স্থানে নয়। এর বয়স প্রায় ১৩ বিলিয়ন বছর। অন্ধকার রাতে, মেঘমুক্ত আকাশে দৃশ্যমান অনন্ত রহস্যময় ছায়াপথের সংক্ষিপ্ত সমাচার এ অধ্যায়ে আলোচিত হলো। খালি চোখে এটি সৌন্দর্য ও অপার রহস্যের আকর। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর প্রতিটি কর্ম-কারণের রয়েছে

যথাযথ ব্যাখ্যা, এও সৌন্দর্য—এটি তত্ত্বের সৌন্দর্য। এটাই ছায়াপথের নন্দনতত্ত্ব। এই সুবিশাল ছায়াপথে আমাদের বাস। আমাদের সূর্য ও তার সৌর পরিবার এবং অসংখ্য তারা, নীহারিকা নিয়ে এই বিশাল ছায়াপথ ছুটে চলেছে অসীম মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে। কি এর নিয়তি, কোথায় এর চলার শেষ এসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য কৌতূহলী মানুষের চেষ্টার কোনো অন্ত

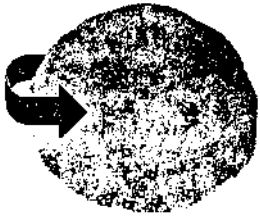

(১) সর্বোচ্চ আকৃতিতে প্রোটো-ছায়াপথ ; চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থের মহাকর্ষীয় আকর্ষণে এটি ঘুরতে শুরু করে

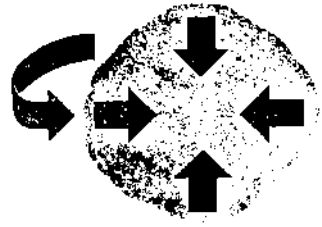

(২) প্রোটো-ছায়াপথ মহাকর্ষের অধীনে ঘনীভূত হতে শুরু করে

(৩) কেন্দ্রীয় এবং বহিস্থ অঞ্চলে তারা তৈরি হতে শুরু করে এবং বর্তুলাকার স্তবক তৈরি হয়

(৪) ঘূর্ণনের ফলে বিষুবীয় অঞ্চল স্ফীত হয়ে যায়

(৫) ক্রমশ ডিস্ক/নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এবং এদের চারপাশে প্রাচীন কিরীট বা halo টি রয়ে যায়

(৬) ছায়াপথের বর্তমান দশা

চিত্র ৫.৫ : ছায়াপথ সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ

নেই জানার এই চেষ্টাই বিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান দূর দূরান্তের নক্ষত্রের সামান্য, দুধু মিটিমিটি আলো যে কত রহস্যের আধার তা এখন মানুষ উপলব্ধি করছে। নক্ষত্রের একবিন্দু আলো মানুষের মনে অসীম কৌতূহলের সৃষ্টি করে। এ ভাবেই মনুষ্য শত বিষণ্ণতা, শত হতাশার মাঝেও জেগে থাকে ; জেগে থাকে তার চেতনা মনীষা-জ্ঞান-গরিমা। জীবনানন্দের ভাষায় :

একবার নক্ষত্রের দিকে চাই— একবার প্রান্তরের দিকে
আমি অনিমেষে।

ধানের খেতের গন্ধ মুছে গেছে কবে
জীবনের থেকে যেন ; প্রান্তরের মতন নীরবে
বিচ্ছিন্ন খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার ;
নক্ষত্রেরা বাতি জ্বেলে জ্বেলে জ্বেলে—'নিভে গেলে—নিভে গেলে ?' বলে
তারে জাগায় আবার
জাগায় আবার।

বইপত্র

আকাশগঙ্গা ছায়াপথের উপর ভালো সাধারণ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য The Milky Way Galaxy by B.J. Bok, *Scientific American*, March, 1981। এছাড়া Zeilik (1990), Snow (1983) এবং Pasachoff (1981) দেখা যেতে পারে। এসব বইয়ে ভালো তবে কিছুটা বিক্ষিপ্ত আলোচনা পাওয়া যাবে। তাছাড়া *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার* Galaxies প্রবন্ধের The Milky Way অনুচ্ছেদ এবং *McGraw Hill Encyclopedia of Science & Techonology* দেখা যেতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নক্ষত্রের গর্ভ থেকে

Looking at the stars always makes me dream.

Vincent Van Gogh

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আশ্চর্য ব্যাপার সকল স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয় এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে তাহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল জন্মে।...নিদাঘ ঋতুতে নিশানাথহীনা নিশাকালে উচ্চ প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট হইয়া একবার গ্রহ–নক্ষত্র- তারকা বিকীরিত মন্দাকিনী মধ্য প্রবাহিত গগণ প্রাঙ্গন–এ দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত কর। সেই অমল নীলিমা, সেই অনন্তবিস্তৃতি, সেই অসংখ্য জ্বলন্ত বিন্দুপাতোজ্জ্বলীকৃতা শোভা, সেই অস্ফুট শ্বেত কলেবরা স্বর্গ মন্দাকিনী, এই সকল শোভা শোভিত দিগ্বলয়ব্যাপী সেই মহাগর্ভে ব্রহ্মাণ্ড কটাহ দেখিলে বিস্ময় পরিপূরিত মনে আপনাআপনি জিজ্ঞাসা করিবে, এগুলি কি? কোথা হইতে আসিল? কি নিয়মে আকাশে বিচরণ করিতেছে?

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬.১ প্রারম্ভিক

নক্ষত্রের ভৌত প্রকৃতি বর্ণনা, এর অভ্যন্তরীণ গঠন পর্যালোচনা, এদের বর্ণালি বিশ্লেষণ ইত্যাদি জ্যোতির্ঃপদার্থবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নক্ষত্র কি, তার গঠনোপাদান, তার শক্তি উৎস এবং বিভিন্ন ধরনের নক্ষত্রের অন্তিম নিয়তি এখানে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া জোড়াতারা, বিষমতারা ও এর বিষমতার কারণ এবং অনুষঙ্গিকভাবে নক্ষত্রের উজ্জ্বলতার শ্রেণীভেদ এবং দূরত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। নক্ষত্রের সমস্ত তথ্য তার বর্ণালি রেখায় চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। তাই বর্ণালি বিশ্লেষণ জ্যোতির্ঃপদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। বর্ণালি নিয়ে এ অধ্যায়ে রয়েছে বিশদ আলোচনা। নিউট্রন তারা, তাদের স্পন্দনের কারণ এবং সাদা বামনতারা নিয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৮৭ সালে ঘটে যাওয়া সুপারনোভা বিস্ফোরণটিকে বহুদিন থেকে বিভিন্ন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়ে আসছে। তাই একে নিয়ে এখানে সচিত্র ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আকাশের সবচেয়ে রহস্যময় বস্তু কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে সংযোজিত 'নক্ষত্র ও আমরা' অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে মানুষ এবং নক্ষত্রের মধ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। কিভাবে মানুষ প্রতিটি জন্মও

মুহূর্তে নক্ষত্রের উপর নির্ভরশীল সে সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদের শুরুতেই প্রবীণ কবি শামসুর রাহমানের যে কবিতা ছত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল পাঠককে ভাবনার খোরাক দেবে। জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে দীর্ঘদিন পর্যন্ত দৃশ্যমান আলোয় পর্যবেক্ষণ চলেছে। আলোকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে (optical astronomy) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে পরিসরে পর্যবেক্ষণ করা হয় সেটি চোখে দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ৩০% হ্রস্বতর থেকে ৩০% দীর্ঘতর পর্যন্ত বিস্তৃত। স্বভাবতই এ পরিসর যথেষ্ট সংকীর্ণ। সম্প্রতি বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বর্ণালির অন্যান্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যেও জোর অনুসন্ধান ও গবেষণা শুরু হয়েছে। অনেকে জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের এই সাম্প্রতিকতম শাখাকে তাই 'new astronomy' আখ্যা দিয়েছেন। এই শাখায় বর্ণালির সকল বিকিরণই অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত : গামা রশ্মি, এক্স-রশ্মি, অতিবেগুনি, দৃশ্যমান আলো, অবলোহিত আলো ও রেডিও তরঙ্গ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দুর্ভাগ্যমে এই বর্ণালি-পরিসরের প্রায় পুরো বিকিরণকেই বাধা দেয়। কেবল দুটি 'জানালা' (window) ব্যবহার করা যায়—একটি হলো দৃশ্যমান আলোর জানালা এবং অন্যটি রেডিও জানালা। এই পুরো বর্ণালি পর্যবেক্ষণের জন্যে তাই কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ সংস্থাপন করা হয়েছে। যেমন কম্পটন গামা রে অবজারভেটরি, রোসাট, স্কাইল্যাব, অ্যাস্ট্রো, হাবল স্পেস টেলিস্কোপ, ইনফ্রারেড স্পেস অবজারভেটরি, কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপ্লোরার, চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি ইত্যাদি। এই সাম্প্রতিক শাখার পর্যবেক্ষণযোগ্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর হলো :

সারণি

দৃশ্যমান আলো :	৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার
আলোকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান :	৩০০ থেকে ১০০০ ন্যানোমিটার
অতিবেগুনি :	৩১০ থেকে ১০ ন্যানোমিটার
এক্স-রশ্মি :	১০ থেকে ০.০১ ন্যানোমিটার
গামা রশ্মি :	< ০.০১ ন্যানোমিটার
রেডিও পরিসর :	> ১ মিমি থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত

এই সুবিশাল পরিসরের বিদ্যুৎ-চুম্বক বর্ণালি আজ জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে উন্মুক্ত। বিজ্ঞানীরা তাই আকাশকে আর দুটি 'জানালা' দিয়ে দেখছেন না ; তাঁদের কাছে এখন পুরো আকাশটাই 'দৃশ্যমান'। দুর্ভাগ্যক্রমে কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এই উত্তেজনাপূর্ণ শাখাটির পূর্ণ বিবরণ এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা গেল না। আগ্রহী পাঠক Henbest & Marten (1996) এর অনবদ্য গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন।

৬.২ নক্ষত্র কি

নক্ষত্র হলো ভারি, জ্বলন্ত কায়া যা অভ্যন্তরীণ শক্তি উৎস হতে প্রাপ্ত বিকিরণের সাহায্যে জ্বলে। এ নক্ষত্রের পৃষ্ঠে থাকে উত্তপ্ত গ্যাস। পৃষ্ঠের গ্যাসের ঘনত্ব আমাদের বায়ুর চেয়েও

অনেক কম। কিন্তু যতোই কেন্দ্রের দিকে যাওয়া যায় ঘনত্ব ততোই বাড়তে থাকে। তবে গড় ঘনত্ব (নক্ষত্রের মোট ভর ও আয়তনের অনুপাত) পানির ঘনত্বের কাছাকাছি। কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পদার্থের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের ১০০ গুণ বা পাথরের ৩০ গুণ। তথাপি কেন্দ্র কিন্তু কঠিন নয়। কারণ কেন্দ্রে ঘনত্ব বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রাও বাড়তে থাকে। ফলে পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। কেন্দ্রে তাপমাত্রা থাকে এক থেকে দশ কোটি ডিগ্রি কেলভিন। এই প্রবল তাপ ও চাপে গ্যাসের পরমাণুগুলো সব ইলেকট্রন হারিয়ে ফেলে। ফলে নাক্ষত্রিক গ্যাসে থাকে কেবল নগ্ন পরমাণু কেন্দ্রীন এবং মুক্ত ইলেকট্রন। পদার্থের এ ধরনের অবস্থাকে বলে প্লাজমা। নক্ষত্রের ভৌত গঠন জানতে হলে তাই প্লাজমার আচরণও জানা থাকা চাই।

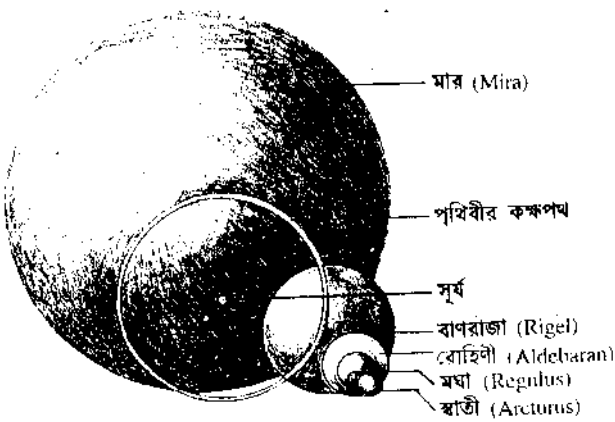

চিত্র ৬.১ : কয়েকটি নক্ষত্রের তুলনামূলক চিত্র

তারাচিত্র নিয়ে কিছু বলা দরকার। আকাশে কতকগুলো তারা নিয়ে কাল্পনিক চিত্র আঁকা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট পুরাণ রচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারাচিত্রে যেসব নক্ষত্রস্তবক কল্পিত হয়েছে সেগুলোর কোনো ভৌত তাৎপর্য নেই। কেবল আমাদের দৃষ্টিরেখায় পড়ে বলেই এমনি কল্পনা করা যায়। যেমন একই রাশির বিভিন্ন তারার দূরত্ব বিভিন্ন রকম। কোনোটির হয়তো ১০ আলোকবর্ষ, কোনোটির বা ১০০ আলোকবর্ষ। এসব তারাচিত্র সুপ্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতা থেকে আজো প্রচলিত আছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭০ অব্দে রাশিচক্র ও ৪১১ অব্দে কেন্দ্রীবিচার শুরু হয়। ফলিত জ্যোতিষের চর্চাও শুরু হয়। বলা হয়, প্রাচীন পারসিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা জরথুস্ত্র (বা জোরাস্টার) ফলিত জ্যোতিষচর্চার শুরু করেন। চীন, মিশর ও ভারতে তারাচিত্র কিঞ্চিৎ অন্য রকম। আকাশে তারাদের জন্ম হয় কখনো জোড়ায়, কখনো বহুতারা ব্যবস্থায়, কখনো অনেকগুলো একত্রে একটি গুচ্ছে। আমাদের ছায়াপথে তারা আছে ১০,০০০ কোটিরও বেশি। এ রকম ছায়াপথের সংখ্যা ১০,০০০ কোটি। ফলে দৃশ্যমান মহাবিশ্বে তারার সংখ্যা $১০^{২২}$।

৬.৩ নক্ষত্রগর্ভে

নক্ষত্রের ভেতরকার অবস্থা কি? আমাদের পক্ষে কখনোই তা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। তবুও পদার্থবিজ্ঞানের বিধি এবং বর্ণালি থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রয়োগ করে আমরা জানতে চেষ্টা করব সেখানে কি ঘটছে। নক্ষত্রের ভেতরের প্রতিটি বিন্দুতে বজায় থাকে এক ধরনের সাম্যাবস্থা। একে বলে উদস্থৈতিক সুস্থিতি (hydrostatic equilibrium)। অর্থাৎ নক্ষত্রের আবহমণ্ডলের প্রতিটি বিন্দুতে চাপ উপরের স্তরগুলোর চাপ বহন করছে। একটি হচ্ছে অন্তর্মুখী চাপ যা ভরের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের জন্য হয়ে থাকে, অন্যটি হচ্ছে বহির্মুখী

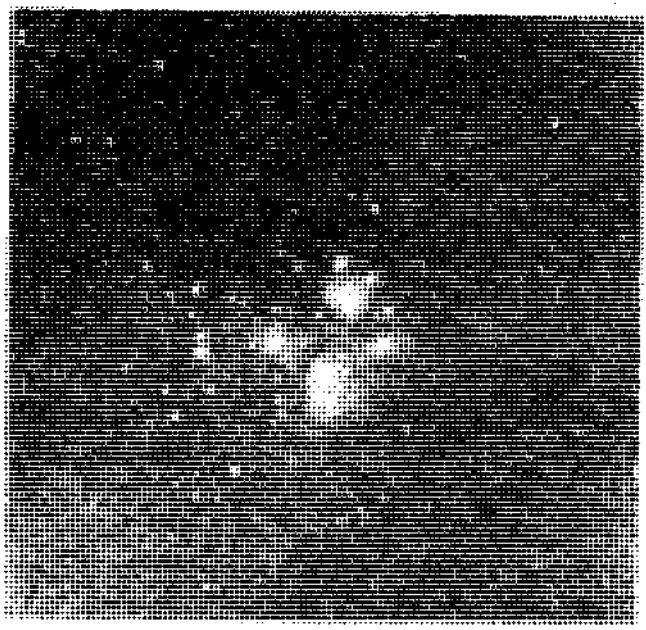

চিত্র ৬.২ : কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডলী।

বিকিরণ চাপ। এই কাঙ্ক্ষিত সুস্থিতি না থাকলে কোনো নক্ষত্র তৈরি সম্ভব নয়। কারণ যে কোনো একটি চাপের প্রাধান্য হলে তা নক্ষত্র না হয়ে হবে অন্য কিছু যা সহজেই বোধগম্য। এভাবে যে কোনো গভীরতায় চাপ ও ঘনত্বের মধ্যে একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অন্তর্মুখী বা মহাকর্ষীয় আকর্ষণ নির্ভর করে ভরের উপর। আবার মহাকর্ষণের উপর নির্ভর করে কী পরিমাণ চাপ একে সাম্যাবস্থায় রাখবে। এবং নক্ষত্রের প্রায় সমস্ত ধর্মই নির্ধারিত হয় এর ভর দ্বারা। অবশ্য তারার অভ্যন্তরীণ রাসায়নিক গঠনও তারার ধর্মকে প্রভাবিত করে। তারার বাতাবরণের গ্যাস যতো ভারি মৌল দিয়ে গঠিত হয় তারা ততো বেশি মহাকর্ষ শক্তি অনুভব করে, ফলে এটি আরো উত্তপ্ত হয় এবং উজ্জ্বলতা বাড়ে। এই যে তারার তাবৎ গুণাবলি

নিয়ন্ত্রণ করতে ভর একে বলে রাসেল ভগট উপপাদ্য। তবে তারার চৌম্বকক্ষেত্র, এর ঘূর্ণনও এক্ষেত্রে অবদান রাখে, কিন্তু এ সম্পর্কে জ্ঞান এখনো অসম্পূর্ণ। ঘূর্ণনের ফলে নক্ষত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে মহাকর্ষীয় ক্রিয়া কমে যায়। এক্ষেত্রে আবহমণ্ডলের সঠিক বর্ণালি পাওয়া যায় অক্ষাংশভিত্তিক গণনায়। আবার বিভিন্ন অক্ষাংশে নক্ষত্রের ঘূর্ণন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ঘূর্ণনের প্রভাব খুব ভালো লক্ষ্য করা যায় জোড়া তারা ব্যবস্থায় যেখানে উপাদানগুলো খুব কাছাকাছি অবস্থান করে।

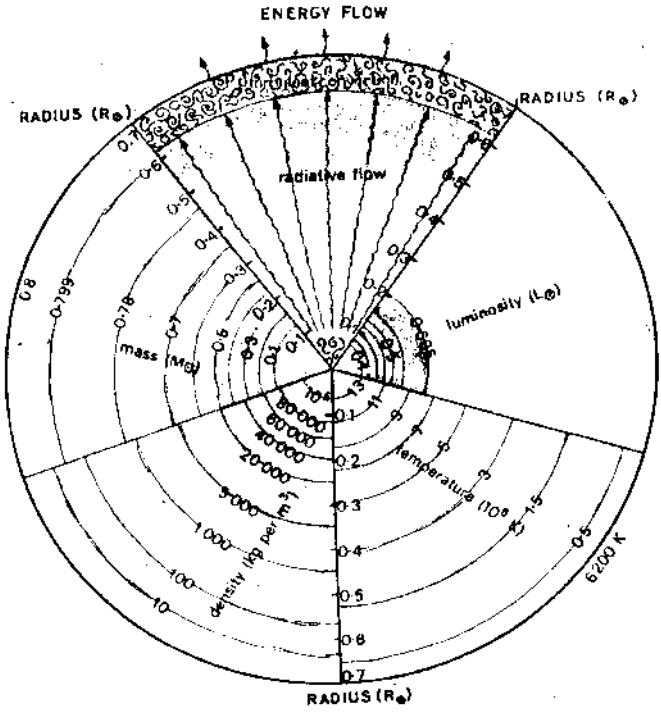

(ক)

চিত্র ৬.৩ : বিভিন্ন শ্রেণীর নক্ষত্রের অভ্যন্তরভাগ : ক, একটি প্রধানধারার তারার বিভিন্ন অংশের অবস্থা কিভাবে কেন্দ্র থেকে দূরত্ব অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় তা দেখানো হয়েছে। চিত্রে দৃষ্ট তারাটি একটি প্রথম তারাসমষ্টির ১.৬ সৌরভরবিশিষ্ট তারা।

সূর্যের আবহমণ্ডলের অনচ্ছতার প্রধান কারণ ঋণাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন H^- (হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে একটি অতিরিক্ত ইলেকট্রন যুক্ত থাকে)। এই ইলেকট্রন যখন অন্য কোনো পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় তখন শক্তি নির্গত হয়। দৃশ্যমান আলোর অনচ্ছতার সৃষ্টি হয় এই আয়নের সাথে ফোটনের মিথস্ক্রিয়ার জন্য। এ প্রক্রিয়াকে বলে আলোক বিযুক্তকরণ। উষ্ণ

তারায় অনচ্ছতার উৎস পারমাণবিক হাইড্রোজেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত শীতল তারায় টাইটানিয়াম অক্সাইড, পানি বাষ্প, কার্বন মনোক্সাইড কর্তৃক শক্তি বিশোষিত হয়। হিলিয়াম পরমাণুর বিশোষণ, ইলেকট্রন বিক্ষেপণ উষ্ণ তারায় অনচ্ছতা ঘটায়, কিন্তু শীতল, দানবতারায় পারমাণবিক আয়নের বিশোষণ, র‍্যালে বিক্ষেপণ (কণিকা দ্বারা বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণকে বিক্ষেপণ) ইত্যাদি অনচ্ছতা ঘটায়

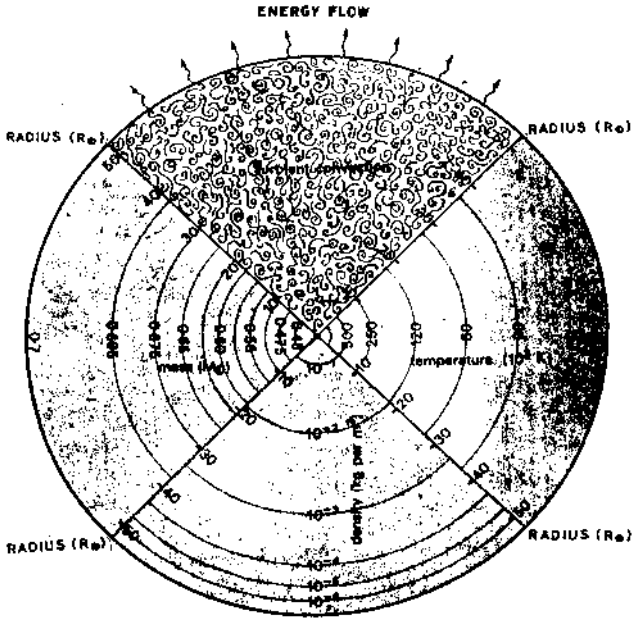

(খ)

৬.৩ : খ) সৌরভরবিশিষ্ট একটি লাল দানবতারার অভ্যন্তর ভাগ যার পৃষ্ঠতাপমাত্রা কমে ৩৫০০ কেলভিনে পৌঁছেছে। এ কারণেই এর বর্ণ হলুদ থেকে লালে পরিণত হয়েছে এবং ব্যাসার্ধ প্রসারিত হয়ে সৌরব্যাসের ৫০ গুণ হয়েছে। এসব কারণে এই দানবতারার উজ্জ্বলতা সূর্যের ১০০০ গুণ। এ ধরনের তারার অধিকাংশ ভরই কেন্দ্রভাগে জমা থাকে।

নক্ষত্রের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে এখানে উদস্থৈতিক সুস্থিতি বজায় থাকে এবং গ্যাস আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে। অত্যধিক তাপে ও চাপে গ্যাসের পরমাণুগুলো ইলেকট্রন হারিয়ে আয়নিত হয়ে যায়। এই আয়নিত গ্যাসকে প্লাজমা বলে। এটি পদার্থের চতুর্থ দশা। যদি তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশি হয় তাহলে আদর্শ গ্যাস চাপের (P_g) পাশাপাশি বিকিরণ চাপও (P_r) বিবেচনায় আনতে হবে। ফলে মোট দশা সমীকরণ দাঁড়ায় : $P=P_r+P_g$; P_r নির্ভর করে তাপমাত্রা ও বিকিরণ ঘনত্ব ধ্রুবকের (প্রতি ডিগ্রিতে প্রতি ঘন

সে. মি.-এ $a=7.5 \times 10^{-15}$ আর্গ, চতুর্থ ঘাতে) ওপর, P_g নির্ভর করে তাপমাত্রা, ঘনত্ব ও আণবিক ওজনের ওপর। এখান থেকে গ্যাসের চাপকে বিকিরণ চাপ কত তাপমাত্রায় সমান দেবে তা নির্ণয় করা যায়। দেওয়া আছে $\mu=2$ (উচ্চসীমা), $\rho=1.4$ গ্রাম/সি.সি., যেখানে μ হচ্ছে গড় কণিকাভর। এটি নির্ণয় করা হয় একক প্রোটন ভরকে একটি গুণক দিয়ে ভাগ

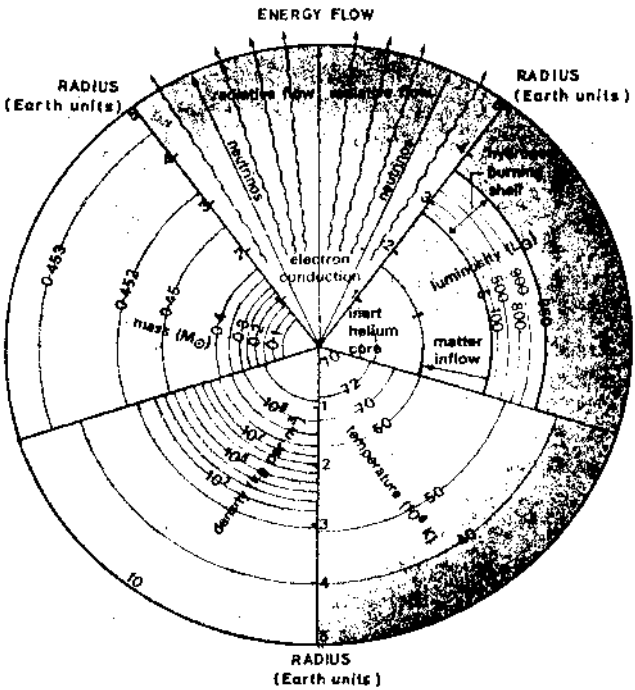

(গ)

৬.৩ : গ. ক চিত্রের তারাটির লালদানব দশায় অভ্যন্তর ভাগ। সমস্ত তারার শক্তি আসে একটি দহনশীল হাইড্রোজেনের মাত্র ৩০০০ কি.মি. পুরু খোলক বা শেল থেকে। কেন্দ্রে থাকে নিষ্ক্রিয় হিলিয়াম যার তাপ নিউট্রিনো বহন করে নিয়ে যায়; কিন্তু তারপরেই হিলিয়াম-জ্বলক শ্রাক্রিয়ায় যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে হিলিয়াম দহন শুরু করে (অনুচ্ছেদ ৬.১১)।

করে। গুণকটি নির্ভর করে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও ভারি আয়নদের গড়ভরের উপর। কিন্তু সাদা বামনতারাদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ভিন্ন। এদের অভ্যন্তরের পদার্থ আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে না। এদের বলা হয় অপজাত পদার্থ (degenerate matter)। এদের ক্ষেত্রে আয়নিত গ্যাসের চাপ, $P=10^{13}(\rho/\mu')^{5/3}$, এখানে ρ = ঘনত্ব, μ' = মুক্ত ইলেকট্রনের গড় ভর। এ ক্ষেত্রে চাপ তাপমাত্রা নিরপেক্ষ।

৬.৪ নক্ষত্রের দূরত্ব ও উজ্জ্বলতা

দূরত্ব : অতিদূর তারাদের দূরত্ব নির্ণয় করা যায় কিভাবে? সমুদ্রের গভীরতা যেমন এক সময় দড়ি ফেলে মাপা হতো, দুই স্থানের দূরত্ব মাপার পদ্ধতিও প্রাক্‌তজনের জানা ছিল। কিন্তু জানা ছিল না তারার দূরত্ব মাপার উপায়। আর তার দরকারও ছিল না, কারণ মানুষ ধরেই নিয়েছিল ওগুলোর দূরত্ব সমান। এবং ওগুলো হচ্ছে আকাশের গায়ে এক ফুটকি আলোকবিন্দু, যা দেবতারা অনুগ্রহ করে জ্বালিয়ে রেখেছেন।

কোপার্নিকাস তাঁর বইতে বললেন যে, তারারা হচ্ছে দূরবর্তী সূর্য। নিউটন পরে হিসাব করে দেখালেন যে, সূর্যকে যদি মিটমিটে তারা হিসেবে দেখতে চাই তবে একে এর বর্তমান দূরত্বের আড়াই লক্ষ গুণ দূরে সরাতে হবে। ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে সূর্যসহ অন্যান্য তারা আসলে একেকটি নক্ষত্র। তবে নিউটনের হিসাবে বেশ ভুল ছিল। বর্তমানে তারার দূরত্ব নির্ণয় করতে ত্রিকোণমিতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। দূরবর্তী বস্তুর দূরত্ব মাপার একটি খুব চমৎকার পদ্ধতি আছে। আপনি একটি পেন্সিল আপনার সামনে ধরুন। এবার এক চোখ বন্ধ করে অন্যচোখ দিয়ে দেখুন। এরপর অপর চোখ বন্ধ করে দেখুন। লক্ষ্য করুন পেছনের স্থির পটভূমির সাপেক্ষে পেন্সিলের ডানে বামে কিছু সরণ ঘটে। পেন্সিলকে যতো দূরে ধরবেন ততো কম হবে এই সরণ। একে বলে **লম্বন** (parallax) পদ্ধতি এবং ঐ সূক্ষ্ম সরণকে লম্বন কোণ বলে (চিত্র ৬.৪)। যতো দূরে বস্তু থাকবে লম্বন কোণ ততো কম হবে এবং যে দুই অবস্থান থেকে পর্যবেক্ষণ হচ্ছে সে দুটি অবস্থানের দূরত্বের ওপরও লম্বন নির্ভর করে। তবে এ পদ্ধতি খুব একটা কার্যকর নয়। কারণ পৃথিবীপৃষ্ঠের ওপর অনেক বড় দূরত্বও নক্ষত্রের দূরত্বের তুলনায় নগণ্য। এমনকি যদি পৃথিবীর দুই মেরু থেকেও করা হয় তথাপি তা নগণ্য। জার্মান জ্যোতির্বিদ বেসেল ঠিক করলেন যে তিনি তারার লম্বন পরীক্ষা করবেন এমন দুটি রাতে, যাদের মধ্যে পার্থক্য ছয় মাস। অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষপথের দুই বিপরীত বিন্দুতে। এই দুই বিপরীত বিন্দুর দূরত্ব ৩০ কোটি কি. মি.। তিনি 61 Cygni নামের একটি তারার লম্বন এভাবে মাপলেন ০.৩ সেকেন্ড। ১ সেকেন্ড হলো ১ ডিগ্রির ৩৬০০ ভাগের ১ ভাগ। তিনি এর দূরত্ব ঠিক করলেন ১০৩ মিলিয়ন মিলিয়ন কি.মি.। সূর্য থেকেও প্রায় ৬ লক্ষ গুণ দূরে। লক্ষণীয় যে তারাদের দূরত্ব এতো বেশি যে তা মাইল–কিলোমিটারে প্রকাশ দুরূহ। তাই নতুন একক ব্যবহার করা হয়। যেমন আলোকবর্ষ, আলো এক বছরে যতো দূরত্ব অতিক্রম করে। প্রায় ৯.৪ মিলিয়ন মিলিয়ন কি.মি.। আরো একটি একক হলো পারসেক বা প্যারালাক্স-সেকেন্ডে। পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধকে স্থির রেখা ধরে তারার দূরত্ব বের করা যায় এর লম্বন কোণ p থেকে। p যদি ১ সেকেন্ড হয় তবে সে দূরত্বকে ১ পারসেক বলে। ১ পারসেক = ৩.২৬ আলোকবর্ষ। কোনো তারার দূরত্ব ১০ পারসেক হলে তার লম্বন হবে ০.১″। আরো দূরবর্তী তারাদের জন্য অবশ্য পদ্ধতিটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। কারণ লম্বন দশমিকের পর দুঘর পর্যন্ত মাপতে গেলে ভুল হয় প্রায় ০.০১″। কাজেই কোটি কোটি মাইল দূরের নক্ষত্র, ছায়াপথের জন্য পদ্ধতিটি গোলমেলে।

যাহোক, পরবর্তীতে বিশেষ এক ধরনের তারা আবিষ্কৃত হলো যারা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে এদের উজ্জ্বলতার পরিবর্তন করে। নির্দিষ্ট সময় ধরে এদের উজ্জ্বলতা স্থির থাকে। এরপর উজ্জ্বলতা বাড়ে বা কমে, তারপর আবার নির্দিষ্ট সময় পর পূর্বের উজ্জ্বলতায় ফিরে আসে।

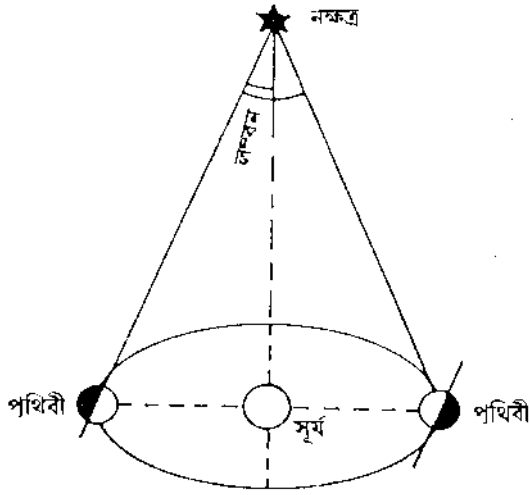

চিত্র ৬.৪ : নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপের লম্বন পদ্ধতি

এদের বলে শেফালী বিষমতারা। হেনরিয়েটা লিভিট ১৯১২ সালে দেখতে পেলেন যে শেফালী বিষমতারাদের পরম উজ্জ্বলতা ও পর্যায়কালের মধ্যে একটা রৈখিক সম্পর্ক আছে (চিত্র ৬.৫)। পর্যায়কাল যতো বেশি, পরম উজ্জ্বলতা ততো বেশি। ফলে দূরবর্তী ছায়াপথগুলোয় যেসব শেফালী বিষমতারা আছে তাদের পর্যায়কাল ও আপাত উজ্জ্বলতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যায়কাল থেকে পাওয়া যায় পরম উজ্জ্বলতা। আর তাহলে দূরত্ব খুব সহজে নির্ণয় করা যায় : পরম উজ্জ্বলতা = আপাত উজ্জ্বলতা + ৫ – ৫ লগ (দূরত্ব)। এখানে দূরত্ব পারসেক–এ পাওয়া যায়। দূরত্ব পরিমাপে এখন প্রায় ২৭টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। শেফালী বিষমতারা, সুপারনোভা, গুচ্ছস্তবক এসবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে কোনোটিই সর্বাংশে ঠিক নয়।

নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা : নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা দু'রকমের আপাত ও পরম উজ্জ্বলতা বা প্রভা। আপাত উজ্জ্বলতা হচ্ছে সেই উজ্জ্বলতা যা পৃথিবী থেকে দেখা যায়। অর্থাৎ খালি চোখে কোনো তারার যে মানের উজ্জ্বলতা দেখা যায় সেটাই এর আপাত প্রভা। খালি চোখে দৃশ্যমান তারাদেরকে হিপারকাস ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতির ফলে অনেক তারাই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ফলে উজ্জ্বলতার শ্রেণীবিভাগে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। তখন প্রয়োজন পড়ে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার। দেখা যায়, বিভিন্ন পর্যবেক্ষক

উজ্জ্বলতার যে অনুপাত ব্যবহার করেছেন তা সর্বত্র একই না হলেও মোটামুটি কাছাকাছি। বর্তমানে স্বীকৃত বিধি অনুযায়ী যে কোনো উজ্জ্বলতার তারা তার পূর্ববর্তী শ্রেণীর চেয়ে আড়াইগুণ কম উজ্জ্বল এবং তার পরবর্তী শ্রেণী তার থেকে আড়াইগুণ কম উজ্জ্বল। যেহেতু তারার শ্রেণীবিভাগ উজ্জ্বলতার সমানুপাতিক ধারা অনুযায়ী গঠিত হয় তাই পগসন প্রস্তাব করেন যে এই মানটি হওয়া উচিত ২.৫১২, যাতে $(২.৫১২)^{৫}=১০০$। বর্তমানে এ ধারাই অনুসৃত হচ্ছে। খালি চোখে দৃশ্যমান সর্বনিম্ন উজ্জ্বলতার শ্রেণী হচ্ছে ৬ষ্ঠ শ্রেণী।

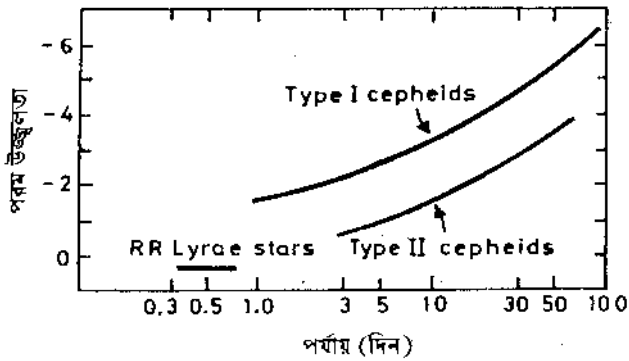

চিত্র ৬.৫ : পর্যায় প্রভা সম্পর্ক

কতকগুলো অধিকতর উজ্জ্বল তারা আছে যাদের উজ্জ্বলতা ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত। যেমন আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের মান −১.৫। ক্যালিফোর্নিয়ার পালোমার মানমন্দিরে ২০০ ইঞ্চি দুরবিনের সাহায্যে ২৩তম উজ্জ্বলতার তারা দেখা গেছে। সূর্যের আপাত প্রভা −২৬.৯। তবে তারার প্রকৃত বা পরম প্রভা জানতে হলে চাই দূরত্ব নির্ণয়। পরম উজ্জ্বলতা হচ্ছে কোনো তারার দূরত্ব যখন ১০ পারসেক তখন তার যে আপাত প্রভা হবে সেটা। কাজেই সূর্য যখন ১০ পারসেক দূরে থাকবে তখন এর প্রকৃত প্রভা হবে ৪.৭। এর সূত্রটি হচ্ছে : $M=m+5-5\log d$; M প্রকৃত প্রভা, m আপাত প্রভা, d দূরত্ব (পারসেক—এ)। বাণরাজা, আল্ফা এদের মতো উজ্জ্বল তারাদের পরম প্রভা −৭ থেকে −৯ এবং সবচেয়ে ক্ষীণ তারার পরম প্রভা +১৯, সূর্যের তুলনায় যা ১ মিলিয়ন ভাগ কম।

৬.৫ জোড়াতারা (Binary Star)

জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় যে সমস্ত তারা পরস্পরের এতো কাছে থাকে যে পারস্পরিক আকর্ষণ এদের একটি নির্দিষ্ট ভারকেন্দ্রের চারদিকে ঘুরতে বাধ্য করে তারাই জোড়াতারা বা যুগল তারা। একটি জোড়াতারা ব্যবস্থার (system) মোট শক্তি ঋণাত্মক। প্রকৃত বিভেদের (separation) নিম্নক্রমিক ধারা অনুযায়ী জোড়াতারা ৩ ভাগে বিভক্ত — দৃশ্যমান, বর্ণালীয় এবং অবরণী জোড়াতারা।

দৃশ্যমান জোড়াতারা (visual binary) : ১০০ থেকে ১০০০০ জ্যোতির্বিদ্যার একক (A.U.) পরিমাণ পার্থক্য বিশিষ্ট জোড়াতারা এ ধরনের। এদের সংখ্যা প্রায় ৬০,০০০। মহাশূন্যে এরা একটি সাধারণ গতি প্রদর্শন করে। আপাত পার্থক্য প্রায় ০.১ এবং পর্যায়কাল মাত্র কয়েক বছরের। এদের যে কোনো একটি তারাকে প্রসঙ্গ ধরলে অন্যটির কক্ষপথে হয়

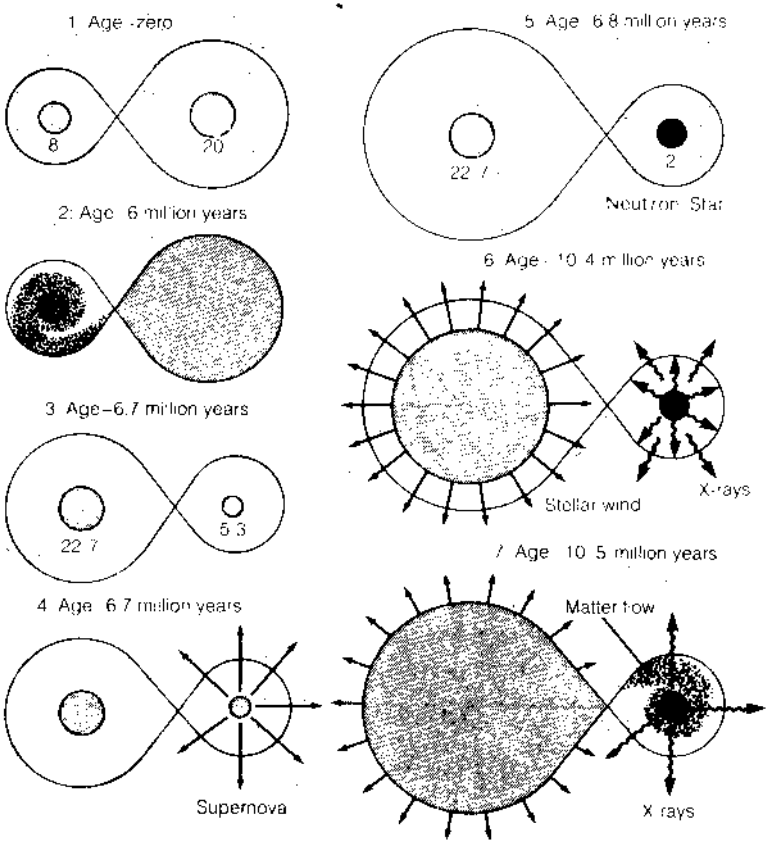

চিত্র ৬.৬ : জোড়া তারার ভর বিবর্তন পর্যায়।

উপরে উল্লিখিত (যার উপরেও প্রসঙ্গ তারা) দুটি তারার ভর M_1 ও M_2 সূর্যভরাহলে, পর্যায়কাল P, অর্ধ-বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য a_1 ও a_2, তারাদুটির লম্বন π (আর্কসেকেন্ড) হলে কেপলারের গ্রহগতির তৃতীয় সূত্রানুসারে : $M_1+M_2=a^3/\pi^3P^2$ এবং $M_1/M_2=a_2/a_1$। প্রথম আবিষ্কৃত জোড়া তারা ছিল উরসা মেজরিস। অন্যান্য জোড়াতারা হলো : 61Cygni, Castor (যোড়া তারা), Sirius (লুব্ধক)।

বর্ণালীয় জোড়াতারা (spectroscopic binary) : পারস্পরিক বিভেদ 10 A.U. বা এর চেয়ে কম। বর্ণালীর উপস্থিতির সরণের ওপর ভিত্তি করে এদের প্রকৃত বেগ নির্ণয় করা হয়। পর্যায়কাল ১ থেকে ১০০ দিন। এরকম প্রায় ২,০০০ তারা আছে। তারা দুটো পরস্পরকে ঘিরে ঘোরে বলে একটি তারা পৃথিবী থেকে দূরে সরে যায় এবং অন্যটি পৃথিবীর দিকে সরে আসে। ফলে প্রথমটির বর্ণালীতে রক্তিম ও দ্বিতীয়টির বর্ণালীতে নীল সরণ দেখা যায়। এই নিয়মিত পরিবর্তনের জন্য এদের বেগের লেখচিত্র (velocity curve) পর্যাবৃত্তিক। ফলে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ছন্দিত পরিবর্তন ঘটে। তবে এদের অর্ধ-বৃহদক্ষ পরিমাপ জটিল বলে ভর নির্ণয় কঠিন। উদাহরণ হলো : Capella (ধ্রুবতারা), Spica (চিত্রা), Ballatrix (বিশাখা)।

আবরণী জোড়াতারা (Eclipsing binary) : এদের পার্থক্য হলো 0.1 থেকে 10 A.U.। স্পষ্ট গ্রহ এরা খুব নিকটবর্তী। ফলে পর্যায়কাল কম। মাত্র কয়েক ঘণ্টা থেকে দশ দিন। প্রায় ৪,০০০ তারা আবরণী জোড়াতারা। এদের কক্ষতল পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিরেখার সাথে খুব কোণে থাকে। এতে করে একটি তারার দ্বারা অন্য তারার গ্রহণ ঘটতে পারে। এই গ্রহণ পূর্ণ অথবা বলয়াকার (annular) হতে পারে। দূরবর্তী পর্যবেক্ষকের কাছে এ ধরনের নাক্ষত্রিক গ্রহণকে ব্যবস্থার আলোর পর্যায়বৃত্ত পরিবর্তন বলে মনে হবে। Algol (মঘাবর্তী) এ ধরনের একটি সুবিখ্যাত তারা।

যেকোনো জোড়া তারা এক বা দুই শ্রেণীতে পড়তে পারে। শেষ ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থার তারা দুটি যদি পরস্পরের পরিধি স্পর্শ করে এবং এরা যদি উজ্জ্বলতায় দেদীপ্যমান হয় তবে এরা দীপ্যমান জোড়া তারা। এরা যদি পর্যায়ক্রমে পরস্পরের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তবে এরা আবরণী জোড়া এবং অবশ্যই বর্ণালীয় জোড়া। আবার অনেক সময় অনেক জোড়াতারার একটি সঙ্গীকে দেখাই যায় না। দীর্ঘকাল যাবৎ এর পথ পর্যবেক্ষণ করলে মনে হবে যেন এর একটি অদৃশ্য সঙ্গী আছে। এরা জ্যোতির্মিতিক জোড়া (astrometric binaries)। জোড়া তারাসমূহ শুধু সংখ্যায় বেশি নয়, নক্ষত্রের অনেক মৌলিক তথ্যও এখান থেকে পাওয়া যায়।

৬.৬ বিষমতারা (Variable Stars)

অনেক তারা আছে যাদের উজ্জ্বলতা পরিবর্তনশীল। যেমন আবরণী জোড়াতারা-এ ক্ষেত্রে জ্যামিতিক কারণে বিষমতা ঘটে। কিন্তু এমন অনেক তারা আছে যারা স্বকীয় কারণেই বিষম। এ ধরনের তারা আসলে এদের বিবর্তনের পথে বিশেষ দশায় উপনীত হয়। এরা কয়েক ধরনের হতে পারে :

স্পন্দনশীল বিষম (Pulsating variables) : এদের বিষমতা ঘটে নাক্ষত্রিক স্পন্দনের কারণে। ছন্দিত সেফিয়ি (δ-Cepheid) বা সেফেলীয় মণ্ডলের এই তারাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বিষম তারা। এদের বলে সেফেলী বিষম তারা (Cepheid variables)। ছায়াপথের বৃত্তাংশে বা বহুত্ব তারা (population I) অথবা সেফেলী বিষমতারার চমকের বেগরেখা

(velocity curve) পাওয়া যায়। এরা পর্যায়-প্রভা সম্পর্ক মেনে চলে এবং দূরত্বের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ছায়াপথের দূরবর্তী দ্বিতীয় তারাসমষ্টির অন্তর্গত শেফার্লী বিষমতারা পর্যায়-প্রভা সম্পর্ক মেনে চলে না। এরা নীলচে এবং দূরত্ব নির্ণয়ের ব্যাপারে এরা একদম অকেজো। ঠিক একই রকমের আরেক ধরনের তারা আছে RR Lyrae—এদেরকে সাধারণত তারাস্তবকে পাওয়া যায়। দূরবর্তী তারাস্তবকের দূরত্ব নির্ণয়ে এরা ব্যবহৃত হয়। শেফার্লী বিষমতারার পৃষ্ঠতাপমাত্রা ৬ থেকে ৭.৫ হাজার ডিগ্রি কেলভিন। এরা শীতল লাল দানব বা অতিদানব তারা। বর্ণালির শ্রেণী M, R, N (কার্বন সমৃদ্ধ), এবং S (ভারি ধাতু সমৃদ্ধ)। যখন কোনো শেফার্লী বিষমতারা সংকুচিত হয় তখন এর ঘনত্ব বাড়ে, ফলে হিলিয়াম আয়ন ইলেকট্রন গ্রাস করে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়। এতে আলো বিশোষিত হয়। এই বিকীর্ণ শক্তি নক্ষত্রের গর্ভে জমা হয়, এতে তাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা আবার প্রসারিত হয়। ঘনত্ব কমে যায় এবং হিলিয়াম পরমাণু পুনরায় নির্গত বিকিরণ দ্বারা আয়নিত হয়, ফলে আলো মুক্ত হয়, কারণ হিলিয়াম পরমাণু আলো বিশোষণ করে অনচ্ছতা ঘটায় না। Mira type Variables, RV Tauri, Beta Canis Majoris এরা সবাই বিভিন্ন ধরনের স্পন্দনশীল বিষমতারা। আমরা এখানে এদের আলোচনা উহ্য রাখছি।

বিস্ফোরণশীল বিষমতারা (Explosive variables) : সুপারনোভা বিস্ফোরণ, বিভিন্ন জোড়াতারায় দৃশ্যমান নানা পরিবর্তন, তারায় ঝলক ক্রিয়া (flare activity) ইত্যাদি বিস্ফোরণশীল বিষমতারা সৃষ্টি করে। জোড়াতারা ব্যবস্থার একটি তারা যদি বিবর্তনের অন্তিম দশায় আসে তবে এটি থেকে পদার্থ অন্য তারায় চলে যায় এবং বিস্ফোরণের পর সেখানে তৈরি হতে পারে কোনো নিউট্রন বা সাদা বামনতারা। তখন আবার অন্য তারা থেকে পদার্থ এতে এসে পড়ে। ফলে সুস্থিতি বিনষ্ট হওয়ায় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে (চিত্র ৬.৬)। এতে করে তারার উজ্জ্বলতা বেড়ে যায়। একে নবতারা (Nova) বলে। উজ্জ্বলতার মান কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ২০ শ্রেণী ছাড়িয়ে যেতে পারে। সঙ্গী তারার প্রসারিত বহিরাবরণের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকালে নিউট্রন তারা থেকে এক্স-রে বিকিরণ পাওয়া যেতে পারে। আবার কোনো ভারি তারার অন্তিম দশায় সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটায়। এটাও বিস্ফোরণশীল বিষমতারার অন্তর্ভুক্ত। কিছু লাল বামনতারা আছে (যেমন — Proxima Centauri) যাদের উজ্জ্বলতা হঠাৎ চার শ্রেণী বেড়ে যায়। এরা ঝলক বা প্রদীপ্ত তারা (flare star)। এদের শক্তি নির্গমন ক্ষণস্থায়ী অপরিবৃত্ত প্রকৃতির। নক্ষত্রের ঝলক ক্রিয়ার (flare activity) সময়ে বর্ণালির নিঃসরণ রেখা প্রবল হয়। নতুন সৃষ্ট তারাদের মধ্যে T Tauri তারা দেখা যায় যারা ঝলক ক্রিয়া প্রদর্শন করে। আমাদের ছায়াপথের দক্ষিণে একটি উজ্জ্বল, সূর্যের ১০০ গুণ ভারি তারা দেখা যায় যার নাম Eta Carinae। এর বাংলা নাম মারীচ (?)। ১৮৩৩ সালে এর উজ্জ্বলতা সূর্যের ৪০ লক্ষ গুণ হয়ে যায়। কয়েক বছর পর উজ্জ্বলতা কমে এবং এখন এটি একটি মে উজ্জ্বল তারা। এটি একটি রহস্যময় বিস্ফোরণশীল বিষমতারা। মনে হয় সব বিষমতারাই তারার বিবর্তনের স্বল্পস্থায়ী দশা নির্দেশ করে।

বিচিত্র বিষমতারা (Peculiar variables) : কতক তারা আসলে বিচিত্র বিষমতারাও বটে। R Coronae Variables নামে এক ধরনের দানবতারা আছে যাদের পৃষ্ঠতাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি। এরা কার্বনসমৃদ্ধ এবং ক্ষেত্রবিশেষে কার্বন বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ছাই (soot) তৈরি করে। এতে করে তারাটি ঢাকা পড়ে যায় এবং এর উজ্জ্বলতা কমে। ধীরে ধীরে এই ছাই বাষ্পীভূত হয় এবং তারার উজ্জ্বলতা বেড়ে আবার আগের মতো হয়। দীর্ঘ-পর্যায়ী (Long period) বিষমতারাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের ক্রিয়া হতে পারে। বর্তুলাকার স্তবক (globular cluster) এবং এর বাইরেও এমন কিছু উৎস পাওয়া যায় যারা এক্স-রে বিকিরণ করে। এ ধরনের উৎসের বিকিরণ প্রাবল্য কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ১০ গুণের মতো হয়ে যেতে পারে। এদেরকে বলে বিদারক (bursters)। কোনো কোনো বিদারক নিয়মিত বিষমতা দেখালেও অধিকাংশই অনিয়মিত বিষমতা দেখায়। বিদারক হলো পরিবর্তিত জোড়াতারা। এতে একটি সঙ্গী তারা হলো নিউট্রন তারা বা কৃষ্ণবিবর। অন্য তারা থেকে যখন পদার্থ এতে আসা হয় তখন তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, ফলে এক্স-রে পাওয়া যায়। বিদারণের (burst) জন্য বোধহয় এমন কিছু দায়ী যা পদার্থ পতনের পদ্ধতিকে বাধা দেয় অথবা জোড়া তারার অবস্থাকে কমপক্ষে একজন দায়ী হতে পারে।

বিষমতারার নামকরণ : যখন কোনো স্তবকের প্রথম বিষমতারা আবিষ্কৃত হয় তখন সেই তারাটির নামকরণ করতে R অক্ষর বসিয়ে তারপর স্তবকের নাম জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন RCMa। এর পরবর্তী আটটি ক্রমিক বিষমতারার নাম দেওয়া হয়েছিল ক্রমান্বয়ে S, T, U, V, E, X, Y, ও Z জুড়ে দিয়ে। এরপর দশম তারা এবং তার পর থেকে এদের নামে যোগ করা হয়েছিল RR, RS ...RZ এসব জোড়া অক্ষর, এবং তারপর SS, ST ...SZ, এভাবে ZZ পর্যন্ত। যেমন RR Lyr। এই সিকোয়েন্স শেষে AA, AB ... থেকে AZ পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছিল (কেবল AJ বাদে)। এরপর BB, BC ... থেকে BZ পর্যন্ত (কেবল BJ বাদে)। এরপর ইংরেজি বর্ণমালার Q পর্যন্ত এভাবে নামকরণ করা হয় (J অক্ষরটি বাদে)। এভাবে জোড়া অক্ষর ব্যবহার করে কোনো স্তবকের প্রথম ৩৩৪টি বিষমতারার নাম দেওয়া হয়ে থাকে। এরপরও যদি কোনো বিষমতারা থেকে থাকে তবে তাদের নাম দেওয়া হয় এভাবে : V335, V336 ইত্যাদি। যেমন : V 1195Aql। নিচের তালিকাটি লক্ষণীয় :

[illegible]

বিষমতারার ক্রমিক সংখ্যা	নাম
১–৯	R, S,T.U,V,W,X,Y,Z,
১০ – ১৮	RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ
১৯ – ২৬	SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ
২৭ – ৩৩	TT, TU, TV, TW, TX, RY, TZ
৩৪ – ৩৯	UU, UV, UW, UX, UY, UZ
৪০ – ৪৪	VV, VW, VX, VY, VZ
৪৫ – ৪৮	WW, WX, WY, WZ
৪৯ – ৫১	XX, XY, XZ
৫২ – ৫৩	YY, YZ
৫৪	ZZ
৫৫ – ৭৯	AA, AB ...AI & AK, AL ... AZ
৮০ – ১০৩	BB, BC ...BI & BK, BL ...BZ
১০৪ – ১২৫	CC,CD ...CI & CK, CL, ...CZ
১২৭ – ১৪৮	DD, DE ...DI & DK, DL ...DZ
১৪৯ – ১৬৯	EE,EF ... EI & EK, EI ... EZ
১৭০ – ১৮৯	FF, FG ...FI & FK, FL ... FZ
১৯০ – ২০৮	GG, GH, GI & GK, GL ... GZ
২০৯ – ২২৬	HH, HI & HK, HL ...HZ
২২৭ – ২৪৩	II & IK, IL ... IZ
২৪৪ – ২৫৯	KK, KL ... KZ
২৬০ – ২৭৪	LL, LM ... LZ
২৭৫ – ২৮৬	MM, MN ... MZ
২৮৯ – ৩০১	NN, NO ... NZ
৩০২ – ৩১৩	OO, OP ... OZ
৩১৪ – ৩১৪	PP, PQ, ... PZ
৩১৫ – ৩৩৪	QQ, QR ... QZ
৩৩৫ থেকে	V335 etc.

৬.৭ নবতারা (Nova)

নবতারা বিস্ফোরণের ফলে হঠাৎ করে একটি কম উজ্জ্বল তারার উজ্জ্বলতা ১০০০০ বা তারও বেশি গুণ বেড়ে যায় মাত্র কয়েকদিনের জন্য। একটি নোভা বিস্ফোরণে প্রায় 10^{45} জুল বা তারও বেশি শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তির উৎস হচ্ছে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়ার দহন। বছরে প্রায় ২৫ থেকে ৩৫ টি নোভা দেখা যায়। ১৯৯২ সালে এরকম একটি নোভা বিস্ফোরণ ঘটনাকে যথেষ্ট সূক্ষ্মতায় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এর নাম Nova V 1974 Cygni। নোভা থেকে দৃশ্যমান, রেডিও, অতিবেগুনি, অবলোহিত এবং নিম্নশক্তির এক্স রশ্মির বিকিরণ পাওয়া যায়। জোড়াতারাই নোভার সৃষ্টি করে। জোড়াতারার বড় তারাটি (বা মুখ্য তারা) বিবর্তনের পথে প্রসারিত হয় এবং এর প্রসারিত বহিরাবরণের মধ্যে ছোট তারাটি, যা তখনো প্রধান ধারার একটি তারা, প্রবেশ করে। মুখ্য তারাটি তার অনুযায়ী অন্তিম দশায় সাদা বামন, নিউট্রন তারা বা কৃষ্ণবিবরে পরিণত হয় (চিত্র ৬.৬)। শেষের দুটির ক্ষেত্রে জোড়াতারাটি এক্স-রে উৎস হিসেবে কাজ করে। প্রসারণের ফলে জোড়াতারা ব্যবস্থা থেকে অধিকাংশ পদার্থ এবং কৌণিক ভরবেগ হারিয়ে যায়। ফলে তারা দুটি নিকটবর্তী হতে থাকে। ফলে এদের পর্যায়কাল সপ্তাহ বা বছর থেকে কমে ঘণ্টা/দিনে পরিণত হয়। এরপর গৌণ তারাটির বিবর্তন শুরু হয় এবং এটি প্রসারিত হয়। প্রসারিত হয়ে এটি Roche limit এ পৌঁছে। এ বিন্দুতে দুই তারার মহাকর্ষীয় ও কক্ষীয় বলসমূহ সাম্যাবস্থায় থাকে, ফলে গ্যাস কে নো শক্তি না হারিয়েও প্রবাহিত হতে পারে। এখন শীতল গৌণ তারাটি থেকে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামসমৃদ্ধ পদার্থ গিয়ে সাদা বামনতারাটিতে পড়তে থাকে। এই নির্গত পদার্থের যথেষ্ট কৌণিক ভরবেগ থাকার কারণে এরা ঘুরে ঘুরে কুণ্ডলাকারে পড়তে থাকে। যে বিন্দুতে গ্যাসের স্রোত সাদা বামনতারার বিবৃদ্ধির (accretion) ডিস্কে প্রবেশ করে সে বিন্দুকে বলে hot spot। আপতিত পদার্থের সাথে সাদা বামনতারার কেন্দ্রের উপজাত পদার্থ মিশ্রিত হয়। যখন যথেষ্ট পদার্থ বামনতারার পৃষ্ঠে জমা হয় তখন পৃষ্ঠস্থ পদার্থ সংকুচিত এবং উত্তপ্ত হয়। এর ফলে বামনতারার বাইরের ও ভেতরের স্তরসমূহের মধ্যে ঘটে কার্বন-নাইট্রোজেন-অক্সিজেন (CNO) বিক্রিয়া। এর ফলে বাইরের অঞ্চলের তাপমাত্রা বেড়ে প্রায় ১০ কোটি ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। এর ফলে নিয়ন্ত্রণহীন কেন্দ্রীন বিক্রিয়া (runaway nuclear reaction) শুরু হয় যাতে H_2, He, C, N_2 ও O_2 পুড়তে থাকে। এভাবেই বিস্ফোরণটি ঘটে থাকে। বিস্ফোরণের সম্পূর্ণ ঘটনা অবশ্য আরেকটু জটিল। নোভা কয়েক রকমের হতে পারে : (১) বামন (dwarf) নোভা যাদের উজ্জ্বলতা ১০ থেকে ১০০ গুণ বেড়ে যায় প্রতি ঘণ্টায়/সপ্তাহে/মাসে/বছরে। এর কারণ অতিরিক্ত পদার্থ সাদা বামনে পড়তে থাকে। (২) নোভা বিষম তারা (novalike variables) যেখানে পদার্থ পতনের হার বাড়তে থাকে তবে সাম্প্রতিক কোনো বিস্ফোরণ ঘটেনি, (৩) মিথোজীবী (symbiotic) তারা যাদের গৌণ তারাটি একটি দানব তারা, ফলে দীর্ঘ পর্যায়কাল এবং বিবৃদ্ধির ডিস্কের অনুপস্থিতি লক্ষণীয় (৪) চিরায়ত এবং পৌনঃপুনিক (recurrent) নোভা। এখানে সাদা বামনের উপর আপতিত পদার্থ হাইড্রোজেন দহনের ফলে বিস্ফোরিত হয়। পৌনঃপুনিক নোভায় বিস্ফোরণের ঘটনা

স্বল্প সময়ে একাধিকবার ঘটে এবং খুব বেশি পদার্থ মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয় না। চিরায়ত (classical) নোভার বিস্ফোরণের পর্যায় দীর্ঘ (হাজার থেকে লক্ষ বছর)। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া Nova V 1974 Cygni ছিল গত ১০ বছরের মধ্যে উজ্জ্বলতম নোভা। একে একদম শুরু থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল –Compton Gamma Ray Observatory, ROSAT, Voyager-2, Hubble Space Telescope, International Ultraviolet Explorer, Lowell Observatory ও Very Large Array থেকে। এই বিপুল ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ফলে এ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গিয়েছে। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য *Scientific American*, January 1995।

৬.৮ বর্ণালি তারাবর্ণালি

নক্ষত্রের দূরত্বের সাথে সাথে যা মানুষের মনকে ভাবিত করে তোলে তা হচ্ছে নক্ষত্রের গঠন। নক্ষত্র কি দিয়ে তৈরি? এটি কীভাবে জানা সম্ভব? সূর্যের প্রচণ্ড তাপে এর কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া অনেক নক্ষত্রের দূরত্ব এতো বেশি যে আমাদের কল্পনাও হার মেনে যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দেখা গেল, নক্ষত্র থেকে যে আলো আসে সেই আলোতেই পাওয়া যায় নক্ষত্রের জীবনকথা, তার ইতিবৃত্ত, সুসমাচার। জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানে উষালগ্নের সূচনা ঘটে আলোর প্রকৃত অনুসন্ধান শুরুর মাধ্যমে। নিউটন প্রথমে সূর্যের সাদা আলোকে একটি প্রিজমের মধ্য দিয়ে চালিত করে দেখালেন যে, তা সাতটি রঙের আলোর মিশেল। ১৬৬৩ সালের এই পরীক্ষায় সূর্যের আলোর যে বিশ্লেষিত রূপ পাওয়া গেল তাকে বলা হলো বর্ণালি (spectrum)। তবে নিউটন এ পদ্ধতি কোনো নক্ষত্রের আলো বিশ্লেষণে প্রয়োগ করেননি। ১৮১৪ সালে জোসেফ ফন ফ্রানহোফার সূর্যের আলোকে একটি পাতলা স্লিটের মাধ্যমে চালিয়ে তারপর প্রিজমের সাহায্যে বিশ্লেষণ করলেন। তিনি দেখলেন যে রঙধনুর বর্ণালিতে অসংখ্য কালো কালো রেখা। কিন্তু এগুলো কিসের দাগ? "দেহ কেন ভরা ওর কালো কালো দাগে?" দীর্ঘকাল যাবৎ এর কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। ১৮৫৪ সালের কাছাকাছি দুজন জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট বুনসেন ও গুস্তাফ কার্শফ বিভিন্ন লবণের উপস্থিতিতে অনুজ্জ্বল বুনসেন বার্নারের রঙ পর্যবেক্ষণ করলেন। তারা দেখালেন যে যদি বার্নারের উজ্জ্বল আলোকে সোডিয়ামের বাষ্পের মধ্য দিয়ে চালিয়ে তারপর প্রিজমে প্রবেশ করানো হয় তাহলে কালো রেখা উৎপন্ন হয়। কারণ সোডিয়াম কিছু আলো বিশোষণ করে এবং বর্ণালির ঐ সমস্ত জায়গায় কালো রেখা দেখা যায় যেখানে আলো বিশোষিত হয়েছে। কিন্তু যখন অনুজ্জ্বল বুনসেন বার্নারের শিখায় সোডিয়াম লবণ দেওয়া হলো তখন বর্ণালির ঠিক সেসব জায়গায় উজ্জ্বল রেখা পাওয়া গেল যেখানে আগে কালো রেখা পাওয়া গিয়েছিল। এভাবে বর্ণালিতে কালো রেখা থেকে বোঝা যায় কোন কোন মৌল উপস্থিত আছে। কিন্তু নক্ষত্রের বেলায় এই বর্ণালি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গিল ধাঁধা। বর্ণালির অনেক রেখাই জানা মৌলের বর্ণালির সাথে মেলে না। এর সমাধান দিলেন বাঙালি জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহা। তার তত্ত্বীয় আয়োজন তত্ত্বের সাহায্যে বলা যায় যে, নক্ষত্রের অভ্যন্তরিক তাপে

গ্যাসগুলো তখন আর সাধারণ গ্যাস থাকে না, এরা আয়নিত হয়ে যায়। এদের তখন প্লাজমা বলে। গ্যাসকে আয়নিত করে নিলে এ সমস্যার সুন্দর সমাধান পাওয়া যায়। এরা বর্ণালি বিশ্লেষণ করে কি পদার্থ কি পরিমাণে আছে তা আমরা জানতে পারি। নক্ষত্রের কেন্দ্রে বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন আলো যখন এর আবহমণ্ডলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তখন আবহমণ্ডলে যেসব আয়নিত গ্যাস থাকে তারা আলো বিশোষণ করে। ড. সাহার এই তত্ত্ব আধুনিক জ্যোতির্ঃপদার্থবিজ্ঞানে পথিকৃতের কাজ করেছে এবং এভাবে জ্যোতির্ঃপদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে বাঙালির অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

এভাবে জানা যায় কি কি পদার্থ নক্ষত্রের বাতাবরণে আছে। প্রত্যেক মৌলের জন্য আলাদা আলাদা বর্ণালিরেখা আছে এবং কারো সাথে কারো মিল নেই, যেমন মানুষের হাতের ছাপে একজনের সাথে অন্যজনের কোনো মিল নেই। তারকা থেকে নিঃসৃত বর্ণালিতে আছে তারার সমস্ত মর্মবাণী, সমস্ত রহস্য। নক্ষত্রের বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করা হয় স্পেকট্রোস্কোপ দিয়ে। গবেষণার ফলে জানা গেছে সূর্যে আছে সোডিয়াম, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, তামা, দস্তা, নিকেল। পরে হাইড্রোজেন, কার্বন, সিলিকন আবিষ্কৃত হয়। সব নক্ষত্রেই হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। পরমাণু বা আয়নের মধ্যে ইলেকট্রন পরিবর্তির জন্য বর্ণালি রেখার সৃষ্টি হয়। যখন ইলেকট্রন কেন্দ্রীনের নিকটবর্তী বা দূরবর্তী হয় তখন আলো বা বিকিরণের আকারে শক্তি নির্গত বা বিশোষিত হয়। সূর্যের অবিচ্ছিন্ন বর্ণালি (বর্ণালিরেখা থেকে পৃথক) তৈরি হয় ঋণাত্মক হাইড্রোজেন আয়নের আলোক বিযুক্তকরণের (photo dissociation) মাধ্যমে। ঋণাত্মক হাইড্রোজেন আয়নে (H^-) একটি অতিরিক্ত ইলেকট্রন দুর্বলভাবে এর সাথে যুক্ত থাকে। যখন H^- আলোক বিযুক্তকরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয় তখন তা যে কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শক্তি বিশোষণ করতে পারে। ফলে বিকিরণ বিশোষণের অবিচ্ছিন্ন ধারা স্থাপিত হয়। নক্ষত্রের বর্ণালি অবশ্য তাপমাত্রার উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। যেহেতু ১৮৯০ সালে ফাদার অ্যাঞ্জেলো সেচি ব্যবহারিকভাবে তারাবর্ণালির একটি খসড়া প্রণয়ন করেন। এতে ৫টি গ্রুপ ছিল : নমুনা I এ ছিল নীল সাদা তারা (শক্তিশালী হাইড্রোজেন বিশোষণ রেখা), নমুনা II এ ছিল হলুদ ও কমলা তারা (অনেকগুলো পদার্থের বর্ণালি), নমুনা III ও IV এ ছিল লাল তারা (চওড়া কালো ব্যান্ডের বর্ণালি), নমুনা V এ ছিল উজ্জ্বল বর্ণালিরেখার তারা। স্পেকট্রোস্কোপের উন্নতির ফলে হার্ভার্ডের ই. সি. পিকেরিং চমৎকারভাবে তারাবর্ণালির শ্রেণীবিভাগ করলেন। তিনি A থেকে Q পর্যন্ত বর্ণগুলো ব্যবহার করেছিলেন। ১৯১৬ সালে হেনরি ড্রেপার ক্যাটালগে উষ্ণতম থেকে শীতলতম বর্ণালিশ্রেণীর তারাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয় এভাবে : O, B, A, F, G, K, M (তাপমাত্রার অধঃক্রমে)। এর সাথে R, N ও S বর্ণালির তারাও মাঝে মাঝে যোগ করা হয়। শেষের তিনটি বর্ণালির তারার রাসায়নিক গঠন ভিন্নতর, এরা দানব বা অতিদানব। বর্ণালির শ্রেণীর মধ্যে আবার উপশ্রেণী আছে, যেমন G5 হলো G0 থেকে K0 এর মাঝে। O এবং M তারাদের জন্য উপশ্রেণী আলাদাকম : Oa থেকে Oe, Ma থেকে Md। বর্ণালির উপরিউক্ত ধারাটি মনে রাখার জন্য একটি চমৎকার বাক্য আছে : "Oh Be A Fine Girl Kiss Me

Right Now Sweetheart." [illegible] O M [illegible] B [illegible] M, R, N, S [illegible] (PiO) [illegible] K [illegible] G [illegible] (CN) [illegible] OH [illegible] G [illegible] B [illegible] d. [illegible] (emission) [illegible] e. [illegible] s, [illegible] (broad) [illegible] n. [illegible] (interstellar absorption lines) [illegible] k [illegible] (dMe, Blne)

[illegible] M K [illegible] Ia [illegible] O9 S IV-V [illegible] O9 S B0 [illegible] M K [illegible] (peculiar) [illegible] R S N [illegible] (CN) [illegible] S [illegible] DO, DB, Dc [illegible] K0 III-(CN 3) [illegible] (CN) [illegible]

হার্ভার্ড ও M-K পদ্ধতি

বর্ণালি	রঙ	সাধারণ ধর্ম	উদাহরণ	তাপমাত্রা (কেলভিন)
O	নীল	আয়নিত হিলিয়াম ও প্রশম হিলিয়াম রেখা, হাইড্রোজেনের দুর্বল রেখাও কখনো দৃশ্যমান।	উজ্জ্বল তারার কোনো উদাহরণ নেই	>২৫,০০০
B	নীল	প্রশম হিলিয়াম রেখা এবং শেষের উপশ্রেণীগুলোতে (B6-B9) হাইড্রোজেন রেখা সবল	রিগেল (মৃগরাজা), স্পিকা (চিত্রা)	১১,৫০০–২৫,০০০
A	নীল	A0-তে শক্তিশালী হাইড্রোজেন রেখা A9-এ কমে যায়, A0 থেকে A9–এ ক্যালসিয়াম রেখা সবল হয়।	লুব্ধক, অভিজিৎ	৭,৫০০ ১১,০০০
F	নীলচে সাদা	আয়নিত ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেনের তুলনায় জোরালো হতে থাকে। অন্যান্য পদার্থের বর্ণালি লক্ষণীয়।	অগস্ত্য, প্রভাস বা সরমা	৬,০০০–৭,৫০০
G	সাদা থেকে হলুদ	আয়নিত ক্যালসিয়াম রেখা মুখ্য, ধাতুর বিশেষ করে লোহার বর্ণালি দেখা যায়।	সূর্য, ব্রহ্মহৃদয়	৫,০০০–৬,০০০
K	কমলা থেকে লাল	ধাতব রেখা প্রধান, কার্বনের ব্যান্ড দেখা যায়।	রোহিণী, স্বাতী	৩,৫০০ ৫,০০০
M	লাল	টাইটানিয়াম অক্সাইড বিশোষণের রেখা প্রধান, ধাতব রেখাও দেখা যায়।	আর্দ্র, জ্যেষ্ঠা	<৩,৫০০

M-K পদ্ধতিতে উজ্জ্বলতার শ্রেণী

শ্রেণী	নক্ষত্রের ধরন
O	অত্যন্ত উজ্জ্বল, বলা যায় 'অতীব' অতিদানব, খুব সামান্য সংখ্যায়
Ia	উজ্জ্বল অতিদানব (সুপারজায়ান্ট)
Ib	কম উজ্জ্বল অতিদানব
II	উজ্জ্বল দানব

III সাধারণ দানব

IV উপদানব

V বামন-তারা (প্রধান ধারার অন্তর্গত)

VI উপবামন

বিভিন্ন নক্ষত্রের নামের আগে এবং পরে যেসব উপসর্গ বা বিভক্তি যোগ করা হয় যা নক্ষত্রের বিভিন্ন দশা নির্দেশ করে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো[২] :

c (sharp lines) উজ্জ্বল রেখা

d (dwarf (main-sequence star)) বামন (প্রধান ধারার তারা)

D (white dwarf) সাদা বামন

e (emission (hydrogen emission in O stars) O তারার হাইড্রোজেন নিঃসরণ রেখা

em (emission in metal lines) ধাতুর নিঃসরণ রেখা

ep (peculiar emission) বিচিত্র নিঃসরণ

eq (emission with shorter wavelength absorption) কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শোষণসহ নিঃসরণ

f (emission of helium and neon in O stars) O তারায় হিলিয়াম ও নিয়নের নিঃসরণ

g (giant) দানব তারা

k (interstellar lines) আন্তঃনাক্ষত্রিক রেখা

m (strong metallic lines) সবল ধাতব রেখা

n (diffuse lines) হাল্কা রেখা

nn (very diffuse lines) খুবই হাল্কা রেখা

p (peculiar spectrum) উজ্জ্বল রেখা

sd (subdwarf) উপবামন

wd (white dwarf) সাদা বামন

wk (weak lines) দুর্বল রেখা

---

২. Mitton (1992) অনুসরণে।

হের্টজপ্রুঙ-রাসেল চিত্র : আমরা দেখেছি যে নক্ষত্রের তাপমাত্রা ও বর্ণালি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ১৯১১ সালে ডেনমার্কের এজনার হের্টজপ্রুঙ (E. Hertzprung) তারার আপাত উজ্জ্বলতার বিপরীতে বর্ণালি শ্রেণী বসিয়ে একটি লেখচিত্র তৈরি করেন। অপরদিকে ১৯১৩ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী হেনরি নরিস রাসেল (H. N. Russell) তারার পরম উজ্জ্বলতার বিপরীতে বর্ণালি শ্রেণী বসিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আরেকটি লেখচিত্র পান। দুজনেই দেখতে পান যে লেখচিত্রে তারাগুলো মোটেই বিশৃঙ্খল নয় বরং সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত। এই লেখচিত্রকে হের্টজপ্রুঙ রাসেল চিত্র বা এইচ আর চিত্র বলে। এটি এমন একটি চিত্র যেখানে নাক্ষত্রিক উজ্জ্বলতার প্যারামিটারের বিপরীতে নক্ষত্রের পৃষ্ঠের তাপমাত্রার প্যারামিটার বসানো হয়।

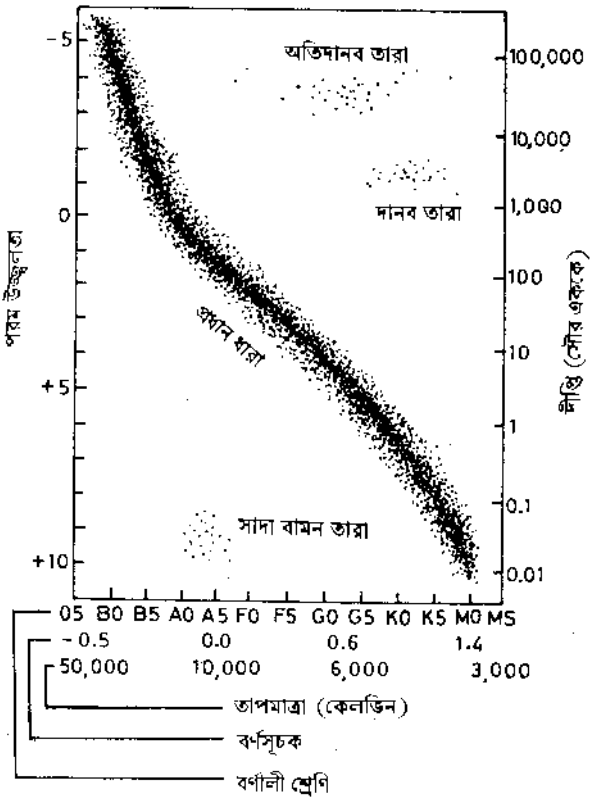

চিত্র ৬.৭ : প্রযুক্তিক এইচ আর চিত্র

তার মধ্যে তারাচিত্রের উল্লম্ব অক্ষে বসতে পারে আপাত উজ্জ্বলতা, পরম উজ্জ্বলতা বা দীপ্তি। অনুভূমিক অক্ষে বসতে পারে বর্ণালিশ্রেণী, বর্ণসূচক (কালার ইন্ডেক্স), পৃষ্ঠতাপমাত্রা যখন তারাদেরকে তাদের শ্রেণী অনুযায়ী এইচ-আর চিত্রে প্লট করা হয় তখন দেখা যায় অধিকাংশ তারাই একটি রেখার উপর পড়ছে যা চিত্রের উপরে বামকোণ থেকে নিচে ডানকোণ পর্যন্ত বিস্তৃত। একে বলে প্রধানধারা (main sequence)। এর অধিকাংশই বামন

তারা : উত্তপ্ত O তারা বা নীল B-তারা, যাদের উজ্জ্বলতা সূর্যের ১০,০০০ গুণ বা আরো বেশি, থেকে শুরু করে সাদা A-তারা (লুব্ধক), কমলা K-তারা হয়ে অনুজ্জ্বল লাল বামন M-তারায় প্রধানধারা শেষ হয়।

প্রধানধারা একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা, পৃষ্ঠতাপমাত্রা কমার সাথে সাথে উজ্জ্বলতা কমে, ভর ও ব্যাসার্ধও কমে তবে ঘনত্ব ধীরে বাড়ে। কিছু তারা আছে যারা প্রধানধারায় পড়ে না। যেমন দানবতারা। যেমন ব্রহ্মহৃদয় (ক্যাপেলা), স্বাতী (আর্কটরাস), রোহিণী (আলদাবরান)। এরা যথাক্রমে হলুদ, কমলা ও লাল তারা, সূর্যের চেয়ে ১০০ গুণ উজ্জ্বল এবং ব্যাসার্ধ সূর্যের ১০ থেকে ১০ গুণ। এরা প্রধানধারার উপর দিকে চিত্রের উপরে ডানদিকের কোনায় অবস্থান করে। অতিদানব তারাদের বর্ণালি বিভিন্ন শ্রেণীর হয়ে থাকে। এদের আকৃতি বৃহস্পতি বা শনিগ্রহের কক্ষপথের সমান হতে পারে। তবে এরা অত্যন্ত ক্ষণজীবী এবং তীব্র উজ্জ্বলতার জন্যই এদের দেখা যায়। উপদানব তারা লাল এবং প্রধানধারার তারা থেকে বড়। আরেক ধরনের তারা হলো সাদা বামনতারা। এদের আকৃতি পৃথিবীর সমান, কিন্তু ভর সূর্যের সমান। ফলে ঘনত্ব অপরিসীম। প্রধানধারার তারা থেকে এদের উজ্জ্বলতার মান ১০ শ্রেণী কম। এরা প্রধান ধারার তারার নিচে, এইচ–আর চিত্রের বাম কোনায় অবস্থান করে। এইচ-আর চিত্রে দেখা যায় নক্ষত্রের উজ্জ্বলতার মানের সীমা ২৭। অর্থাৎ উজ্জ্বলতার 10^{11} গুণ এবং পৃষ্ঠ তাপমাত্রার সীমা ২২০০ থেকে ৫০,০০০ ডিগ্রি কেলভিন। আমাদের সূর্য একটি প্রধানধারার তারা। এর পরম উজ্জ্বলতা +5, বর্ণালি G-2 শ্রেণীর। এইচ-আর তারাচিত্রের তারাদের তিন শ্রেণী প্রমাণ করে যে তারাদের জীবনে তিনটি পর্যায় থাকতে পারে।

যেসব তারা ছায়াপথের কুণ্ডলিত বাহু ও কেন্দ্রের মাঝে থাকে তাদের দ্বিতীয় তারাসমষ্টির তারা (star population II) বলে। এরা বয়োবৃদ্ধ নক্ষত্র। এরা অত্যন্ত ক্ষীণ (কারণ এরা আমাদের থেকে দূরে অবস্থিত)। কাজেই এদের বর্ণালির তুলনায় বর্ণই মুখ্য। তাই এদের জন্য তারার বর্ণ পর্যবেক্ষণ করে পরম প্রভা ও বর্ণ-সূচক দিয়ে আরেক ধরনের লেখচিত্র পাওয়া যায়। যেহেতু বর্ণসূচক পৃষ্ঠতাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত এবং পৃষ্ঠতাপমাত্রা সম্পর্কিত বর্ণালির সাথে, কাজেই এ ধরনের চিত্রে বর্ণালিও যোগ করা যেতে পারে। আরেক ধরনের তারা আছে যাদের বলে প্রথম তারাসমষ্টির তারা (star population I)। এদের ছায়াপথের কুণ্ডলিত বাহুতে পাওয়া যায়। সব বয়সের সব তারা এতে অন্তর্ভুক্ত। এদের সাথে আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস ও ধূলিকণা সংশ্লিষ্ট থাকে।

৬.৯ নক্ষত্রের জন্ম

পর্যবেক্ষিত বিভিন্ন ধরনের নক্ষত্রের জন্ম হয় কিভাবে? আসলে সব নক্ষত্রের জন্ম হয় একই প্রক্রিয়ায়। অভিন্ন প্রক্রিয়ায় জন্মপ্রাপ্ত সমস্ত নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য থাকে কেবল ভরের। ভর বেশি হলে তাদের বিবর্তন হয় এক পথে, ভর কম হলে হয় অন্য পথে।

নক্ষত্রের জন্ম শুরু হয় আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসের মহাকর্ষীয় পতনের মধ্য দিয়ে। মহাশূন্যে নক্ষত্রদের মাঝে থাকে বিপুল দূরত্ব। এই দূরত্বের মাঝে তেমন কিছুই থাকে না। হয়তো কিছু

গ্যাস, ধূলি ধূলিকণা, কঠিনকণা হাইড্রোজেন পরমাণু ইত্যাদি। এগুলো কোথাও কম, কোথাও বেশি থাকে। কোথাও সুষম নয়। ধূলিকণা কে আশ্রয় করে পানিকণা জমে যেমন মেঘ গঠিত হয় ঠিক তেমনি এ সমস্ত পদার্থকে আশ্রয় করে অন্যান্য আরো পদার্থ জমে তৈরি হয় আন্তঃনক্ষত্রিক গ্যাসের সুবিপুল মেঘ। এটি তৈরি হতে হয়তো কয়েক মিলিয়ন বছর সময় লাগে এবং লম্বা-চওড়ায় মেঘটি কয়েক আলোকবর্ষ হতে পারে। এ ধরনের একটি সুবিপুল গ্যাসের আকার যখন বেশ বড়সড় হয় তখন শুরু হয় মহাকর্ষীয় পতন। ঠিক কিভাবে এই পতন শুরু হয় সেটি সুনিশ্চিত নয়, তবে একবার পতন শুরু হলে এটি ঘনীভূত হতে থাকে। কেন্দ্রের অঞ্চল খুব দ্রুত ঘনীভূত হতে থাকে, ঘনত্ব বাড়তে থাকে, ফলে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। তবে এই তাপমাত্রা বেরিয়ে যায়। কারণ গ্যাসমেঘ কণারা এই তাপ বিকিরণ করে দেয়। এই বিকিরণ পাওয়া যায় অবলোহিত (infrared) আলোয়। দীর্ঘ সময় পর কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি অনচ্ছ হয়ে পড়লে বিকিরণ আর বেরিয়ে যেতে পারে না, ফলে কেন্দ্রে তাপমাত্রা আরো দ্রুত বাড়তে থাকে। এ পর্যায়ে এ অঞ্চলটিকে দূর থেকে কালো দেখায়। অসংখ্য তারার মেলায় একখণ্ড অন্ধকার বলে মনে হয়। বিভিন্ন আলোকচিত্রে এ ধরনের বহু অঞ্চল দেখা যায়। চিত্র ৬.১১। তাপমাত্রা প্রায় ১,০০০ ডিগ্রি হলে তাকে **ভ্রূণতারা** বা **প্রোটোস্টার** বলে। এ অবস্থায় ভ্রূণতারার চাপ বৃদ্ধি পায় বলে মহাকর্ষীয় ঘনীভবন অনেকখানি মন্দীভূত হয় এবং ভ্রূণতারাটি পর্যবেক্ষণক্ষম হয়। ভ্রূণতারার ভর যদি বেশি হয় তবে বিকিরণ চাপের দ্বারা এটি এর আশপাশের পদার্থকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারে। কম ভরের হলে পদার্থ কেন্দ্রে পড়তেই থাকে। সেভাবেই ধীরে আশপাশের পদার্থের ঘনত্ব কমে যায়। ফলে ভ্রূণতারা দৃষ্টিগোচর হয়। অবলোহিত আলো থেকে দৃশ্যমান আলোয় বিকিরণ করতে সময় নেয় লাখ দশেক বছর। কারণ কেন্দ্রের ফোটন বাইরে বেরিয়ে আসতে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। মধ্যবর্তী সময়ে ফোটন কণা অসংখ্য বিশোষণ, নিঃসরণ প্রক্রিয়ার শিকার হয়। ভ্রূণতারা তৈরি হতে ১০[illegible] টি পরমাণু প্রয়োজন। এসব যদি হাইড্রোজেন হয় তবে এর ভর ১,০০০ গ্রাম হবে যা আমাদের সূর্যের ভরের কাছাকাছি। তবে এর চেয়ে কম ভরের কম উজ্জ্বল বামন তারাও অসংখ্য আছে।

ভ্রূণতারার কেন্দ্রে তাপমাত্রা যখন এক থেকে দেড়কোটি ডিগ্রি কেলভিন তখন শুরু হয় তাপকেন্দ্রীয় বিক্রিয়া। জ্বলে উঠে নক্ষত্র। এবং তার জন্ম হয় এটচ আর চিত্রের প্রধান ধারায়। এখানে তারাটি তার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করবে হাইড্রোজেন পুড়িয়ে হিলিয়াম তৈরি করে। অন্ধকার গ্যাসমেঘ থেকে নক্ষত্রের জ্বলে ওঠা পর্যন্ত সময় লাগে কয়েক মিলিয়ন এমনকি বিলিয়ন বছর। তবে খুব ভারি গ্যাসের ক্ষেত্রে তা মাত্র কয়েক লক্ষ বছর। ভ্রূণতারা যে পথ অনুসরণ করে এটচ আর চিত্রের প্রধানধারায় অনুপ্রবেশ করে তার নাম।

হায়াশি পথ (Hayashi track)। নক্ষত্র যখন এই পথে থাকে তখন তাকে হায়াশি দশা বলে। আন্তঃনক্ষত্রিক মেঘের মহাকর্ষীয় পতন থেকে শুরু করে ভ্রূণনক্ষত্রের জ্বলে ওঠা পর্যন্ত হায়াশি দশা বিরাজ করে। সময় কয়েক মিলিয়ন বছর হায়াশির দশায় ছিল। কেন গ্যাসমেঘ ঘনীভবনের শিকার হয় সে সম্পর্কে একটি সীমা আছে যার নাম জিনসের সংখ্যা বা মানদণ্ড

Jeans' length। ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার জেমস জিন্‌স এটি হিসাব করেছিলেন। এক সেট ভৌত শর্তাবলির অধীনে একটি গ্যাসমেঘের ভর কত হলে তা ঘনীভূত হবে তা নির্ণয় করা যায়। ফলে দেখা যায় যে মেঘের ভর খুব বেশি হলে তবেই তা থেকে নক্ষত্র জন্ম নেবে। কিন্তু কম ভারি তারাদের ক্ষেত্রে কি ঘটে? বলা হচ্ছে, একটি ভারি গ্যাসমেঘ যখন মহাকর্ষীয় পতনের শিকার হয় তখন তা খণ্ডে খণ্ডে ভেঙে যায় এবং প্রত্যেকটি খণ্ড পৃথক পৃথকভাবে ঘনীভূত হয়ে স্বতন্ত্র নক্ষত্র সৃষ্টি করে। এভাবে নক্ষত্রস্তবক কিভাবে তৈরি হয় তার সুন্দর ব্যাখ্যা মেলে। জিন্‌সের দৈর্ঘ্য সেই সংকট দৈর্ঘ্য বা মানদণ্ড যেখানে মহাকর্ষীয় ঘনীভবন ও বিকিরণ চাপ পরস্পরকে নাকচ করতে সক্ষম। চাপ বাড়লে দৈর্ঘ্যের মান বাড়ে। চাপ মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতা নির্দেশ করে অর্থাৎ ঘনীভবনকে এটি কিভাবে মোকাবিলা করে তা জানা যায়। কিন্তু মাধ্যমের ঘনত্ব ও তার মহাকর্ষীয় আকর্ষণ পরস্পর ও সম্পর্কযুক্ত। মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতার সাথে শব্দের বেগ সম্পর্কযুক্ত। ফলে জিন্‌সের দৈর্ঘ্যের সূত্রটি

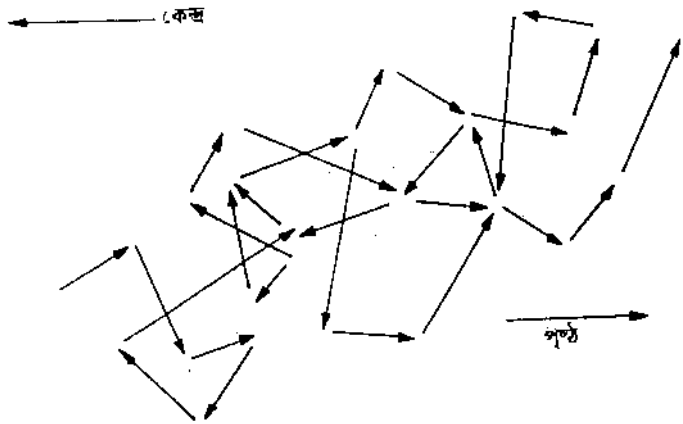

চিত্র ৬.৮ : নির্বিচার চলন (random motion) : নক্ষত্রের অভ্যন্তরে ফোটন কণা নিয়ত হবার পর বারংবার শোষিত হতে থাকে। ফলে কেন্দ্র থেকে তারা হয়ে পৃষ্ঠে পৌঁছতে ফোটন কণার অনেক সময় প্রয়োজন হয়।

দাঁড়ায় : (শব্দের বেগ) ^{2} (মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, G × মাধ্যমের ঘনত্ব, ρ)$^{-1/2}$। মাধ্যমের ঘনত্ব ৩×১০$^{-22}$ গ্রাম/সি.সি হলে ঐ মাধ্যমে শব্দের বেগ মাত্র ৬ কি.মি. সে.$^{-1}$। তাহলে জিন্‌সের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ২×১০^{20} সে.মি. (G = ৬.৬৭×১০$^{-8}$ (সে.মি.)^3/ (গ্রাম সে.^{2})। এই দৈর্ঘ্যের ও উক্ত ঘনত্বের কোনো পদার্থের ভর সূর্যের কয়েক লক্ষ গুণ দাঁড়ায়। জিন্‌সের ভর বলে আরেকটি পদ আছে যার অর্থ হলো জিন্‌সের দৈর্ঘ্যের সমান ব্যাসার্ধের কোনো গোলকের ভর। এখন গ্যাসমেঘের ভর ও আকার যতো বেশি হবে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ ততো বেশি হয়। ফলে মহাকর্ষীয় অস্থিতি সূচিত হয়। যদি কোনো সুষম মাধ্যম প্রসারমান হয় এবং এর কোনো

অংশের ঘনত্ব যদি কোনো কারণে সাধারণ ঘনত্ব থেকে বেশি হয় তবে সে অংশ সাধারণ অংশের প্রসারণের তুলনায় ধীরে প্রসারিত হয়। একে **মহাকর্ষীয় অস্থিতি** বলে। তবে জিনসের দৈর্ঘ্য কোনো সর্বজনীন ধ্রুবক নয়। মাধ্যমের চাপ ও ঘনত্বের ওপর এটি নির্ভর করে। ছায়াপথের প্রথম তারা তৈরি হয় একটি সংকোচমান ভ্রূণছায়াপথীয় মেঘ থেকে। এই মেঘের দৈর্ঘ্য ছিল জিনসের দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক বেশি। এটি ভেঙ্গে যায়। এর খণ্ডগুলোর দৈর্ঘ্যও ছিল সংকট দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ সুবিপুল সেই ভ্রূণছায়াপথীয় মেঘ কয়েকটি

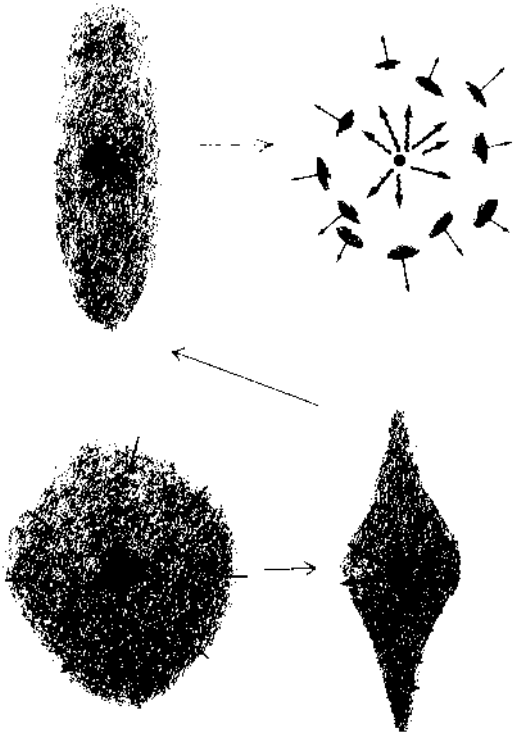

চিত্র ৬.৯ : তারাদের বিভাজন

খণ্ডে ভাগ হয়ে যায়। সেই খণ্ডগুলো স্বতন্ত্রভাবে ছিল অনেক বড়। এগুলো আবার ভেঙে যায় এবং অবশেষে তারায় পরিণত হয়। এই অনুক্রমিক ভাঙ্গনে জিনসের দৈর্ঘ্য পর্যায়ক্রমে কমতে থাকে। ফলে যথেষ্ট ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড পাওয়া সম্ভব। জিনসের দৈর্ঘ্যের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন নির্ভর করে পরিবর্তনশীল ঘনত্ব ও চাপের উপর। মেঘখণ্ড যতো সংকুচিত হয় ততো তাপমাত্রা বাড়ে এবং ১০^{4} কেলভিন তাপমাত্রা হচ্ছে একটি সংকট তাপমাত্রা যার কম হলে দশাযন বিকিরণ (ফোটন) সম্ভব নয়। কারণ এর নিচে পরমাণু আয়নিত হয় না। মেঘখণ্ডের ভাঙ্গনের সময়ে সবত্রই এই তাপমাত্রা রক্ষিত হয়। এর অধিক তাপমাত্রা থাকলে

এটি অতিরিক্ত তাপ বিকিরণ করে দিয়ে শীতল হয়ে যায়। কিন্তু ঐ তাপমাত্রার নিচে শীতলকরণ অসম্ভব। এই তাপমাত্রায় জিনসের দৈর্ঘ্যের মান $১০^{১৩}$ থেকে ৩×১০^{১৩} সেন্টি. এবং ঘনত্ব $১০^{-১৭}$ গ্রাম/সি.সি.। কিন্তু এভাবে কি অসীম ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড খণ্ডীকরণের মাধ্যমে পাওয়া যাবে? না, এক সময় এই খণ্ডীকরণ (fragmentation) বন্ধ হবে। যখন একটা বড় মেঘখণ্ড ভেঙ্গে যায় তখন ফোটন নির্গত হয় এবং সাথে সাথে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। যতো ক্ষুদ্র খণ্ড সৃষ্টি হয় ততো ঘনত্ব বাড়তে থাকে এবং এক সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে শক্তি হারায়। স্বচ্ছ হবার সাথে সাথে আকারের সাথে জিনস্ দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক বদলে যায়। এখন যেহেতু শক্তি ধীরে বিকিরিত হয় কাজেই জিনসের দৈর্ঘ্যের হ্রাসও ধীরে হয় এবং যখন জিনসের দৈর্ঘ্য মেঘখণ্ডের চেয়ে আর ছোট হয় না তখন আর পরবর্তী খণ্ডীকরণও হয় না। পর্যায়ক্রমিক এই খণ্ডীকরণকে বলে ক্যাসকেড ফ্র্যাগমেন্টেশন। এই ধারণাটি সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেন ফ্রেড হয়েল ১৯৫৩ সালে। তাঁর ছাত্র মার্টিন রীজ দেখিয়েছেন যে এই পর্যায়ক্রমিক খণ্ডীকরণের সর্বশেষ খণ্ডটির ভর সূর্যের এক শতাংশ। বলে রাখা ভালো যে এই ভর ফোটনের নিঃসরণ বা অনচ্ছতার কারণে ঘটে না।

সমগ্র খণ্ডীকরণ প্রক্রিয়া ঘটে $১০^{৩}$ কেলভিনে এবং সর্বশেষ ভর নির্ভর করে আলোর দ্রুতি, হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর, প্ল্যাংকের ধ্রুবক ও মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের ওপর। এবং সর্বভিন্ন ভরের তারা পর্যবেক্ষণে ধরাও পড়েছে। প্রক্রিয়াটি সরল নিঃসন্দেহে। তবে মেঘে মেঘে সংঘর্ষ, মেঘখণ্ডের বিশৃংখলা, মাধ্যমের অভিঘাত তরঙ্গ ইত্যাদি নিয়ামকও গুরুত্বপূর্ণ। ফলে কোনো প্রলম্বায়পথীয় মেঘ থেকে ছোট বা বড় ভরের তারা জন্ম নিতে পারে। ভ্রূণতারায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে নির্গত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমতে থাকে। অতিবেগুনি বিকিরণ এর হাইড্রোজেনকে আয়নিত করে ফেলে। আয়নিত হাইড্রোজেনের স্তর তারার চারদিকে আচ্ছাদিত থাকে। একে এইচ-টু (H-II) অঞ্চল বলে। এইচ-টু অঞ্চলের তাপমাত্রা থাকে $১০^{৪}$ কেলভিন। এই অঞ্চল থেকে দৃশ্যমান আলো বিকিরিত হয়। এইচ-টু অঞ্চল দেখা যায় O- এবং B-তারাদের। এদের বলে (O-B) দল। নেদারল্যান্ডের এ. ব্লু দেখলেন যে (O-B) তারারা সব সময়ে ৫ থেকে ২০টির দলে থাকে এবং কোনো একটি অঞ্চলে কম বয়সের তারা থাকে এক প্রান্তে এবং বেশি বয়সের তারা থাকে অপর প্রান্তে। O-B তারার ভারি তারা এলমগ্রিন ও লাডা বললেন যে প্রথম প্রজন্মের O এবং B-তারাদের এইচ-টু অঞ্চল প্রসারিত হয়। ফলে পার্শ্ববর্তী মেঘখণ্ডে অভিঘাত তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ফলে নতুন তারা সৃষ্টির সহায়ক মেঘ ঘনীভবন শুরু হয়। এতে করে নতুন ভারি তারা জন্ম নেয়। তাদের এইচ-টু অঞ্চলের বিস্ফোরণে নতুন অভিঘাত তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং এ ভাবে নক্ষত্র সৃষ্টির এক পরম্পরা গঠিত হয়। কিন্তু প্রথম প্রজন্মের নক্ষত্র সৃষ্টি হলো কিভাবে? এর জন্য প্রয়োজন ছিল বাহ্যিক প্রভাবের। মহাশূন্যে আন্তঃনক্ষত্রিক মেঘখণ্ডের গতি বিশৃংখল। ফলে এদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটতে পারে। তবে এ ধরনের সংঘর্ষ খুবই প্রান্তিক সম্ভাবনার ব্যাপার। আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে আমাদের সূর্যের কোনো সঙ্গী-তারা নেই। মনে হয় না যে আমাদের সূর্য কোনো তারাস্তবকের সদস্য। তাহলে এটি গঠিত হলো কি করে? এমন হতে পারে যে কয়েক পারসেকের মধ্যে হয়ত কোনো সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেই বিস্ফোরণের অভিঘাত

[illegible]

লগভারার সৃষ্টি হবে, তবে বলা যায় না তা সূর্যের মতো না তার চেয়ে ভারি হবে। তারাটির মনোযোগ দিয়ে দেখলে এ রকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে।

চিত্র ৬.১১ : কপ্পকর নীহারিকা।

আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের বিভিন্ন অংশের তারাটির পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে অনেক তারার কাছে হঠাৎ কোথাও কোথাও কালো ছোপ। এদেরকে বকের বর্তুল (Bok's globule) বলে। এরা আসলে গুহা কৃতির আণবিক মেঘ যারা তাতোটাই ঘন যে পেছনের তারার আলোকে বাধা দেয়। এজন্যই এদেরকে কালো দেখায়। এদের ব্যাসার্ধ ১ পার্সেকের কম এবং ভর সূর্যের ভরের ১ থেকে ১০০ গুণের মধ্যে। এ অঞ্চলে নতুন তারা তৈরির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এদের কেন্দ্রীয় অঞ্চল বাইরের তুলনায় শীতল ঘনীভূত হতে থাকে। এক মিলিয়ন বছরের মধ্যেই এরা নতুন তারা সৃষ্টি করবে।

[illegible] ঠিক তেমনি অন্ধকার মেঘখণ্ড থেকে জন্ম নেয় [illegible]। অন্ধকার, শীতল মেঘখণ্ড সময়ের বিবর্তনে তৈরি করে অত্যুষ্ণ, আলোকময়, সুদীপ্ত [illegible] নক্ষত্র। আলো নেই, তাপ নেই, সেখানেই জন্ম নেবে আলো আর তাপ। এটা [illegible] মহাসৃষ্টিকর বটে।

৬.১০ ভোজোময় নক্ষত্রের শক্তির উৎস

নক্ষত্রের শক্তির উৎস কী? অনন্ত নক্ষত্রবীথি যে অসীম কালব্যাপী মিটমিট করে জ্বলছে তার উৎস কোথায়? এই মানুষ দীর্ঘদিন যাবৎ করে আসছে। কাছের সূর্যের কথাই ধরা যাক। এর অসীম তেজের উৎস সত্যই রহস্যজনক। ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও গ্রীষ্মের দুপুরে আমরা ঠসঠসে করি। এ শক্তি আসে কোত্থেকে?

ঊনবিংশ শতাব্দী এবং তার আগে মানুষের ভাবনা জ্বালানি ছিল কয়লা। তাই স্বভাবতই মানুষ ভেবেছিল হয়ত কয়লাই এই জ্বালানি। কিন্তু এটা ঠিক উপযোগী জ্বালানি নয়। কারণ যদি ধরে নেওয়া হয় যে সূর্য পুরোটাই কয়লাপূর্ণ (এবং সাথে যদি অক্সিজেন থাকে) তবে এটা মাত্র ১[illegible] থেকে ২০০০ বছর জ্বলতো। কিন্তু বাস্তবে ঘটছে সম্পূর্ণ উল্টো জিনিস। ১৮৪৪ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হেরমান লুডভিগ ফার্দিনান্দ ফন হেলমহোলৎস বলেন যে, এই শক্তি আসে মহাকর্ষীয় সংকোচন প্রক্রিয়ায়। সূর্যে পতিত উল্কাও এ ব্যাপারে সাহায্য করে। অবশ্য এর জন্য অসীম সংখ্যক উল্কার পতন প্রয়োজন যা সূর্যের বা নক্ষত্রের ভরকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়। ব্যাপারটি অভাবনীয়। পরে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী টমসন (যিনি লর্ড কেলভিন নামে সুপরিচিত) হিসাব করে দেখান যে, সূর্যের বয়স ৫ কোটি বছর। কিন্তু এর সাথে অসঙ্গতি [illegible] ৫ কোটি বছরের পুরনো জীবাশ্ম পেয়েছেন। যার অর্থ সূর্যকে আরো প্রাচীন হতে হবে। এ সমস্ত চিন্তা ভাবনা তক বিতর্কের অবসান ঘটলো আইনস্টাইনের বিশেষ ও সমীকরণ প্রচলনের পর। তাঁর সমীকরণের মাধ্যমে বস্তু ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক সূচিত হয় ($E=mc^2$, E= শক্তি, m= ভর, c= আলোর বেগ)। এই সমীকরণের [illegible] উপলব্ধি করেন পরমাণুবিদ ও পদার্থবিদরা। দেখা গেল, পরমাণু এক অসীম শক্তির উৎস। এই নতুন শক্তির নাম কেন্দ্রীয় শক্তি (nuclear energy)। [illegible] দেখিয়েছেন যে কোনো নক্ষত্রের [illegible] গ্যাসের [illegible] শক্তি হাইড্রোজেন, কিন্তু [illegible] হিলিয়াম এবং [illegible] আলো পাবে। এসবই বাধা পাবে নক্ষত্রের শক্তিশালী মহাকর্ষীয় বাধনে। নক্ষত্রের ভর যতো বেশি হবে [illegible] মহাকর্ষীয় শক্তি [illegible] হয় এবং নক্ষত্রকে চুপসে ফেলতে চায়। কাজেই সহজেই [illegible] থাকতে হলে এমন কিছু [illegible] যে এই অন্তর্মুখী মহাকর্ষীয় শক্তিকে [illegible] দিতে পারে। এসব চিন্তাভাবনা করেই ১৯১৯ সালে পোরিন এবং ১৯২০ সালে এডিংটন প্রস্তাব করেন যে নক্ষত্রের গর্ভ থেকে, নিঃসৃত এই বিপুল শক্তির [illegible] নিউক্লীয় বিক্রিয়া (nuclear reaction)। তিনি [illegible] দেখান যে নক্ষত্রের [illegible] যে শক্তিশালী মহাকর্ষীয় সংকোচন সৃষ্টি করে তাকে [illegible]

রাখার জন্য নক্ষত্রের কেন্দ্রে তাপমাত্রা অত্যুচ্চ হবে এবং তিনি এর মান দেন দেড় কোটি (১৫ মিলিয়ন) ডিগ্রি (আমাদের সূর্যের জন্যে এবং এই তাপমাত্রা সৃষ্টি সম্ভব নিউক্লীয় বিক্রিয়ার মাধ্যমে। যেহেতু নক্ষত্রে হাইড্রোজেনের ভাগ বেশি তাই যে বিক্রিয়াটি প্রয়োজন তা হচ্ছে ফিউশন (fusion) বিক্রিয়া।

যদিও এডিংটন মূল সত্যের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তথাপি নক্ষত্রের গর্ভে ঠিক কি রকমভাবে বিক্রিয়া চলবে তার পুরো ক্রিয়া-পদ্ধতিটি (mechanism) তিনি বলেননি। ১৯৩৯ সালে হান্স্ বেটে এবং ফন ভাইৎসাকার পুরো ক্রিয়া-পদ্ধতিটির, সমীকরণ রূপ দেন স্বতন্ত্রভাবে এবং এভাবে নাক্ষত্রিক শক্তির রহস্য উদ্ঘাটিত হলো। এবার ঘটনাক্রমের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। নক্ষত্রের গর্ভে কণাদের গতি অত্যন্ত বেশি (কারণ অত্যুচ্চ তাপমাত্রা)। প্রায়শই দেখা যায় যে প্রোটন কণা কোনো কেন্দ্রীনের এতো কাছে চলে আসে যে কেন্দ্রীন সেটা গ্রাস করে নিতে পারে। এটাই গলন বা ফিউশন বিক্রিয়া। গলন প্রক্রিয়ার জন্য ন্যূনতম তাপমাত্রার দরকার ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি ডিগ্রি কেলভিন। সূর্য এবং সাধারণ প্রধান ধারার তারাদের জন্য (অর্থাৎ যাদের ভর তুলনামূলকভাবে কম) যে প্রক্রিয়াটি ঘটে তার নাম p-p বা প্রোটন প্রোটন চক্র এখানে দুটি প্রোটন (^1_1H) মিলে একটি ডিউটেরন (^2_1H) এবং একটি পজিট্রন (e^+) তৈরি হয়। এর সাথে নির্গত হয় আধানহীন, ভরহীন (ν) নিউট্রিনো।

$$\text{প্রোটন } (^1_1H) + \text{প্রোটন } (^1_1H) \rightarrow \text{ডিউটেরন} + \text{পজিট্রন } (e^+) + \text{নিউট্রিনো}$$

p-p চক্র

$$\text{ডিউটেরন } (^2_1H) + \text{প্রোটন } (^1_1H) \rightarrow \text{হিলিয়াম-৩ } (^3_2He) + \text{গামা}$$

$$\text{হিলিয়াম-৩} + \text{হিলিয়াম-৩} \rightarrow \text{হিলিয়াম-৪ } (^4_2He) + \text{প্রোটন} + \text{প্রোটন}$$

যখন এক গ্রাম প্রোটন ডিউটেরনে পরিবর্তিত হবে তখন ৬.৮ x 10^{11} আর্গ শক্তি নির্গত হয়। ৪টি হাইড্রোজেন মিলে সরাসরি হিলিয়াম প্রস্তুতি সূর্যের ক্ষেত্রে সম্ভব নয় বরঞ্চ এটি ঘটে ধাপে ধাপে। উৎপন্ন হিলিয়াম কেন্দ্রে রয়ে যায়। উৎপন্ন পজিট্রন একটি ইলেকট্রনের সাথে মিলে পরস্পরকে বিনাশ করে দিয়ে (গামা) বিকিরণ প্রদান করে। এর পরিমাণ প্রায় ($E = mc^2$ দ্বারা নির্ধারিত) ১.০২ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। সমীকরণ অনুযায়ী পরে প্রোটন ডিউটেরনের সাথে মিলে হিলিয়াম-৩ গঠন করে। এতে গামা রশ্মি (একে 'hard' X-ray বা উচ্চশক্তির এক্স-রে বলা যায়) নির্গত হয়। হিলিয়াম-৩ একটি অলফা কণার (হিলিয়াম-৪) সাথে মিলে বেরিলিয়াম ৭ তৈরি করে। বেরিলিয়াম-৭ একটি ইলেকট্রন গ্রাস করে বোরন-৮ এ পরিণত হয়। কিন্তু এটি দ্রুত ভেঙ্গে গিয়ে বেরিলিয়াম-৮, পজিট্রিনো তৈরি করে। বেরিলিয়াম ৮ দুটি অলফা কণায় পরিণত হয় :

$$\text{হিলিয়াম-৩} + \text{হিলিয়াম-৪} \rightarrow \text{বেরিলিয়াম-৭} \left(^7_5Be\right) + \text{গামা} \qquad \text{(ধীর বিক্রিয়া)}$$

$$\text{বেরিলিয়াম-৭} + \text{প্রোটন} \rightarrow \text{বোরন-৮} \left(^8_1B\right) + \text{গামা} \qquad \text{(দ্রুত বিক্রিয়া)}$$

$$\text{বোরন-৮} \rightarrow \text{বেরিলিয়াম-৮} + \text{পজিট্রন} + \text{নিউট্রিনো} \qquad \text{(তাৎক্ষণিক বিক্রিয়া)}$$

$$\text{বেরিলিয়াম-৮} \rightarrow \text{২ হিলিয়াম-৪} \qquad \text{(তাৎক্ষণিক বিক্রিয়া)}$$

[illegible] হিলিয়াম কেন্দ্রক সৃষ্ট হয়। এখানে লক্ষণীয় যে হিলিয়ামের ভর [illegible] প্রোটনের সম্মিলিত ভর থেকে কম। এই অতিরিক্ত ভর পুরোটাই শক্তিতে পরিণত হয়। [illegible] ভর একক যা মূল ভরের [illegible] এর কিছু অংশ অবশ্য পজিট্রন নিউট্রিনো নিয়ে যায়, কিন্তু বেশির ভাগই [illegible] শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। [illegible] সূর্যের মতো কোনো নক্ষত্রের ক্ষেত্রে [illegible] হাইড্রোজেন পুড়ে [illegible] মিলিয়ন টন হিলিয়াম হয় এবং [illegible] শক্তিতে পরিণত হয়।

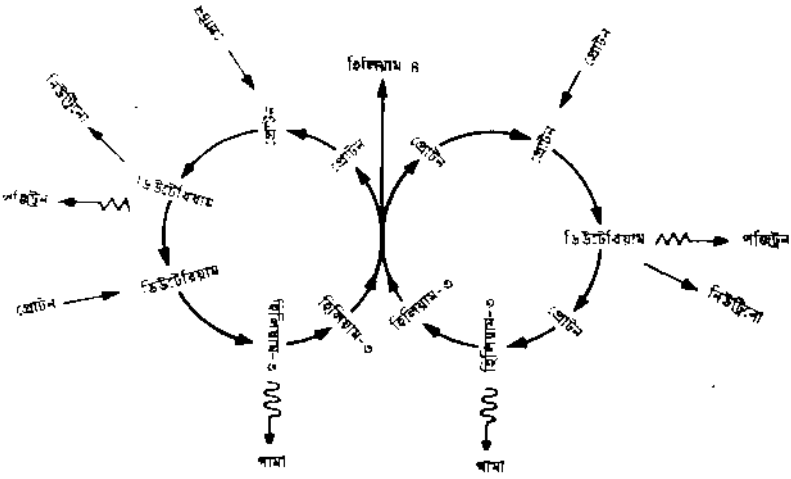

চিত্র ৪.১২ : [illegible] প্রোটন চক্র

সূর্যের ক্ষেত্রে এ সমস্ত তত্ত্ব ভালোভাবে কাজ দিয়েছে এবং পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তা যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে একটি ব্যাপারে মিলছে না। সূর্য থেকে যে পরিমাণ নিউট্রিনো পাবার কথা তা পাওয়া যাচ্ছে না। [illegible] সৌর নিউট্রিনো ঘাটতি। পাওয়া যাচ্ছে তার অর্ধেকেরও কম। নিউট্রিনো আবার [illegible] কোনো বিক্রিয়া করে না। [illegible] ক্লোরিনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় এটি [illegible] তৈরি করে। [illegible] শনাক্তকরণে ক্লোরিন ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ডাকোটা [illegible] সৌর নিউট্রিনো [illegible] রূপে দেখা গেছে যে [illegible] অর্ধেকেরও কম। কারণ [illegible] সূর্যের ভেতরকার পারিপার্শ্বিক, বিশেষ করে তাপমাত্রা সম্পর্কে আমাদের [illegible] সঠিক নয়। অবশ্য কেউ বলেন, যদি নিউট্রিনোর [illegible] ভর [illegible] হয় এবং [illegible] হয় তখন তিন রকম নিউট্রিনো আছে : ইলেকট্রন নিউট্রিনো, মিউন নিউট্রিনো ও টাউ-নিউট্রিনো। এমনও হতে পারে যে সূর্য থেকে [illegible] একটি নিউ

নিউট্রিনোতে। কিন্তু যেহেতু আমাদের শনাক্তকারী যন্ত্র কেবল ইলেকট্রন-নিউট্রিনোর প্রতি সংবেদনশীল, তাই হয়ত এই ঘাটতি। সম্প্রতি ক্লোরিনের পরিবর্তে গ্যালিয়াম ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি নিউট্রিনোর সাথে বিক্রিয়া করে জার্মেনিয়ামে পরিণত হয়। তত্ত্বীয় হিসাবে পাওয়া উচিত ১৩০ এস.এন.ইউ - ১ এস.এন.ইউ. মানে প্রতি 10^{36} গ্যালিয়াম পরমাণুতে প্রতি সেকেন্ডে একটি নিউট্রিনো গ্রাস। ১৯৯০ সালের এক পরীক্ষায় এর মান পাওয়া যায় মাত্র ২০ এস.এন.ইউ.; কিন্তু ১৯৯২ সালের মাঝে এক পরীক্ষায় এর মান পাওয়া যায় ৭৩ এস.এন.ইউ. (১০ এস.এন.ইউ. অনিশ্চয়তাসহ)। এসব কারণে এই নিউট্রিনো ঘাটতির সমস্যাটি এখনো সমাধান করা যায়নি। সূর্যে আরো একটি পদ্ধতিতে শক্তি উৎপন্ন হয়। সেটি হলো ক্রিসফিল্ডের H H পদ্ধতি। সূর্যের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ শক্তি এ পদ্ধতিতে নিঃসৃত হয়; যেসব নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা সূর্যের চেয়ে কম তাদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়

অধিকতর উত্তপ্ত একটি পদ্ধতিতে শক্তি যোগায় **কার্বন চক্র**, যার অপর নাম সি-এন-ও চক্র (কার্বন–নাইট্রোজেন– অক্সিজেন চক্র)। এতে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয় এবং কার্বন প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। প্রথমে কার্বন কেন্দ্রীন $\left({}^{12}_{6}C\right)$ একটি প্রোটন আত্মসাৎ করে তৈরি করে নাইট্রোজেন ১৩ $\left({}^{13}_{7}N\right)$-এ পরিণত হয়। সাথে সাথে নিউট্রিনো ও পজিট্রন নির্গত হয়। পজিট্রন ইলেকট্রনের সাথে যুক্ত হয়ে বিকিরণ দেয়। কার্বন ১৩ কেন্দ্রীন গ্রাস করে নাইট্রোজেন–১৪ $\left({}^{14}_{7}N\right)$ গঠন করে ও গামা বিকিরণ দেয়। এই সাধারণ নাইট্রোজেন স্থায়ী, কিন্তু একটি প্রোটন গ্রাস করার পরে এটি অক্সিজেন–১৫ তৈরি করে যা পুনরায় বিটা–ভাঙ্গনের শিকার হয়ে নাইট্রোজেন–১৫ $\left({}^{15}_{7}N\right)$ গঠন করে। নাইট্রোজেন-১৫ একটি দ্রুত গতিসম্পন্ন প্রোটনের সাথে বিক্রিয়া করে পুনরায় কার্বন–১২ তৈরি করে। তবে খুব কম ক্ষেত্রে অক্সিজেন–১৬ $\left({}^{16}_{8}O\right)$ তৈরি হয়। এভাবে অক্সিজেন পুনরাবির্ভূত হয়। মোটের উপর, ৪টি হাইড্রোজেন মিলে হিলিয়াম গঠন করে এবং একই পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। পুরো ঘটনাটির সমীকরণ রূপটি হলো :

কার্বন ১২ $\left({}^{12}_{6}C\right)$ + প্রোটন $\left({}^{1}_{1}H\right)$ → নাইট্রোজেন-১৩ $\left({}^{13}_{7}N\right)$ + গামা

নাইট্রোজেন–১৩ → কার্বন–১৩ $\left({}^{13}_{6}C\right)$ + পজিট্রন + নিউট্রিনো

কার্বন-১৩ + প্রোটন → নাইট্রোজেন ১৪ $\left({}^{14}_{7}N\right)$ + গামা

নাইট্রোজেন–১৪ + প্রোটন → অক্সিজেন ১৫ $\left({}^{15}_{8}O\right)$ + গামা → নাইট্রোজেন ১৫ + পজিট্রন + নিউট্রিনো

নাইট্রোজেন–১৫ + প্রোটন → কার্বন–১২ + হিলিয়াম–৪ + গামা।

[illegible] p-p [illegible] p p চক্র [illegible]

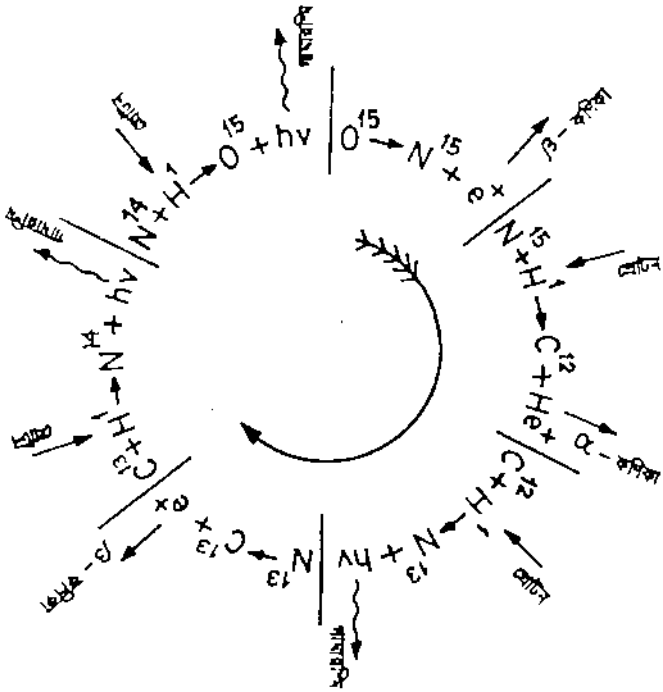

[illegible]

[illegible] convection [illegible]

তাপ সঞ্চালনে কোন পদ্ধতি অনুসৃত হবে তা নির্ভর করে নক্ষত্রের তাপমাত্রার উপর, বিশেষ করে দূরত্বের সাথে কত দ্রুত তাপমাত্রা কমে তার উপর। অধিকাংশ নক্ষত্রে দুই পদ্ধতিতেই তাপ সঞ্চালিত হয়। প্রধান ধারার নিচের অর্ধাংশের তারাদের, যাদের বর্ণালি F, G, K, M (যেমন সূর্য), ক্ষেত্রে পরিচলন ঘটে কেন্দ্রের বাইরের অংশে এবং গভীর কেন্দ্রে তাপ সঞ্চালিত হয় বিকিরণ প্রক্রিয়ায়। প্রধান ধারার উপরের অংশের তারাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়া ঘটে, সেখানে কেন্দ্রে ঘটে পরিচলন এবং বাইরের অংশে ঘটে বিকিরণ। মনোযোগ দিয়ে চিত্র ৬.৩ লক্ষ্য করুন।

দানব ও অতিদানব (supergiant) তারাদের জন্য রাসায়নিকভাবে সমরূপ কোনো মডেল তৈরি সম্ভব নয়। কোনো দানব তারাকে, যেমন কাপেলা (Capella), যদি প্রধান ধারার তারা মনে করা হয় তবে দেখা যায় যে, এর কেন্দ্রের তাপমাত্রা এতো কম হয় যে কোনো নিউক্লীয় বিক্রিয়াই চলতে পারে না। এ সমস্যার সমাধানের জন্য ধরে নিতে হবে যে এগুলো এক সময় প্রধানধারায় ছিল এবং এদের জীবন ধারায় একসময় কেন্দ্রের হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়াম হয়। ফলে পোড়ানোর জন্য যথেষ্ট তাপমাত্রা কেন্দ্রে থাকে না। তখন কেন্দ্রের চারদিকে একটি পাতলা স্তরে অদগ্ধ হাইড্রোজেন থাকে এবং সেটি জ্বলতে থাকে। এই স্তরে কার্বন চক্র শক্তি যোগায় এবং কেন্দ্র নিষ্ক্রিয় থাকে। একে বলে শেল সোর্স মডেল (shell source model)। এই মডেলের মাধ্যমে দানব ও অতিদানব তারার দীপ্তি, ভর ও ব্যাসার্ধ ব্যাখ্যা করা যায়।

৬.১১ নক্ষত্রের অন্তিম নিয়তি

নক্ষত্রের আয়ুষ্কাল : আমরা জেনেছি নক্ষত্রের শক্তির যোগানদাতা হচ্ছে নিউক্লীয় বিক্রিয়া। একটি নক্ষত্র কত সময়ব্যাপী এই বিকিরণ দেবে তা নির্ভর করে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ ও বিকিরণ হারের উপর। নক্ষত্রের যে সময়ব্যাপী হাইড্রোজেন পোড়ানো হয় সে সময়টা সহজেই আমরা নির্ণয় করতে পারি। এটি করা যায় বিক্রিয়ায় কি পরিমাণ ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে এবং $E=mc^2$ সমীকরণ দ্বারা কি পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হবে তার হিসাব থেকে। সূর্যের কথাই ধরা যাক। এর ভর ২ × ১০^{৩৩} গ্রাম। কিন্তু কেন্দ্রীয় অংশে মোট ভরের মাত্র ১০ ভাগই থাকে যা নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। ফলে বিক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে মাত্র ২ × ১০^{৩২} গ্রাম। তার আবার ০.৭ শতাংশই সরাসরি বিশুদ্ধ শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। অতএব মোট শক্তি =(১.৪ × ১০^{৩২} গ্রাম) × (৩ × ১০^{১০} সে. মি/সে)^{২} = ১.২৬ × ১০^{৫১} আর্গ। সূর্য প্রধান ধারায় থাকাকালীন সবমোট এই পরিমাণ শক্তিই উৎপন্ন করতে পারবে।

এই শক্তি শেষ করতে এর কত সময় লাগবে? সূর্যের বিকিরণ হার ৪ × ১০^{৩৩} আর্গ–সে. হলে নির্ণেয় সময়কাল ৩.১৫ × ১০^{১৭} সেকেন্ডে। অর্থাৎ প্রায় ১,০০০ কোটি (দশ বিলিয়ন) বছর। তার মানে সূর্যের সমস্ত হাইড্রোজেন পুড়তে সময় নেবে ১ হাজার কোটি বছর। বর্তমানে সূর্যের বয়স ৪.৬ বিলিয়ন বা ৪৬০ কোটি বছর।

[illegible] নক্ষত্রের [illegible] কে মতো প্রধানধারার উপরের অংশের কোনো তারার ভর সূর্যের প্রায় [illegible] গুণ এবং একই সময় এটি এর শক্তির রূপান্তর করেছে ১০% গুণ বেশি হারে। এটির আয়ু মাত্র কয়েক মিলিয়ন বছর। তাই একটি নক্ষত্র আকারে আকৃতিতে, ভর–ভারে চকচকেপনে বা বর্ণে দানবাকৃতির হলেই যে তার জীবনকাল দীর্ঘ হবে এমনটি নয়। বরঞ্চ সম্পূর্ণ উল্টো। এবার কম ভরি নক্ষত্রদের কথা বিবেচনা করা যাক। কোনো তারার ভর যদি সূর্যভরের অর্ধেক হয় এবং উজ্জ্বলতা দীপ্তি যদি ১/১০ ভাগ হয় তবে এর জীবনকাল হবে [illegible] গুণ (সূর্যের চেয়ে)। এজন্য কম ভরের, ছোটখাটো তারাদেরই অধিক সংখ্যায় দেখা যায়।

নক্ষত্রদের জীবনকাল মিলিয়ন কিংবা বিলিয়ন স্কেলে মাপা হয়। তার মধ্যে আবার অনেক কয়েক মিলিয়ন বছরের আয়ুর কথা বলি মাত্র। [illegible] বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহাকালের হিসাবে এগুলো যথেষ্ট ক্ষুদ্র। মহাকালের দৃষ্টিতে কয়েক মিলিয়ন বছর মাত্র কয়েকমুহূর্তের কালকণা। এর সাথে আমাদের মানবজীবনের তুলনাটা কিরকম নগণ্য সেটা ভাবা যেতে পারে।

নিম্নভর তারার পরিণতি : এ ধরনের তারার কেন্দ্রে শি শি ১৫ বা কারবন চক্রের মাধ্যমে হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়াম তৈরি হয়। [illegible] হিসাবে দেখা যায় যে এদের বয়স যতো বাড়ে ততো এদের হিলিয়াম কেন্দ্র ভারি হতে থাকে এবং সংকুচিত হতে থাকে। কেন্দ্রের বাইরের হাইড্রোজেনের স্তর কেন্দ্র থেকে হিলিয়াম তৈরি যতো কেন্দ্রে পতিত হয় ততো এর আয়তন কমে। কেন্দ্র থেকে শক্তি পরিচলন প্রক্রিয়ায় বাইরে চলে যায়। এতে তাপমাত্রা বাড়ে এবং তারার উজ্জ্বলতা বাড়ে। এর ফলে তারাটি প্রধানধারার ছেড়ে উপরে উঠে আসে। প্রধানধারার [illegible] ফালি নয়; এটি বেশ কিছুটা চওড়া হয়। কারণ সেসব তারার উজ্জ্বলতা বাড়ে তারা মূল রেখা ছেড়ে সমান উপরে উঠে আসে। প্রধানধারার মূল রেখাটিকে বলে শূন্য বয়সের প্রধানধারা (Zero-Age Main Sequence, ZAMS)। তারার কেন্দ্র যখন হিলিয়াম শূন্য হয়ে যায় তখন কেন্দ্রে কোনো বিক্রিয়া হয় না। কারণ হিলিয়ামের পক্ষে কোনো কেন্দ্রীয় বিক্রিয়া শুরু করার জন্য তাপমাত্রা যথেষ্ট কম থাকে। নিষ্ক্রিয় কেন্দ্রটি সংকুচিত হতে থাকে এবং বাইরের স্তরে আবরণী আরো বেশি শক্তি বিকিরণ করে পুড়তে থাকে। সাথে সাথে আবরণীটি সামনের দিকে এগোতে থাকে। এতে তারার বহিঃভাগ প্রসারিত হয়। ফলে পৃষ্ঠ বেড়ে যায়। এতে দীপ্তিও বেড়ে যায়। ফলে তারা এইচ আর চিত্রের ডানদিকের উপরে উঠতে থাকে। এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কিন্তু কমতে থাকে। এই পর্যায়ে তারাটি লাল দানবে (red giant) পরিণত হয়। এ সময়ে তারার হিলিয়াম কেন্দ্রটি অত্যন্ত ঘন অবস্থায় থাকে। হিলিয়াম পোড়ানোর জন্য যে তাপমাত্রার দরকার তা প্রায় ১০ কোটি ডিগ্রি কেলভিন এবং তারার কেন্দ্রে সেটা থাকে না। কেন্দ্র যতো সংকুচিত হতে থাকে পদার্থ তখন এক নতুন ধর্ম লাভ করে। একে বলে অপভ্রষ্ট (degenerate) পদার্থ। এ অবস্থায় পদার্থ ইলেকট্রন হারায়। ঘন কেন্দ্র ইলেকট্রনদেরকে চাপ প্রয়োগ করে কাছাকাছি থাকতে বাধ্য করে। তবে

ইলেকট্রনদের একটি ধর্ম আছে যে তাদেরকে খুব কাছাকাছি নেওয়া যায় না। কাছে করলে তারা একটি চাপ দেয়। অপজাত গ্যাসের অদ্ভুত ধর্ম হলো এই যে চাপ বাড়লে আর তাপমাত্রা বাড়ে না এবং বিপরীতক্রম। এ পর্যায়ে আমরা পেলাম একটি লাল দানব যার কেন্দ্রে আছে অপজাত হিলিয়াম গ্যাস। এর কেন্দ্রে তারার সমগ্র ভরের এক তৃতীয়াংশ থাকে। হিলিয়াম অন্তঃস্থলের বাইরে থাকে হাইড্রোজেন গ্যাসের আবরণী।

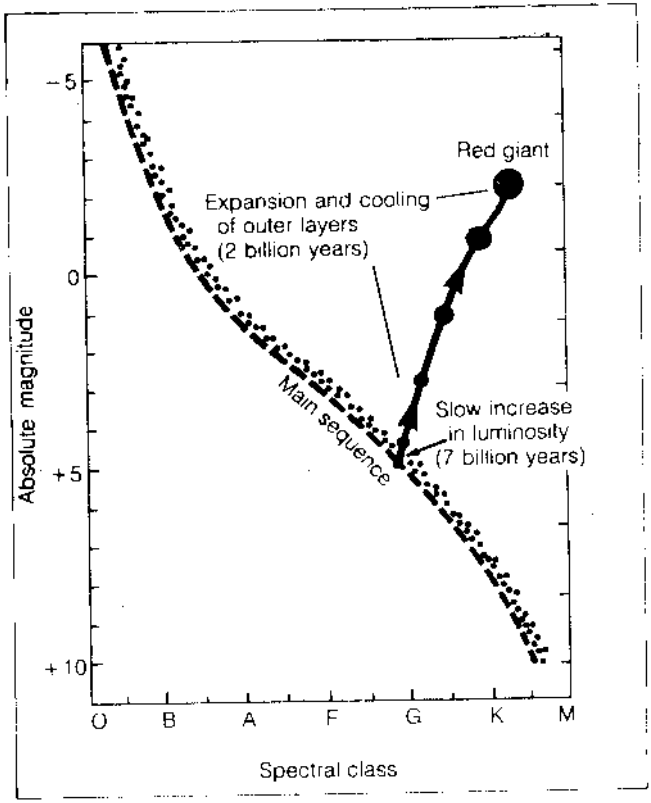

চিত্র ৬.১৪ : কম ভারী তারার বিবর্তন পথ।

হিলিয়াম ঝলক : লাল দানব পর্যায়ে হিলিয়াম অন্তঃস্থল তার চারপাশের বিক্রিয়ার ফলে উত্তপ্ত হতে থাকে এবং যথেষ্ট উত্তপ্ত হলে হিলিয়াম পুড়তে শুরু করে। যখন এ দহন শুরু হয় তখন দর্শনীয় ঘটনাবলি দেখা যায়। তাপমাত্রা যখন ১২০ মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিন তখন শুরু হয় ত্রি-আলফা পদ্ধতি (triple alpha process)। দুটি হিলিয়াম মিলে তৈরি হয় বেরিলিয়াম ৮। এটি অস্থায়ী হলেও অত্যুচ্চ তাপমাত্রায় এটি আরেকটি হিলিয়াম যোগে

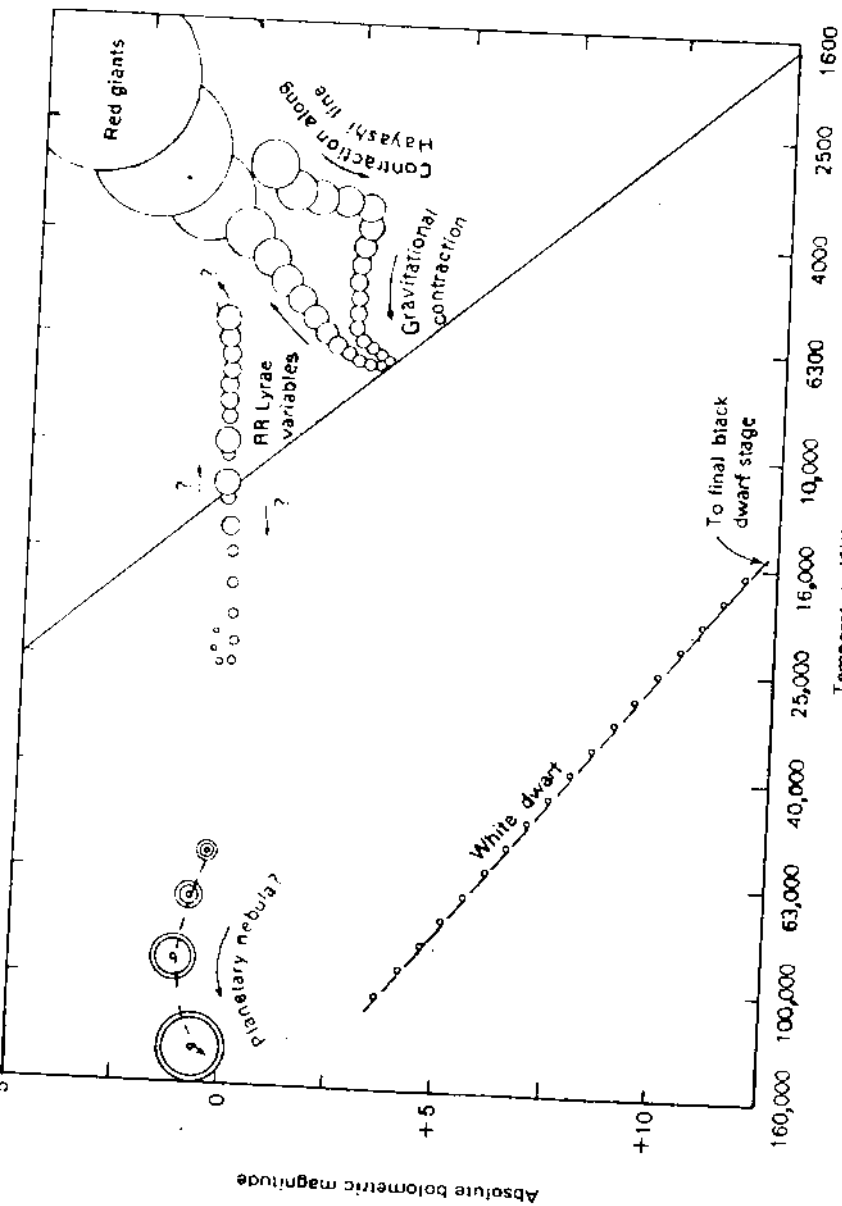
Red giants
Contraction along Hayashi line
Gravitational contraction
RR Lyrae variables
To final black dwarf stage
White dwarf
Planetary nebula?
Absolute bolometric magnitude
0
+5
+10
160,000
100,000
63,000
40,000
25,000
16,000
10,000
6300
4000
2500
1600
Temperature (°K)

কার্বন ১২ তৈরি করে : হিলিয়াম-৪ + হিলিয়াম-৪ $\xrightarrow{\text{বেরিলিয়াম ৮}}$ $\xrightarrow{\text{অক্সিজেন ১৬}}$ কার্বন-১২। আরো হিলিয়াম-গুচ্ছের মাধ্যমে ভারি মৌল সম্ভব হতে পারে। যেমন—নিয়ন ২০, ম্যাগনেসিয়াম-২৪ ইত্যাদি। কার্বনের পরবর্তী ধনকের জন্য প্রয়োজন ৬০ কোটি ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রা। যখন কেন্দ্রে বিক্রিয়াগুলো শুরু হয় তখন তাপমাত্রা বেড়ে যায়, কিন্তু ঘনত্ব ও চাপ একই থাকে (কারণ কেন্দ্র অপজাত)। বাড়তি তাপ বিক্রিয়া আরো বাড়িয়ে দেয়; ফলে আরো তাপ উৎপন্ন হয় যা বিক্রিয়াকে আরো দ্রুত করে। এভাবে মুহূর্তের মধ্যে অন্তঃস্থলের এক বিরাট অংশ বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। এই তাৎক্ষণিক বিক্রিয়াই হিলিয়াম ফ্লাশ বা ঝলক। হিলিয়াম ঝলকের ফলাফল প্রায় কিছুই দেখা যাবে না। বহু বছর পর তারার বিবর্তনে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে কেবল। হিলিয়াম ঝলকের ফলে কেন্দ্রের অপজাত ধর্ম বিনষ্ট হয়। এই অবস্থায় তারা অনেকটা শান্ত। এ পর্যায়ে তারা আবার এইচ-আর চিত্রের বাম দিকে চলতে থাকে। তারার কেন্দ্রে পুনরায় উদস্থৈতিক সুস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এ পর্যায় অস্থায়ী। এই সময় হাইড্রোজেন গলনকালের ১ শতাংশেরও কম। কেন্দ্রের হিলিয়াম পুড়ে কার্বনে পরিণত হয়। তখন কার্বন অন্তঃস্থলের বাইরে হিলিয়াম আবরণীতে হিলিয়াম পুড়তে থাকে। তারা প্রসারিত ও শীতল হয় এবং পুনরায় লাল দানবে পরিণত হয়। কেন্দ্রে পুনরায় অপজাত পদার্থ দেখা দেয়। এ পর্যায় চলে প্রায় ১ মিলিয়ন বছর। একটি কম ভরের তারার পরিণতি কেমন হবে তার সাধারণ ছবি চিত্র ৬.১৪-এ দেখানো হয়েছে। চিত্র ৬.১৫-এ একটি ১.১ সৌরভরের তারার বিবর্তন দেখানো হয়েছে। আমাদের সূর্যের পরিণতি অনুরূপ হবে আশা করা যায়।

গ্রহ নীহারিকা : দ্বিতীয় লাল দানব পর্যায়ে তারার দুটি পৃথক অংশ হয়। অতীব ঘন, অপজাত পদার্থ সমৃদ্ধ অন্তঃস্থল (core) এবং প্রসারিত বহিরাবরণ। কেন্দ্রে থাকে কার্বন এবং কম ভরের তারাদের পক্ষে পরবর্তী বিক্রিয়া শুরু করা সম্ভব নয়। ফলে বহিরাবরণের গ্যাস আবরণ তারাকেন্দ্র থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে এবং এদের তাপমাত্রা মাত্র কয়েক হাজার কেলভিনে দাঁড়ায়। এই গ্যাস বলয়টি প্রায় সৌরজগতের সমান আয়তনে ছড়িয়ে থাকে। দূর থেকে দেখা আলোকচিত্রে এটি ইউরেনাস বা নেপচুন গ্রহের মতো দেখায়। তাই একে গ্রহ নীহারিকা (planetary nebula) বলে। মহাশূন্যে এদের প্রচুর দেখা পাওয়া যায়। আমাদের ছায়াপথে প্রায় ১,০০০ টি আছে। NGC7027 এ রকম একটি বস্তু। বলয় নীহারিকা (Ring Nebula, চিত্র ৬.১৬), Dumbbell নীহারিকা এ ধরনের গ্রহ নীহারিকার উদাহরণ। গ্রহ নীহারিকার পর অবশিষ্ট কার্বন কেন্দ্রীনের অন্তিম দশা হলো একটি সাদা বামনতারা (white dwarf)।

ভারি নক্ষত্রের পরিণতি : কোনো একটি তারার ভর সূর্যের ৩, ৫ বা ১০ গুণের মধ্যে হলে তাদের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ ঘটনাই ঘটবে, তবে ক্ষেত্রবিশেষে পার্থক্য থাকবে প্রচুর। এদের ক্ষেত্রে আয়ুষ্কালেরও ভিন্নতা দেখা দেয়। কারণ এদের উজ্জ্বলতা থাকে সূর্যের প্রায় ১০০ গুণ, ফলে শক্তি বিকিরণের হার বেশি। ভর সূর্যের ৫ গুণ হলে বর্ণালি B4, ১০ গুণ

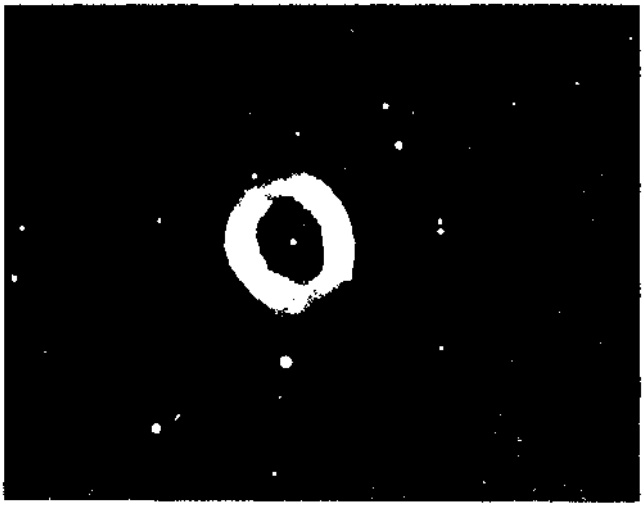

[illegible]

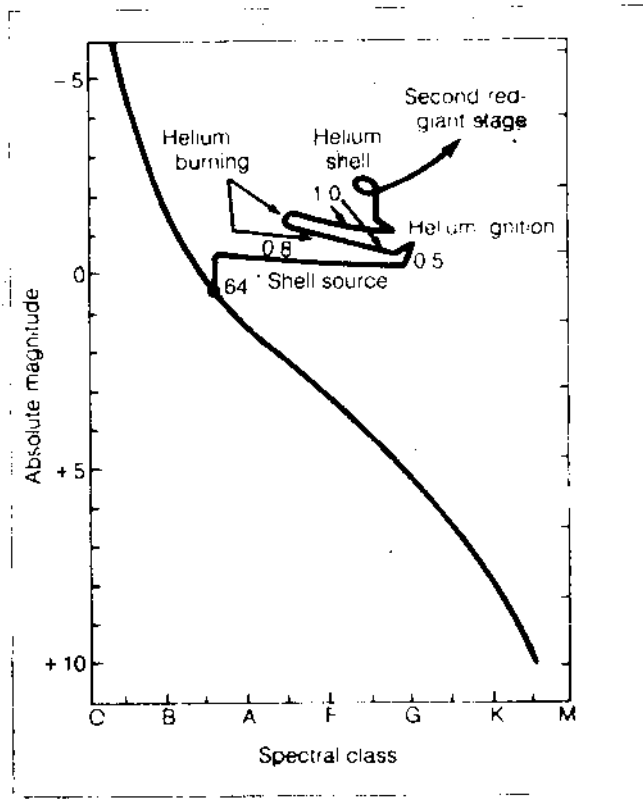

চিত্র ৬.১৭ : [illegible]

সূর্যের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বা ততোধিক ভারি তারাদের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা থাকে ২০,০০০ ডিগ্রি এবং উজ্জ্বলতা সূর্যের $১০^{৫}$ বা $১০^{৬}$ গুণ। বেশকোনো ক্ষেত্রেই যখন তারার কেন্দ্র গঠিত হয় তখন কেন্দ্রীয় বিক্রিয়া পুরো বন্ধ হয়ে যায়। কারণ কেন্দ্রের পরমাণুর বিক্রিয়াগুলো সবই তাপশোষী (endothermic) অর্থাৎ তাপ শোষিত হয়ে যায়। ফলে কেন্দ্র তৈরি হওয়া মাত্রই সমস্ত বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং তারার শক্তি উৎপাদনের আর কোনো

[illegible] মহাকর্ষের প্রবল আকর্ষণকে সামলে নিশ্চল বা বহির্মুখী [illegible] হয়ে যায়। তারা কেন্দ্রে পড়ে এক বিরাট অন্তঃস্ফোটন (implosion) [illegible] তারা নিয়ে কেন্দ্রে চুপসে যায় এবং অবশিষ্ট গ্যাসীয় বস্তুকণাগুলো

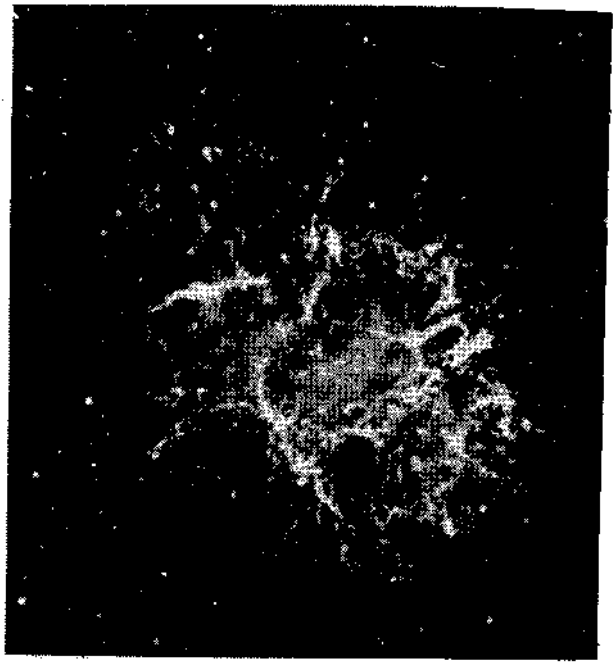

চিত্র ৬.১৮ : [illegible]

[illegible] থেকে বাজুলস্ত হয়। একে বলে অতিনবতারা বা সুপারনোভা। সুপারনোভা [illegible] সেকেন্ড পর কয়েক ধরনের নিউক্লীয় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে যার [illegible] চেয়ে ভারী ও [illegible] পদার্থ। এ ধরনের সুপারনোভাকে বলে type II সুপারনোভা। সুপারনোভার পরে [illegible] তারা অথবা কৃষ্ণবিবর (black hole)।

[illegible] সালের দিকে অতিবেগুনী [illegible] পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা যায় যে ঊর্ধ্বতর [illegible] বিশেষ করে O এবং B তারাদের ক্ষেত্রে পদার্থ বিপুল বেগে শুরু

উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। এদের বলে নাক্ষত্রিক বায়ু (stellar winds)। এই নাক্ষত্রিক বায়ুর ফলে এদের প্রচুর ভর হারিয়ে যায় এবং নতুন এক ধরনের তারার সৃষ্টি হতে পারে। এর নাম উলফ-র‍্যায়েট তারা (Wolf Rayet)। এদের থাকে একটি কার্বন (C) অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অঞ্চলের এবং শক্তিশালী নাক্ষত্রিক বায়ু।

সুপারনোভা বিস্ফোরণ বিজ্ঞানীদের কাছে একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আজকাল আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে দূরান্তের অনেক সুপারনোভা বিস্ফোরণ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বছরে বিশটি বা তারও বেশি সুপারনোভা এখন দেখা সম্ভব। জর্জ মিকানওস্কি নামের এক সুমেরবিদ বিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত এক কিউনিফর্ম লিপির উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ বছরে সুমেরীয়রা এ রকম একটি সুপারনোভা দেখেছিল। বিজ্ঞানীরা ভেলা নীহারিকার একটি পালসারকে উক্ত সুপারনোভার সম্ভাব্য অবশেষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ১০৫৪ সালে চীনা জ্যোতির্বিদগণও এরূপ একটি সুপারনোভার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই 'অতিথি তারাটি'র স্থায়িত্ব হয়েছিল ১৫ দিন এবং একে দিনের বেলায়ও দেখা গিয়েছিল। কাঁকড়া নীহারিকাকে বর্তমানে উক্ত বিস্ফোরণের বর্তমান অবশেষ বলে মনে করা হয়। ১৬০৪ সালে কেপলার একটি সুপারনোভা দেখেছিলেন খালি চোখে। এরপর ১৯৮৭ সালে ম্যাজেলানের মেঘপুঞ্জে আবারো একটি সুপারনোভাকে দেখা গেল খালি চোখে। এই সুপারনোভাটিকে নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে।

সুপারনোভা ১৯৮৭-এ : ফার্দিনান্দ ম্যাজেলান যখন বিশ্ব ভ্রমণে বের হলেন তখন তাঁর এক নাবিক ১৫২০ সালে দক্ষিণ প্যাসিফিকের আকাশে অসংখ্য ছোট ছোট তারার সমন্বয়ে পৃথক দুটি তারার মেঘ দেখতে পেলেন। সেই থেকে দক্ষিণাকাশের এ দুটি মেঘকে ম্যাজেলানের মেঘ বলে। এরা আসলে আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের দুটি উপ-ছায়াপথ (অনুচ্ছেদ ৪.৩)। এদের নাম যথাক্রমে বড় এবং ছোট ম্যাজেলানের মেঘ (Large and Small Magellanic Clouds)। ১৯৮৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি আয়ান শেলটন তাঁর মানমন্দিরে কাজ করার সময়ে বড় ম্যাজেলানের মেঘের অন্তর্ভুক্ত টারানটুলা নীহারিকায় একটি সুপারনোভা খালি চোখেই দেখতে পেলেন। এই বিশেষ তারাটির কেতাবি নাম ছিল সানডিউলিক ৬৯°২০২। ১৯৬৯ সালে নিক সানডিউলিক বড় ম্যাজেলানের মেঘের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। সেখানে এই তারাটির ভর ছিল সূর্যের দশগুণ এবং এটি ছিল একটি নীলচে সাদা দানবতারা। এর প্রকৃতি অনেকটা কালপুরুষের বাঁপরজার (Rigel) অনুরূপ। এর উজ্জ্বলতা বা দীপ্তি ছিল সূর্যের এক লক্ষ গুণের বেশি। কাস সূর্যের ৫০ গুণ। এবং সর্বোপরি এর দূরত্ব ১৫০০০০ আলোকবর্ষ। এটি দক্ষিণাকাশের ৬৯ এর তারাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তালিকায় এর ক্রমসংখ্যা হলো ২০২। এই সুপারনোভাটির নাম দেওয়া হয়েছে এস এন, ১৯৮৭ এ (SN 1987A)। অর্থাৎ ১৯৮৭ সালের প্রথম দৃষ্ট সুপারনোভা।

সুপারনোভাদের [illegible] দুটি শ্রেণী [illegible] I ও II [illegible] প্রথম শ্রেণীর সুপারনোভার পৃষ্ঠে [illegible] হাইড্রোজেন থাকে না এবং মনে করা হয় এরা নিম্নভরের শ্বেত বামনের বিস্ফোরণে তৈরি। অন্যদিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারনোভায় হাইড্রোজেনের [illegible] থাকে এবং এদের ব্যাখ্যা হয় কেন্দ্রে। SN1987A আসলে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারনোভা হলেও যথেষ্ট ভিন্ন [illegible] দেখা গেছে। চন্দ্রজ্বলতা, বর্ণরূপান্তর এবং উচ্চগতিবেগ [illegible] SN 1987A [illegible] আমাদের টিপিক্যাল দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারনোভা থেকে

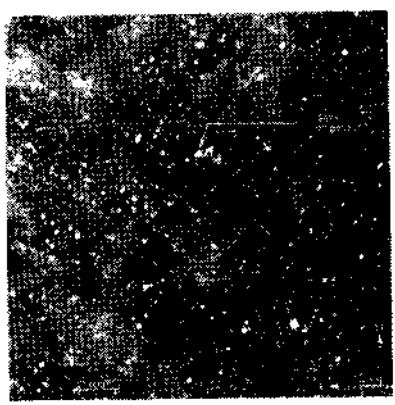

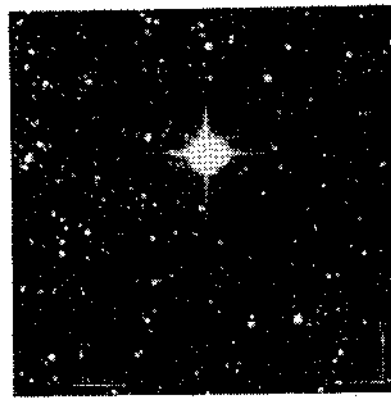

চিত্র ৪.১৯ : বামে ডিসেম্বর [illegible] এ তোলা Sanduleak 69 202 এর চিত্র। ডানে [illegible] ফেব্রুয়ারি, [illegible] তে মাত্র যাওয়া সুপারনোভা বিস্ফোরণের।

[illegible]। দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুযায়ী সুপারনোভার উজ্জ্বলতা বাড়তে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এটি আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তুতে পরিণত হয়। কিন্তু SN 1987A এর ক্ষেত্রে দেখা গেল এটি এর প্রত্যাশিত উজ্জ্বলতার মাত্র এক-দশমাংশ পৌঁছে তারপর ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং উত্তপ্ত নীল দানবতারা থেকে একটি ঠাণ্ডা লাল দানবতারায় পরিণত হয়। অবশ্য তার [illegible] সংস্ফোরণ হয়ে ছিল বিস্ময়কর। এর বাইরের স্তরের বিস্ফোরণের বেগ ছিল [illegible] লেগে [illegible] এক দশমাংশ।

এবার আমরা এই সুপারনোভা বিস্ফোরণটিকে সীচ করে দেখা করবো কোন মুহূর্তে কোন অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল (চিত্র ৪.২০) :

1. চিত্র ১ : বিস্ফোরণের [illegible] মিলিয়ন বছর পরে এটি ছিল একটি নীল-সাদা দানবতারা। দীর্ঘকাল যাবৎ জ্বালানি দহনের ফলে এর হাইড্রোজেনের ঘাটতি দেখা দেয় এবং হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়ামে পরিণত হয়।

2. চিত্র ২ : ফলত এটি পরিণত হয় একটি লাল দানবতারায় যা আমরা 'তারা মন্ডলের পরিণতি' অনুচ্ছেদে তাত্ত্বিক আলোচনায় দেখেছি। কেন্দ্রভাগের

মহাকর্ষীয় আকর্ষণের প্রাবল্যে তাপমাত্রা দাঁড়ায় ১০০ মিলিয়ন কেলভিনে। এই অতিরিক্ত তাপমাত্রায় হিলিয়াম পুড়ে কার্বনে ও অক্সিজেনে পরিণত হয়। পৃষ্ঠের গ্যাস বাষ্পাকারে উড়ে যায়। ফলে প্রচুর বন্ধনশক্তি নির্গত হয়।

৩. চিত্র ৩। বিস্ফোরণের এক হাজার বছর পূর্বে এর কেন্দ্রের তাপ পৌঁছায় প্রায় ৩০০ মিলিয়ন কেলভিনে। এই তাপে নিয়নের দহন শুরু হয়

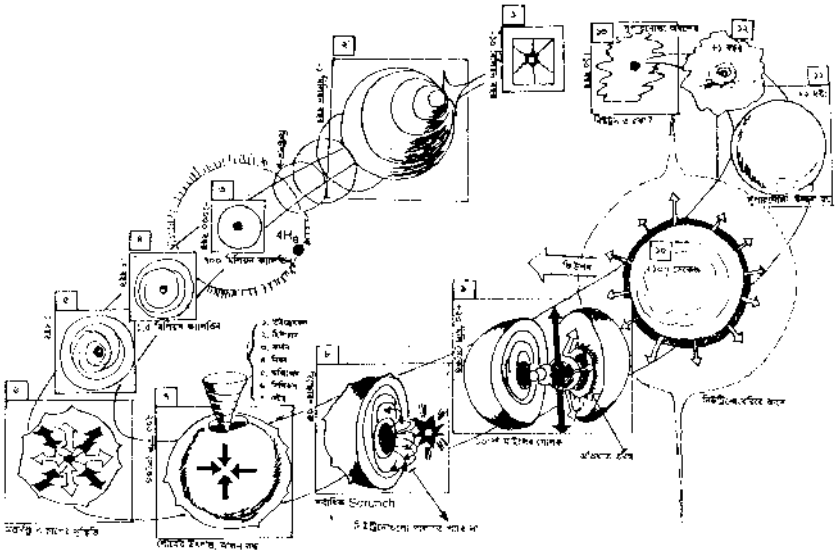

চিত্র ৬.২০ : সুপারনোভা বিস্ফোরণ ১৯৮৭ (SN 1987A)।

৪. চিত্র ৪। ক্রমশ বিক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। বিস্ফোরণের সাত বছর পূর্বে নিয়ন পুড়ে গিয়ে এর কেন্দ্রের তাপমাত্রা ১.৫ বিলিয়ন কেলভিনে পরিণত হয়।

৫. চিত্র ৫। বিস্ফোরণের এক বছর পূর্বে অক্সিজেন ভেঙ্গে সিলিকন তৈরি হয়

৬. কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে তার উপাদানিক নিউক্লিয়াসগুলোকে পরস্পরের হাত থেকে মুক্ত করতে নিউক্লিয়াসকে যে পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করতে হয় কিংবা বিপরীতক্রমে যে যে প্রোটনের সঙ্গে ও নিউট্রিয়াসকে একত্র করে একটি নিউক্লিয়াস গঠন করতে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়োজন সেটাকে নিউক্লীয় বন্ধনশক্তি।

৬. চিত্র ৬। বিস্ফোরণের চার দিন পূর্বে সিলিকন লোহায় পরিণত হয়।

৭. চিত্র ৭। সিলিকন পুড়ে লোহা তৈরি করে। ফলে শক্তি ও আগুন দুটোই বন্ধ হয়। এ সময়ে তারার কেন্দ্রে যেসব পদার্থ সঞ্চিত হয় তাদের আপেক্ষিক অবস্থান দেখা যাচ্ছে ছবিতে অংকিত কোনকটি থেকে। এর প্রতিটি বলয় অনেকগুলো ধারাবাহিক নিউক্লীয় গলন বিক্রিয়ার উৎপাদে পূর্ণ থাকে। সবচেয়ে বাইরে থাকে অদগ্ধ হাইড্রোজেনের শেল, তারপর হিলিয়াম, তারপর যথাক্রমে কার্বন, নিয়ন, অক্সিজেন এবং সিলিকনের বলয়।

৮. চিত্র ৮। ২০০ মিলিসেকেন্ড পূর্বে লোহার যে (পৃথিবীর সমান আয়তনের) স্তম্ভ থাকে তা ভেঙ্গে দশ মাইল ব্যাসের এক গোলক তৈরি করে। প্রচুর পরিমাণে নিউট্রিনো কণা নির্গত হয় এবং এরাই শক্তি বহন করে নিয়ে যায়।

৯. চিত্র ৯। বিশ মিলিসেকেন্ডের মধ্যে কেন্দ্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এর ফলে ১০–১৫ মাইল ব্যাসের একটি ছোট গোলক তৈরি হয়। অভিঘাত তরঙ্গ (shock wave) নিঃসৃত হয়।

১০. চিত্র ১০। একশ সেকেন্ড পর নিউট্রিনো কণাতারার পৃষ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে আসে এবং এরা বিস্ফোরণের ৯৯% শক্তি বহন করে।

১১. চিত্র ১১। দুঘণ্টা পর অভিঘাত তরঙ্গ পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করে দেয় এবং নক্ষত্র আকাশে ভাস্বর হয়ে জ্বলতে থাকে।

১২. চিত্র ১২। এক বছর পর উজ্জ্বলতা কমে যায়। গ্যাসের মেঘ দেখা যায়।

১৩. চিত্র ১৩। ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নেয় একটি অতিঘন নিউট্রন তারা। সম্ভবত এটিও একটি পালসার হবে যা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে স্পন্দন দেবে।

আগেই বলা হয়েছে, বিশেষ যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই সুপারনোভাকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। উচ্চাকাশের বেলুন এবং অপরাপর স্যাটেলাইট থেকে একে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই তারা থেকে উচ্চশক্তির গামা এবং এক্স–রশ্মির বিকিরণ পাওয়া গেছে। তারাটির অভিঘাত তরঙ্গের সাথে নিঃসৃত গ্যাসীয় বহিরাবরণ বড় ম্যাজেলানিক মেঘের আন্তঃনক্ষত্রিক গ্যাসের সাথে মিশবে। এতে করে নতুন ভারি মৌল সংশ্লেষিত হবে এবং আন্তঃনক্ষত্রিক স্থান সমৃদ্ধ হবে। সাধারণত এ ধরনের সুপারনোভা বিস্ফোরণে প্রচুর পরিমাণে সোনা, সীসা এবং ইউরেনিয়াম তৈরি হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যখন কোনো তারা সুপারনোভায় পরিণত হয় তখন তা একাই সমস্ত ছায়াপথের সমান শক্তি বিকিরণ করতে থাকে। এটাই তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতার কারণ।[৪]

৪. অনুচ্ছেদটি *National Geographic* (May 1988) অনুসরণে লিখিত এবং মহাকাশ বার্তা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, ৪র্থ বর্ষ : ১-২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৬.১২ নক্ষত্রের অন্তিম দশা

আমরা জেনেছি যে, কোনো একটি নক্ষত্র বিবর্তিত হয়ে অবশেষে ধীরে অথবা বিস্ফোরণের মাধ্যমে তার বাইরের গ্যাসীয় আবরণ পরিত্যাগ করে। পরিশেষে তাদের জীবনে কি ঘটে তা নির্ভর করে তাদের ভরের উপর। কম ভারি একটি তারা অবশেষে সাদা বামনে পরিণত হয়; এবং ভারি তারা নিউট্রন তারা অথবা কৃষ্ণবিবরে পরিণত হয়। যেসমস্ত তারার ভর $M \leq 4M_{\odot}$ পরিসরে তারাই সাধারণত সাদা বামনতার গঠন করে; যদিও সাদাবামন হওয়ার তাত্ত্বিক সীমা $1.4M_{\odot}$ নিউট্রন তারা বা কৃষ্ণবিবর হবে তখনই যখন প্রোজেনিটর তারার ভর 1.4-$3\ M_{\odot}$ পরিসরে থাকে। অবশ্য ঠিক কোন তারাটি নিউট্রন তারা হবে আর কোনটি কৃষ্ণবিবর হবে তা এখনও সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। কারণ সুপারনোভা বিস্ফোরণের প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট জটিল এবং এই সংক্রান্ত সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই।

সাদা বামন, নিউট্রন তারা এবং কৃষ্ণবিবরকে সাধারণভাবে ঘনসংবদ্ধ বস্তু (compact objects) বলে। সাধারণ তারা থেকে এদের দুটো পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এক, এরা কোনো নিউক্লিয় জ্বালানি দহন করে না বলে এদের মহাকর্ষীয় পতনকে তাপীয় বিকিরণের চাপ আর সামাল দেয় না। সাদা বামনের ক্ষেত্রে এই চাপ আসে ডিজেনারেট বা অপজাত ইলেকট্রনের চাপ থেকে এবং নিউট্রন তারার জন্য ডিজেনারেট নিউট্রনের চাপ থেকে। কিন্তু কৃষ্ণবিবর প্রকৃত অর্থেই একটি সম্পূর্ণ পতিত (collapsed) তারা (যার আর কোনো ভবিষ্যতই নেই)। দুই, সাধারণ তারার তুলনায় ঘনসংবদ্ধ তারার আকৃতি হয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্রতর ব্যাসার্ধের কারণে এদের পৃষ্ঠে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র হয় প্রবল। এই প্রবল ঘনত্বের কারণে ঘনসংবদ্ধ তারাদের আলোচনায় পদার্থের ভৌত গঠন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। ক্ষুদ্রতর ব্যাসার্ধ এবং অধিকতর পৃষ্ঠ উজ্জ্বলতার কারণে সাদা বামনতারাদের তাপমাত্রা সাধারণ তারার চাইতে অনেক বেশি থাকে এবং এরা অবশিষ্ট বিকিরণ ধীরে ধীরে বিকিরণ করে দিতে থাকে। অন্যদিকে নিউট্রন তারা আসলে একটি বিশাল নিউট্রন কেন্দ্র (10^{57} সংখ্যক ব্যারিয়ন) যেখানে ইলেকট্রন ও প্রোটন পারস্পরিক বিপরীত বিটা-ক্ষয়ের দ্বারা নিউট্রনে পরিণত হয় (চিত্র : ৬.২১)।

সারণি—১

বস্তু	ভর (M)	ব্যাসার্ধ (R)	গড় ঘনত্ব (গ্রাম/সি.সি.)	পৃষ্ঠ বিভব (GM/Rc^2)
সূর্য	$M_{\odot}$	$R_{\odot}$	1	10^{-6}
সাদাবামন	$<M_{\odot}$	$\sim 10^{-2} R_{\odot}$	$<10^{6}$	$\sim 10^{-4}$
নিউট্রন তারা	$\sim 1.4 M_{\odot}$	$\sim 10^{-5} R_{\odot}$	$<10^{15}$	$\sim 10^{-1}$
কৃষ্ণবিবর	ইচ্ছামূলক	$2GM/c^2$	$\sim M/R^3$	~ 1

$M_{\odot} = 1.9886 \times 10^{33}$ গ্রাম

$R_{\odot} = 6.96133 \times 10^{10}$ সে.মি.

Shapiro & Teukolsky (1983) থেকে

সাদা বামনতারা (white dwarfs) : কম ভরের তারা, যার ভরের কেন্দ্রে পরিণত হয় [illegible] তারায়। এ ধরনের তারার ঘনত্ব হয় প্রচণ্ড। এদের ভর প্রায় সূর্যের [illegible] কিন্তু আয়তন পৃথিবীর মতো। এই তারকাদীয় ঘনত্বের তারাগুলি নতুন কোনো শক্তি

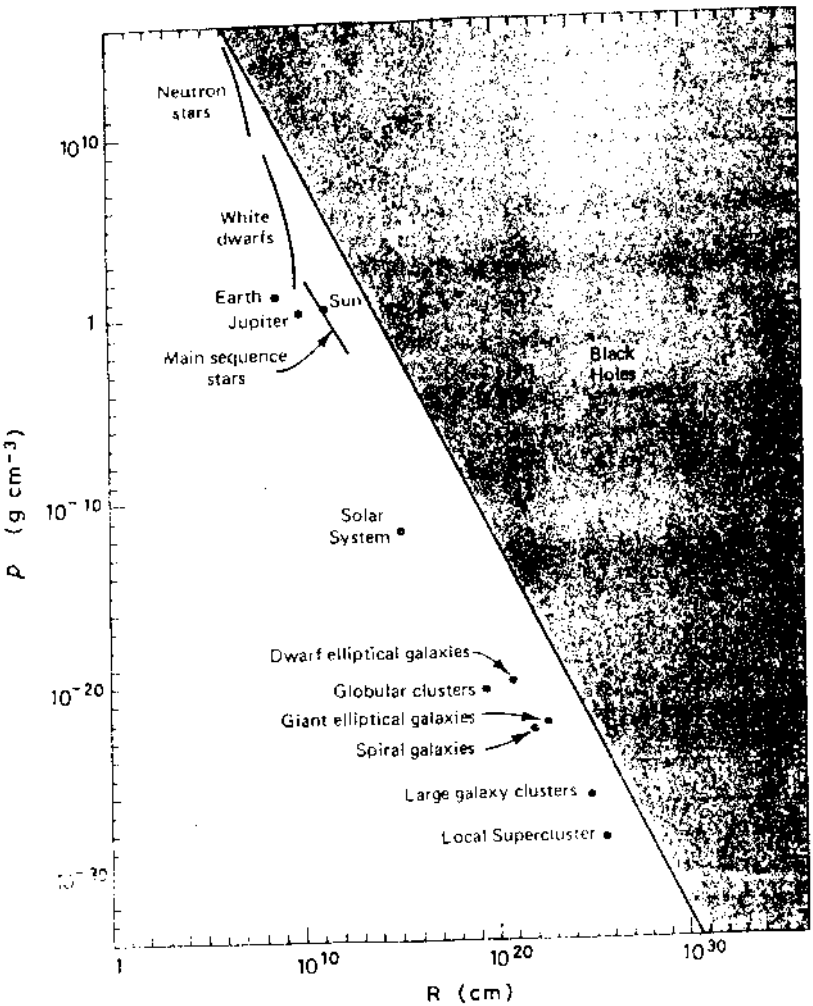

[illegible]

যায় না। সাদা বামনতারার অভ্যন্তরে গ্যাস স্বাভাবিক দশায় থাকতে পারে না। প্রকল্পনীয় ঘনত্বের কারণে এর অভ্যন্তরের পরমাণুর প্রতিটি পরমাণু এদের কক্ষস্থ ইলেকট্রন হারায়। এদের বলে অপভ্রষ্ট ইলেকট্রন (degenerate electron)। ভারী ঘনত্বের ফলে অপভ্রষ্ট ইলেকট্রন পরস্পরের অত্যন্ত নিকটে চলে আসে। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের একটি আইন আছে—পাউলির বর্জন নীতি। সেখানে বলা হয়েছে যে, কোনো দুটি ইলেকট্রন কখনোই একই কোয়ান্টাম দশায় থাকতে পারবে না। ফলে তাদের শক্তি নীতি যখন ইলেকট্রনদের চাপ দিয়ে একীভূত করে ফেলতে চায় তখন এই আইন কতৃক নির্ধারিত ন্যূনতম দূরত্বে ইলেকট্রনগুলো আর সংকুচিত হতে পারে না এবং চাপ দিলে বাধা প্রদান করে। একে অপভ্রষ্ট ইলেকট্রনের চাপ বলে। সাদা বামনতারায় শক্তিশালী অভিকর্ষকে ঠেকিয়ে রাখে এই অপভ্রষ্ট ইলেকট্রনের চাপ। এ অবস্থায় যদি আরো চাপ প্রয়োগ করা হয় তবে ইলেকট্রনের গতি বেড়ে যায় এবং এটি বিপরীতমুখী চাপ দেয়। এই চাপ সাধারণ তাপীয় চাপের মতো গ্যাসের তাপমাত্রা ও ঘনত্বের উপর নির্ভর না করে নির্ভর করে শুধু ঘনত্বের উপর। চাপ যতো বাড়ে ইলেকট্রনের বেগ ততো বাড়ে। সূর্যের চেয়ে কিছু ভারী তারাদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের বেগ প্রায় আলোর বেগের কাছাকাছি। ফলে প্রয়োজন পড়ে আপেক্ষিক তত্ত্বীয় সংশোধনের। ১৯৩১ সালে সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর এ সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেখতে পান যে, সাদা বামনতারার সর্বোচ্চ ভর হবে সূর্যের ১.৪ গুণ। এর বেশি হলে অপভ্রষ্ট পদার্থের চাপ আর মহাকর্ষকে ধরে রাখতে পারবে না। ঘনত্ব হবে প্রায় ১০৯ গ্রাম/সি.সি.।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চন্দ্রশেখর যখন সাদা বামনতারা সংক্রান্ত তার তত্ত্ব উপস্থাপন করেন তখন সে সময়কার প্রধান জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটন এ তত্ত্বের 'বিরোধিতা' করেন। বস্তুত তার বিরোধিতাই এ সংক্রান্ত গবেষণা অনেক দিনের জন্য পিছিয়ে দেয় এবং চন্দ্রশেখর বিলেত ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। পরে ১৯৮৩ সালে চন্দ্রশেখরকে একাজের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Venkataraman (1992), Thorne (1994) এবং Wali (1990)।

সাদা বামনতারা ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করতে থাকে এবং খুব দীর্ঘ সময় ধরে তা চলে। কিন্তু কেন্দ্রে নতুন শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে না। তাহলে কেন্দ্রে থাকলে যে অপভ্রষ্ট পদার্থ থাকে তা তাপ-সুপরিবাহী। কিন্তু এর বহিরাবরণে থাকে সাধারণ কিছু গ্যাস। এই বহিরাবরণটি হতে পারে মাত্র ১০ কি.মি. পুরু এবং এতে থাকে সাধারণ গ্যাস যা তাপের অন্তরক। ফলে তাপের বিকিরণ হয় ধীরে।

এর কেন্দ্রে থাকে প্রধানত হিলিয়াম, তবে হিলিয়াম সহনা যদি তারার আদিম পর্যায়ে শুরু হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কেন্দ্রে কারবন বা কিছু ভারী মৌলও পাওয়া যাবে, যাহোক, সমস্ত তাপ বিকিরণ করে এটি পরিণত হবে একটি মৃত কালো তারায়। আমাদের সূর্যও অবশেষে সাদা বামনে পরিণত হবে। তবে তার আগে এটি লাল দানব হয়ে বুধ ও শুক্র গ্রাস করে পৃথিবী দুই দুই করবে। সে সময়ে পৃথিবীতে কোনো প্রাণী থাকা সম্ভব নয়।

সবপ্রথম আবিষ্কৃত সব বামন হচ্ছে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের সঙ্গী সিরিয়াস বি। আসলে লুব্ধক (সিরিয়াস) একটি জোড়া তারা। একটিকে ঘিরে অপরটি ঘুরছে। ঐ বামনটির ভর সূর্যের চেয়ে কিছু কম এবং আয়তন ঐটি পৃথিবীর চেয়ে কিছু ছোট। [illegible] কেলভিন।

নিউট্রন তারা : সূর্যের চেয়ে দেড়গুণ ভারি কোনো তারার অন্তিম নিয়তি ঘটে একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের পরে অবশেষ থাকে একটি অতি ঘন নিউট্রন তারা। [illegible] ভর সূর্যের [illegible] এ ছাড়া তাত্ত্বিক হিসাবে দেখান হয় যে কোনো একটি তারার ভর যদি [illegible] গুণের বেশি হয় তবে উৎপন্ন অপজাত নিউট্রন চাপ আর মহাকর্ষকে রুখতে পারে না। এই সীমাটিকে বলে **ওপেনহাইমার-ভলকফ সীমা**। অবশ্য এই সীমাটি সুপ্রতিষ্ঠিত [illegible] এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে এটা মোটামুটি বলা যাচ্ছে যে, তারার ভর সূর্যের দেড় থেকে তিন গুণের মধ্যে হলে তার অন্তিম দশা হবে নিউট্রন তারা। বিবর্তন তারা অবস্থাটির [illegible] আগে আমরা সাদা বামন তারায় অপজাত পদার্থের আচরণ দেখেছি। নিউট্রন তারার ক্ষেত্রে চাপ ও ঘনত্ব এতো বেড়ে যায় যে অপজাত ইলেকট্রন প্রায় আলোর বেগে চলতে শুরু করে এবং প্রোটনের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিউট্রন তৈরি করতে থাকে : নিউট্রন → ইলেকট্রন + প্রোটন + প্রতি-নিউট্রিনো। ফলে নিউট্রন তারা হয় একটা বিশালকায় নিউট্রন গোলক। এর একচামচ পদার্থের ভর পৃথিবীতে দশ কোটি টন। নিউট্রন তারার ব্যাস ১০ মাইল [illegible] কিলোমিটারের মধ্যে হয় এবং ঘনত্ব [illegible] গ্রাম/সি.সি. মতো হয়। নিউট্রন তারার একটি নিকেল [illegible] এক লোহার মতো মৌলের সমন্বয়ে গঠিত এবং এটি দ্রুত অপজাত হয়ে যায় এবং $^{56}_{26}Fe$ এর লাটিসের ভেতর ইলেকট্রনগুলো তুমুলবেগে ছোটাছুটি করতে থাকে। এর [illegible] থেকে একটি পরম নিউট্রন প্রবাহ (সুপারফ্লুইড)। এই প্রবল [illegible] সুপারফ্লুইডের জন্ম সুপরিচিত। এর সম্পর্ক হবে শূন্য [illegible] সম্পর্কতা, হিলিয়ামের ক্ষেত্রে, পরম শূন্য তাপমাত্রায় পাওয়া গেছে)। এবং কেন্দ্রে, যেখানে সর্বোচ্চ চাপ সেখানে, হয়ত নগ্ন কোয়ার্ক আছে। কুইকার্ক কোয়ার্কের রহস্যময় অবগুণ্ঠন হয়ত নিউট্রন তারার কেন্দ্রে উন্মোচিত হয়েছে।

সারণী — ৩

উৎস	পর্যবেক্ষিত সংখ্যা	আমাদের ছায়াপথে দৃষ্ট মোট সংখ্যা	বিকিরিত শক্তি (আর্গ/সে.)
রেডিও পালসার	~৪০০০	~১০০০০	$10^{[illegible]}$–$10^{[illegible]}$
এক্স রে পালসার	~২৬	~১	$10^{[illegible]}$–$10^{[illegible]}$
এক্স রে বার্স্ট (bursts)	~৩৬	১০	$10^{[illegible]}$–$10^{[illegible]}$

নিউট্রন তারার কথা প্রথম বলেছিলেন লেভ লান্ডাউ, ১৯৩২ সালে। ১৯৬৭ সালে আন্টনি হেউইশের ছাত্রী জেসেলিন বেল কেমব্রিজে কাজ করার সময়ে ১.৩ সেকেন্ড পর পর একটি বেতার সংকেত পাচ্ছিলেন। প্রথমে ভাবা হয়েছিল যে এটি হয়ত কোনো অপার্থিব বুদ্ধিমত্তার বড় প্রকাশিত প্রমাণ। পরে দেখা গেল যে এটি নিউট্রন তারা যা দ্রুতগতিতে ঘুরছে এবং সংকেত পুনরাবৃত্তি করছে অদ্ভুত নিখুঁতভাবে। একে বলে পালসার বা স্পন্দক। আসলে পালসার ও নিউট্রন তারা এক ও অভিন্ন।

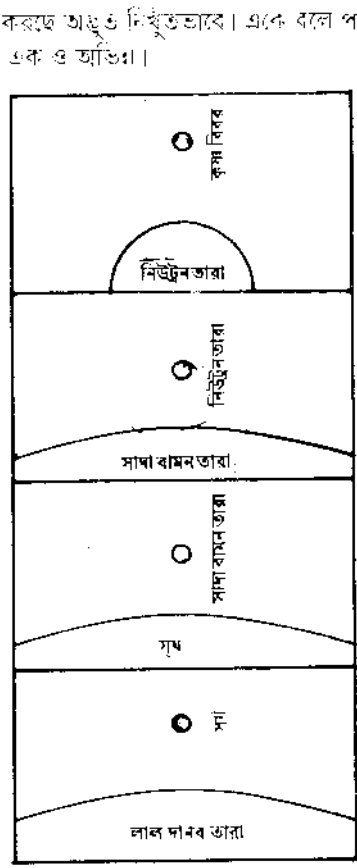

চিত্র ৬.২২ : একটি তুলনামূলক চিত্র : সবচেয়ে ছোট তারা সবচেয়ে বড় তারার চেয়ে দশ কোটি ভাগ ছোট। তারার ভর : সৌরভর হলে বিভিন্ন এরার ব্যাস হয় : লালদানব-১৪ কোটি কি.মি.; সূর্য-১৪ লক্ষ কি.মি.; সাদাবামন-১৩ হাজার কি.মি.; নিউট্রন তারা-১৬ কি.মি.; কৃষ্ণবিবর-১.৫ কি.মি.

কাঁকড়া (crab) নীহারিকায় একটি পালসার আছে। এটি আমাদের ভবের এক চমৎকার প্রমাণ। ১০৫৪ সালে চীনা জ্যোতির্বিদরা এখানে একটি সুপারনোভা দেখেছিলেন এবং সেটি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। কাজেই এখানে একটি পালসার স্বভাবতই প্রকাশিত ছিল। এর স্পন্দন–হার সেকেন্ডে ৩০। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭০০টি পালসার আবিষ্কৃত হয়েছে[১]। মনে

---

১. দেখুন Lyne & Graham-Smith (1998)।

করা হয়, আমাদের গ্যালাক্সির ৫ হাজারেরও পালসারের সংখ্যা ১০[illegible] থেকে ১০[illegible] এবং এদের অধিকাংশই গ্যালাক্সির তলে (plane of the Galaxy)। এদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে ধীরে ঘোরে, যার আবর্তনকাল [illegible] সেকেন্ড এবং সবচেয়ে দ্রুতটির (PSR B1937 + 21) ঘোরার হার [illegible] সেকেন্ড অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে ৬৪১ বার। এই দ্রুতের পৃথিবী আলোর বেগের ১/[illegible] ভগ্নাংশ বেগে বেগবান। গতিপরতায় পালসারের আবর্তনকাল [illegible] থেকে ১০[illegible] বছর। ঘূর্ণনের ফলে পালসার তার গতিশক্তি হারায় এবং এভাবে এর আবর্তনকাল কমতে থাকে। মনে হয় অধিকাংশ পালসারের আবর্তনকাল শুরুতে ১০০০ মিলিসেকেন্ডের কম থাকে এবং ১০ লক্ষ থেকে মিলিয়ন বছর পর সেটি ধীরে বিকিরণ করে [illegible] থেকে মাত্রায় থাকে [illegible] বছরে একটি করে পালসার জন্ম নিচ্ছে। অন্যান্য সুপারনোভা অবশেষের উপাত্তের পালসারের অনুসন্ধান সফলজনক নয়। [illegible] বছরের গবেষণার পর জানা যায়নি পালসার কোন লক্ষ্যই উজ্জ্বল মতো বিকিরণ দেয় এবং কি ভাবে দেয়। এক অনুকল্পে কল্পিত হয়েছে যে, নিউট্রন তারার শক্তিশালী চৌম্বক অক্ষের কাছাকাছি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণা বিপুল বেগে ত্বরিত হয়। এই বেগ যদি আলোর বেগের কাছাকাছি

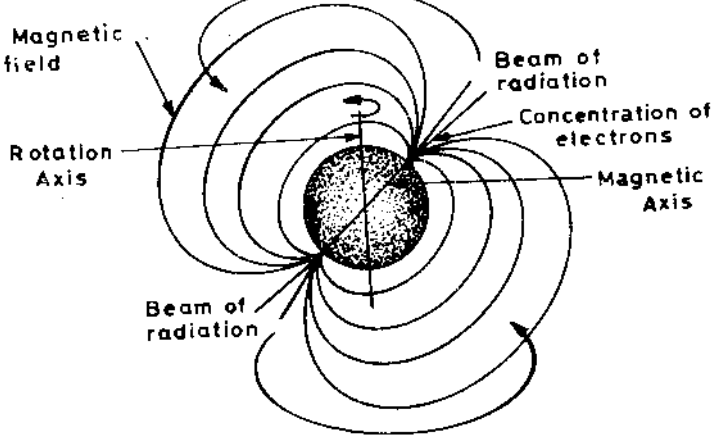

চিত্র ৬.২৩ : নিউট্রন তারার পালস বিকিরণ।

হয় তবে বেগের অভিমুখে বিকিরণ পাওয়া যাবে। এভাবে যে বিকিরণ রশ্মি (বীম) তৈরি হয় এবং যেহেতু চৌম্বক অক্ষ ও ঘূর্ণন অক্ষ এক নয়, তাই দূর থেকে এই বিকিরণকে লাইটহাউসের মতো মনে হয় (এ ক্ষেত্রে অবশ্যই নিউট্রন তারা ঘূর্ণায়মান হবে) (চিত্র ৬.২৩)। এর জন্য অবশ্যই আহিত কণার মেঘ চাই। ফলে চৌম্বকক্ষেত্রের বলরেখা বরাবর আহিত কণা কুণ্ডলিত পথে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে এগোয় এবং বিকিরণ দেয়। একে বলে সিনক্রোট্রন (synchrotron) পদ্ধতি। এর ফলে বিকিরণ (রৈখিক ও বৃত্ত দুভাবেই) পোলারায়িত হয়ে যায়। এ ধরনের প্রবণতা দিয়েছেন টমাস গোল্ড। যদিও এর অনেক তাত্ত্বিক জটিলতা আছে।

যখন কোনো তারা এর চৌম্বকক্ষেত্রসহ সংকুচিত হয়ে নিউট্রন তারা গঠন করে তখন এটি বস্তুতঃ একটি শক্তিশালী চুম্বক এবং তা দ্রুত ঘূর্ণমান। ফলে ডায়নামো প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যাতে মেরু ও বিষুবীয় অঞ্চলের মধ্যে যে বিভবপার্থক্য তৈরি হয় তার মান [illegible] মিলিয়ন মিলিয়ন ভোল্ট। মেরু অঞ্চলের ক্ষেত্র প্রাবল্য নবীন পালসারের জন্যে [illegible] ওয়েবার প্রতি বর্গ

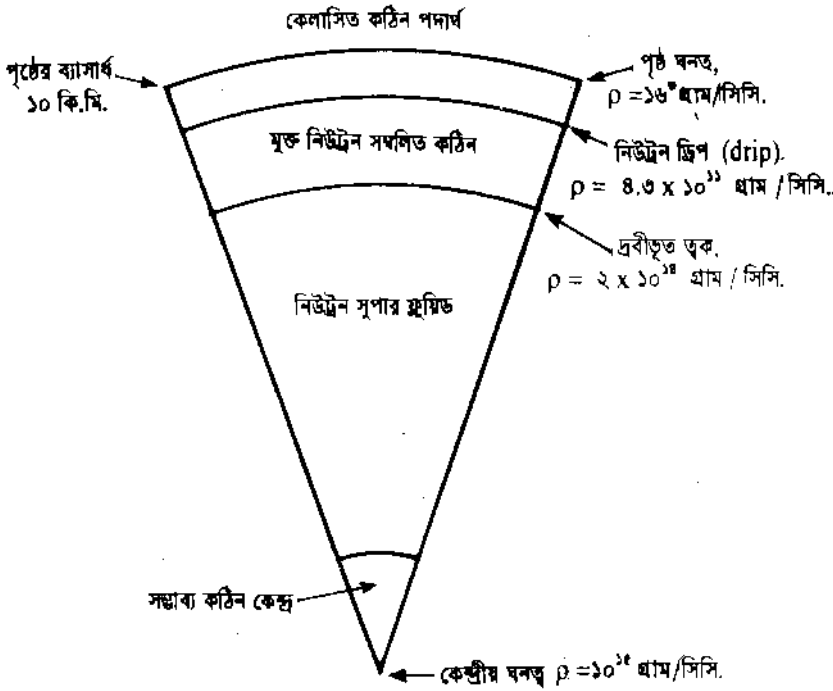

চিত্র ৬.২৪ : নিউট্রন তারার [illegible]

নবীন পালসারে ১০^১৮ ওয়েবার। এই প্রচণ্ড শক্তিশালী ডায়নামো ক্রিয়া তারার পৃষ্ঠ থেকে আহিত কণা টেনে নিয়ে মহাশূন্যে ছুঁড়ে ফেলে। বিকিরণ অঞ্চলে যেসব আহিত কণা থাকে ইলেকট্রন ও পজিট্রন তাদের শক্তি থাকে প্রায় 10^{15}eV এরা চৌম্বকক্ষেত্রে বক্রপথে চালিত হয়ে একটি বিশাল চৌম্বকমণ্ডলের সৃষ্টি করে। কিন্তু আণ্বিক কারণে তারার সাথে ঘুরতে পারে না। এবং ঘূর্ণন হারের উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট দূরত্বে চৌম্বকমণ্ডল হয় শেষ হবে অথবা সৌরবায়ুর মতো আচরণ করবে। চৌম্বকমণ্ডলের ব্যাপারে যথেষ্ট তাত্ত্বিক জটিলতা আছে বলে বিকিরণের ব্যাপারটির সুসমাধান হয়নি। একটি নবীন পালসারের পৃষ্ঠতাপমাত্রা থাকতে পারে প্রায় ১০^৬ কেলভিন।

পালসার মহাজগতের ঘড়ির মতো। অত্যন্ত নিখুঁত সূক্ষ্মতায় এটা সময় পরিমাপ করতে পারে এবং তা যে কোনো পার্থিব পারমাণবিক ঘড়ির তুলনায় উৎকৃষ্ট। তবে কোনো কোনো পালসার অতো ভালো ঘড়ি নয়। কারণ তারার ঘূর্ণন শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে বিকিরণ শক্তিতে। তাছাড়া এর আশেপাশে আছে অজ্ঞনিত গ্যাসমেঘ এবং এর আছে একটি শক্তিশালী চুম্বক। ফলে এর ঘূর্ণন ধীরে ধীরে কমে যায়। নিউট্রন তারা পর্যবেক্ষণের একটি উপায় হলো যদি এটি অন্য কোনো তারার সাথে যুগ্মভাবে অবস্থান করে, তাহলে অপর তারা থেকে ভর যখন নিউট্রন তারায় গিয়ে পড়বে তখন বিপুল এক্স-রে পাওয়া যাবে। তবে এক্ষেত্রে একটি অসুবিধে হলো, যে সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিউট্রন তারাটি গঠিত হয়েছে, সে বিস্ফোরণ জোড়া তারা ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করতে পারে। একটি পালসার আছে PSR 1913+16 (১৯৭৫ এ আবিষ্কৃত)। এর একটি যুগ্ম নিউট্রন তারা আছে বলে মনে হয়। জানা গেছে যে এ দুটি নিউট্রন তারা তাদের কক্ষীয় গতির শক্তি হারাচ্ছে এবং ক্রমশ এরা কাছাকাছি হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ হতে পারে যে এরা মহাকর্ষীয় তরঙ্গাকারে শক্তি হারাচ্ছে। যদি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ পাওয়া যায় তবে তা হবে বিজ্ঞানের এক অবিসংবাদিত বিজয়। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এর গতিপথে কোনো বস্তুকে যথাক্রমে প্রসারিত ও সংকুচিত করবে খুবই সূক্ষ্ম হারে। এরা আলোর বেগে ধাবমান। পালসার সম্পর্কে সাম্প্রতিক তথ্যসমৃদ্ধ বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Lyne & Graham-Smith (1998)। পালসারের গাণিতিক ধর্মাবলি জানতে হলে Shapiro & Teukolsky (1983)র লেখা অনবদ্য বইটি দেখা যেতে পারে।

হাল্‌স-টেইলর যুগ্ম পালসার (PSR 1913+16)[৮] : ১৯৭৪ সালে জোসেফ টেইলর ও রাসেল হাল্‌স এই জোড়া পালসার আবিষ্কার করেন। এটি সেই বিখ্যাত পালসারজোড়া যা বহু প্রার্থিত মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে। এই যুগ্মপালসারটি আসলে একজোড়া নিউট্রন তারা যারা পরস্পরকে ঘিরে ঘূর্ণ্যমান এবং এদের একটি সদস্য সৌভাগ্যক্রমে পালসার। তাই একে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এদের পরস্পরকে ঘিরে আবর্তনকাল ৮ ঘণ্টা। এই ঘূর্ণনের ফলে পালসারের ফ্রিকোয়েন্সিতে ডপলার-ক্রিয়াজনিত পরিবর্তন দেখা দেয়। পালসারটি তার অপর সদস্যকে ঘিরে ~৩০০ কি.মি./সে. বেগে ঘূর্ণ্যমান। এই জোড়া সিস্টেমের নিকটবিন্দুর (periastron) অগ্রগমন, হিসেব করে দেখা গেছে, বছরে প্রায় ৪.২°। কিন্তু এই অগ্রগমন কেবলমাত্র সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বজনিত কারণে হয়ে থাকে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। সঙ্গীতারাটি ঘূর্ণনের কারণে অথবা পালসারের জোয়ার বলে বিকৃত হয়ে অ-গোলাকার হলে এ ধরনের অগ্রগমন হতে পারে।

আসলে এ পালসারজোড়াটি আপেক্ষিকতত্ত্বীয় জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের (relativistic astrophysics) বিভিন্ন প্যারামিটারের পরিমাপের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং ১৯৭৪ সাল থেকে এ সম্পর্কে বহু নতুন ধর্মাবলি যথেষ্ট সূক্ষ্মতার সাহায্যে পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে। নিচে

৮. Shapiro & Teukolsky (1983) অনুসরণে।

একটি সারণি দেওয়া হলো :

সারণি—৩

প্যারামিটার	মান
P_p (s)	[illegible]
$\dot{P}_p$ (10^{-15})	[illegible]
e	[illegible]
p(s)	[illegible]
ω(deg.)	[illegible]
ω (deg yr^{-1})	[illegible]

P_p হলো পালসার পর্যায়কাল, p কক্ষীয় পর্যায়কাল। বন্ধনীস্থ সংখ্যা পরপর মানের শেষ সংখ্যায় পরিমাপিত অনিশ্চয়তা নির্দেশ করে।

এছাড়া হালস-টেইলর পালসারজোড়ার অন্যান্য ধর্মাবলি হলো :

১. এই জোড়াতারা ব্যবস্থার একটি হলো পালসার যা অপর অনুরূপ সদস্যকে ঘিরে একটি উপবৃত্তাকার পথে ৩০০ কি.মি.-সে.⁻¹ বেগে ঘুরছে। পালসার থেকে যা ও স্পন্দনের পরিবর্তন হার থেকে এই মান গণনা করা হয়েছে

২. এই সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যমূলক চারটি প্যারামিটার আছে : ভর M_1 ও M_2 ; পালসারের কক্ষপথের অর্ধ বৃহদক্ষ হলো a_1 (যেখানে $M_1a_1 = M_2a_2$) ; এবং দৃষ্টিরেখার সাথে কক্ষীয়তলের আনতি, i।

৩. সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব প্যারামিটারদের তিনটি সমাবেশ সম্ভব : ক) নিকটবিন্দুর অগ্রগমন, খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের ডপলার সরণ, ও মহাকর্ষীয় রক্তিমসরণের মিলিত ফল, গ) মহাকর্ষীয় তরঙ্গ নিঃসরণের দরুন ক্রমহ্রাসমান কক্ষীয় পর্যায়।

৪. তিনটি প্যারামিটারের দুটি সমাবেশ : $a_1 \sin i$ ও ভর অনুপাত।

৫. চারটি প্যারামিটারের এই পাঁচটি বিভিন্ন সমাবেশ মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উপস্থিতি দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে। এমনকি সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব কর্তৃক পূর্বাভাসিত মহাকর্ষীয় তরঙ্গের চতুষ্পোল সূত্র (quadrupole formula) [illegible] প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে।

আজকাল তাই সন্দেহাতীতভাবে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উপস্থিতি সপ্রমাণিত হয়েছে (দেখুন অনুচ্ছেদ ২.৬)। আইনস্টাইনের অসামান্য মনীষা আবারো যুক্তিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হলো। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের এ এক ঐতিহাসিক সার্থকতা নিঃসন্দেহে।

ম্যাগনেটার (Magnetar) : ম্যাগনেটার বা চৌম্বকতারা হলো এমন এক ধরনের নিউট্রন তারা যাদের রয়েছে এক প্রচণ্ড শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র। এই চৌম্বকক্ষেত্র পৃথিবীর তুলনায় প্রায় এক হাজার ট্রিলিয়ন (১০ কোটি কোটি) গুণ এবং যেকোনো গড় নিউট্রন তারার তুলনায় একশ গুণ শক্তিশালী। ম্যাগনেটারের চৌম্বক ক্ষেত্রের মান 10^{15} থেকে 10^{16} গাউস যেখানে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র ০.৬ গাউস মাত্র। কিন্তু একটি গড়পরতা নিউট্রন তারা কি করে এই প্রচণ্ড শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র অর্জন করে সেটি একটা প্রশ্ন বটে।

ষাটের দশকে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় 'ভেলা' নামের অনেকগুলো কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে নিক্ষেপ করে। এই স্যাটেলাইটগুলো থেকে দেখা যায় যে মহাবিশ্বের সবত্র প্রায় প্রতিনিয়ত অল্পাবস্থার গামা রশ্মির ক্ষণস্থায়ী বিস্ফোরণ ঘটছে। ১৯৭৩ সালে এই প্রতিভাসের নাম দেওয়া হয় gamma-ray bursts বা গামারশ্মির বিদারণ; সংক্ষেপে জি.আর.বি। ১৯৭৯ সালের মধ্যে প্রায় ডজনখানেক গামারশ্মির উপস্থিতি নির্দেশকারী ডিটেক্টর তৈরি করা হয় এবং মহাকাশে বিভিন্ন স্যাটেলাইটে এদেরকে রাখা হয়। এই সব ডিটেক্টর ১৯৭৯ সালের ৫ই জানুয়ারি ধনুরাশিতে সর্বপ্রথম soft gamma repeaters বা এস.জি.আর আবিষ্কার করে। একই বছর ৫ই মার্চ সবচেয়ের উজ্জ্বলতম এস.জি.আর আবিষ্কৃত হয়। আসলে প্রথমদিকে এস.জি.আর. ও জি.আর.বি. এর মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। এরা দুটোই আসলে গামারশ্মি বিকিরণ করে; কিন্তু এস.জি.আর এর ক্ষেত্রে একই জায়গা থেকে পর্যায়ক্রমে বিকিরণ আসে, অন্যপক্ষে জি.আর.বি এর বিকিরণ একই উৎস থেকে একবারই হয়ে থাকে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় শক্তি এস.জি.আর এর ক্ষেত্রে অধিকতর কম। এরা আসলে শক্তিশালী এক্স রে বিকিরণ করে থাকে। ১৯৯৮ সালে আধুনিক ডিটেক্টর যন্ত্রে প্রতিদিনে একটি জি.আর.বি. এবং সারা বছরে প্রায় ১০–২০টি এস.জি.আর ধরা পড়েছে।

১৯৭৯ সালে ৫ই মার্চে ঘটে যাওয়া বৃহত্তম এস.জি.আর বিদারণের ঘটনা নিয়ে গবেষণা চলতে থাকে। দেখা গেল, এই বিদারণের উৎসটি অবস্থিত একটি মেঘলা/ধোঁয়াটে অঞ্চল থেকে যা আসলে একটি সুপারনোভা অবশেষ (supernova remnant, SNR)। তালিকায় এর নাম N49 এবং এটি বড়ো ম্যাজেলানীয় মেঘে (LMC) অবস্থিত। এটি যে একটি নিউট্রন তারা তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কারণ সুপারনোভা বিস্ফোরণের অবশেষ হিসেবে প্রধানত নিউট্রন তারাই রয়ে যায়। মনে হয় ঐ বিশেষ নিউট্রন তারাটি একটি উচ্চ গতিসম্পন্ন আইসোলেটেড (isolated) নিউট্রন তারা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি এমন ঘটনা ঘটল যা এই নিউট্রন তারাটিকে এত বিপুল বিকিরণের শক্তি যোগায়? এ বিষয়ে অনেক তত্ত্ব প্রণীত হয়েছে। ১৯৯১ সালে ড. রবার্ট ডনকান ও ড. ক্রিস্টোফার টমসন তাদের ম্যাগনেটার তত্ত্ব প্রকাশ করেন। ওরা দেখালেন যে একটি সদ্যজাত নিউট্রন তারা যদি খুব জোরে ঘূর্ণায়মান হয় তবে উদ্ভূত ডায়নামো ক্রিয়ায় প্রায় 10^{15} গাউস ক্ষমতাসম্পন্ন চৌম্বকক্ষেত্রের উদ্ভব হতে পারে। আমরা জানি যে উত্তপ্ত নিউট্রন তারার ফ্লুইড বিদ্যুৎ সুপরিবাহী কারণ এতে মুক্ত ইলেকট্রন ও প্রোটন

---

৬. দেখা যাচ্ছে ১৯৯৮ সালে সন্দেহের এবং Duncan (1998) অনুসারে।

[illegible] ঘূর্ণন ও [illegible] ফ্লুইডের [illegible] উদ্ভব হয়। [illegible] যায়। এখন অনেক নিউট্রন তারা [illegible] থাকে এদের ডায়নামো ক্রিয়া করে না। ফলে [illegible] সম্ভব হয় না। কিন্তু সেসব নিউট্রন [illegible] চৌম্বকক্ষেত্রের সকল [illegible] সমস্যার মোকাবেলা [illegible] ম্যাগনেটারের সূক্ষ্ম [illegible] পালসারের মধ্যে [illegible] পালসারের চৌম্বকক্ষেত্র [illegible] হিসেবে কাজ করে। [illegible] থেকে যায় এক প্রবল চৌম্বকক্ষেত্র। এই [illegible] এই চৌম্বক ক্ষেত্র নিউট্রন তারার [illegible] এবং এ ভাবে চৌম্বকক্ষেত্র শক্তি [illegible] দেখা যায় এবং কমশক্তির গামা রশ্মি বিকিরণ (soft gamma bursts) [illegible]

[illegible] ভর্তি নিউট্রন তারা [illegible] ১০[illegible] গ্রাম/সি.সি.। এই নিউট্রনের ফ্লুইডের [illegible] মিশ্রিত থাকে। যেমন অন্যান্য তারায়, নিউট্রন তারার পৃষ্ঠে, [illegible] এই নিউট্রনের ফ্লুইড শক্ত হয়ে প্রায় [illegible] (crust) [illegible] তৈরি হয়। ভারি কেন্দ্রীয়ের কঠিন [illegible] নক্ষত্রের পৃষ্ঠে থাকে [illegible]। সাধারণ পালসারে [illegible] ম্যাগনেটারের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গনীয় চৌম্বকক্ষেত্রের [illegible] (drift) ফলে এই পৃষ্ঠকে পীড়নের (stress) [illegible] (deformed) এবং প্রায়শই চিড় (crack) [illegible] অনুরূপ ফলশ্রুতিতে পৃষ্ঠ এক সিলমিক তরঙ্গে [illegible] চৌম্বক তরঙ্গ বাইরে নিক্ষেপ হয়। এই তরঙ্গ [illegible] করে। এর ফলে উচ্চশক্তির এক্স রে [illegible] starquake বা নক্ষত্রকম্প বলে। যাহোক এ [illegible] (unstable) হয়ে যায় তখন এটি নিজেই [illegible] (rearrange) হয়ে যায়। এ ধরনের [illegible] (solar flare) [illegible] এ সময়ে পৃষ্ঠের কাছে সূর্যে চৌম্বকক্ষেত্র [illegible] magnetic reconnection এ বিশুদ্ধ চৌম্বক [illegible] চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে এই ঘটনা অনুরূপ প্রবল [illegible]

এই হলো সংক্ষেপে ম্যাগনেটারের [illegible] করেছিল তার নাম SGR 1806-20। এটি [illegible] এবং এদের একে নিয়ে তুমুল গবেষণা করা হচ্ছে [illegible]

এবং প্রতি বছর এই হার তিন মিলিসেকেন্ড করে হ্রাস পাচ্ছে। প্রবল চৌম্বকক্ষেত্রই এর ঘূর্ণনকে স্তিমিত এবং এর তাপকে কমিয়ে দিচ্ছে। এপর্যন্ত প্রায় পাঁচটি ম্যাগনেটারের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা গেছে। মনে হয়, নিউট্রন তারা পরিবারের ১০% সদস্যই ম্যাগনেটার। ম্যাগনেটার নিউট্রন তারা হিসেবে জন্ম নেবার ১০০০০ বছর পর এদের চৌম্বকক্ষেত্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ধীরে ঘূর্ণ্যমান, অনুজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়। ম্যাগনেটার সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম তথ্যের জন্য দেখুন Duncan (1998) এবং http://science.msfc.nasa.gov/newhome/headlines/ast09Jul98–1.htm]

নক্ষত্রের অন্তিম দশা হিসেবে সাদা বামন তারা ও নিউট্রন তারা (পালসার ও ম্যাগনেটার) এবং তাদের বিস্তারিত ধর্মাবলি জানা গেল। নক্ষত্রের অন্তিম অবস্থার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দশা হলো কৃষ্ণবিবর। বিষয়টির ব্যাপকতা ও গুরুত্বের কথা চিন্তা করে কৃষ্ণবিবরকে নিয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৬.১৩ কৃষ্ণবিবর

তারার ভর যদি কমপক্ষে সূর্যের ৩ গুণ হয় তবে তারার অন্তিমদশা হবে একটি কৃষ্ণবিবর বা ব্ল্যাক হোল। ৫ থেকে ১০ গুণ ভারি কোনো তারা একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের শিকার হয়। অতঃপর এর অন্তঃস্থল চুপসে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ভর এতো বেশি যে অপজাত নিউট্রনের চাপ কিংবা অন্য কোনো জাত বলই পরম মহাকর্ষকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। ফলে তারাটি চুপসে গিয়ে বিন্দুতে পরিণত হয়। এর মহাকর্ষ এতো শক্তিশালী যে আলো পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না।

এটি স্থানকালের এমন এক অঞ্চল যার প্রচণ্ড মহাকর্ষীয় আকর্ষণে আলোক–কণাও মুক্ত হতে পারে না। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী যদি কোনো তারার ভর ৩ সৌরভরের বেশি হয় তবে এটি এর সমস্ত কেন্দ্রীন জ্বালানি পুড়িয়ে অন্তিম দশায় কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে। কৃষ্ণবিবর ঘূর্ণ্যমান হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে। অঘূর্ণ্যমান কৃষ্ণবিবরদের শোয়ার্জশিল্ড (Schwarzschild) কৃষ্ণবিবর বলে এবং ঘূর্ণ্যমানদের কের-নিউম্যান (Kerr-Newman) কৃষ্ণবিবর বলে। প্রকৃতিতে অধিকাংশ বলে এবং ঘূর্ণ্যমানদের কের–নিউম্যান কৃষ্ণবিবর বলে। প্রকৃতিতে অধিকাংশ কৃষ্ণবিবরই ঘূর্ণ্যমান বলে মনে হয়। শোয়ার্জশিল্ড কৃষ্ণবিবরে ব্যাসার্ধ $2GM/c^2$। যখন কোনো নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ উক্ত মানের কম হয়ে যায় তখন মহাকর্ষ প্রাধান্য বিস্তার করে এবং এতে বাধা দেবার মতো কোনো বলের অস্তিত্ব নক্ষত্রের থাকে না। শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ কৃষ্ণবিবরের একটি পৃষ্ঠ নির্দিষ্ট করে দেয় যার নাম ঘটনা দিগন্ত (event horizon)। ঘটনা–দিগন্তের ভেতর থেকে কোনো আলো, সংকেত বা বস্তু বাইরে নির্গত হতে পারে না। কের–নিউম্যান কৃষ্ণবিবরের ঘটনা–দিগন্ত বৃত্তাকার নয় কিছুটা চ্যাপ্টা (চিত্র ৬.২৫)। অঘূর্ণ্যমান কৃষ্ণবিবরের কেন্দ্রে থাকে অসীম মহাকর্ষীয় আকর্ষণের একটি ব্যতিক্রমী বিন্দু (singularity)। এদের ক্ষেত্রে ঘটনা–দিগন্ত এবং অসীম রক্তিমসরণের পৃষ্ঠ অভিন্ন। এই ধরনের পৃষ্ঠ থেকে নির্গত আলো দূরবর্তী দর্শকের কাছে

আদি মান থেকে অনেক কম কম্পাঙ্কের ও শক্তিবিশিষ্ট আলো বলে মনে হয়। কিন্তু ঘূর্ণমান কৃষ্ণবিবরদের জন্য দুই মেরু ছাড়া ঘটনা দিগন্ত ও প্রসীম রক্তিমসরণের পৃষ্ঠ — এ দুয়ের মাঝে একটি অঞ্চল আছে যার নাম ergosphere। এই অঞ্চলের কণাদের থাকে (বাইরের দর্শকের সাপেক্ষে) ঋণাত্মক শক্তি। কৃষ্ণবিবরের ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করতে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের শোয়ার্জশিল্ড সমাধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণবিবর পৃষ্ঠের স্থানকালের জ্যামিতি ব্যাখ্যা করে শোয়ার্জশিল্ড মেট্রিক :

$$ds^2 = -c^2\left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2GM}{c^2 r}} + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2) \qquad (৬.১৩.১)$$

মেট্রিক বা রেখা অংশক (লাইন এলিমেন্ট) হলো স্থানকালের যে কোনো দুই বিন্দুর সঠিক দূরত্ব। এই দূরত্বের প্রকৃতি জানা গেলে ঐখানে স্থানকালের আচরণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। সূর্যের জন্য শোয়ার্জশিল্ড মেট্রিক সমাধান করলে কৃষ্ণবিবরের যে ব্যাসার্ধ পাওয়া যায় তা হলো ২.৫ কি.মি.। এই শোয়ার্জশিল্ড সমাধান কেবলমাত্র অঘূর্ণমান কৃষ্ণবিবরের জন্য। কিন্তু বিশ্বে আমরা ঘূর্ণমান তারাই বেশি দেখি। তাদের জন্য কি হবে? তাছাড়া মনে করা হতো যে ঘূর্ণমান তারার অবশিষ্ট অংশের কৌণিক ভরবেগ সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলবে। কিন্তু ১৯৬৩ সালে আর.পি. কের যখন কৌণিক ভরবেগ বিবেচনায় রেখে নতুন সমাধান দিলেন তখন দেখা গেল সমস্যা মোটেই জটিল নয়, বরঞ্চ সব দিক দিয়েই সহজ। সেই বিখ্যাত, অসীমতটীয়ভাবে সমতল (asymptotically flat), কের মেট্রিক হলো :

$$ds^2 = \left(1 - \frac{K^2}{\Delta}\right)(dt - a\sin^2\theta d\phi)^2 + \frac{\sin^2\theta}{K^2}[(r^2 + a^2)\,d\phi - a\,dr]^2 + \frac{K^2}{\Delta}dr^2 + K^2 d\theta^2 \qquad (৬.১৩.২)$$

যেখানে $K^2 = r^2 + a^2\cos^2\theta$ এবং $\Delta = r^2 - 2Mr + a^2$ [এখানে a কৌণিক ভরবেগের একটি প্যারামিটার, যেখানে $a = \frac{J}{M}$]। এই সমাধানটি লেখা হয়েছে বয়ার ও লিন্ডকুইস্ট কর্তৃক প্রবর্তিত স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় এবং এখানে $c = G = 1$।

এই সমীকরণ শূন্যতলের জন্য আইনস্টাইনের সমীকরণ সমাধান করে পাওয়া যায়। এখানে দুটো প্যারামিটার M ও a আছে। এই মেট্রিক $\theta=0$ অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণন প্রতিসম, মেট্রিকের কোনো সহগ স্থানাঙ্ক t এর উপর নির্ভর করে না (অর্থাৎ অসীম দূরত্বের কোনো দর্শকের কাছে t সময়ে এটি স্থির মনে হবে)। কের সমাধানে $a = 0$ বসালে শোয়ার্জশিল্ড সমাধান পাওয়া যায়। কাজেই কোনো ভারী, ঘূর্ণমান তারার পরিণতি একটি কৃষ্ণবিবর যার বহিস্থ মেট্রিকটি হবে অবশ্যই কের মেট্রিক (গাণিতিকভাবে দেখানো সম্ভব যে অন্যান্য অপ্রতিসাম্য বিদূরিত হবে)। কের সমাধানে ঘটনা-দিগন্তের ব্যাসার্ধ $r = \frac{G}{c^2}[M + (M^2 - a^2)^{1/2}]$ (ধরা হয়েছে $a \leq M$)। কের মেট্রিক ঘটনা দিগন্তের বাইরেও একটি পৃষ্ঠের সংজ্ঞা দেয় যার সমীকরণটি হলো :

$$r = \frac{G}{c^2}\left[M + (M^2 - a^2\cos^2\theta)^{1/2}\right] \qquad (\text{illegible})$$

এই পৃষ্ঠ ঘটনা দিগন্তকে দুই ভাগে ভাগ করে। একটি হলো এরগোস্ফিয়ার (ergosphere) হকিং ও রুফিনি এই নাম দিয়েছেন। এই পৃষ্ঠের উপর কোনো কণা অনন্ত দূরত্বে পৌঁছাতে থাকতে হলে আলোর বেগে ছুটতে হবে এবং এই পৃষ্ঠের আলো অসীম লোহিত সরণ দেখাবে। বাইরে থেকে এই এরগোস্ফিয়ার পৃষ্ঠে (ergosphere) পৌঁছে কণাকে দুইভাগে বিভক্ত হবে। বাইরের দর্শকের কাছে এর একটি অংশকে ঋণাত্মক শক্তিবিশিষ্ট বলে মনে হবে। শক্তির সংরক্ষণশীলতা দাবি করে যে, অন্য অংশের শক্তি হবে তুলনায় বেশি থাকবে। ঋণাত্মকশক্তি অংশটুকু যদি ঘূর্ণন দিগন্ত অতিক্রম করে তবে এর একটি শক্তিবিশিষ্ট অংশটুকু যদি কেন্দ্রে নিক্ষেপ করে। অসীমে ফিরে এলে তাকে বলা যায় কৃষ্ণবিবরের কৌণিক ভরবেগ কমিয়ে ঘূর্ণনশক্তি নিষ্কাশন করা হয়েছে। পেনরোজ শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রথম পেশ করেছিলেন।[১] এভাবে কৃষ্ণবিবরের সাথে শক্তি নিগমন মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সম্ভাবনা বাদ করে। গাণিতিকভাবে কৃষ্ণবিবরকে বর্ণনা করতে দরকার তিনটি রাশির : ভর, ঘূর্ণন ও বৈদ্যুতিক আধান। আদি নক্ষত্রের ভর এবং কৌণিক পদার্থের ভর থেকে কৃষ্ণবিবরের ভর নির্ধারিত হয়। উপরিউক্ত শোয়ার্জশিল্ড সীমাবিন্দুর M এর সর্বনিম্নমান ১০ ^{illegible} কেজি। এছাড়াও ৫, ১০০, ১০০০০০, ১০০০০০০০০০ সৌরভরের কৃষ্ণবিবরও সম্ভব। এ ছাড়াও সচল ভারী কৃষ্ণবিবরসমূহ এবং ভারীমহাকেন্দ্রের ভেতর থাকে অথবা ভারী অনেকগুলো কৃষ্ণবিবরের একীভূত হওয়ার মাধ্যমে তৈরি হতে পারে। যদি আদি নক্ষত্র ঘূর্ণমান হয় তবে কৃষ্ণবিবরও ঘূর্ণমান হবে। তবে কাপ্পা যতো কমে ঘূর্ণন তত বাড়ে। বেশি ঘূর্ণনে ঘটনা দিগন্তের সংকোচন ঘটে। ফলে ঘটনা দিগন্তহীন কৃষ্ণবিবর গাণিতিকভাবে সম্ভব। এক্ষেত্রে একটি নগ্ন বৈভিন্নতা বিন্দুর (naked singularity) জন্ম হয়। অবশ্য বস্তুসমূহ আধানহীন হলেও ঘূর্ণমান কৃষ্ণবিবরের উপরে ঘটনা দিগন্ত থাকে। যেহেতু কৃষ্ণবিবর থেকে কোনো আলোক বের হয় না তাই একে দেখা ও সম্ভব নয়। তবে কোনো জোড়াতারা সিস্টেমে যদি কোনো কৃষ্ণবিবর সঙ্গী থাকে তবে এটি প্রমাণ করে তাকে পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে দৃশ্যমান তারার কোনো অদৃশ্য সঙ্গী থাকবে, একে খুব ঘন হতে হবে এবং অন্য তারা থেকে এতে পদার্থের বিনিময় হবে যার ফলে এরা রে পাওয়া যাবে। [illegible] জোড়াতারাকে অবশ্যই বর্ণালীর জোড়া হতে হবে। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী কৃষ্ণবিবরসমূহ সৃষ্টিত। তবে ডি. সিয়ামা হকিং দেখিয়েছেন যে, যদি কোয়ান্টাম তত্ত্বকে বিবেচনায় আনা যায় তবে দেখা যাবে যে এরা বিকিরণক্ষম। এর নাম হকিং বিকিরণ। এতে দেখা যায় কম ভরের কৃষ্ণবিবর বেশি বিকিরণ দেয়। অর্থাৎ যে সব কৃষ্ণবিবরের নক্ষত্রিক ঘটনা ক্রমে তৈরি নয়। বিশ্ব সৃষ্টির আদিমুহূর্তে অত্যন্তবিশেষের মহাকর্ষীয় অস্থিরতার মাধ্যমে এক ধরনের আদি কৃষ্ণবিবর (primordial) তৈরি হতে পারে। এরা [illegible] এবং বাইরে থেকে এদের শ্বেত গহ্বর (white hole) মনে হয়। [illegible]

১. দেখুন Chandrasekhar (1973), Ferguson (1996)

থেকে কোনো বিকিরণ পাওয়া যায়। এ ধরনের আণুবীক্ষণিক কৃষ্ণবিবরদের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ হলেও বৃহৎ কৃষ্ণবিবরদের জন্য নয়।

কৃষ্ণবিবরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় কিভাবে? আগেই বলা হয়েছে যেহেতু কৃষ্ণবিবর কৃষ্ণ — প্রকাশ কোনো আলোই এর ঘটনা-দিগন্ত থেকে নির্গত হতে পারে না, তাই একে দেখা সম্ভব নয়। কেবল এবং কেবলমাত্র অপ্রত্যক্ষভাবেই কৃষ্ণবিবরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব। দুভাবে এটা করা যায়।

১. ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে নক্ষত্রসমূহ অত্যন্ত দ্রুত গতিবেগে চলাচল করে। যদি অত্যন্ত শক্তিশালী মহাকর্ষীয় আকর্ষণে তারা বাধা না থাকে তবে তারা ছুটে চলে যেত। ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বাধা থাকত না। এই প্রবল মহাকর্ষীয় আকর্ষণ পারে এক বিশালাকার ভর বিশিষ্ট বস্তু সরবরাহ করতে পারে। এই প্রবল ভর-বিশিষ্ট কেন্দ্রকে অবশ্যই ঘন সংবদ্ধ হতে হবে এবং একটি অতিকায় কৃষ্ণবিবর ছাড়া এই ছোট কিন্তু প্রবল মহাকর্ষীয় উৎসের আর কোনো বিকল্প নেই। কারণ ছায়াপথসমূহের কেন্দ্রে যে কৃষ্ণবিবর অবশ্যম্ভাবী সে সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত নেই। আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রেও একটি অতি ভারি কৃষ্ণবিবর আছে বলে ধারণা করা হয় (অনুচ্ছেদ ৫.৩ দ্রষ্টব্য)।

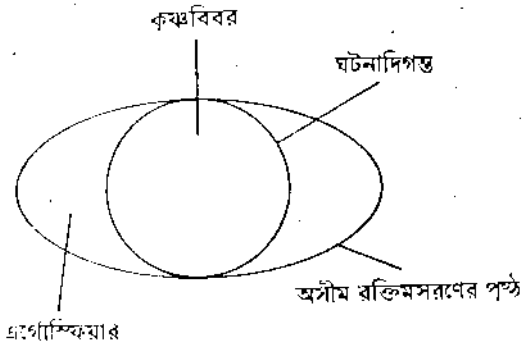

চিত্র ৬.১৫ : ঘূর্ণমান কৃষ্ণবিবর

২. ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে এবং জোড়া তারা ব্যবস্থায় (binary star systems) দেখা যায় যে এক কোনো এক অজানা প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে বিকিরণ উৎপন্ন করে। এই প্রচুর শক্তি উৎপাদনের একটি দক্ষ ইঞ্জিন প্রয়োজন হবেই হবে। তাত্ত্বিকভাবে সম্ভাব্য দক্ষতম ইঞ্জিন হলো কৃষ্ণবিবর।

কিন্তু এসব এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে কৃষ্ণবিবর সত্যমিথ্যা হয়েছে। যা নিশ্চিতভাবে বলা যায় তা হলো এই যে, ঐ সব সিস্টেমে কোনো না কোনো ঘন বস্তু অস্তিত্ব আছে। নিউট্রন তারাও একটি ঘন সংবদ্ধ বস্তু (compact

object) যা কৃষ্ণবিবরের সদৃশ প্রক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে। নিউট্রন তারা অবশ্য কখনোই কৃষ্ণবিবরতুল্য প্রবল মহাকর্ষীয় প্রভাব রাখতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ নিউট্রন তারা ও কৃষ্ণবিবরের ঘনত্বের তুলনা করা যেতে পারে। যেমন একটি এক সূর্যভর বিশিষ্ট নিউট্রন তারার ব্যাসার্ধ হতে পারে ১০ কিলোমিটার ; যেখানে একটি দশ সূর্যভরের কৃষ্ণবিবরের ঘটনা-দিগন্তের ব্যাসার্ধ হবে ৩০ কিলোমিটার। তাছাড়া কোনো ঘন সংবদ্ধ বস্তুতে পতনশীল পদার্থের (infalling matter) তাপমাত্রা থেকেও কৃষ্ণবিবর ও নিউট্রন তারার পার্থক্য করা সম্ভব নয় — কারণ দুই ক্ষেত্রেই তাপমাত্রা একই। তবে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য থেকেই যায় — নিউট্রন তারার রয়েছে একটি কঠিন পৃষ্ঠ (hard surface) যার উপর পতনশীল পদার্থ জমা হতে পারে ; কিন্তু কৃষ্ণবিবরের ক্ষেত্রে পতনশীল পদার্থ একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যায়, জমা থাকার প্রশ্নই আসে না। এই কারণে বিকিরণে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য থেকে যায়। তাই আজকাল বলা যায় যে, নিউট্রন তারা ও কৃষ্ণবিবরের পার্থক্য সম্ভব এবং ফলত কৃষ্ণবিবরের অস্তিত্ব প্রমাণও সম্ভব।

কৃষ্ণবিবরের প্রবল মহাকর্ষীয় বিভবশক্তিই তার ইঞ্জিনের দক্ষতার উৎস। চতুষ্পার্শ্বের পদার্থকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে কৃষ্ণবিবরের ঘটনাদিগন্তের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করা হয়। পথিমধ্যে এই পদার্থসমূহ অপরাপর পদার্থের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এভাবে কৃষ্ণবিবরের ঘটনাদিগন্তের চতুষ্পার্শ্ব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যেহেতু এই সংঘর্ষ প্রায় আলোর দ্রুতিতে বেগমান পদার্থের মধ্যে ঘটে থাকে, তাই তাপে রূপান্তরিত গতিশক্তি পদার্থের অন্তর্নিহিত ভর শক্তির ($E=mc^2$) সমতুল্য হয়ে থাকে। যদি কোনো একটি পদার্থকণাকে ঘটনা দিগন্ত থেকে বাইরে এর যাত্রা শুরুর আদি বিন্দুতে নিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যাবে এর ভরের উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটেছে এবং এই হ্রাসকৃত অংশ বিশুদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই অর্থে কৃষ্ণবিবর পদার্থের নিশ্চল ভরকে তাপীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই রূপান্তরের দক্ষতা নির্ভর করে কৃষ্ণবিবরের ঘূর্ণনের উপর। সর্বোচ্চ সম্ভব হারে (maximum possible rate) ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণবিবর পতনশীল পদার্থের ৪২% অংশকে বিশুদ্ধ শক্তিতে রূপান্তর করে। কিন্তু একটি অঘূর্ণায়মান কৃষ্ণবিবরে এই দক্ষতা মাত্র ৬%। তুলনা করলে, সাধারণ নক্ষত্রের অভ্যন্তরে তাপকেন্দ্রীন ফিউশন প্রক্রিয়ার দক্ষতা মাত্র ০.৭% এবং ইউরেনিয়ামের সাধারণ বিশ্লেষণের দক্ষতা ০.১%।

---

১১ কৃষ্ণবিবরের অভিদিকে [illegible] একটি [illegible] কৃষ্ণবিবরের [illegible] থাকে না। তাহলে নগ্ন বৈচিত্র্যের কথা (naked singularity) [illegible] কসমিক সেন্সরশিপ [illegible] conjecture of cosmic censorship [illegible] imploding object) [illegible] নগ্ন বৈচিত্র্যের কথা [illegible] বৈচিত্র্যের কথা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ঠিক কখনো একটি প্রোটন তার ভরের অধিকাংশই হারিয়ে ফেলে এবং [illegible] তাপমাত্রা দাঁড়ায় 10^{12} কেলভিনে। এই অত্যুচ্চ তাপমাত্রায় পদার্থ থেকে গামা বিকিরণ পাওয়ার কথা। কিন্তু আদতে তা ঘটে না। কারণ প্রোটন (এবং সাধারণভাবে আয়ন) [illegible] হয় বটে, কিন্তু ভালো বিকিরক নয়। তাই তারা তাদের শক্তি ইলেকট্রনকে দিয়ে দেয় এবং ইলেকট্রন চমৎকার বিকিরক। ইলেকট্রনসমূহ কম তাপমাত্রায় ফোটন নিঃসরণ করে এবং এভাবে [illegible] প্রবল এক্স-রশ্মির বিকিরণ পেয়ে থাকেন। ১৯৬২ সালে প্রথম [illegible] এক্স-রে বাইনারি সিস্টেম আবিষ্কৃত হয়। এধরনের বাইনারি বা জোড়াতারা সিস্টেমে সাধারণভাবে একটি দৃশ্যমান নক্ষত্র একটি অদৃশ্য সঙ্গীর চারদিকে ঘুরতে থাকে। এধরনের সিস্টেম থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অথবা ক্ষণস্থায়ীভাবে এক্স-রে বিকিরণ পাওয়া যায়। শেষোক্ত ধরনটিকে বলে x ray transients। এই বিশেষ ধরনটি হঠাৎ অল্প সময়ব্যাপী বিপুল এক্স-রে বিকিরণ করে এবং অন্য সময়ে (নিঃসাড় অবস্থায়, quiescent state) প্রায় কোনো বিকিরণই করে না। সর্বোচ্চ বিকিরণের দশায় এক্স-রে ট্রানজিয়েন্ট 10^{39} থেকে 10^{31} ওয়াট (সূর্যের মোট বিকরণের ১,০০,০০০ গুণ) শক্তি এক্স-রে আকারে বিকিরণ করে। এই বিকিরণ একটি কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের (blackbody radiation) অনুরূপ যার তাপমাত্রা 10^7 কেলভিন। এই পারসেরের তাপমাত্রা একটি কৃষ্ণবিবর থেকে প্রাপ্তব্য বলে মনে হয়। পর্যবেক্ষণ ফলে বিকিরণ করতে হলে ঐ কৃষ্ণবিবরটিকে বছরে 10^{-9} থেকে 10^{-8} সৌরভর পরিমাণ পদার্থ গ্রহণ করতে হবে। মজার ব্যাপার এই যে, দৃশ্যমান নক্ষত্র থেকে ঠিক এই পরিমাণ পদার্থই হারিয়ে যেতে দেখা যায়। এইসব যুক্তি ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্য তাই এক্স-রে জোড়াতারাকে কৃষ্ণবিবরের অস্তিত্বের এক জোরালো প্রমাণ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

কিন্তু সমস্যা হলো এই যে, একটি নিউট্রন তারাও অনুরূপ ক্রিয়া ঘটাতে পারে। যদিও কৃষ্ণবিবরের অনুরূপ ব্যাপক প্রভাব একটি নিউট্রন তারা কখনোই দেখাতে পারে না। নিউট্রন তারার শক্তি রূপান্তরের দক্ষতা ১০% জোড়াতারায় নিউট্রন তারার উপস্থিতি প্রায়শই এর বিকিরিত পালস থেকে পাওয়া যায় (সেক্ষেত্রে তারাটি একটি পালসার — ঘূর্ণ্যমান, চুম্বকায়িত নিউট্রন তারা)। কিন্তু মহাজাগতিক কৃষ্ণবিবরের (astronomical blackholes) কোনো চুম্বক ক্ষেত্র থাকে না। তাই এক্স-রে পালসার কখনোই কৃষ্ণবিবর হতে পারে না। এমনকি অনিয়মিত এক্স-রে বিদারণও (burst) নিউট্রন তারা ঘটাতে পারে। কারণ এর কঠিন পৃষ্ঠে পদার্থের জমা থাকে যা পরবর্তীতে বিদারণ ঘটায়। তাই পালসের অনুপস্থিতিও কৃষ্ণবিবরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। কেবলমাত্র দুটি বিষয় কৃষ্ণবিবরকে স্বাতন্ত্র্য দেয় — কৃষ্ণবিবরের কোনো কঠিন পৃষ্ঠ নেই এবং এর থাকতে পারে অনির্দিষ্ট পরিমাণের ভর (unlimited mass)। হিসেব করে দেখা গেছে নিউট্রন তারার তাত্ত্বিক ভর কখনোই ৩ সূর্যভরের বেশি হয় না। অন্যদিকে কৃষ্ণবিবরের ভরের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই। কাজেই জোড়াতারা ব্যবস্থায় যদি সন্দেহভাজন তারাটির ভর যদি ৩ সূর্যভরের বেশি হয় তবে সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে ঐ তারাটি কৃষ্ণবিবর, নচেৎ তারাটি একটি নিউট্রন তারা হবে। প্রথম আবিষ্কারের পর থেকে আজ পর্যন্ত (১৯৯৯) কয়েক শত এক্স-রে ট্রানজিয়েন্ট আবিষ্কৃত হয়েছে যার মধ্য

থেকে সাতটিকে কৃষ্ণবিবর প্রার্থী হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কৃষ্ণবিবরপ্রার্থীর ভর সূর্যের ৪ থেকে ১২ গুণ। এখন এই সাতটি প্রার্থী নিশ্চিতভাবে কৃষ্ণবিবর হবে যদি এরা আরেকটি কৃষ্ণবিবর-প্রতিভাস দেখাতে সক্ষম হয়। যেহেতু কৃষ্ণবিবরের কোনো কঠিন পৃষ্ঠ নেই, তাই পতিত পদার্থ যখনই ঘটনা দিগন্তের ভেতরে প্রবেশ করে তখন থেকেই তা হারিয়ে যায় (কারণ ঘটনা দিগন্তের ভেতর থেকে কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না)। এখন যদি কোনো উষ্ণ প্লাজমা ঘটনা দিগন্তের ভেতর প্রবেশ করে তবে তার সাথে সাথে তার তাপশক্তিও অন্তর্হিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে advection। এই তাপশক্তি আবার কৃষ্ণবিবরের ভর বাড়িয়ে দেয় - এভাবে ভরশক্তি সংরক্ষিত থাকে। অপরপক্ষে, উষ্ণ প্লাজমা যখন নিউট্রন তারার কঠিন পৃষ্ঠে পতিত হয় তখন এটি ঐ পৃষ্ঠে জমা থাকে (accumulated) এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বিকিরিত হয়ে যায়। কৃষ্ণবিবর ও নিউট্রন তারার পার্থক্যকারী এই প্রক্রিয়াটির নাম advection-dominated accretion flows, সংক্ষেপে ADAFs। কাজেই যেসব এক্স ও গামা রশ্মি ব্যবস্থার দক্ষতা ১% বা তার বেশি কিন্তু উজ্জ্বলতা যা হওয়ার কথা তার চাইতে কম সেসবের দিকে জ্যোতির্বিদরা মনোযোগ দিলেন।

যেকোনো নক্ষত্র অথবা ঘন সংবদ্ধ বস্তুর চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থ সরাসরি নক্ষত্রে পতিত হয় না। কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার কারণে এই পদার্থসমূহ ঘুরে ঘুরে পেঁচানো পথে (spiral into) নক্ষত্রে পতিত হয়। এ কারণে নক্ষত্রের চারপাশে পতনশীল পদার্থের বৃত্তাকার, চ্যাপ্টা ডিস্ক বা চাকতি তৈরি হয়। একে বলে accretion disk বা বিবৃদ্ধির চাকতি। এই ডিস্কে ঘর্ষণের ফলে ঘূর্ণায়মান গ্যাস ও পদার্থ কৌণিক ভরবেগ হারাতে থাকে এবং শীতল হতে থাকে, এটি ক্রমান্বয়ে নক্ষত্রের নিকটবর্তী হতে থাকে এবং একসময়ে নক্ষত্রে পতিত হয়। ঘর্ষণের ফলে ডিস্কের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি ঘূর্ণায়মান পদার্থ ও গ্যাস দক্ষতার সাথে শীতল হতে না পারে তবে এটি ডিস্কের পরিবর্তে বর্তুলাকার আকার (spherical shape) ধারণ করবে। ADAF এর ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটিই ঘটে। বিশেষ ধরনের জোড়াতারা ব্যবস্থায় (নিঃসাড় এক্স-রে ট্রানজিয়েন্ট বা quiescent x-ray transient-এর ক্ষেত্রে) দেখা গেছে বিবৃদ্ধি প্রবাহের দুটি উপাংশ থাকে (two component accretion flow)। ভেতরের অংশটি হয় ADAF, কিন্তু বাইরের অংশে থাকে চ্যাপ্টা বিবৃদ্ধির ডিস্ক। এইসব ব্যবস্থা দীর্ঘসময় ধরে সুপ্ত থাকে এবং হঠাৎ অল্প সময়ের জন্য এরা বিদারণ ঘটায়। ১৯৯৬ সালের ২০শে এপ্রিল এম.আই.টি, ইয়েল ইউনিভার্সিটি ও পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির কয়েকজন জ্যোতির্বিদ সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এরকম একটি এক্স-রে ট্রানজিয়েন্ট GRO J1655 40 দেখতে পেলেন যা হঠাৎ করেই একটি বিদারণ ঘটিয়েছে[১২]। আবিষ্কারের প্রথম পঁচদিন সিস্টেমটি দশমান আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিন্তু কোনো এক্স-রশ্মির বিকিরণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু ষষ্ঠদিনে এটি এক্স রশ্মি বিকিরণ করতে শুরু করে (চিত্র ৬.২৬)। ADAF সংক্রান্ত পূর্বোক্ত তত্ত্বেও ঠিক এরকম বিলম্ব হওয়ার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বিদারণ ঘটলে কৃষ্ণবিবর থেকে দূরবর্তী চ্যাপ্টা ডিস্ক থেকে

১২. এই বিশেষ এক্স-রে ট্রানজিয়েন্ট GRO J1655-40 আবিষ্কৃত হয় ১৯৯৪ সালে

[illegible] ঊর্ধ্বমুখে পদার্থ ও গ্যাস বাষ্পীয় প্রক্রিয়ায় তেজস্ক্রিয়ের [illegible] ADAF [illegible] হলেই এক্স-রে বিকিরণ শুরু হয়। [illegible] ইমেজিং [illegible] ইমেজদের দৃষ্টিরেখার সাথে [illegible] এই সিস্টেমটির মধ্য অবস্থিত বস্তুটির ভর পরিমাপ করা [illegible] বিকিরণের পর কয়েকমাস ধরে জেড্রা তারা বলয়টির [illegible] এই ডেটা দিয়ে পদার্থ নিঃসরণের হার জন্য [illegible] পর জেড্রা তারা বলয়টি অবার সৃষ্টির সময় [illegible] প্রবল বজ্রশক্তি পদার্থ ও গ্যাস সরাসরি কৃষ্ণবিবরটিতে [illegible] বিকিরণ পাচ্ছি না এবং পতিত গ্যাস ও পদার্থের [illegible] সাথে তাদের সাথে বলা যায়, এতে দিন পর কৃষ্ণবিবরের [illegible] পেয়েছেন। কৃষ্ণবিবরের অস্তিত্ব [illegible]

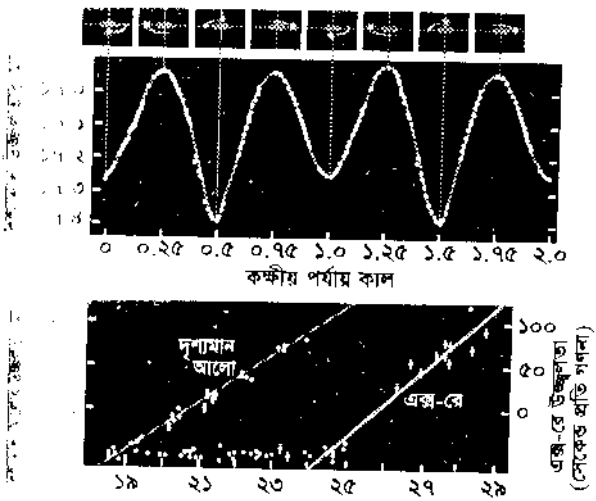

[illegible] (1999)।

কৃষ্ণবিবরে যদি কোনো বস্তু প্রবেশ করে তবে কি ঘটবে? আমরা দূর থেকে দেখব যে বস্তুটি কৃষ্ণবিবরের ঘটনা দিগন্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা এও দেখব যে বস্তুটি, ঘটনা দিগন্তে প্রবেশ করতে অসীম সময় নিচ্ছে। কারণ যে মুহূর্তে বস্তুটি ঘটনা দিগন্ত স্পর্শ করে সে মুহূর্তে এটি আর কোনো আলো বা সংকেত প্রেরণ করতে পারে না। ধরা যাক একটি বিস্ফোরণোন্মুখ নক্ষত্রে একজন মহাকাশচারীকে পাঠানো হলো। তিনি ১ সেকেন্ড পর পর সংকেত পাঠান। ধরা যাক তারটি ঠিক ১২:০০ টায় একটি কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে। এখন আমরা দূর থেকে তার সংকেত পেতে থাকবো ১১:৫৯:৫৯ পর্যন্ত। আমাদের কাছে দুই সংকেতের মধ্যের সময় ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে বলে মনে হবে, আর ১২:০০টার আগে তা খুবই ছোট। ১১:৫৯:৫৮ ও ১১:৫৯:৫৯ এর মধ্যের বিরতি হবে ১ সেকেন্ডের কিছু বেশি। কিন্তু ঠিক ১২:০০টার সংকেত আমরা কোনোদিনই পাবো না। এর জন্য আমাদের অসীম কাল দরকার হবে। হতভাগ্য মহাকাশচারীর 'বারোটা' বেজে যাবে। কিন্তু সত্যিই কি তার বারোটা বাজবে? সাধারণ আপেক্ষিকতার কিছু সমীকরণ সমাধান করলে দেখা যায় যে মহাকাশচারী নগ্ন বক্রিকরণ বিন্দুকে সরাসরি অতিক্রম না করে একে দেখতে পারেন এবং হয়ত তিনি কোনো ক্ষুদ্রবিবর (wormhole) দিয়ে অন্য বিশ্বে চলে যেতে পারেন। যাহোক এ ধরনের সমীকরণের সমাধান অত্যন্ত অস্থায়ী। এমনকি মহাকাশচারীর উপস্থিতি পুরো ব্যাপারটিকে ওলট পালট দিতে পারে। তাই কৃষ্ণবিবর সব সময় একমুখী রাস্তা : এর ভেতর যাওয়া যায় কিন্তু অনন্ত সময়েও বেরুনো যায় না। এর সাথে মহাকবি দান্তের নরকের বর্ণনার মিল আছে : "All hope abondon, ye who enter here" প্রিন্সটনের জ্যাকব বেকেনস্টাইন বলেছিলেন, কৃষ্ণবিবরের পুরো ঘটনা দিগন্তই তার এনট্রপি। এনট্রপি হচ্ছে বিশৃঙ্খলার গাণিতিক পরিমাপ। এখন যদি কোনো বস্তুর এনট্রপি থাকে তবে তার তাপমাত্রা থাকে; তাপমাত্রা থাকলে থাকবে বিকিরণ, বিকিরণ থাকলে বলা যায় না যে কৃষ্ণবিবর থেকে কিছু বেরোয় না। ১৯৭৩ সালে রুশ বিজ্ঞানী ইয়াকভ জেলদোভিচ এবং আলেক্সান্দার স্টারোবিনস্কি অনিশ্চয়তা নীতির প্রয়োগ করে দেখান যে কৃষ্ণবিবর সত্যিই বিকিরণ দেয়। তবে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য দিয়েছেন স্টিফেন হকিং। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের অনিশ্চয়তার নীতি বলছে যে, কোনো কণার অবস্থান ও ভরবেগ দুটোই যুগপৎ মাপা যায় না। এও বলা যায় যে, কোনো ক্ষেত্রের মান কখনো শূন্য হতে পারে না; কারণ তাহলে উপরিউক্ত দুটি মানই শূন্য হবে। কাজেই মহাশূন্য সত্যিকার অর্থে শূন্য হয়। আসলে মহাশূন্যে থাকে ন্যূনতম পরিমাণে অনিশ্চয়তা। এই কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা হচ্ছে নিয়ত অবাস্তব (virtual) কণার উপস্থিতি ও অন্তর্ধান। যেমন ফোটন (বা graviton) জোড়া। প্রতিটি জোড়ায় দুটি কণার জন্ম হয় এবং অতিক্ষুদ্র সময় পর এরা পুনরায় মিলিত হয়ে পরস্পরকে বিনাশ করে দেয় যাতে $\Delta E.\Delta t \geq h/2\pi$ হয়। এই অবাস্তব কণাদের কখনো উদঘাটন করা সম্ভব নয়। আমরা শুধু অন্য কণার উপর এদের প্রভাব পরিমাপ করতে পারি। জোড়ার একটি প্রতিকণা এবং অন্যটি ঋণকণা। বলা হচ্ছে, বিশ্বের মোট শক্তি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু কোয়ান্টাম স্তরে আমরা অতিক্ষুদ্র সময়ের জন্য বেশ কিছু পরিমাণ শক্তি 'ধার' নিতে পারি। কৃষ্ণবিবরের নিকটবর্তী অঞ্চলে এ ধরনের কণা প্রচুর সংখ্যায় থাকে। এখন কোনো ভারি বস্তুর কাছে যদি কোনো কণা থাকে তবে তার শক্তি কম থাকে। কিন্তু দূরে থাকলে শক্তি বেশি থাকে, কারণ তখন মহাকর্ষীয় আকর্ষণের বিপরীতে বস্তুটিকে দূরে নিতে হয়। যাহোক, কৃষ্ণবিবরের ভেতর মহাকর্ষ এতো

[illegible] শক্তি ঋণাত্মক হতে পারে। ফলে অবাস্তব কণাজোড়ার [illegible] সেটি চট করে ঘটনা-দিগন্তের ভেতর ঢুকে পড়ে। জোড়ার [illegible] ভেতর ঢুকে পড়তে পারে অথবা ধনাত্মক শক্তি থাকায় কণাটি [illegible] হয়ে ছিটকে দূরে চলে যায়। কৃষ্ণবিবরের অসীম ক্ষমতায় [illegible] বাস্তব হয়ে যায়। এভাবে দূর থেকে মনে হবে যে বিকিরণ

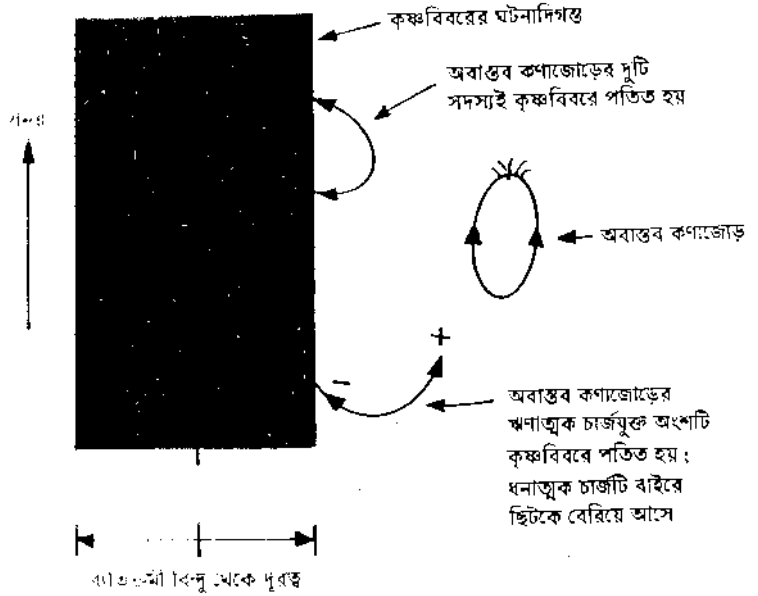

চিত্র ৬.২৭ : হকিং বিকিরণ

[illegible] হচ্ছে, আসলে আসছে ঠিক বাইরে থেকে (চিত্র ৬.২৭)। এখন [illegible] বিবরে ঢুকছে সেহেতু এর মোট শক্তি কমছে। শক্তি কমলে ভর [illegible] দিগন্তও ছোট হতে থাকে। ফলে এনট্রপিও কমে। কিন্তু আমরা [illegible] সবসময় বাড়ে। কাপ ভাঙলে টুকরোগুলো জোড়া লাগে [illegible] এনট্রপি তা পুষিয়ে দেয়। ফলে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র [illegible] কোনো তারার অবশেষ কৃষ্ণবিবরের ক্ষেত্রে যদি আমরা হকিং [illegible] তা হবে অত্যন্ত কম। কারণ এর তাপমাত্রা পরম শূন্যের উপরে [illegible] ভরের ও কম। তবে ভর যতোকমে তাপমাত্রা ততো বাড়ে এবং [illegible] আরো ভর কমে। এর ফলে একসময় ভর অনেক কমে যায়। তখন [illegible] বিকিরণ দিয়ে মিলিয়ে যাবে। তবে এটা সুনিশ্চিত নয়। এক কথায,

[illegible] বিকিরণ দিয়ে মিলিয়ে যাবে। তবে এটা সুনিশ্চিত নয়। এক কথায,

কৃষ্ণবিবরের ভর যতো বেশি হবে ঘটনা-দিগন্ত ততো বড় হবে, এনট্রপি বেশি হবে, ফলে পৃষ্ঠতাপমাত্রা ও বিকিরণ কম হবে। তবে আরেক ধরনের কৃষ্ণবিবর হলো আদি (primordial) কৃষ্ণবিবর। এগুলো কোনো তারা থেকে জন্ম নেয়নি, আদি বিশ্বের ঘটনাবলির ফলে এদের জন্ম। এরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে ব্যাপকহারে বিকিরণ দেবে। এদের ক্ষেত্রটি এখানে আলোচিত হবার সুযোগ কম। কৃষ্ণবিবর সম্পর্কিত তত্ত্ব এতো সুন্দর যে তত্ত্বের সৌন্দর্যই এদের অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। কৃষ্ণবিবর এনট্রপির হকিং-বেকেনস্টাইন আইন হলো :

$$S_{bh} = \frac{A}{4} \times \left(\frac{kc^3}{G\hbar}\right) \qquad (৬.১৩.৪)$$

এখানে A = কৃষ্ণবিবর দিগন্তের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল, k = বোলৎসমান ধ্রুবক ($১০^{-২৩}$ জুল/ডিগ্রি কেলভিন), G = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, c = আলোর বেগ, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$। বন্ধনীর অংশটুকু, দেখাই যাচ্ছে, ধ্রুব থাকে। কাজেই এনট্রপি নির্ভর করবে A এর উপর। একটি শ্বাতসম (গোলাকৃতির) কৃষ্ণবিবরের জন্য দেখানো যায় : $A = m^2 \times 8\pi \left(\frac{G^2}{c^4}\right)$। এনট্রপি আইনে এই মান বসালে : $S_{bh} = m^2 \times 2\pi \left(\frac{kG}{\hbar c}\right)$ (৬.১৩.৫)

কাজেই একক ভরে এনট্রপি $\frac{S_{bh}}{m}$ নির্ভর করে কৃষ্ণবিবরের ভরের উপর। কৃষ্ণবিবর যতো বড় হবে এর এনট্রপি ততো বেশি হবে। কাজেই নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তু (বা শক্তি)কে যদি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণবিবরে রূপান্তরিত করা যায় তবেই সর্বাধিক এনট্রপি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু হকিং দেখিয়েছেন, তাপগতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কৃষ্ণবিবরে পরিণত করলেই সর্বাধিক এনট্রপি মিলবে না ; এটা তখনই পাওয়া যাবে যখন কৃষ্ণবিবর তাপীয় বিকিরণের সাথে সাম্যাবস্থায় থাকে। প্রমাণ সাইজের কোনো কৃষ্ণবিবরের জন্য এই বিকিরণ খুবই ক্ষীণ (সৌরভরের কোনো কৃষ্ণবিবরের জন্য 10^{-70} K)। হকিং বিকিরণের তাপমাত্রা তখনই তাৎপর্যপূর্ণ যখন (বিশ্বসৃষ্টির সময়ে তৈরি) ক্ষুদ্র কৃষ্ণবিবর বিবেচনায় আনা হয়, অথচ যদি বিশ্ব হকিং বাষ্পীভবন সময়ের (hawking evaporation time—যে সময়ের পর কৃষ্ণবিবর সমস্ত তাপ বিকিরণ করে উবে যাবে) পরে ধ্বংস হয়। হকিং বাষ্পীভবন সময় খুবই বিশাল। সৌরভর কৃষ্ণবিবরের জন্য তা বিশ্বের বর্তমান বয়সের $১০^{৬৪}$ গুণ। আরো বড় কৃষ্ণবিবরের জন্য এই মান আরো বড় হয়। বিশ্বে ক্ষুদ্র কৃষ্ণবিবরের সংখ্যা কম। কারণ এদের প্রভাব যা হবার তা পর্যবেক্ষণ করা যায়নি। এভাবে দেখানো যায়, কৃষ্ণবিবর এনট্রপির বিষয়টি বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষ্ণবিবর বিকিরণের উপর বিস্তারিত সহজ আলোচনার জন্য দেখুন Hawking (1977 & 1988), Penrose (1987), Thorne (1994) ও Ferguson (1991 & 1996)।

একটি নক্ষত্র যখনই কৃষ্ণবিবরে রূপান্তরিত হয় তখন থেকে ঐ নক্ষত্র সম্পর্কে আমরা আর কোনো তথ্য পাইনা। কারণ কৃষ্ণবিবর থেকে কিছু বেরিয়ে আসতে পারে না। যে হকিং

বিকিরণের কথা পরে বলা হয়েছে সেটিও প্রকৃতপক্ষে নির্গত হয় কৃষ্ণবিবরের ঘটনা-দিগন্তের ঠিক বাইরে থেকে কাজেই এই বিকিরণ বিবরের ভেতরকার কোনো তথ্য দেয় না। কাজেই প্রশ্ন হলো কৃষ্ণবিবরে পতিত সকল তথ্যই কি পুরোপুরি হারিয়ে যায়? একে বলে information paradox বা তথ্যের হেঁয়ালী। হারিয়ে যাওয়া তথ্য অবশ্য কৃষ্ণবিবরের অভ্যন্তরে থেকে যায় কিন্তু সেটা জানার কোনো উপায় আমাদের জানা নেই। কিন্তু যেহেতু হকিং বিকিরণের মাধ্যমে একসময়ে কৃষ্ণবিবর সম্পূর্ণ উবে যাবে তখন তার সাথে সাথে ঐ তথ্যও উবে যাবে বলে মনে হয়। স্টিফেন হকিঙের মতে এই তথ্য একেবারেই হারিয়ে যায়। একে ফিরে পাবার আর কোনো উপায়ই নেই। কিন্তু অনেকের মতে তথ্য কখনোই সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় না। একে কোনো না কোনো উপায়ে ফিরে পাওয়া যাবেই। এই বিতর্কের অবশ্য কোনো সমাপ্তি হয়নি। একটি গরম বস্তুর তাপ বিকিরণের ক্ষেত্রে যদি তথ্য হেঁয়ালী না থাকে তবে কৃষ্ণবিবরের ক্ষেত্রে তা কেন প্রযোজ্য হবে সেটাও একটা প্রশ্ন বটে। তাই হকিং কৃষ্ণবিবরের কারণে তথ্যের হারিয়ে যাওয়াকে একটি অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা বলে অভিহিত করেছেন। (অর্থাৎ হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি ছাড়াও আরো একটি অনিশ্চয়তার নীতি)। কিন্তু পেনরোজ এটাকে একটি 'সম্পূরক অনিশ্চয়তা' বলতে চান। তাঁর মতে ভৌত জগতের বর্ণনায় আমাদের একটি নতুন তর পদ্ধতির প্রয়োজন যা মহাকর্ষকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথে একীভূত করে দেবে।

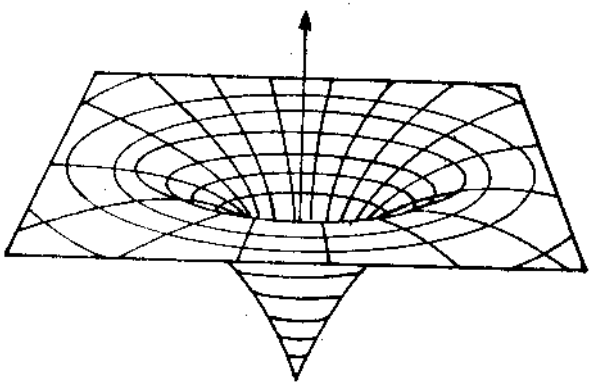

চিত্র ৬.২৮ : কৃষ্ণবিবরের নিকট স্থানকালের জ্যামিতি।

"কৃষ্ণবিবরের অভ্যন্তরে কি আছে?" এ এক দুঃসাহসিক প্রশ্ন সন্দেহ নেই। যেখানে কৃষ্ণবিবর থেকে কোনো কিছুই এমনকি আলো পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না সেখানে এর অভ্যন্তরে কি আছে তা জানতে চাওয়াটা দুঃসাহস বৈকি! এ প্রশ্নের উত্তরদানের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু করেন রবার্ট ওপেনহাইমার ও হার্টল্যান্ড স্নাইডার ১৯৩৯ সালে যখন তাঁরা একটি সম্পূর্ণ গোলাকার (spherical) নক্ষত্রের অন্তস্ফোটন (implosion) নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁদের

সমীকরণগুচ্ছ থেকে দেখা গেল যে এই অবস্থায় অন্তর্স্ফোটনশীল নক্ষত্রটি তার চতুর্দিকে একটি কৃষ্ণবিবর দিগন্তের (blackhole horizon) সৃষ্টি করে, এবং নক্ষত্রটি অসীম ঘনত্ব ও শূন্য আয়তনের একটি সিংগুলারিটি বা ব্যতিক্রমী বিন্দুতে পরিণত হয়। এই সিংগুলারিটি যে জোয়ার বলের সৃষ্টি করে সেটা পৃথিবী, সূর্য ইত্যাকার অপরাপর মহাজাগতিক বস্তুর অনুরূপ। ফলে কোনো বস্তু যখন সিংগুলারিটির খুব বেশি কাছে চলে যায় তখন তাকে অরীয়দিকে (অর্থাৎ সিংগুলারিটির দিকে এবং এর বিপরীত দিকে) টেনে লম্বা করে দেয় এবং আড়াআড়ি দিকে চ্যাপ্টা করে ফেলে (stretches radially and squeezes transversely)। অনুচ্ছেদ ২.১ এবং চিত্র ২.২ দ্রষ্টব্য। ধরা যাক কোনো মহাশূন্যচারী (চিত্র ২.২ এর অনুরূপ) কোনো ব্যতিক্রমী বিন্দুর দিকে অগ্রসর হলো। সিংগুলারিটি যতো বড় হবে মহাশূন্যচারীর জীবন ততো দীর্ঘস্থায়ী হবে অর্থাৎ জোয়ার বল ততো দেরিতে ক্রিয়া করবে। তাই ধরা যাক কোনো কোয়েসারের অভ্যন্তরস্থ ১০ বিলিয়ন সৌরভরের কোনো কৃষ্ণবিবরস্থ ব্যতিক্রমী বিন্দুর দিকে আমাদের কল্পনার মহাশূন্যচারী অগ্রসর হলেন। মহাশূন্যচারী যখন দিগন্ত পার হয়ে কৃষ্ণবিবরে ঢুকে পড়লেন তখনও তিনি সিংগুলারিটি থেকে ২০ ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থান করছেন এবং তেমন কোনো জোয়ার বল অনুভব করবেন না। তবে বহির্বিশ্বে আলো একটি গুহামুখের মতো পরিসর দিয়ে তার কাছে দৃশ্যমান হবে, বাকি সব অন্ধকার। মহাশূন্যচারী যতো সিংগুলারিটির নিকটবর্তী হতে থাকবে টান ও সংকোচন (stretch & squeeze) ততো শক্তিশালী হবে। সিংগুলারিটিতে পৌঁছার ১ সেকেন্ড আগে তার মনে হবে পায়ে টান পড়ছে এবং মাথা ছিঁড়ে যেতে চাইছে; একই সময়ে দুপাশ সংকুচিত হয়ে আসতে (চিত্র ২.১৬)। এক সেকেন্ডের এক হাজার ভাগের একভাগ সময়ে এই টান ও সংকোচন এতো তীব্র হবে যে তার পেশী ও হাড় আর এই পীড়ন সহ্য করতে পারবে না (মাথার ছবি)। এভাবে সে সিংগুলারিটির যতো কাছে যাবে ততো লম্বা ও চিকন হতে থাকবে। এবং তার পক্ষে কখনোই আর সিংগুলারিটি ভেদ করে ফিরে আসা সম্ভব হবে না। দিগন্ত একবার পার হয়ে গেলে সমস্ত বস্তু, বস্তুর সমস্ত কণা, ইলেকট্রন, প্রোটন এককথায় সবকিছুরই উপরোক্ত পরিণাম অনিবার্য, এমনকি সময়ও সিংগুলারিটিতে পতিত হয় অর্থাৎ সময় এখানে টাইমলাইক নয়, স্পেসলাইক।

ওপেনহাইমার স্নাইডর সমাধানে আমরা দেখেছি যে একটি আদর্শ, গোলাকার নক্ষত্র যখন কৃষ্ণবিবরে পরিণত হয় তখন—১. যা কিছু দিগন্তের ভেতর প্রবেশ করে সব কিছুই সিংগুলারিটিতে পতিত হয়, ২. কোনো কিছুই আমাদের বিশ্বের অন্য অংশে বা অন্য বিশ্বে স্থানান্তর করে না, ৩. সিংগুলারিটির নিকটবর্তী হলে অসীম অরীয় টান ও অনুপ্রস্থ সংকোচন (infinite radial stretch & transverse squeeze) অনুভূত হয়। কিন্তু রুশ বিজ্ঞানী আইজাক খালাতনিকভ ও ইভগেনি লিফশিৎজ (Evgeny Lifshitz) দেখিয়েছেন যে এ ধরনের সমাধান "ক্ষুদ্র বিচলনের দরুন অস্থায়ী" (unstable against small perturbations) হয়ে থাকে। একইভাবে আইনস্টাইনের সমীকরণের ১৯১৬ ১৮ সালে হানস রাইস্নার (Hans Reissner) ও গুনার নর্ডস্ট্রম (Nordström) কর্তৃক সমাধান দেখায় যে যখন কোনো আদর্শ, গোলাকার, আহিত নক্ষত্র কৃষ্ণবিবরে পরিণত হয় তখন একটি বিচ্ছিন্ন 'ক্ষুদ্র

[illegible] বিশ্বকে একই বিশ্বের পৃথক অংশে যুক্ত হতে পারে। কিন্তু এই [illegible] "ক্ষুদ্র বিচলনকে করেছে অস্থায়ী"। আসলে বাস্তব বিশ্বে [illegible] ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শূন্যস্থানের বিদ্যুৎচৌম্বক বিক্ষোভ (electromagnetic vacuum fluctuations) [illegible] করে। ১৯৬৬ সালে রজার পেনরোজ [illegible] এইসব বিক্ষোভকে বহুগুণে ত্বরিত করে [illegible] বিশ্বকে [illegible] করে ধ্বংস করে দেয়।

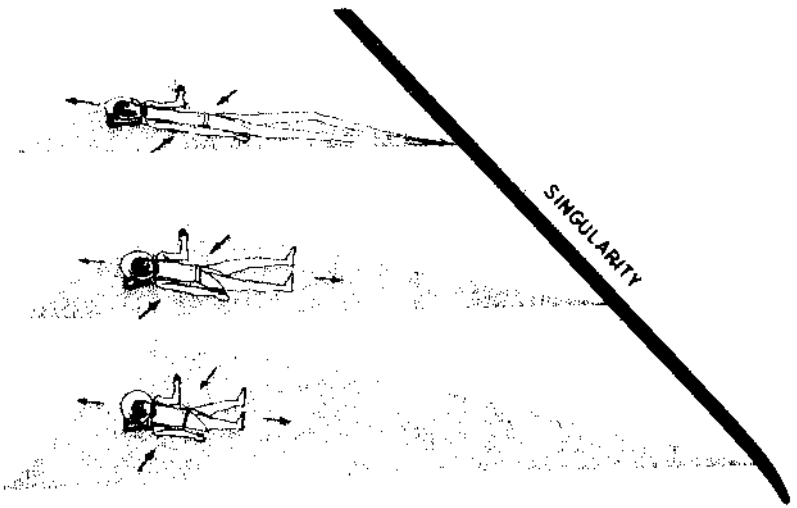

চিত্র ৪.২৯ [illegible] দিক থেকে অগ্রসরমান কোনো মহাশূন্যচারীর উপর [illegible] দুই মাত্রিক।

বেলিনস্কি (Vladimir Belinsky), খালাতনিকভ ও লিফশিৎজ এমন এক নতুন ধরনের সিঙ্গুলারিটি প্রবর্তন করেছেন, দেখা গেছে, যা এ ধরনের সকল ক্ষুদ্র বিচলনের মুখে স্থায়ী হবে। এর নাম BKL singularity। ওপেনহাইমার-স্নাইডার সিঙ্গুলারিটিতে অগ্রসরমান মহাশূন্যচারীকে [illegible] দেয় বরাবর টেনে লম্বা করে দেয় এবং প্রস্থ বরাবর সংকুচিত করে দেয়। এক [illegible] ও সংকোচনের শক্তি মসৃণভাবে বাড়তে থাকে। কিন্তু বি.কে.এল সিঙ্গুলারিটি এই টান ও সংকোচন একবার এই দিকে, তারপর ঐদিকে, এবং এরপর আবার দিকে প্রয়োগ করে। ফলে এই টান ও সংকোচন অসিলেট করতে থাকে বিশৃংখলভাবে — তবে এর মান যতো সিঙ্গুলারিটির কাছে যাওয়া যায় ততো বাড়তে থাকে। চার্লস মিসনার এই পাগলপারা টান ও সংকোচনের নাম দিয়েছেন mixmastar oscillation। তবে মিসনারের অসিলেশনে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্থানের সর্বত্র একই থাকে ; কিন্তু বি.কে.এল সিঙ্গুলারিটিতে এই অসিলেশন সময় এবং স্থান—দুদিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিশৃংখল

(chaotic)। কোনো ক্ষেত্রেই মহাশূন্যচারীর মৃত্যু অবধারিত। তার দেহের অণু পরমাণু পর্যন্ত জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে এবং অতঃপর অসীম টান ও সংকোচনের ফলে নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে। এমনকি স্থানকালেরও আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কৃষ্ণবিবরে ঘটনাদিগন্তের নিকটবর্তী অঞ্চলে দৃশ্যপটের কি ধরনের পরিবর্তন ঘটে (visual distortion) তা অত্যন্ত সহজভাবে Thorne (1994) এর প্রথম অধ্যায়ে লেখা আছে। এটি পড়লে অনেক মৌলিক তত্ত্ব স্বচ্ছ হয়ে যাবে। এছাড়া Nemiroff (1993) দেখা যেতে পারে। এই ওয়েবসাইটে একটি চমৎকার মুভিও আছে।

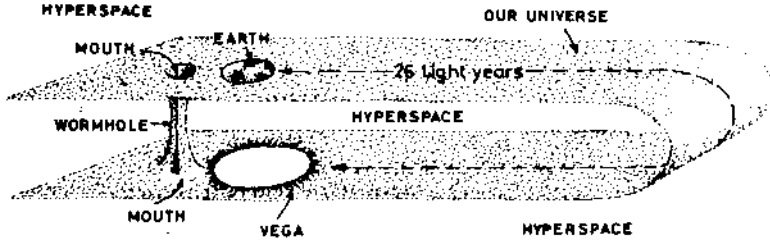

চিত্র ৬.৩৩ : হাইপারস্পেসের ভেতর ১ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ক্ষুদ্রবিবর ২৬ পার্সেকে ১৩ আলোকবর্ষ দূরের অভিজিৎ (Vega) নক্ষত্রের সাথে যুক্ত করেছে।

ক্ষুদ্রবিবর বা wormhole হলো, যেমন আগে বলা হয়েছে, হাইপারস্পেসের মধ্য দিয়ে বিশ্বের দুই অংশকে বা দুই ভিন্ন বিশ্বকে সংযোগকারী সরলরেখা। দেখুন চিত্র ৬.৩৩। ক্ষুদ্রবিবরের দুটি 'মুখ' থাকে যাদেরকে চিত্রে গর্তের মতো দেখানো হয়েছে। তিনমাত্রায় এদেরকে গোলক বলে মনে হবে (কারণ দুই মাত্রায় এরা বৃত্ত)। মনে রাখা দরকার, কৃষ্ণবিবরের দিগন্ত একটি একমুখী দরজা ; কিন্তু ক্ষুদ্রবিবর দুইমুখী। আসা ও যাওয়া দুটোই এ দিয়ে করা যায়। বলে রাখা ভালো, ক্ষুদ্রবিবর এবং এর যে বিচিত্র কার্যপ্রণালী আমরা এতোক্ষণ আলোচনা করলাম তা মোটেও কল্পকাহিনীর বিষয় নয়। রীতিমতো আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণ সমাধান করে এসব সম্ভাবনা যাচাই করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্রবিবরদের মুখের ব্যাস হয় 10^{-35} মিটার। এমনও দেখা গেছে যে কোনো বস্তুকণিকার উপস্থিতিই ক্ষুদ্রবিবরকে অদৃশ্য করে দেয়। কিপ থর্ন দেখিয়েছেন যে ক্ষুদ্রবিবরের মুখ খোলা রাখতে প্রয়োজন এমন সব পদার্থের যাদের রয়েছে ঋণাত্মক গড় শক্তি ঘনত্ব। এদের তাই বলা হয় "exotic material"। এই ঋণাত্মক শক্তি কেবলমাত্র ক্ষুদ্রবিবর দিয়ে গমনকারী আলোকরশ্মির সাপেক্ষে, অন্য প্রসঙ্গকাঠামোয় এই শক্তি ধনাত্মক হতে পারে (যেমন ক্ষুদ্রবিবরের প্রসঙ্গকাঠামো সাপেক্ষে)। হকিং দেখিয়েছেন যে কৃষ্ণবিবরের ঘটনা দিগন্তের ঠিক বাইরে যে শূন্যস্থানের বিক্ষোভ (vacuum fluctuation) সংঘটিত হয় তার শক্তি ঋণাত্মক (ঘটনা দিগন্ত থেকে বাইরের দিকে গমনকারী আলোর সাপেক্ষে)। অনেক বিজ্ঞানীই (যেমন কিপ থর্ন) বলছেন যে এইসব ক্ষুদ্রবিবর দিয়ে আন্তঃনাক্ষত্রিক ভ্রমণ সম্ভব। এমনকি

[illegible] ক্ষুদ্রবিবর ব্যবহার করে। স্বপ্নের টাইম-মেশিনের এক আধুনিক সংস্করণ। বলা হচ্ছে, স্থানকালের কোনো অংশে (যেমন কোনো অতিভারি কৃষ্ণবিবরের ঘটনা দিগন্তের কাছে। স্থানকালের বক্রতা এতো তীব্র হতে পারে যেখানে স্থান বেঁকে ঘুরে নিজের উপরই আবদ্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ স্থানকালে একটা লুপের সৃষ্টি হয়। ফলত উদ্ভব হয় টাইম [illegible] closed timelike path। আমাদের [illegible] অগ্রসর হতে পারে তবে হয়ত ক্ষুদ্রবিবর ব্যবহার করে মহাশূন্যের অকল্পনীয় দূরত্বকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। এই চমৎকার (কিন্তু [illegible] আমরা এখানে আর অধিক আলোচনা করব না। তবে ক্ষুদ্রবিবর [illegible] এর ব্যবহার সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Thorne (1994)। এখানে [illegible] সহজভাবে এসব বিষয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া দ্রষ্টব্য Deutsch & Lockwood (1994) এবং Simon (1994)।

৬.১৪ নক্ষত্র ও আমরা

"কবি, তুমি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে মিশে থাকো
মেশে মাটি, নক্ষত্রেও [illegible] পাথরে, কাঁকরে
[illegible] হয় ঈষৎ আবছা।"

শামসুর রাহমানের এ কবিতায় ("কবি তুমি", *আজকের কাগজ*, ১২ চৈত্র, ১৪০০ সাল) বলা হয়েছে কবি মিশে থাকেন "নক্ষত্রেও"। কথাটি খুব সত্য। অবশ্য শুধু কবিই নন, সমস্ত মানুষই তাদের জীবনের [illegible] নক্ষত্রের কাছে চিরঋণী। কারণ নক্ষত্র না থাকলে সুপারনোভার মতো বিপুল বিস্ফোরক [illegible] না, আর তা না ঘটলে ভারি মৌল—যা আমাদের 'সবুজ জীবনের' [illegible], কখনোই তৈরি হতো না। বলা হয়ে থাকে, 'বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে [illegible] নির্ভর করে মানবমনের উপর, মানবমন ব্যক্তিত্বের প্রতিভূ। বিজ্ঞানের উন্নতির [illegible] আবেগহীনতা, নির্মমতা ছিল না? বরঞ্চ আরো বেশি ছিল। ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়। বিজ্ঞানের উন্নতি নির্ভর করে সভ্যতার উন্নতির উপর। কাজেই বিজ্ঞানের উন্নতি সভ্যতার অগ্রগতিই নির্দেশ করে। যাহোক, আমাদের মূল বিষয় ছিল কিভাবে আমরা নক্ষত্রের কাছে ঋণী তা অনুসন্ধান করা। দেখা যাক কথাটি সত্য কিনা।

ইতোমধ্যে আমরা [illegible] স্তরের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন তারায় কি ধরনের বিবর্তন হয় এবং কি ধরনের পদার্থের সংশ্লেষণ হয়। সুপারনোভা বিস্ফোরণের গ্যাস, গ্রহ নীহারিকা এসবই ঐসব তারা মৌলের অণুকে [illegible] ক্ষত্রিক গ্যাসের মেঘে পাঠিয়ে দেয়। আমাদের সৌরজগৎ [illegible] তা নির্ণয় করা যায় উল্কাপিণ্ড থেকে। ১৯৬৯ সালে মোগ্রকোর এক প্রান্তে একটা বড় উল্কাপিণ্ড পড়ে। এখানে বেশ কিছু আইসোটোপ পাওয়া গেছে। বেশ কিছু আইসোটোপ আছে যারা আবার ভেঙে অন্য আইসোটোপ তৈরি করে। এরকম আরো [illegible] যা থেকে জানা যায়, যে আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস থেকে সূর্যের

জন্ম তাতে কি কি পদার্থের প্রাচুর্য ছিল দেখা গেছে, ভারি মৌল থেকে হাল্কা মৌলের প্রাচুর্য বেশি। হাল্কা মৌলের মধ্যে আবার জোড় সংখ্যার ও চার দ্বারা বিভাজ্য পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের প্রাচুর্য বেশি। লিথিয়াম বা বেরিলিয়ামের তুলনায় কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন-এর প্রাচুর্য বেশি। বহু গবেষকের গবেষণার একটি তালিকা দেওয়া হলো যাতে প্রথমে মৌলগুলোর হদিস পাওয়া যায় :

হাইড্রোজেন=10^{9} (সংখ্যায়)	নিয়ন=৯৩,০০০	সালফার=১৬,২০০
হিলিয়াম=৬.৩×10^{8}	সোডিয়াম=১,৯০০	ক্লোরিন=৪২০
কার্বন=৫,০০,০০০	ম্যাগনেসিয়াম=৪৫,০০০	আর্গন=১,৯০০
নাইট্রোজেন=১,০০,০০০	অ্যালুমিনিয়াম=২,১৪০	পটাসিয়াম=৭৬
অক্সিজেন=৮,০০,০০০	সিলিকন=৩১,০০০	ক্যালসিয়াম=২,৩০০
ফ্লোরিন=৮০	ফসফরাস=৩২০	টাইটানিয়াম=৩০
ক্রোমিয়াম=১৬৬		
ম্যাংগানিজ=৭৫		
লৌহ=২২,০০০		
নিকেল=৫০০		

দেখা যাচ্ছে, হাইড্রোজেন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে উপস্থিত। তাই মনে হয়, অন্য সব ভারি মৌলই হাইড্রোজেন থেকে ধাপে ধাপে সংশ্লেষিত হয়েছে। বলা হচ্ছে, চতুর্মাত্রিক বিশ্ব ও দৃশ্যমান দেশকালের সৃষ্টি হয়েছে ১২ বিলিয়ন বছর আগে এক বিপুল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। এবং সৃষ্টির প্রায় ৭ মিলিয়ন বছরের মধ্যে সংশ্লেষিত প্রথম মৌল হলো ৭৫ শতাংশ হাইড্রোজেন ও বাকি হিলিয়াম। কাজেই এই বিপুল পদার্থের বিচিত্র সমাহার কিছুতেই সেই "সৃষ্টির মহেন্দ্র ক্ষণে" তৈরি হতে পারে না। আর আমাদের পর্যবেক্ষণ বলছে তারকার গর্ভে তৈরি হচ্ছে ভারিতর মৌল। কাজেই মেনে নিতে হচ্ছে যে বিশ্বে নক্ষত্র ব্যতীত জন্ম আর কোনো তন্দুর নেই যেখানে ভারি মৌলের সংশ্লেষ ঘটতে পারে।

M-বর্ণালির তারাদের আবহমণ্ডলে কার্বনের তুলনায় অক্সিজেন প্রচুর, জার্কোনিয়াম দলের চেয়ে টাইটানিয়াম দলের প্রাধান্য বেশি। R বা N বর্ণালির তারাতে কার্বনই প্রাধান্য পায়। বিবর্তনের পথে যেসব তারা বুড়ো হয়ে গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে মৌলের প্রাচুর্যের কিছু ব্যত্যয় দেখা গেলেও প্রধান ধারার বামনতারাদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। S-বর্ণালির তারাতে টেকনিসিয়াম (Tc) দেখা গেছে। কিন্তু সবচেয়ে দীর্ঘ অর্ধজীবন টেকনিসিয়াম ৯৯ এর, যা প্রায় ২ লক্ষ বছর। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই অস্থায়ী মৌলটি কি করে এতো কম সময়ে তারার কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠে উঠে আসে কোনো বিস্ফোরণ ছাড়াই। এসব বিতর্কিত বিষয় নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা চলছে।

নক্ষত্রের শক্তির উৎস আলোচনাকালে দেখা গেছে নক্ষত্রের মূল জ্বালানি হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। হাইড্রোজেন প্রতিনিয়ত পুড়ে হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে এবং নির্গত হচ্ছে বিপুল শক্তি। সেখানে আরো বলা হয়েছে যে, ভারি-মৌল (heavy element) তৈরির যে সমস্ত

বিক্রিয়া সেখানে সংঘটিত হয় তাতে নগণ্য পরিমাণের শক্তি উৎপন্ন হয়। তবে যেসব ভারি মৌল উৎপাদন হবে তাদের পরিমাণ ও প্রকৃতির উপর নক্ষত্রের অন্তিম নিয়তি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। উৎপন্ন ভারি মৌল কেবল কেন্দ্রেই রয়ে যায় এবং তাৎক্ষণিকভাবে সেটা জানা যায় না। কারণ নক্ষত্রের সমস্ত খবর আমরা পাই এর বর্ণালি থেকে এবং তাও আসে বহিঃস্তর থেকে। কাজেই ভারি মৌলের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নক্ষত্রের বিবর্তন থেকে এবং দানব,

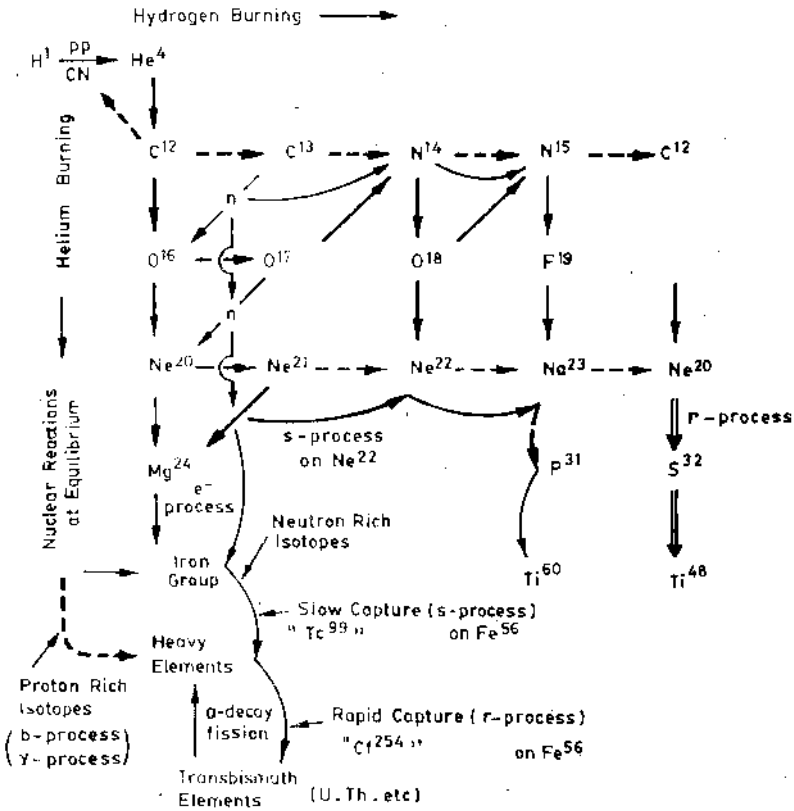

চিত্র ৬.৩১ : নক্ষত্রে মৌলিক পদার্থের সংশ্লেষণ।

অতিদানব বা উপদানব তারাদের বর্ণ ও দীপ্তি থেকে জানা যায় এদের ভেতরের খবর এবং বিবর্তন ধারায় এদের পর্যায়। যখন কোনো তারা প্রধান ধারা ত্যাগ করে তখন তার নির্ণীত নির্ধারিত হয় এর ভর, ঘূর্ণনহার ও রাসায়নিক গঠন থেকে। আরো একটি ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ হলো যে তারাটি কোনো জোড়া তারার সদস্য কিনা।

খুব ভারি মৌলগুলো কিভাবে তৈরি হয়? কোনো একটি তারা যখন বিস্ফোরিত হয় তখন কিছু ভারি মৌল তৈরি হয় এবং আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসে ছড়িয়ে পড়ে। সেই আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসের মহাকর্ষীয় পতনে সৃষ্ট হয় আরেকটি নতুন তারা। সেটি আবার যখন বিস্ফোরিত হয় তখন আরো ভারি মৌল তৈরি হয়ে আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসে ছড়িয়ে পড়ে। এ ভাবে তৈরি হয় এরগন, হফনিয়াম, ডিপ্রেসিয়াম, প্রাসিওডিমিয়াম, ইট্রিয়ামের মতো ভারি মৌল। আমাদের কোষের ডিএনএ তে আছে নাইট্রোজেন, দাঁতে আছে ক্যালসিয়াম, হাড়ে আছে ফসফরাস। এই যে কালি দিয়ে লিখছি তাতে আছে কার্বন। এ সমস্তই তৈরি হয়েছে নাক্ষত্রিক তাপদাহে, কোটি বছরের বিবর্তনে। আমাদের সূর্য সম্ভবত দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের একটি তারা। নচেৎ এ ধরনের ভারি মৌল সমাহার সম্ভব হতো না।

প্রাণের উদ্ভব ও বিবর্তন বহুলাংশে নক্ষত্রের উপর নির্ভরশীল। আগেই বলেছি আমাদের দেহের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে সেসব মৌল যা তৈরি হয়েছে ভারি লাল দানবতারার অভ্যন্তরে। তবে ভূ-পৃষ্ঠিতে প্রাপ্ত বেশ কিছু ভারি মৌলের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে সৌরজগৎ তৈরি হবার কিছু আগে হয়ত কোনো সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এই বিস্ফোরণের অভিঘাত তরঙ্গ (shockwave) আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসকে সংকুচিত করে সৌরজগৎ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। সূর্য সৃষ্টি হবার পর এর থেকে অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীকে আঘাত করে বিদ্যুৎ চমকানির জন্ম দেয়। পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণীজ ক্রিয়া চলছে সূর্যের শক্তির উপর। উদ্ভিদ যা লোক কণা থেকে শক্তি নিয়ে খাদ্য তৈরি করছে, প্রাণী সে খাদ্য গ্রহণ করছে। ফলে খাদ্যচক্রের সৃষ্টি হয়েছে। মিউটেশন, যার মাধ্যমে প্রকৃতি নতুন, বিবর্তিত প্রাণী তৈরি করে, অনেকাংশে নির্ভর করে নভোরশ্মির উপর। নভোরশ্মি উচ্চশক্তির কণা বিকিরণ যা সুপারনোভা বিস্ফোরণে তৈরি হয়।

এ ভাবে আমাদের সমগ্র জীবনের উপাদান তৈরি হয়েছে অতিদূর নক্ষত্রের বর্ণালি বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। এই যে আমরা বাসে চড়ি, বাস তৈরি হয় লোহা দিয়ে। এই যে পাজেরো জিপগাড়ি ভেঙে আজ রাস্তা পার হওয়া যায়, এই যে সুউচ্চ ইমারত — এগুলো তৈরি করতে লেগেছে টনকে টন ভারি পদার্থ। যে কোনো ভারি পদার্থের একমাত্র জন্মস্থল ভারি নক্ষত্রের ও কিংবা তার বিস্ফোরণ। আর এভাবেই আমরা আমাদের সামগ্রিক অস্তিত্বের জন্য এ নক্ষত্রগুলি তারাদের কাছে ঋণী।

বইপত্র

নক্ষত্রের উপর ভালো সাধারণ আলোচনার জন্য *এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা* (Stars and Star Clusters রূপক), এবং *ম্যাকগ্রাহিল এনসাইক্লোপেডিয়া অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি*, বিভিন্ন অনুচ্ছেদ দেখা যেতে পারে। নক্ষত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর সাধারণ আলোচনার জন্য দেখুন Abell (1975), Abhyankar (1992), *Cambridge Atlas of Astronomy* (1994), Pasachoff (1981), Ronan (1980), Sagan (1992), Snow (1983) এবং Zeilik (1990)। নিউট্রন তারা ও কৃষ্ণবিবরের উপর বিস্তারিত, তথ্যবহুল ও গাণিতিক

আলোচনার জন্য Shapiro & Teukolsky 1983) একটি অনবদ্য গ্রন্থ। তবে সহজ আলোচনার জন্য Thorne (1994) একটি অননুকরণীয় বই নিঃসন্দেহে। সবশ্রেণির পাঠকের জন্য এটি একটি আদর্শ বই। এছাড়া Ferguson (1996) ও একটি ভালো সহজ বই। বিশেষ করে কৃষ্ণবিবরের উপর আলোচনার জন্য Hawking (1993), Hawking & Penrose (1996), Hawking (1977) এবং Chandrasekhar (1973) দেখা যেতে পারে। বাংলায় এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন গ্যামো (অনু. ১৯৮৩), হারুন-অর-রশীদ (১৯৮৮ক), বিশেষ করে ইসলাম (১৯৮৫)। পালসারের উপর বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন Lyne & Smith (1998)। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত নিউক্লীয় বিক্রিয়াসমূহের বিশেষ করে r,s-ইত্যাদি পদ্ধতির উপর ভালো সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য ড. সরোজ কান্তি সিংহ হাজারী লিখিত *নিউক্লীয় রসায়ন* (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, ২য় সংস্করণ) গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায় দেখা যেতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্বের অন্তিম নিয়তি

We feel that even when all possible scientific questions have been answered, the problems of life remain completely untouched. Of course there are then no questions left, and this itself is the answer.

Ludwig Wittgenstein

৭.১ প্রারম্ভিক

মহাবিশ্বের অন্তিম নিয়তি নিয়ে এই আলোচনায় আমরা ধরে নেবো যে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এক মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) মধ্য দিয়ে অন্তত ১২ বিলিয়ন বছর আগে। আধুনিক বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের (Cosmology) সাহায্যে আমরা বিশ্বের সৃষ্টির প্রথম $১০^{-৩৬}$ সেকেন্ড পর্যন্ত মোটামুটি নিশ্চয়তার সাথে বিভিন্ন ঘটনাবলির ব্যাখ্যা দিতে পারি। ১৯২২ সালে রুশ বিজ্ঞানী আলেকজান্দার ফ্রিডম্যান আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণের একটি বিশেষ সমাধান (মহাজাগতিক ধ্রুবককে শূন্য ধরে) প্রকাশ করেন। আধুনিক বিশ্বের জন্য এটাই সবচেয়ে সার্থক সমাধান। তাই বিশ্বের যেসব তাত্ত্বিক মডেল এই সমাধান অনুসরণ করে তাদেরকে ফ্রিডম্যান মডেল বলে। এই মডেলের মূল স্বীকার্যটি মেনে নিলে বিশ্বের তিনটি সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে জানা যায়: ১. বিশ্ব যথেষ্ট ধীরভাবে প্রসারমান এবং একসময় প্রসারণ বন্ধ হবে, ফলে সংকোচন শুরু হবে এবং এক পর্যায়ে বিশ্বের সমাপ্তি ঘটবে। স্থানের বক্রতা ধনাত্মক। ২. বিশ্ব এতো দ্রুত প্রসারমান যে মহাকর্ষ কখনোই এই প্রসারণ বন্ধ করতে পারে না। স্থানের বক্রতা ঋণাত্মক। ৩. বিশ্বের প্রসারণ ক্রান্তিক মানের কাছাকাছি অর্থাৎ যাতে পুনরায় সংকুচিত না হয় এরকম। স্থান সমতল বা ফ্ল্যাট বা শূন্য বক্রতার।

৭.২ বিশ্বের নিয়তি ও স্থানের জ্যামিতি

স্থানের বক্রতা একটি জটিল বিষয়। অবধারিতভাবে তাই আমাদের আর চিরায়ত (ইউক্লিডীয়) জ্যামিতির সাহায্য নিলে চলবে না। আর তাই জন্ম নিয়েছে জ্যামিতির এক শক্তিশালী শাখা—অ ইউক্লিডীয় জ্যামিতি। এই নতুন জ্যামিতির যার স্রষ্টারা হলেন বোলাই, লোবাচেভস্কি, রিমান প্রমুখ গণিতবিদ—সুদূরপ্রসারী প্রভাব মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। তাই এ ধরনের জ্যামিতিতে স্থান কিভাবে আচরণ করে তা জানা প্রয়োজন

যে বিশ্ব প্রসারণের পর পুনরায় সংকুচিত হয় সে ধরনের বিশ্বকে **আবদ্ধ বিশ্ব** (closed universe) এবং যে ধরনের বিশ্ব অনন্ত প্রসারমান তাকে **উন্মুক্ত বিশ্ব** (open universe)

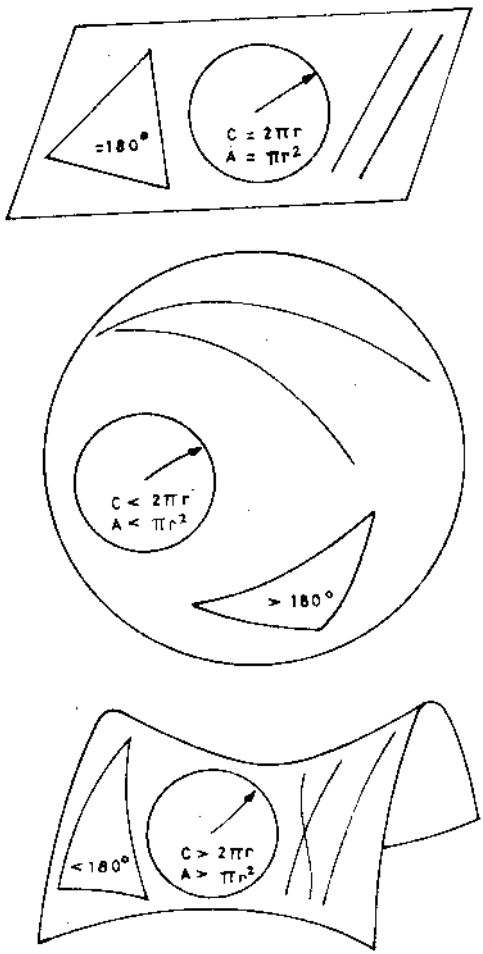

চিত্র ৭.১ : [illegible]

বলে প্রত্যেক বিশ্বের স্থান ধর্ম পৃথক ভাবে বক্র। এর [illegible] এ ধরনের বিশ্বে [illegible] কেন্দ্রের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন যথাক্রমে $4\pi r^2$ এবং $4/3\pi r^3$ এর তুলনায় ছোট। এ ধরনের স্থানকে গোলকের স্থান বলে। পৃথিবীর [illegible] পৃষ্ঠ এ ধরনের স্থানের উদাহরণ হতে পারে। উন্মুক্ত বিশ্বের [illegible] দূরকালের [illegible] ও [illegible] বক্রতা

ঋণাত্মক বক্রতার স্থানে গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও আয়তন উপরিউক্ত মানের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এ ধরনের পৃষ্ঠের ত্রিমাত্রিক উদাহরণ হলো ঘোড়ার পৃষ্ঠের জিন পৃষ্ঠ (saddle surface)। যদিও উদাহরণ হিসেবে এটি কিছুটা ত্রুটিযুক্ত, কারণ এ পৃষ্ঠের একটি কেন্দ্র থাকে অথচ বিশ্বের কোনো নির্দিষ্ট দিকসাপেক্ষতা নেই। আরেক ধরনের উন্মুক্ত বিশ্বের জ্যামিতি সাধারণ ইউক্লিডীয়, কারণ এর বক্রতা শূন্য। এ ধরনের স্থানকে সমতল বা ফ্ল্যাট বলা হয়। শূন্য ও ঋণাত্মক বক্রতার স্থানকে সাধারণভাবে পরাবৃত্তীয় (hyperbolic) স্থান বলে।

নীতিগতভাবে মহাবিশ্ব কিরকম হবে তা স্থানীয়ভাবে কোনো গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করে বলে দেয়া সম্ভব। এভাবে বিশ্ব উন্মুক্ত না আবদ্ধ তাও জানা সম্ভব। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রযুক্তি দিয়ে এ কাজটি করা একেবারেই দুঃসাধ্য। কারণ বিশ্বের জ্যামিতি অত্যন্ত ব্যাপক কাঠামোর এবং এমনকি ছায়াপথ স্কেলেও যদি বিশ্ব বক্র হতো তাহলেও স্থানের বক্রতা নির্ণয় দুঃসাধ্য হতো। কারণ এই বক্রতা এতোই সূক্ষ্ম যে তা পরিমাপ করা সম্ভব হতো না।

৭.৩ বিশ্বের সম্ভাব্য নিয়তি

এখন আমরা আলোচনা করব বিশ্বের দুটি সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে। বিশ্বের দুটি সম্ভাব্য দশা হলো উন্মুক্ত এবং আবদ্ধ বিশ্ব।

বিশ্ব যদি উন্মুক্ত হয় তাহলে কি ঘটবে? এটা নেহায়েতই ভবিষ্যতের বিষয়। তবু বর্তমানে জন্ম ভৌত আইনসমূহের ভিত্তিতে মোটামুটি একটা ভবিষ্যদ্বাণী দাঁড় করানো যায়। উন্মুক্ত বিশ্ব অনন্তভাবে প্রসারিত হতে থাকবে। এখানে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে পারে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো নক্ষত্রের জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়া। মহাবিস্ফোরণের ১০১৪ বছর পর সমস্ত নক্ষত্রের জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়াম, এবং হিলিয়াম পুড়ে কার্বন এবং এভাবে সবশেষে লৌহ তৈরি হয়। এর পরবর্তী দহন তাপগ্রাসী বলে নিউক্লীয় বিক্রিয়া এ পর্যায়ে থেমে যায়। জ্বালানি দহনের বিভিন্ন স্তরে নক্ষত্র বহুগুণ প্রসারিত হয় এবং সবশেষে সুপারনোভা বিস্ফোরণে বা গ্রহ নীহারিকায় পরিণত হয়। এখন একটি নক্ষত্র কি হারে জ্বালানি পোড়াবে তা নির্ভর করে তার ভরের উপর। যে নক্ষত্র যতো ভারি সে ততো দ্রুত জ্বালানির দহন ঘটায়। আমাদের সূর্যের কথাই ধরা যাক। সূর্য ৫০০ কোটি বছর পর সমস্ত হাইড্রোজেন পুড়িয়ে শেষ করে ফেলবে এবং অবশেষে কয়েকটি ক্ষণস্থায়ী দশার মধ্য দিয়ে সাদা বামনতারায় পরিণত হবে। অবশ্য এতে আমাদের চিন্তার কিছু নেই আপাতত। কারণ বিশ্বের শেষ তারাটি যখন নিভে যাবে তখন বিশ্বের বয়স হবে তার বর্তমান বয়সের ১০,০০০ গুণ।

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে তা হলো নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলী ত্যাগ। অর্থাৎ সমস্ত নক্ষত্র তাদের যতো গ্রহ ছিল তা ত্যাগ করবে, গ্রহসম্বলিত কোনো নক্ষত্রের গ্রহের কক্ষপথের কাছাকাছি বা মধ্যে যদি অন্য কোনো নক্ষত্র চলে আসে তাহলে গ্রহের কক্ষপথ

অনাবৃত নক্ষত্রের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে বিচলিত হবে এবং এর ফলে সূর্য মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হবে। এ ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নির্ভর করে কোনো অঞ্চলের নক্ষত্রের ঘনত্ব, গ্রহের কক্ষপথের ক্ষেত্রফল এবং নক্ষত্রদের পরস্পরের সাপেক্ষে গতিবেগের উপর। কোনো অঞ্চলে নক্ষত্রের ঘনত্ব নির্দেশ করতে একটি ঘনক (cube) ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে অন্তত একটি নক্ষত্র থাকে। গ্রহসম্বলিত কোনো নক্ষত্র যখন মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে গমন করে তখন তা একটি সিলিন্ডার আকৃতির পথ অনুসরণ করে যার আকৃতি গ্রহের কক্ষপথের ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে। এখন গ্রহের কক্ষপথ বিচলিত (perturbed) করতে পারে এ ধরনের নার্কএক ঘটনা ঘটতে হলে ঐ গ্রহ মহাশূন্যে যে কক্ষপথ অনুসরণ করে তার আয়তন সেই ঘনকের আয়তনের সমান হবে যার মধ্যে অন্তত একটি নক্ষত্র পাওয়া যায়। যদি প্রতি ১৫ ঘন আলোকবর্ষে একটি নক্ষত্র থাকে এবং গ্রহব্যবস্থাসমূহ (planetary systems) মহাশূন্যে ৫০ কি.মি./সে. বেগে ছুটে চলে এবং গ্রহব্যবস্থার সর্বোচ্চ কক্ষপথের ব্যাসার্ধ প্রায় ১০ কোটি কি.মি. হয়ে থাকে তাহলে হিসাব করে দেখা যায় ঐ সংখ্যক ১০ বছরে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাতে নক্ষত্রের গ্রহ পরিত্যক্ত হয়। তিন বছর পর ১০০টি অনুরূপ ঘটনায় কোনো নক্ষত্রের সকল গ্রহ পরিত্যক্ত হয় তবে ১০[illegible] বছর পর আমরা আশা করতে পারি যে সকল নক্ষত্র তাদের সমস্ত গ্রহ পরিত্যাগ করবে। এই হিসাবটি দিয়েছেন প্রিন্সটন ইন্স্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজের ফ্রিম্যান ডাইসন। এ ধরনের নার্কএক ঘটনার (stellar encounter) আরো একটি তাৎপর্য আছে। দুটি নক্ষত্র যখন কাছাকাছি আসবে তখন উদ্ভূত মহাকর্ষীয় মিথস্ক্রিয়া এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রে গতিশক্তি স্থানান্তর করে। এর ফলে যেকোনো একটি নক্ষত্র এতো বেশি গতিশক্তি পেতে পারে যে সেটি ছায়াপথ থেকেই বহিষ্কৃত হতে পারে। এই মিথস্ক্রিয়ায় যেহেতু শক্তি সংরক্ষিত থাকে তাই অপর নক্ষত্রটি বেশ কিছু গতিশক্তি হারিয়ে ছায়াপথের আরো কেন্দ্রের দিকে সরে যাবে। এ ধরনের পদ্ধতিকে ছায়াপথের বাষ্পীভবন (galactic evaporation) বলে। পানির বাষ্পীভবনে পানির অণুর ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। একইভাবে ছায়াপথ থেকে প্রচুর আন্তঃনক্ষত্রিক গ্যাসও হারিয়ে যায়। এভাবে ছায়াপথ তার প্রায় ১০ শতাংশ ভর হারাতে ফেলে। ফলে ছায়াপথের মহাকর্ষীয় আকর্ষণে অবশিষ্ট নক্ষত্র ও গ্যাস ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। ধারণা করা হয় যে প্রতিটি ছায়াপথের কেন্দ্রেই বিশাল কৃষ্ণবিবর (black hole) রয়েছে। যদি তা নাও থাকে তথাপিও উপরিউক্ত ঘনীভূত নক্ষত্র ও অন্যান্য গ্যাস ছায়াপথের কেন্দ্রে একটি অতিকায় কৃষ্ণবিবরের সৃষ্টি করবে। প্রায় ১০[illegible] বছরের মধ্যেই ছায়াপথসমূহ অধিকাংশ নক্ষত্র হারিয়ে অতিকায় কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে। এ ধরনের একটি কৃষ্ণবিবরের ভর হতে পারে প্রায় ১ বিলিয়ন সৌরভরের সমান এবং এর শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ হবে ৩ বিলিয়ন কি.মি.। ছায়াপথের কেন্দ্র যখন চুপসে কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে তখন খুব সম্ভবত ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে আলোর স্ফুলিঙ্গ এবং বিকিরণ পাওয়া যাবে। এতো গেল ছায়াপথের কথা। যদি ছায়াপথের স্তবকের কথা চিন্তা করতে হয় তাহলে আশা করা যায় সেখানেও প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটবে। স্তবকের ছায়াপথসমূহ নক্ষত্র হারিয়ে একটি অতিবৃহৎ কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে। একে মহাছায়াপথের কৃষ্ণবিবর (supergalactic

blackhole) বলে ; এর ভর হবে প্রায় 10^{11} সৌরভর এবং শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ হবে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন কি. মি.। ছায়াপথের স্তবক ছায়াপথসমূহের কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবার আগে নিজেই একটিমাত্র বিশাল ছায়াপথে পরিণত হতে পারে (বড়ো ছায়াপথের মহাকর্ষীয় আকর্ষণে ছোট ছোট ছায়াপথ তাদের সাথে একীভূত হয়ে যেতে পারে)। এ সমস্ত ঘটনা ঘটতে সময় নেবে 10^{10} থেকে 10^{11} বছর। কাজেই আমরা আশা করতে পারি, এক বিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন (10^{27}) বছর পর সকল ছায়াপথ ও ছায়াপথস্তবক যথাক্রমে ছায়াপথের কৃষ্ণবিবর এবং মহাছায়াপথের কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে। এছাড়াও থাকবে আরো অনেক মৃত নক্ষত্র যারা ছোট কৃষ্ণবিবর, নিউট্রন তারা কিংবা সাদা বামনতারা রূপে মহাশূন্যে বিরাজ করতে থাকবে। অবশ্য এই দশায় অনেক অনিশ্চয়তা আছে। এখনো অনেক ভৌত প্রতিভাসের সঠিক ব্যাখ্যা আমরা জানি না। যেমন ছায়াপথ থেকে কি পরিমাণ তারা বেরিয়ে যাবে তা আমরা জানি না।

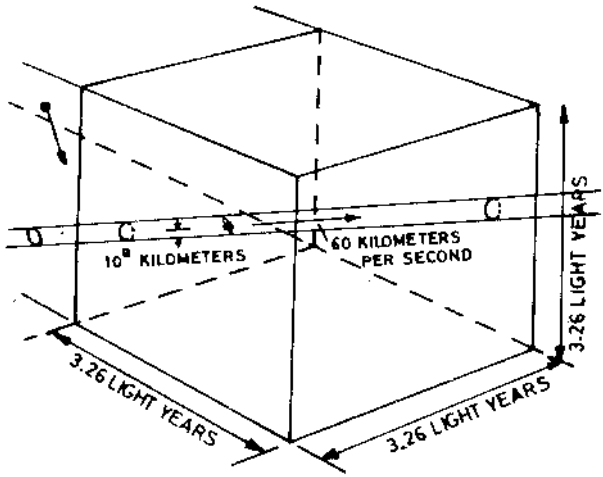

চিত্র ৭.২ : ১৫ খন আলোকবর্ষের ঘনকের মধ্যে শূন্য নক্ষত্রের সাথে সম্পর্কে ৬৫ পৃথিবীতলের সম্ভাবনা এবং তার ফিক্সেশন

চতুর্থ এবং পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা একটি উন্মুক্ত প্রসারমান বিশ্বে ঘটতে পারে তা কণা পদার্থবিজ্ঞানের সম্পর্কিত তত্ত্বাবলির অবশ্যম্ভাবী ফল বলে আমরা মনে করি। কণা পদার্থবিজ্ঞানের মহাএকীভূত তত্ত্ব (Grand Unified Theories, সংক্ষেপে GUT) ভবিষ্যদ্বাণী করে যে প্রায় 10^{15}–10^{16} কেলভিন তাপমাত্রায় বিশ্বের তিনটি বলকে—দুর্বল–সবল–বিদ্যুৎচুম্বক বল—একীভূত করে দেওয়া সম্ভব হবে (পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য)। এটা যদি সত্য হয় তবে আর সব ভারি কণার মতো প্রোটনও ভাঙনের সম্মুখীন হবে। চিরাচরিত জগতে আমরা কখনোই প্রোটন ভাঙন প্রত্যক্ষ করি না। তবে গুটি সত্য হলে প্রায় 10^{30} থেকে

$১০^{৩২}$ বছরের মাথায় প্রোটন অবশ্যই ভাঙনের সম্মুখীন হবে। তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে যদি $১০^{৩২}$ প্রোটনকে একত্রে রাখা যায় (বিকল্পে ১৬০ টন পানি) তাহলে বছরে অন্তত একটি প্রোটন ভেঙে যাবে। বিষয়টি বেশ মজার। যেন পদার্থবিদরা অবিরামভাবে প্রোটনকে ঘিরে বসে আছেন এটি কখন ভাঙে তা দেখার জন্য! যাহোক এ পর্যন্ত অন্তত ১৩টি পরীক্ষা দাবি করছে যে প্রোটন ভাঙন সত্য। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাঙন প্রাথী হলো দক্ষিণ ভারতের বাঙ্গালোরে অবস্থিত কেলার স্বর্ণখনিতে প্রায় ৩০০০ মিটার ভূগর্ভে রাখা ১৫০ টন লোহা থেকে প্রাপ্ত তথ্য। এছাড়া ফ্রান্স ও ইটালির মধ্যে মন্ট ব্লাঁক পর্বতের সুড়ঙ্গেও অনুরূপ একটি পরীক্ষা চালানো হয়েছে। অবশ্য এগুলো নিয়ে এখন বহুদূর গবেষণা চলছে। কারণ এগুলো সত্যি সত্যিই প্রোটন ভাঙনের ফল না নভোরশ্মির প্রভাবজনিত কারণে হয়েছে তা বলা যাচ্ছে না। অবশ্য গাট সত্য না হলেও প্রোটন ভাঙন অন্যভাবে হিসাব করা যায়। মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব যদি সত্য হয় তবে দেখানো যায় শূন্যস্থান অসংখ্য 'অবাস্তব' কৃষ্ণবিবরে (virtual blackhole) এবং 'অবাস্তব' ক্ষুদ্র কৃষ্ণবিবরে (virtual mini-blackhole) পরিপূর্ণ থাকে। এরকম একটি অবাস্তব ক্ষুদ্র কৃষ্ণবিবর যদি বিশ্বের কোনো একাকী, নিঃসঙ্গ প্রোটনকে আত্মসাৎ করে ফেলে তবে প্রোটনটি ভেঙে যাবে। এর ফলে তৈরি হবে পজিট্রন এবং সম্ভবত কিছু ফোটন (কৃষ্ণবিবরটি ব্যারিয়ন সংখ্যাকে সংরক্ষণ না করলেও চার্জ সংরক্ষণ করে)। হকিং হিসাব করে দেখিয়েছেন যে এভাবে প্রোটনের স্থায়িত্বকাল দাঁড়ায় $১০^{৪৬}$ থেকে $১০^{৫০}$ বছর। প্রোটন ভাঙন সাধারণ পদার্থের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এর ভাঙনের ফলে শক্তিশালী ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো ও ফোটনের বিকিরণ পাওয়া যায়। এর ফলে যে শক্তি নির্গত হয় তা স্থায়ীভাবে নক্ষত্রে শক্তি যোগায়। এই নক্ষত্রসমূহ ছায়াপথ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল এবং তখনো কৃষ্ণবিবরে পরিণত হয়নি। প্রোটন ভাঙনের ফলে প্রাপ্ত শক্তি নক্ষত্রের সাম্যাবস্থার তাপমাত্রা (equilibrium temperature) বজায় রাখতে সাহায্য করে। কম ভারি এবং ছোট তারাদের জন্য এই তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি কেলভিন এবং খুব ভারি ও বড় তারাদের জন্য তা মাত্র ৩ ডিগ্রি কেলভিন। প্রায় $১০^{১৭}$ বছরের মধ্যে নক্ষত্রেরা তাদের সাম্যাবস্থার তাপমাত্রায় পৌঁছে যায়। এবং $১০^{৩৩}$ বছরের মধ্যে যখন সব প্রোটন ভেঙে যাবে তখন পর্যন্ত এদের তাপমাত্রা ধ্রুব থাকে। এদিকে $১০^{৩৩}$ বছর পর পটভূমি বিকিরণ দাঁড়াবে $১০^{-২৭}$ ডিগ্রি কেলভিন যদি বিশ্বের ঘনত্ব সংকট ঘনত্বের চেয়ে কম হয় (কারণ বিশ্ব তার বর্তমান আয়তনের $১০^{৩০}$ গুণ প্রসারিত হয়ে যায়)। আর যদি এই দুই ঘনত্ব একেবারে সমান হয় তাহলে এই বিকিরণের তাপমাত্রা হবে $১০^{-১৭}$ ডিগ্রি কেলভিন। প্রোটন ভাঙনের ফলে আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসের গঠনোপাদানও পরিবর্তিত হয়ে যায়। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে প্রোটন ভাঙনের ফলে ইলেকট্রন ও পজিট্রন তৈরি হয় যারা পরে মিলিত হয়ে পরস্পরকে বিনাশ করে দেয়। এই বিনাশ বিকিরণ (annihilation radiation) নক্ষত্রকে উত্তপ্ত করে তোলে। কিন্তু আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস প্রতিনিয়ত বিশ্বের সাথে সাথে প্রসারিত হতে থাকে, ফলে তৈরি হবার পর ইলেকট্রন ও পজিট্রন পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। ফলে এই গ্যাস অত্যন্ত হাল্কা (extremely rarefied) ইলেকট্রন ও পজিট্রন গ্যাসরূপে বিরাজ করে। এখানে একটি প্রশ্ন হলো, কেন ইলেকট্রন ও

পাউন্ড মিলে বিকিরণের সৃষ্টি হয় না। ম্যাক-কী এবং পেজ দেখিয়েছেন যে অনন্ত প্রসারমান এবং ইউক্লিডীয় জ্যামিতির বিশ্বে কিছু পরিমাণ ইলেকট্রন ও পজিট্রন অবিকৃত রয়ে যাবে। এরকম বিশ্বে বিকিরণের ঘনত্ব কখনোই পদার্থের ঘনত্বকে ছাড়িয়ে যাবে না। এই বিশ্বে পদার্থের ঘনত্ব ও বিকিরণের ঘনত্বের অনুপাত দাঁড়াবে ০.৬। যাহোক বিশ্বে অবশিষ্ট থেকে যায় ইলেকট্রন, পজিট্রন গ্যাস, ফোটন, নিউট্রিনো এবং অতিকায় কৃষ্ণবিবর। এ অবস্থা বজায় থাকে প্রায় 10^{30} বছর পর্যন্ত।

উন্মুক্ত, অনন্ত প্রসারমান (open, ever expanding) বিশ্বে শেষ গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনা ঘটবে তাহলো অতিকায় কৃষ্ণবিবরসমূহের বাষ্পীভবন। এটি ঘটবে হকিং বিকিরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে। ১৯৭৪ সালে স্টিফেন হকিং দেখিয়েছেন যে কৃষ্ণবিবর কোয়ান্টাম ক্রিয়াজনিত কারণে বিকিরণ করতে থাকে।[১] এভাবে এক সময়ে কৃষ্ণবিবর তার সব ভর হারিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। হকিং দেখিয়েছেন যে এই বিকিরণ কৃষ্ণবিবরের ভরের ব্যস্তানুপাতিক। প্রাথমিক ভাবে বিকিরণের হার খুব কম থাকে, কিন্তু যতোই ভর কমতে থাকে বিকিরণ ততোই বাড়তে থাকে। কিন্তু এই বিকিরণের সময়কাল অকল্পনীয়ভাবে বড়। যেমন সূর্যের সমান ভরের একটি কৃষ্ণবিবরের তাপমাত্রা থাকবে মোটে 10^{-7} ডিগ্রি কেলভিন এবং এর বাষ্পীভবনের সময়কাল 10^{64} বছর। একইভাবে ছায়াপথের কৃষ্ণবিবরের (galactic blackhole) তাপমাত্রা থাকে 10^{-14} ডিগ্রি কেলভিন এবং মহাছায়াপথের কৃষ্ণবিবরের (supergalactic blackhole) তাপমাত্রা থাকে 10^{-19} ডিগ্রি কেলভিন। আমরা আগেই দেখেছি ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সমতল স্থানের প্রসারমান বিশ্বে পটভূমি বিকিরণ 10^{30} বছর পর হবে 10^{-32} ডিগ্রি কেলভিন। অন্যদিকে পরাবৃত্তীয় জ্যামিতির (hyperbolic geometry) প্রসারমান বিশ্বের ক্ষেত্রে এই তাপমাত্রা 10^{30} বছরের মাথাতেই অর্জিত হয়ে যায়। বোঝাই যাচ্ছে, পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা যদি কৃষ্ণবিবরের চেয়ে বেশি হয় তবে কৃষ্ণবিবর শক্তি বিকিরণ করার চেয়ে শোষণ করবে বেশি। কিন্তু উপরিউক্ত সময়কালের পর যখন পটভূমির তাপমাত্রা কমে যাবে তখন কৃষ্ণবিবরই বেশি তাপ বিকিরণ করবে। এভাবে হিসাব করে দেখা যায়, ছায়াপথের কৃষ্ণবিবর প্রায় 10^{90} বছর পর বিকিরণ করে উবে যাবে এবং মহাছায়াপথের কৃষ্ণবিবরের ক্ষেত্রে সেটা 10^{100} বছর। কাজেই 10^{100} বছর পর বিশ্বে রইবে শুধু ইলেকট্রন, পজিট্রন ও নিউট্রিনোর অত্যন্ত ক্ষীণ গ্যাস, কম শক্তির ফোটন এবং কৃষ্ণবিবরের বাষ্পীভবন থেকে উদ্ভূত উচ্চ-শক্তির ফোটন। এছাড়া থাকবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাদা বামন ও নিউট্রন তারা।

উন্মুক্ত বিশ্বে পদার্থের স্থায়িত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান অনুযায়ী কোনো পদার্থ এরকম অসীম বিশ্বে শূন্য ডিগ্রি কেলভিনে পৌঁছলে তার অণুগুলো সবরকম

---

১. অনুচ্ছেদ ৬.১৬ ও Hawking (1977)

গতি হারিয়ে নিশ্চল হয়ে রইবে অনির্দিষ্টকালের জন্য। কিন্তু এই পদার্থই নিম্নতম শক্তির দশায় থাকতে ইচ্ছুক। পদার্থের এমন অবস্থা থাকতে পারে যেখানে উপাদানিক কণাগুলোর শক্তি কম থাকে। কিন্তু এই দুই অবস্থার মাঝে যে বৈদ্যুতিক বাধা (electrical barrier) থাকে তা অতিক্রম করা চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান অনুযায়ী সম্ভব হয় না। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের টানেলিং (tunneling) প্রক্রিয়ায় এই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। এই পুরো পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ গাণিতিক এবং এর সহজবোধ্য কোনো বর্ণনা নেই। উদাহরণ হিসেবে একটি হীরার কিউব 10^{64} বছর পর লোহার গোলকে পরিণত হতে পারে। কারণ লোহার কেন্দ্রীন সবচেয়ে স্থায়ী সমস্ত পদার্থই অবশেষে লোহায় পরিণত হবে। ফ্রিম্যান ডাইসন হিসাব করে দেখিয়েছেন যে এই সময়কাল $10^{10^{26}}$ থেকে $10^{10^{76}}$ বছর। এই অবস্থায় আমাদের সমস্ত সাধারণ পদার্থই তেজস্ক্রিয় হয়ে যাবে। পদার্থের অস্থায়িত্ব এবং টানেলিং প্রক্রিয়ার সাহায্যে ন্যূনতম শক্তির দশায় অবস্থানান্তরের (transition) গতি থেকে দেখা যায় যে $10^{10^{26}}$ বছর পর বিশ্বের অবশিষ্ট সাদা বামন ও নিউট্রন তারাও অবশেষে কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে প্রোটন স্থায়ী। তা নাহলে পদার্থের স্থায়িত্ব অন্যরকম হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের ক্ষুদ্র কৃষ্ণবিবরের কথা চিন্তা করতে হবে। ক্ষুদ্র কৃষ্ণবিবরগুলোর জন্ম হয় আদি বিশ্বের ঘটনাবলি থেকে। এ সমস্ত কৃষ্ণবিবর আর এখন দেখা যায় না। কারণ তারা এতোদিনে হকিং বিকিরণের মাধ্যমে উবে গেছে। ডাইসন দেখিয়েছেন যে, সব বস্তুই এক সময়ে কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে। এক্ষেত্রে চারটি সম্ভাবনা আছে : ১. কৃষ্ণবিবরের ন্যূনতম ভর যদি শূন্য হয় তাহলে সব পদার্থই অস্থায়ী হবে এবং এর অস্থায়িত্বের কাল কম হবে। ২. ন্যূনতম ভর যদি 2×10^{-5} গ্রাম বা প্লাঙ্কের ভরের সমান হয় তাহলে ভারি সব বস্তু কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে এবং তার সময়কাল $10^{10^{10}}$ বছর। প্লাঙ্কের ভরের চেয়ে ছোট ভরের বস্তু হবে স্থায়ী। ৩. ন্যূনতম ভর যদি 3×10^{-8} গ্রাম হয় তাহলে এর চেয়ে ভারি বস্তুর আয়ুষ্কাল হবে $10^{10^{12}}$ বছর। একে কোয়ান্টাম ভর বলে, কারণ এই ভরের কৃষ্ণবিবর পর্যন্তই চিরায়ত বর্ণনা সম্ভব। ৪. ন্যূনতম ভর যদি 4×10^{-12} গ্রাম বা চন্দ্রশেখরের ভর হয় তবে এর চেয়ে ভারি বস্তুর আয়ুষ্কাল হবে $10^{10^{19}}$ বছর। এই চারটি সম্ভাবনার মধ্যে বড়ো হচ্ছে এই যে, যেসব বস্তুর ভর কৃষ্ণবিবরের ন্যূনতম ভরের চেয়ে বেশি তারা এক সময়ে কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে (যদি অবশ্য প্রোটন স্থায়ী হয়)। যেকোনো একটি সম্ভাবনা সত্য হলে (ডাইসনের মতে দ্বিতীয়টি বেশি সম্ভাব্য) সবশেষে বিশ্বে অবশিষ্ট থাকবে কিছু বিকিরণ ও পদার্থ যাদের মোট ঘনত্ব হবে শূন্যের কাছাকাছি (কিন্তু একেবারেই শূন্য নয়)। পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রাও পরম শূন্যের কাছাকাছি চলে যাবে। তবে বিশ্বে সবসময়েই কোয়ান্টাম ক্রিয়াবলি চলতেই থাকবে, কারণ শূন্যস্থান সবসময়েই অবাস্তব কণায় পরিপূর্ণ থাকে। [illegible] বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে এবং কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর [illegible] থাকার সম্ভাবনা জানার জন্য দ্রষ্টব্য krauss & Starkman (1999)।

সারণি ১

		মহাবিস্ফোরণের প্রথম কয়েক মুহূর্ত বছর
বিশ ত্বরিত হবে প্রসারিত হলে সম্ভাব্য নিয়তি	স্থান ও কালের আবির্ভাব :	$১০^{-১৫}$
	মহাজাগতিক স্ফীতি :	$১০^{-৩৪}$
	বিদ্যুৎ চৌম্বকত্বের আবির্ভাব :	$১০^{-১৬}$
	পরমাণু কেন্দ্রীনের উদ্ভব :	$১০^{-৫}$
		মহাবিস্ফোরণের পর, বছর
	প্রথম পরমাণুর উদ্ভব :	$১০^{৫}$
	প্রথম নক্ষত্রের উদ্ভব :	$১০^{৬}$
	সূর্যের উদ্ভব :	৩×১০^{৯}
	স্ফীতির পুনরাবির্ভাব, বিশ্বের দৃশ্যমান অংশের হ্রাস :	৫×১০^{৯}
	বর্তমান :	১.২×১০^{১০}
	সূর্যের মৃত্যু :	১.৫×১০^{১০}
	গিবস্-হকিং তাপমাত্রায় বিশ্বের শীতলীভবন :	৭×১০^{১১}
	স্থানীয় স্তবকের বহিস্থ ছায়াপথসমূহের দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া :	৫×১০^{১১}
	নক্ষত্র সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সমাপ্তি :	$১০^{১৪}$
	নক্ষত্রের গ্রহ পরিত্যাগ :	$১০^{১৫}$
	ছায়াপথসমূহের কৃষ্ণবিবরে রূপান্তর :	$১০^{১৬}$
	চলতি হারে শক্তি গ্রহণের ফলে ছায়াপথীয় জ্বালানি নিঃশেষ :	$১০^{৩৩}$
	কোয়ান্টাম টানেলিং প্রক্রিয়ায় পদার্থের ভাঙন :	$১০^{৬৫}$
	ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সংযোগে নতুন পদার্থের সংশ্লেষণ :	$১০^{৮৫}$
	ছায়াপথীয় কৃষ্ণবিবরদের উবে যাওয়া :	$১০^{৯৮}$
ফ্রিম্যান ডাইসনের গণনাকৃত উন্মুক্ত বিশ্বের সময়পঞ্জি	কম ভরের নক্ষত্রের শীতল হবার সময়কাল :	$১০^{১৪}$
	নক্ষত্র থেকে গ্রহ পরিত্যক্ত হবে :	$১০^{১৫}$
	ছায়াপথ থেকে নক্ষত্র পরিত্যক্ত হবে :	$১০^{১৯}$
	মহাকর্ষীয় বিকিরণের মাধ্যমে কক্ষপথের পতন :	$১০^{২০}$
	হকিং বিকিরণের ফলে কৃষ্ণবিবরের বাষ্পীভবন :	$১০^{৬৪}$
	পরম শূন্য তাপমাত্রায় পদার্থের ভাঙন :	$১০^{৬৫}$
	সকল পদার্থের লৌহে রূপান্তর :	$১০^{১৫০০}$
	সকল পদার্থের কৃষ্ণবিবরে রূপান্তর :	$১০^{১০^{২৬}}$
	সকল পদার্থের কৃষ্ণবিবর/নিউট্রন তারায় রূপান্তর :	$১০^{১০^{৭৬}}$

এতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা উন্মুক্ত, অনন্ত প্রসারমান বিশ্বের কথা আলোচনা করেছি। কিন্তু বিশ্ব যদি আবদ্ধ (closed) হয় অর্থাৎ বিশ্ব যদি পুনরায় সংকুচিত হয় তাহলে কি ঘটবে? ধরা যাক বিশ্বের ঘনত্ব সংকট ঘনত্বের দ্বিগুণ। তাহলে বিশ্ব এর বর্তমান তথা স্কেল উৎপাদক (scale factor) দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত প্রসারিত হবে এবং তারপর শুরু হবে সংকোচন। নীতিগতভাবে এমন বিশ্ব সম্ভব যা ১০[illegible] বছর পর্যন্ত প্রসারিত হবে, তারপর সংকুচিত হবে। এক্ষেত্রে পূর্বে আমরা যা বলেছি প্রায় সব ঘটনাই ঘটতে থাকবে। তবে আমরা বিশ্বের স্থায়িত্বকাল ১০[illegible] বছর হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সাহেক আমাদের উপরিউক্ত উদাহরণে যেখানে বিশ্ব তার দ্বিগুণ প্রসারিত হয় সেখানে ফিরে যাই। এক্ষেত্রে বিশ্ব ১০ বিলিয়ন বছর পর্যন্ত প্রসারিত হবে এবং পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা দাঁড়াবে ১.[illegible] ডিগ্রি কেলভিন। এরপর এই তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে এবং মহাবিস্ফোরণ থেকে ৪ পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটেছে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। মহাসংকোচনের (Big Crunch) ১০ বিলিয়ন বছর পূর্বে বিশ্বের ঘনত্ব বর্তমান ঘনত্বের সমান হবে। এরপর ফোটনের শক্তি বাড়তে থাকবে, নক্ষত্রেরা উত্তপ্ত হবে এবং বিস্ফোরিত হবে। ছায়াপথসমূহ পরস্পরের দিকে সরে আসতে থাকবে এবং ফলে এদের বর্ণালির নীলাভসরণ (blueshift) দেখা যাবে। বিশ্বের পটভূমির তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে এবং তা যখন ৪০০ ডিগ্রি কেলভিনে পৌঁছে তখন আর কোনো প্রাণী বেঁচে থাকবে না। মহাসংকোচনের এক মিলিয়ন বছর পূর্বে বিশ্বের তাপমাত্রা যখন ৪০০০ ডিগ্রি কেলভিনে পৌঁছে তখন পরমাণুর ইলেকট্রনগুলো মুক্তভাবে বিচরণ করবে। অবশ্য এর আগেই অনেক ছায়াপথ একীভূত হয়ে যাবে এবং এই উত্তপ্ত বিকিরণ প্লাজমায় নক্ষত্রসমূহ বিলীন (অর্থাৎ দ্রবীভূত) হয়ে যাবে। এরপর তাপমাত্রা যখন কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রি হবে তখন নিউট্রন ও প্রোটন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। অবশেষে পদার্থ ও বিকিরণ একত্রে অসীম ঘনত্বের অসীম ক্ষুদ্র স্থানে ধ্বসে পড়বে। মার্টিন রীজ দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ ছায়াপথের কৃষ্ণবিবর (galactic blackhole) মিলিত হয়ে তৈরি করবে এক মহাকৃষ্ণবিবর। এটি যা কিছু নক্ষত্র, নক্ষত্রের পদার্থ আত্মসাৎ করে ফেলবে। এবং অবশেষে থাকবে একটিমাত্র কৃষ্ণবিবর আর সেটাই হবে বিশ্ব।

লক্ষণীয় যে প্রসারণের তুলনায় সংকোচন দশায় মোট শক্তির পরিমাণ বেশি থাকবে। যদিও বিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ ধ্রুব এবং তা শূন্য। কাজেই তা বাড়তে হবে কিন্তু স্থানীয়ভাবে শক্তি সংরক্ষিত থাকবে। ধরা যাক সূর্যের পৃষ্ঠ থেকে একটি ফোটন নিঃসৃত হলো। এই শক্তির সরবরাহ আসছে সূর্য থেকে এবং ফলত সূর্যের ভর সামান্য পরিমাণ কমেছে। এখানে শক্তি সংরক্ষিত থাকছে। বিশ্বের প্রসারণের ফলে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়বে এবং ফলে শক্তি কমবে। এভাবে এমন এক সময় আসবে যখন ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য তার নিঃসৃত হবার সময়ে যা ছিল তার তুলনায় ছোট হয়ে যাবে (কারণ বিশ্বের সংকোচন)। ফলে এর মধ্যে এমনকিছু শক্তি সংরক্ষিত থাকবে যার জন্য অন্যত্র কোনো শক্তির সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না। এভাবে বিশ্ব সংকুচিত হতে থাকলে তাপমাত্রা বাড়ে।

মহাসংকোচন বা Big Crunch এর পর কি ঘটবে? এই প্রশ্নটি বেশ আকর্ষণীয়। যেহেতু মহাসংকোচনের ফলে বস্তু এবং কাল দুটোরই (আপাতত) ধ্বংস সাধিত হয় সেহেতু আমরা কি ঘটবে তা জিজ্ঞেস করা অর্থহীন; কারণ তার আর পরে কোন অবকাশ নেই। আবার যেহেতু এ সম্পর্কে জানা ভৌতবিধিসমূহ ভেঙে পড়ে তাই তারপর কি ঘটবে বা আদৌ কিছু ঘটবে কিনা সেটা

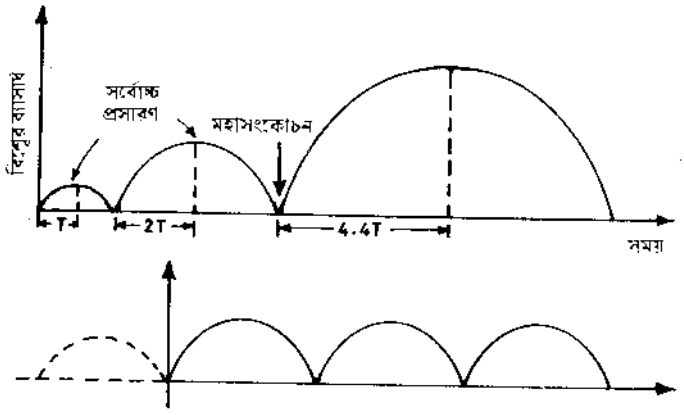

চিত্র ৭.৩ : বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের চক্র যদি পর্যায়ক্রমিক হয় তবে সম্ভবত বৃহৎ বিস্ফোরণ [illegible] থাকতে থাকে তবে বিশ্বের প্রসারণ উপরের ক্রমে ধীর হতে হতে [illegible] চলে নিচের ছবি অনুযায়ী বিশ্ব প্রসারিত ও সংকুচিত হবে।

আমরা জানি না। তাছাড়া মহাসংকোচনে যে বিশাল কৃষ্ণবিবরের আবির্ভাব হয় সেটার কোলাপ্স কিভাবে ঘটে তা আমাদের জানা নেই। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে কোন এক অজ্ঞাত প্রক্রিয়ায় সমস্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া আবার শুরু হবে। অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংস একটি চক্র মেনে চলতে পারে (হয়ত তা পর্যায়ক্রমিক)। হয়ত এই চক্রের পর্যায় অসীম। এখন সমস্যা হচ্ছে যেহেতু সকল ভৌতবস্তুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাদের এনট্রপি (entropy) বৃদ্ধি পায়, কাজেই বিশ্বের প্রসারণ এবং সংকোচন—উভয় দশায়ই মোট এনট্রপি বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিশ্বের অন্তিম মুহূর্তে এনট্রপি হবে সর্বোচ্চ। এখন বিশ্বের অন্তিম মুহূর্তে অদ্ভুত বর্তিতক্রমী বিন্দুর (singularity) মধ্য দিয়ে এই এনট্রপি বিশ্বের পরবর্তী চক্রে (cycle) অবিকৃত থাকবে কিনা তা আমরা জানি না। কারণ বর্তিতক্রমী বিন্দুর ভৌত চরিত্র আমরা জানি না। তাই আমরা ধরে নিতে পারি সকল ভৌতবস্তুর মতোই বিশ্বের এনট্রপি প্রতি চক্রে বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রতিটি বিশ্ব পূর্বের চক্রের তুলনায় বেশি সময় ব্যাপী প্রসারিত এবং সংকুচিত হবে (চিত্র ৭.৩)। যেমন ফ্রিডম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিকে ও পিবলস দেখিয়েছেন যে আমাদের পরবর্তী বিশ্ব আমাদের তুলনায় দ্বিগুণ প্রসারিত হবে। এভাবে প্রতিটি চক্রে এনট্রপি বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের চক্র যদি অসীম হয় তবে এনট্রপিও অসীম হবে। কিন্তু পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এরকম কিছুর ইঙ্গিত দেয় না। আবার অনেকে মনে করেন বর্তিতক্রমী বিন্দুর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ে বিশ্বের ধর্মাবলি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমন কি এনট্রপি হয়ত কমে যাবে। বিশ্বের অন্তিম নিয়তি সম্পর্কে ব্রিটিশ পদার্থবিদ রজার পেনরোজ মনে করেন যেহেতু আদিতে বিশ্ব অধিকতর সুশৃঙ্খল ছিল কাজেই স্বাভাবিকভাবে তার এনট্রপি

চিত্র করা। কিন্তু বিন্দু যদি অবশ্য হয় তবে অন্তিম দশায় বিশ্বের এনট্রপি বেশি হবে। হকিং এবং পেনরোজ ১৯৬৯ সালে প্রমাণ করেছিলেন যে বিশ্বে প্রতি পদার্থের তুলনায় পদার্থ বেশি থাকলে এবং সাধারণ আপেক্ষিকতা সত্য হলে বিশ্বের প্রারম্ভে বাতিক্রমী বিন্দুর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বের এই আদি বাতিক্রমী বিন্দু (Big Bang singularity) এবং অন্তিম বাতিক্রমী বিন্দু (Big Crunch singularity) অভিন্ন নয়। একটির এনট্রপি প্রায় শূন্য, অন্যটির ১০৯০ গুণ। এই প্রতিপাদ্য বোঝাতে পেনরোজ একটি বিশেষ অনুকল্পের (Weyl curvature hypothesis) সাহায্য নিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন আদিতে ওয়েইল বক্রতা টেন্সরের মান ছিল প্রায় শূন্য; কিন্তু অন্তিমে এর মান বাড়ছে অসীম। এভাবে ওয়েইল টেন্সরের সময়ে অপ্রতিসাম্য (time assymetry) আচরণ বিবেচনা করলে বিশ্বের কাল-শরেরও (arrow of time) দেখা দেওয়া সম্ভব। অন্যদিকে হকিং-এর ধারণা তাঁর সীমানাহীনতার নীতি (no boundary principle) মেনে নিলে এ ধরনের (সময়) অপ্রতিসাম্যের সাহায্য না নিয়ে কেবল কাল্পনিক সময় মাত্রার কথা বিবেচনা করলে খুব সহজেই বাতিক্রমী বিন্দুর অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব এড়ানো যায় (তৃতীয় ক্ষেত্রেই)।[১] এসবই এমন অবস্থার দিকে [illegible] যেখানে অস্তিত্ব, কাল বা সময়ের উদ্ভব নেই।

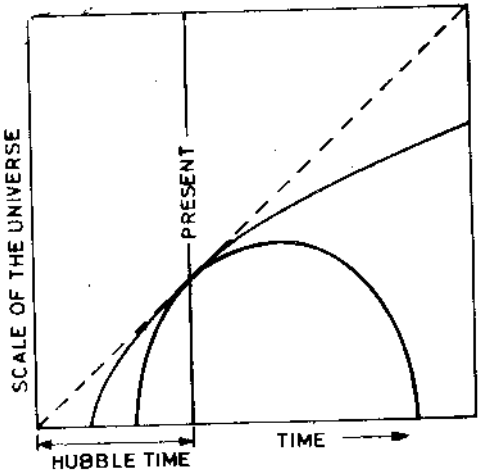

চিত্র ৭.৪ : [illegible] বিশ্বের মডেল। এ বিষয়টি ভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত কোনো বস্তুর গতিপথের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যদি বস্তুর বেগ যথেষ্ট না হয় তবে তা ভূমিতে পতিত হবে, নতুবা শূন্যে অদৃশ্য হয়। [illegible] বিন্দু পুনরায় সঙ্কুচিত হবে এবং [illegible] বিন্দু পুনরায় সঙ্কুচিত হবে।

১ [illegible] দ্রষ্টব্য Hawking (1988) এবং Gribbin (1986)। পেনরোজের ওয়েইল টেন্সরের উপর বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Penrose (1989)। হকিং ও পেনরোজের [illegible] তুলনামূলক, সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Hawking & Penrose (1996)।

৭.৪ বিশ্বের নিয়তি নির্ধারণ

আমরা বিশ্ব উন্মুক্ত বা আবদ্ধ হলে তার সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো বিশ্ব উন্মুক্ত না আবদ্ধ? তা জানার উপায় কি? বেশ কয়েকটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পদ্ধতি আছে যার সাহায্যে আমরা সহজেই জানতে পারি আমাদের বিশ্বের পরিণতি কি হবে। একটি উপায় হচ্ছে বিশ্বের প্রসারণ কমে যাওয়ার হার নির্ণয় করা। একে বলে মন্দন প্যারামিটার (deceleration parameter) পরিমাপ করা। দূরবর্তী ছায়াপথসমূহের গতি পর্যবেক্ষণ করে মন্দন পরিমাপ করা যায়। বিশ্বের বয়স সাধারণ করে ও হাবল সময়ের (হাবল ধ্রুবকের বিপরীত মান) সাথে তুলনা করেও মন্দন পরিমাপ সম্ভব। আবার যেহেতু বিশ্বের মন্দন একটি মহাকর্ষের প্রভাবজনিত ঘটনা তাই পদার্থের গড় ঘনত্ব নির্ণয় করেও মন্দন পরিমাপ করা যায়। মন্দন কেন হয়? আসলে বিশ্বের প্রসারণের ফলে ছায়াপথসমূহ পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। কিন্তু পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে এর প্রসারণ ধ্রুব থাকে না, বরঞ্চ কমে যায়। এভাবে মন্দনের হার নির্ভর করে বিশ্বে কি পরিমাণ পদার্থ আছে তার উপর তথা ঘনত্বের উপর। বিশ্বকে আবদ্ধ করতে যে পরিমাণ পদার্থের প্রয়োজন তার ঘনত্বকে **সংকট ঘনত্ব** (critical density) বলে। বিশ্বের বর্তমান গড় ঘনত্ব ও সংকট ঘনত্বের অনুপাতকে একটি মাত্রাহীন প্যারামিটার দিয়ে প্রকাশ করা হয়। একে বলে **ঘনত্ব প্যারামিটার** (density parameter) যাকে গ্রিক অক্ষর ওমেগা (Ω) দিয়ে লেখা হয় (সমীকরণ ৬.২, ৬০ স্মর্তব্য)। বিশ্বের প্রসারণের মন্দনহারকেও একটি প্যারামিটার দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এটি **মন্দন প্যারামিটার**, q_0।[৬] এর সংজ্ঞা হলো :

$$q_0 = \frac{a_0 \ddot{a}_0}{\dot{a}_0^2} \qquad (৭.৭)$$

যেখানে a_0 হচ্ছে a এর বর্তমান মান। মন্দনহারও স্বাভাবিক ভাবে পদার্থের গড় ঘনত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। q_0 যদি ১/২ এর কম হয় তাহলে বিশ্ব অত্যন্ত দ্রুতহারে মন্দীভূত হবে; কারণ এর মান ঘনত্বের এমন মান নির্দেশ করে যা বিশ্বকে আবদ্ধ করতে সক্ষম। কিন্তু q_0 যদি ১/২ এর বেশি হয় তবে বিশ্ব অনন্ত প্রসারমান হবে। মন্দন পরিমাপের একটি যুৎসই উপায় হলো দুটি পৃথক সময়ে কোনো একটি ছায়াপথের অরীয় বেগ (radial velocity) মাপা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে, একজন মানুষের সারা জীবনেও ছায়াপথসমূহের অরীয় গতিবেগের উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটে না যাতে করে বিশ্বের মন্দন সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তাছাড়া আলোর সসীম গতিবেগের জন্য আমরা যতো দূরবর্তী ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করি সময় ততো বেশি অতীতের। যেমন কোনো ছায়াপথের দূরত্ব ১ বিলিয়ন আলোকবর্ষ হলে তাহলে অর্থ ঐ ছায়াপথ থেকে ১ বিলিয়ন বছর পূর্বের নিঃসৃত আলো বর্তমানে এসে পৌঁছাচ্ছে। এখন যদি বিশ্বের প্রসারণ মন্দীভূত হয়ে থাকে তাহলে ঐ ছায়াপথের গতিবেগ হাবল নির্ণিত গতিবেগের চেয়ে বেশি হবে। এখানে সমস্যা হচ্ছে দূরবর্তী কোনো ছায়াপথের অনুজ্জ্বলতা স্বকীয় (intrinsic dimness) নাকি দূর হওয়াটা তা অনিশ্চিত। ফলে এ পদ্ধতিতে পরিমাপিত

---

৬. সংকট ঘনত্ব এবং বর্তমান ঘনত্বের সম্পর্ক হলো : $\rho_0 = 2q_0\rho_{crit}$, $\rho_{crit} = \frac{3H_0^2}{8\pi G}$। যেখানে ρ_0 বর্তমান ঘনত্ব, ρ_{crit} সংকট ঘনত্ব, G মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, H_0 হাবলের ধ্রুবকের বর্তমান মান।

মন্দনের মতো যথেষ্ট গরমিল থাকতে বাধ্য। সব ছায়াপথের স্বকীয় উজ্জ্বলতা বা পরম উজ্জ্বলতা এক নয়। তাছাড়া কোনো স্তবকে একটি বড় ছায়াপথ কর্তৃক ছোট ছায়াপথ আত্মসাৎ করে ফেলার (galactic canibalism) মতো ঘটনায় ছায়াপথের উজ্জ্বলতার যথেষ্ট তারতম্য হয়।

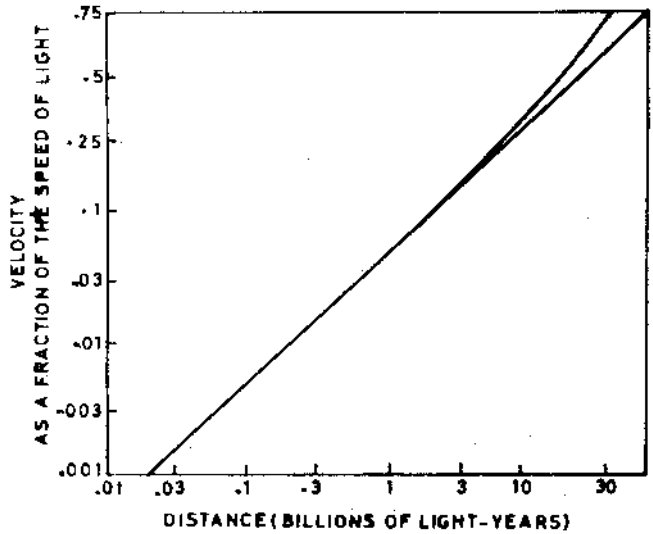

'চিত্র ৭.৫ : [illegible] পরিমাণ। যদি কোনো মন্দন না থাকে তবে হাব্‌লের বিধি অনুযায়ী বেগ ও দূরত্বের সম্পর্ক সরলরেখা অনুসরণ করে। যদি মন্দন থাকে তবে দূরবর্তী ছায়াপথের ক্ষেত্রে বক্ররেখা অনুসরণ করে।'

বিশ্বের নিয়তি জানার আরো একটি উপায় হলো বিশ্বের বয়স নির্ণয় করা। যদি বিশ্বের প্রসারণের কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে বিশ্বের বয়স ঠিক এক হাব্‌ল সময়ের সমান হবে। কিন্তু যেহেতু এটি মন্দীভূত হয়েছে তাই এর বয়স অবশ্যই এক হাব্‌ল সময়ের চেয়ে কম হবে (বিশ্বের বয়স যদি হাব্‌ল সময়ের দুই-তৃতীয়াংশের কম হয় তবে বিশ্ব হয় আবদ্ধ অবস্থায় বিশ্ব তবে উন্মুক্ত)। প্রথমত, এই বয়স নির্ণয় করা যায় বিশ্বের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ নক্ষত্র থেকে। এরা সাধারণত লাল বর্ণের তারা হয়ে থাকে। ছায়াপথের অন্তর্গত গুচ্ছস্তবকেই (globular clusters) এদের বেশি দেখা যায়। এদের ব্যবহার করে বিশ্বের যে বয়স পাওয়া যায় তাহলো ৮ থেকে ১৬ বিলিয়ন বছর; দ্বিতীয়ত, বিশ্বের বয়স কিছু ভারি মৌলের প্রাচুর্য থেকেও নির্ণয় করা যায়। অধিকাংশ ভারি এবং তেজস্ক্রিয় মৌলের উদ্ভব হয় নক্ষত্রের বিস্ফোরণ বা বিস্ফোরণ থেকে এবং এই বিস্ফোরণ আদিকাল থেকেই সংঘটিত হচ্ছে। যেহেতু তেজস্ক্রিয় মৌল ধীর হারে বিকিরণ করে তাই তেজস্ক্রিয় মৌলসমূহ এবং তাদের উৎপাদের (decay products) অনুপাত থেকে সহজেই বিশ্বের বয়স হিসাব করা যায় এবং তাহলো ৬ থেকে ১০ বিলিয়ন বছর। এ ভাবে মোটামুটি বিশ্বের বয়স পাওয়া যায় ৮ থেকে ১৮ বিলিয়ন

বছর। অবশ্য এসব হিসাব বিশ্বের বয়সের ন্যূনসীমা নির্দেশ করে। তবে এখন আমরা জানি বিশ্বের বয়স ১৯ বিলিয়ন বছরের কম নয় (অর্থাৎ ৩.৪)। আরেকটি বিষয় এই যে বিশ্বে ডিউটেরিয়ামের প্রাচুর্য থেকেও বিশ্বের আদিম নির্যাতের হিসাব পাওয়া যায়। ডিউটেরিয়ামের নিউক্লিয়াসে থাকে ১টি প্রোটন ও ১টি নিউট্রন। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে অভ্যন্তরিক ভাবে ডিউটেরিয়ামের সংশ্লেষণ সম্ভব নয়। তাই যা কিছু ডিউটেরিয়াম দেখা যায় তা ই আদিম (primordial) বলে ধারণা করা হয়। এর ঘনত্ব বেশি থাকলে তারা অধিকাংশই হিলিয়ামে পরিণত হয়)। এভাবে দেখা যায় বিশ্ব সনাতন হলে যদি ডিউটেরিয়ামের প্রাচুর্য কম থাকে তাহলে বিশ্ব হবে উন্মুক্ত।

মহাবিশ্বের নির্যাত নির্ধারক তৃতীয় পর্যবেক্ষণ বিশ্বের সম্পদের মোট ঘনত্ব সংক্রান্ত। এই ঘনত্বের একটি ন্যূনসীমা পাওয়া যায় ছায়াপথসমূহের কেবল দৃশ্যমান ভর বিবেচনা করলে। মহাশূন্যের কোনো একটি নির্দিষ্ট আয়তনের স্থানে ছায়াপথের সংখ্যা গণনা করে তাদের ভর দিয়ে গুণ দিয়ে তারপর স্থানের আয়তন দিয়ে ভাগ করলে মোট ঘনত্ব পাওয়া যায়। অবশ্য গুরুকেন্দ্রিক ছায়াপথদের ভর ঠিক করা জটিল। ছায়াপথসমূহের একে অপরের উপর পরিবেষ্টিত মহাকর্ষীয় প্রভাব থেকে নিউটনীয় বলবিজ্ঞানের সহায়তায় এদের ভর নির্ণয় করা যায়। এভাবে যদি শুধু দৃশ্যমান বস্তুর ভর গণনা করা হয় তবে Ω এর মান দাঁড়ায় ০.০৪। ফলে বিশ্ব অবধারিতভাবে উন্মুক্ত এবং অনন্ত প্রসারমান হবে। অবশ্য এই মানে যথেষ্ট ভুলের সম্ভাবনা আছে এবং এই মান অনেকগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে; অর্থাৎ Ω এর মান হবে ০.১৬। এক্ষেত্রেও Ω এর মান ১ এর অনেক কম। ধারণা করা হয় Ω এর মান ০.১, অন্তত দৃশ্যমান বস্তুর কথা বিবেচনা করলে।

সারণি ২ : বিশ্বের সম্ভাব্য নির্যাত।

	উন্মুক্ত	সংকট	আবদ্ধ
ঘনত্ব প্যারামিটার, Ω	$\Omega<1$	$\Omega = 1$	$\Omega>1$
মন্দন প্যারামিটার, q_0	$q_0<1/2$	$q_0 = 1/2$	$q_0>1/2$
স্থানের জ্যামিতি	পরিপৃষ্ঠীয় (বক্রতা ঋণাত্মক)	সমতল (শূন্য বক্রতা)	গোলকীয় (বক্রতা ধনাত্মক)
বিশ্বের নির্যাত	অনন্ত প্রসারণ	অনন্ত প্রসারণ	সংকোচন এবং পতন
	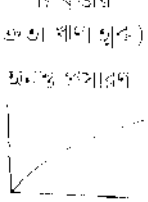	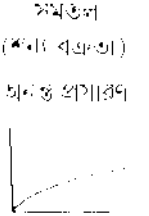	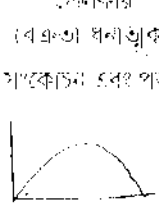

ছায়াপথস্তবকের অন্তর্ভুক্ত ছায়াপথসমূহের সাধারণ গতি পর্যবেক্ষণ করলে (ভিরিয়াল উপপাদ্য প্রয়োগ করে) যে গতীয় ভর পাওয়া যায় তা দৃশ্যমান ভরের অন্তত পাঁচগুণ

[illegible] প্রশ্ন হলো এই অতিরিক্ত লুকানো ভর কোথা থেকে এলো? এই লুকানো ভরের অস্তিত্ব মহাকর্ষীয় প্রভাব ছাড়া আর কোনোভাবেই ধরা যায় না। বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যেই (গামা, অতিবেগুনি, দৃশ্যমান আলো, অবলোহিত, রেডিও বিকিরণ) [illegible] অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। আধুনিক গবেষণা মোটামুটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে বিশ্বে দৃশ্যমান বস্তু ছাড়াও অদৃশ্য বস্তু বা ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্ব আছে যার প্রকৃতি এখন পর্যন্ত অজানা। এদের পরিমাণ দৃশ্যমান বস্তুর কয়েকগুণ হতে পারে।

বিশ্বে গালাক্সির গড় ঘনত্ব ৭.৫×১০$^{-৩১}$ গ্রাম/সি.সি.[৪] কিন্তু সংকট ঘনত্ব ৫×১০$^{-৩০}$ [illegible] গ্রাম/সি.সি. (তাত্ত্বিক মান)। অর্থাৎ প্রতি ঘনমিটারে মাত্র ৩ থেকে ১০টি হাইড্রোজেন পরমাণু। কিন্তু যদি অদৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব সত্যি হয় তাহলে গালাক্সির ঘনত্ব বেড়ে যাবে এবং অবধারিতভাবে বিশ্বের নিয়তি নির্ধারিত হবে। এখন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ যা বলছে তাহলো আমরা যে বিশ্বে বাস করি তার জ্যামিতি ইউক্লিডীয়, ঘনত্ব প্যারামিটার, [illegible] প্যারামিটারের মান ১/২ এর কাছাকাছি, ঘনত্ব প্যারামিটারের মান ১ এর কম [illegible] বিশ্ব অনন্ত প্রসারমান।

৭.৫ অদৃশ্য বস্তু (Dark Matter)

বিজ্ঞানীরা আজকাল অদৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব নিয়ে জোরেসোরে ভাবনা শুরু করেছেন। অদৃশ্য বস্তু হচ্ছে সে ধরনের বস্তু যাদের কোনোভাবেই পর্যবেক্ষণ করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি—কেবল তাদের মহাকর্ষীয় প্রভাবই লক্ষ্য করা গেছে। ছায়াপথে এবং ছায়াপথের স্তবকে যথাক্রমে নক্ষত্র এবং ছায়াপথের গতি পর্যবেক্ষণ করে একথা নিঃসন্দেহে ধারণা করা যায় যে দৃশ্যমান [illegible] ভর লুকানো রয়েছে। ছায়াপথের আশেপাশে এ ধরনের অদৃশ্য বস্তুর [illegible] একটা গোলকাকার কিরীটের (spherical halo) মতো। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ থেকে [illegible] ছায়াপথ স্তবকের থেকে নির্গত এক্স-রশ্মির বিকিরণ এবং ছায়াপথস্তবক কর্তৃক [illegible] উচ্চ রাশ্মিসরণের ছায়াপথের আলোর মহাকর্ষীয় লেন্স প্রক্রিয়ায় ঘনীভবন (gravitational lensing) ইত্যাদি, অদৃশ্য বস্তুর উপস্থিতি নির্দেশ করে। অপ্রত্যক্ষভাবে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের স্ফীতির নীতি (cosmological inflation) অনুযায়ী বিশ্বের ঘনত্ব প্যারামিটারের মান হওয়া উচিত ১ ($\Omega = 1$), যেখানে পর্যবেক্ষণসম্মত মান হলো: Ω_{baryon} [illegible] ১। তাছাড়া ছায়াপথ তৈরির জন্য ঘনত্ব বিচলনের (density perturbation) উদ্ভবের [illegible] অদৃশ্য বস্তু দায়ী।

বেশিরভাগ অদৃশ্য বস্তু কি দিয়ে তৈরি তা আমরা জানি না। তবে কয়েকটি সম্ভাবনা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এমন কিছু দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার কিন্তু ভারি মৌলিক কণা আছে যারা অদৃশ্য বস্তুর সমস্যার সমাধান করতে পারে। এদের বলা হয় WIMP বা Weakly

---

[illegible] $\Omega = 1$ তবে গড় ঘনত্বের মান দাঁড়ায় ১.৫×১০$^{-৩১}$ গ্রাম/সি.সি.

Interacting Massive Particles। এরা হলো নিউট্রিনো (যদি ভরযুক্ত হয়), এক্সিওন (বিশেষ ধরনের কণিকা) এবং অত্যন্ত ভারি পরমপ্রতিসম কণা (যেমন নিউট্রালিনো, ফোটিনো ইত্যাদি)। যদি অদৃশ্য বস্তুর আচরণ আপেক্ষিকতত্ত্বসম্মত (relativistic) হয় অর্থাৎ উচ্চগতির হয় তবে এদের বলে Hot Dark Matter বা HDM। নিউট্রিনো এই গোত্রের। ধারণা করা হয় এর নিশ্চল ভর বড়জোর ১০ ইলেকট্রন ভোল্ট হতে পারে। এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট করে এর ভর নির্ণয় করা যায়নি।[১] তবে এমন কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে যা নিউট্রিনোর ভর ১০ $^{-5}$ জি.ই.ভি.এর সমান। যেহেতু এদের ভর যদি উপরিউক্ত উচ্চসীমার মধ্যে হয় এবং এদের সংখ্যা পটিভূমির ফোটন সংখ্যার প্রায় সমান বলে ধরে নেওয়া হয় সেহেতু এদের কিছু পরিমাণ নিশ্চল ভর বিশ্বকে আবদ্ধ করতে যথেষ্ট হবে। আদি বিশ্বে সাধারণ পদার্থের মতো নিউট্রিনো বিকিরণের সাথে যুগলায়িত (coupled) ছিল না। বিশ্ব শীতল হওয়ার সাথে সাথে নিউট্রিনো শীতল হয়ে কম গতিসম্পন্ন (non-relativistic) হয়ে পড়ে। বিকিরণের থেকে পদার্থ বিযুগলায়িত (decoupled) হয়ে পড়ার কিছু পূর্বেই এই নিউট্রিনোগুলো মহাকর্ষের বন্ধনে বাঁধা পড়ে ছায়াপথের স্তবক তৈরিতে সহায়তা করে। অবশ্য নিউট্রিনো তিন রকমের হয়ে থাকে—ইলেকট্রন, মিউয়ন এবং টাও-সংশ্লিষ্ট নিউট্রিনো। তাছাড়া এদের প্রত্যেকেরই প্রতিকণা (antiparticle) আছে। উপরিউক্ত আলোচনা সব রকমের নিউট্রিনোর এবং প্রতি-নিউট্রিনোর জন্য প্রযোজ্য।

অদৃশ্য বস্তুর আচরণ যদি আপেক্ষিকতত্ত্বসম্মত না হয় তবে তাদেরকে সম্মিলিতভাবে Cold Dark Matter বা CDM বলে। সি.ডি.এম. নিবিড়ভাবে কণা পদার্থবিজ্ঞানের সাথে জড়িত। আমরা জানি ঘূর্ণন বা স্পিনের উপর ভিত্তি করে কণিকার দুরকমের ফার্মিয়ন এবং বোসন। কণিকাদের পরমপ্রতিসাম্য (supersymmetry) দাবি করে যে প্রতিটি ফার্মিয়ন এবং প্রতিটি বোসন কণার একটি করে যথাক্রমে বোসনিক এবং ফার্মিয়নিক প্রতিপক্ষ (super symmetric counterparts) থাকবে। ধারণা করা হয় এ ধরনের কণিকাদের ভর অনেক বেশি হবে। ফোটনের প্রতিপক্ষ এই তত্ত্বমতে হবে ফোটিনো, গ্লুয়নের জন্য হবে গ্লুয়িনো; এছাড়া আছে নিউট্রালিনো, উইনো (winos) ইত্যাদি। পরীক্ষায় এখনো এদের পাওয়া যায়নি। আরেক ধরনের সি.ডি.এম. প্রার্থী হলো এক্সিওন (axion)। এদের উদ্ভব হয় সবল বলের সি.পি. লঙ্ঘন (strong CP problem) থেকে। 'সি.পি.' এর 'সি' অর্থ আধান পরিবর্তন (charge conjugation) এবং 'পি' অর্থ প্যারিটি (Parity)। প্যারিটি হলো কোনো কণার

১. ভারতীয়, কোরিয়া, মার্কিন ও [illegible] বিজ্ঞানীদের যোগ হয়ে [illegible] কণিকার [illegible] মোহুমি খানের নেতৃত্বে প্রায় [illegible] হাজার [illegible] বিশিষ্ট [illegible] এক এবং [illegible] মধ্যপাত্র স্থাপন করা হয়েছে। এর নাম সুপার কামিওকান্দে [illegible]। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রোটন ক্ষয়ের পরীক্ষামূলক [illegible] থেকে নিউট্রিনো [illegible] মহাজাগতিক রশ্মিজাত মিউয়ন কণার উপর বিশ্লেষণ। ১৯৯৮ সালে কামিওকান্দে কোলাবোরেশনের ১৯৪ জন বিজ্ঞানী ঘোষণা করেছেন যে নিউট্রিনোর [illegible] কামিওকান্দে এর পুরো অর্থ কামিওকা নিউট্রিনো ডিটেক্টর [illegible] করে নিতে হবে বিদেশ ভাষা [illegible] সুবর্ণ রয়, পাক্ষিক দেশ, ১ মে ১৯৯৯

দর্পণ প্রতিবিম্ব বিবেচনা করা)। দেখা গেছে, সবল বল বিশেষ ধরনের আধান ও প্যারিটির সমাবেশের অধীনে প্রতিসম থাকে। অর্থাৎ সমস্ত কণাকে যদি তাদের প্রতিকণা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং তারপর যদি এদের দর্পণ–প্রতিবিম্ব গ্রহণ করা হয় তাহলে সবল মিথস্ক্রিয়ার অধীনে সমীকরণ অভিন্ন থাকে। যদিও তাত্ত্বিকভাবে সবল মিথস্ক্রিয়ার তত্ত্বে এমন কিছু শর্ত আছে যার অধীনে এই সি.পি. সমাবেশ প্রতিসম থাকার কথা নয়। ১৯৭৭ সালে পেচে (Peccei) এবং কুইন দেখান যে বিশেষ এক ধরনের প্রতিসাম্য উচ্চশক্তিতে বিভিন্ন মৌলিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে বজায় থাকে যা নিম্নশক্তিতে ভেঙে যায়। স্টিফেন ভাইনবার্গ এবং ফ্রাঙ্ক উইলজেক দেখান যে পিচি কুইন প্রতিসাম্য ভাঙনের অবশ্যম্ভাবী ফল হলো এক্সিওন নামের হাল্কা কণার। হিসাব করে দেখা গেছে এই কণাগুলো হাল্কা হলেও এদের জন্য দায়ী শূন্যভূমি এক্সিওন ক্ষেত্র (axion-field) এমনভাবে এদের সাথে যুক্ত থাকে (clumped) যে এরা যথেষ্ট ভরযুক্ত হয়ে যায়। তাই এই ক্ষেত্রটি অদৃশ্য বস্তুর জন্য বেশ আদর্শ। অদৃশ্য বস্তুর আরেক প্রার্থী কসমিক স্ট্রিং। এরা কোনো কণিকা নয় বরঞ্চ স্থানের বিক্ষোভ বা topological defects, যাদের উৎপত্তি হয়েছে আদি বিশ্বের প্রতিসাম্য ভাঙনের মধ্য দিয়ে। এরা মহাশূন্যে সুদীর্ঘ সুতাকৃতির কাঠামো তৈরি করে যারা অত্যন্ত ঘন এবং ভারি।

সারণি ৩

শ্রেণী	প্রার্থী	সম্ভাব্য ভর
HDM	নিউট্রিনো	$১০^{-১১}$ জি.ই.ভি.
CDM	নিউট্রালিনো, ফোটিনো, হিগসিনো, ভিনো	২০–৩০ জি.ই.ভি.
CDM	এক্সিওন	$১০^{-৫}$–$১০^{-৩}$ ই.ভি.

এ গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে বিশ্বের জ্যামিতি ফ্ল্যাট বা সমতল এবং স্ফীতিশীল বিশ্বের স্ট্যান্ডার্ড মডেল কর্তৃক সুব্যাখ্যাত। কিন্তু অতিসম্প্রতি পর্যবেক্ষণ থেকে এমন সব সাক্ষ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে যে বিশ্বকে ফ্ল্যাট করবার মতো প্রয়োজনীয় ব্যারিয়নিক পদার্থ তো নেইই, উপরন্তু অদৃশ্য বস্তুর সম্ভাব্য প্রার্থীও এটা মেটাতে অক্ষম (সারণি ৪)। এ সংক্রান্ত তিনটি প্রমাণ আমরা উল্লেখ করছি :

১. বিশ্বে বিরাজমান পদার্থের ঘনত্ব নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি হলো ডিউটেরিয়ামের প্রাচুর্য নির্ণয় করা। আমরা জানি বিশ্বের প্রাথমিক মুহূর্তে বিরাজমান প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে হাল্কা মৌল (যেমন হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও কিছু ডিউটেরিয়াম) তৈরি হয়েছিল। কাজেই বিভিন্ন আইসোটোপের প্রাচুর্য (abundance) তুলনা করে বিশ্বের আদিতে কি পরিমাণ হাল্কা মৌল সংশ্লেষিত হয়েছিল তা জানা যায়। ১৯৯৬ সালে আন্তঃছায়াপথীয় হাইড্রোজেন মেঘ (intergalactic hydrogen clouds : যেখানে কখনো কোনো নক্ষত্র ছিল না বিধায় তাদের ডিউটেরিয়াম মহাবিস্ফোরণের সেই ক্ষণ থেকে আজো অবিকৃত

আছে) দ্বারা দূরবর্তী কোয়েসারদের আলো শোষণের মাধ্যমে আদি ডিউটেরিয়ামের প্রাচুর্য নির্ণয় করা হয়েছিল। দেখা গেছে, সাধারণ পদার্থের গড় ঘনত্ব মহাবিশ্বকে সমতল করতে প্রয়োজনীয় পরিমাণের মাত্র ৪ থেকে ৫ শতাংশ।

২. স্তবকভুক্ত ছায়াপথদের পর্যবেক্ষণ করেও পদার্থের গড় ঘনত্বের হিসাব করা যায়। এখান থেকে দৃশ্যমান পদার্থেরই কেবল হদিস পাওয়া যায়। এসব স্তবকের উজ্জ্বল উপাদানের অধিকাংশই হলো উত্তপ্ত আন্তঃছায়াপথীয় গ্যাস যারা এক্স-রে বিকিরণ করে। এই এক্স-রে বর্ণালি থেকে প্রাপ্ত তাপমাত্রা স্তবকের মোট ভরের উপর নির্ভরশীল (যেমন বড় ও ভারি ছায়াপথের স্তবকের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ যেমন বেশি, তেমনি এই আকর্ষণকে বাধাদানকারী গ্যাসের চাপও বেশি যা এই তাপমাত্রাকে প্রকারান্তরে বাড়িয়ে দেয়)। ১৯৯৩ সালে বেশ কয়েকটি স্তবক জরিপ করে দেখা গেছে যে দৃশ্যমান ভর তাদের মোট প্রকৃত ভরের ১০ থেকে ২০ শতাংশ। ডিউটেরিয়াম প্রাচুর্য থেকে প্রাপ্ত পদার্থের গড় ঘনত্বের সাথে এই পরিমাণ মিলিয়ে বলা যায় যে স্তবকভুক্ত পদার্থের (clustered matter) ভর এবং প্রোটন ও নিউট্রনসহ বেশ কিছু অদৃশ্য বস্তুর সম্ভাব্য প্রাচুর্য বিশ্বকে সমতল করতে প্রয়োজনীয় ভরের মাত্র ৬০ শতাংশ।

৩. স্ফীতি পরবর্তী বিশ্বে কাঠামো গঠনের (growth of structure) নিউমেরিক্যাল সিমুলেশনে দেখা গেছে যে অদৃশ্য বস্তু যদি প্রোটন/নিউট্রন দ্বারা তৈরি নাও হয় (যেমন WIMPs) অর্থাৎ অবারিয়নিক প্রকৃতির হয় তবে পটভূমি বিকিরণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসমতা (tiny ripples) পরবর্তীতে ব্যাপক কাঠামোর জন্ম দিতে পারে। উপরন্তু যদি পদার্থের সার্বিক ঘনত্ব বেশি হয় তবে পদার্থের ঘন-সংগ্রহ (concentration of matter) থেকে এখনো ছায়াপথের স্তবক তৈরি হবে। কিন্তু বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসে ভারি ও সমৃদ্ধ স্তবকের তুলনামূলকভাবে মন্থর বিকাশ এ কথাই বলছে যে পদার্থের ঘনত্ব প্রয়োজনীয় ঘনত্বের ৫০ ভাগ মাত্র।

দূরবর্তী সুপারনোভাদের (type Ia) তুলনামূলক কম উজ্জ্বলতা পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতির্বিদরা সম্প্রতি বেশ জোরালো দাবি তুলেছেন যে **বিশ্ব আসলে ত্বরিত হারে প্রসারিত হচ্ছে।**[৬] প্রসারণের এই ত্বরিত হার নির্ভর করে পদার্থের ঘনত্ব (যা প্রসারণের হারকে কমিয়ে দেয়) এবং মহাজাগতিক ধ্রুবকের (যা এই হারকে বাড়িয়ে দেয়) পার্থক্যের উপর। এসব পর্যবেক্ষণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে সমতল বিশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় ভরের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ সরবরাহ করে মহাজাগতিক ধ্রুবক। তবে একথা এখন বোধহয় বলা চলে যে, আশির দশকের বিশ্বসৃষ্টতত্ত্ব, যেখানে বিশ্ব ছিল সমতল এবং যা পদার্থ দ্বারা শাসিত ছিল (matter dominated), এখন মৃত। বিশ্ব হয় উন্মুক্ত নয়তো এখনো অজ্ঞাত প্রকৃতির পদার্থ

৬. দ্রষ্টব্য Hogan *et al.* (1999)।

দ্বারা পরিপূর্ণ। মহাকর্ষীয় লেন্সকরণ প্রক্রিয়ায় (দ্রষ্টব্য অনু. ২.৬ ও ৪.১০ ; চিত্র–২.৪) একই কোয়েসারের একাধিক প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। যদি বিশ্ব প্রসারমান হয় তবে স্থানের আয়তন বেশি হওয়ায় এই ঘটনার আধিক্য বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের সংখ্যা মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি। এমনও হতে পারে যে প্রসারমান বিশ্বের একেক অঞ্চলে প্রসারণের হার বিভিন্ন। আসলে এই দৃশ্যপটের পরিবর্তন হওয়ায় এবং নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণাদির অভাবে এখনই সকল অসঙ্গতির সমাধান সম্ভব নয়। তবে এ প্রসঙ্গে আগামী কয়েক দশকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আশা করা যায়।

সারণি ৪ : বিভিন্ন ধরনের পদার্থ।[৮]

শ্রেণী	সম্ভাব্য গঠন	প্রধান সাক্ষ্য	Ω এর অংশ (আসন্ন)
দৃশ্যমান পদার্থ	সাধারণ পদার্থ (প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত) যা নক্ষত্র, গ্যাস ও ধূলিতে দেখা যায়	টেলিস্কোপে দৃশ্যমান	0.01
ব্যারিয়নিক অদৃশ্য পদার্থ	অত্যন্ত অনুজ্জ্বল সাধারণ পদার্থ যাদের প্রায় দেখাই যায় না, ধূসর (brown) ও কালো (black) বামনতারা (dwarfs) [সামষ্টিক নাম massive compast halo objects বা MACHOs]	বিগ-ব্যাঙ মডেলের কেন্দ্রীন সংশ্লেষণের গণনা এবং ডিউটেরিয়ামের প্রাচুর্য	0.05
অব্যারিয়নিক অদৃশ্য পদার্থ	দুর্বলভাবে মিথস্ক্রিয়াশীল ভারি কণিকা (WIMPs) অথবা 'এক্সিওন', ভরযুক্ত নিউট্রিনো প্রভৃতি	দৃশ্যমান বস্তুর মহাকর্ষীয় প্রভাব ছায়াপথের অভ্যন্তরে নক্ষত্রের বা স্তবকের ভেতরে ছায়াপথের কক্ষীয় গতির ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম	0.3
মহাজাগতিক 'অদৃশ্য' পদার্থ	মহাজাগতিক ধ্রুবক (শূন্যস্থানের শক্তি)	পটভূমি বিকিরণের সুষমতার সাক্ষ্য থেকে বলা যায় যে বিশ্ব সমতল (flat) : কিন্তু একে সমতল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যারিয়নিক বা অব্যারিয়নিক পদার্থ নেই	0.6

৭. এই সাম্প্রতিক চিত্রকে কিভাবে স্ফীতির মডেলে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার জন্য দ্রষ্টব্য–Inflation in a Low-Density Universe—M.A. Bucher & D.N. Spergel (1999), *Scientific American*, Jan., Vol. 280, No. 1।

৮. দ্রষ্টব্য Krauss (1999)।

বিশ্বের নিয়তি তাই এখনো অনির্ধারিত। জ্যোতিঃপদার্থবিদরা নিরলস গবেষণা করে চলেছেন সম্ভাব্য কয়েকটি মডেলের মধ্য থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে। হয়ত তাঁরা সফল হবেন। হয়ত আরো অনেক অজানা প্রশ্ন উঠে আসবে। হয়ত তার আগেই আমাদের নিজেদের নিয়তিই নির্ধারিত হয়ে যাবে। ওমর খাইয়ামের ভাষায় :

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধানো তারো বীজ আছে তায়
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই
সৃষ্টিকর্ত্রী প্রলয়রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই।।

বইপত্র

'বিশ্বের অন্তিম নিয়তি' বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে Islam (1983)। সবশ্রেণীর পাঠকের জন্য নির্দ্বিধায় একটি ভাল বই। অগ্রসর পাঠককে অধিকতর তথ্য দেবে Gott *et al* (1976) এবং Dicas *et al* (1983)। অদৃশ্য বস্তু বা ডার্ক ম্যাটারের উপর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে Peebles (1993), Rubin (1983 & 1998)-এ। এছাড়া Krauss (1986) দেখা যেতে পারে। এছাড়া Krauss (1999), Rees (1999) ও Krauss & Starkman (1999) বিশেষভাবে পাঠ্য। তবে এ সম্পর্কে প্রতিনিয়ত নতুনতর তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে। তাই ইন্টারনেটে এ সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম তথ্য পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

অষ্টম অধ্যায়

বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের সৌন্দর্য

I maintain that the cosmic religious feeling is the strongest and noblest motive for scientific research.

Albert Einstein

The Beauty of the Universe consists not only of unity in variety but also of variety in unity.

Umberto Eco

সংস্কৃতে বলা হয়েছে :

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি

এর অর্থ হলো : যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা সবই আনন্দ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, আনন্দের দ্বারাই তারা জীবিত আছে, আর সেই আনন্দের মধ্যেই তারা প্রবেশ করে। মহাবিশ্ব এক অনির্বচনীয় আনন্দের উৎস। এই আনন্দ আসে অনন্ত সৌন্দর্য থেকে। মহাবিশ্বের এই সৌন্দর্যই বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে সৌন্দর্যানুভূতি এনে দিয়েছে। আর তাই বিজ্ঞানীরা বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব চর্চায় ও চর্যায় আনন্দ খুঁজে পান। এ এক অকারণ আনন্দবোধ। স্টিভেন ভাইনবার্গের ভাষায় "... এ হচ্ছে মনের এক অসাধারণ অনুশীলন"।[১] সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় "...সর্বব্যাপী বাঙ্ময় জগৎ ; নির্বাণ বুদ্ধির স্বপ্ন"।[২] বর্তমান রচনার বিভিন্ন অংশে আমরা মহাবিশ্বের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়েছি। আমরা জানি যে লক্ষ কোটি নক্ষত্রের এক অসাধারণ মিলনমেলায় আমাদের বাস, আমাদের বসতি। আমাদের চারদিকে অগণিত তারা, ছায়াপথ আর নীহারিকা বিস্তৃত আর বিধৃত হয়ে আছে। কবির প্রাণ যেখানে আশ্রয় খোঁজে কাব্যে :

---

১ দ্রষ্টব্য: স্টিভেন ভাইনবার্গের সাক্ষাৎকার, *কথোপকথন*, ভাষান্তর ও সম্পাদনা—রাজু আলাউদ্দিন, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।

২ দ্রষ্টব্য: *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, সম্পাদনা—জগন্নাথ চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, পৃ. ৯১।

আকাশ ভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

আমাদের সবার চেতনার গহীন বিস্ময় তখন কবির কণ্ঠে জগতোত্তর মতো বেজে ওঠে। বস্তুগতভাবে রূপকল্পিত এই বিস্ময়কর মহাবিশ্ব মূর্ত হয়ে ওঠে অতিতপ্ত, জমাটবদ্ধ গ্যাস আর ধূলিকণার প্রলয়ে। এই জমাট গ্যাসের আধার হলো বিচিত্র রকমের নক্ষত্র। অনেক নক্ষত্র মিলে ছায়াপথ আর ছায়াপথদের জোট হলো ছায়াপথস্তবক। এই অনন্ত নক্ষত্রবীথি আকারে যেমন কল্পনাতীত বিশাল, এদের মধ্যের দূরত্বও তেমনি অকল্পনীয়। মহাবিশ্বের অনন্ত বিস্তৃতির প্রেক্ষাপটে এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কল্পনা আমাদের নিয়ে যায় রোমাঞ্চকর অনুভূতির এক আশ্চর্য রূপময়তায়। রোমান্টিকতার এক অসাধারণ রূপক মহাকাশের এইসব নক্ষত্রেরা। প্রখ্যাত মহাকাশবিদ কার্ল সাগান তাঁর সাড়া জাগানো বই 'কসমস' এ এরকমই ইঙ্গিত দিয়েছেন :

> *বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে সামান্যতম চিন্তাও আমাদের বিচলিত করে। মেরুদণ্ডে শিহরণ জাগায়, হঠাৎ চুপ করে যেতে ইচ্ছে হয়। এমন একটা ক্ষীণ অনুভূতি আসে যেন বহু উঁচু থেকে পড়ার একটা দূরবর্তী স্মৃতি। বোঝা যায় যে আমরা গভীরতম রহস্যের দিকে এগিয়ে চলেছি।*

মানুষের ক্ষুদ্রতা এখানেই প্রকটতর।

মানুষের অস্তিত্বের এই নিতান্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতার সামান্যতা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বিপুল বিস্তৃত মহাবিশ্বের অনন্ত পরিপ্রেক্ষিতের চেতনা ও দর্শনে, অভিব্যক্তিতে ও প্রেষণায়। আসিরীয় সভ্যতার সময় থেকেই এই প্রেষণার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় প্রায় চার হাজার বছর আগে নিকটপ্রাচ্য এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষেরাই প্রথম আকাশের কথা ভাবতে শুরু করে। এই অঞ্চলের একটি গুহায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের হাতে আঁকা ছবি পাওয়া গেছে। মানুষ হয়ত আরো আগেই আকাশকে দেখেছে। কিন্তু জানা আর বোঝার শুরু সম্ভবত তখনই। প্রাচীন পর্যবেক্ষকরা (যাদের প্রোটোবিজ্ঞানী নামে অভিহিত করা যায়) দেখলেন কোনো নির্দিষ্ট (বা একগুচ্ছ) তারা আকাশে দেখা দিলে কোনোটির জন্য হচ্ছে বন্যা, কোনোটির জন্য বা খরা। এভাবে তারা জ্যোতিষ্ককে ভাগ্যের জন্য দায়ী করলেন। এবং এর আরো পরে কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস ও গণিত সম্পৃক্ত হয়ে গড়ে উঠল জ্যোতিষশাস্ত্র। পরবর্তীকালে এর থেকে বিশুদ্ধ যুক্তির (গণিতের) অংশ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গড়ে উঠল আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান। আদিম পর্যবেক্ষকরা আকাশের কতকগুলি তারা নিয়ে মানচিত্র ছবি কল্পনা করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট পুরাণও রচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারাচিত্রে যেসব নক্ষত্রমণ্ডলী কল্পিত হয়েছে সেগুলির কোনো ভৌত তাৎপর্য নেই। কেবল আমাদের দৃষ্টিরেখা বরাবর বিশেষ সজ্জায় সজ্জিত থাকে বলেই এমনটি কল্পনা করা যায়। একই রাশির অন্তর্গত বিভিন্ন তারার দূরত্বও বিভিন্নরকম। এসব তারাচিত্র সুপ্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতা থেকে আজো প্রচলিত আছে। অথচ পৃথিবীর অয়নচলনের (precession) জন্য

এদের [illegible] অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেকখানি। গ্রিসে হেলেনীয় সভ্যতার সময়ে সাম্যের মহাবিষুব (vernal equinox) ঘটতো মেষরাশিতে। অর্থাৎ ২১শে মার্চ সূর্য মেষরাশিতে প্রবেশ করতো এবং নববর্ষ শুরু হতো। কিন্তু অয়নচলনের জন্য সেটি এখন ঘটে মীনরাশিতে। ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে রাশিচক্র এবং ৪১৯ অব্দে কোষ্ঠীবিচার শুরু হয়। ফলিত জ্যোতিষের চর্চাও শুরু হয় এখান থেকে। বলা হয়, প্রাচীন পারসিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা জরথুস্ত্র (বা জোরোস্টার) ফলিত জ্যোতিষের চর্চা শুরু করেন। সেই থেকে এই চর্চা অব্যাহত আছে আজো। কিন্তু এ ভাবনাটি হাস্যকর যে, কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রপুঞ্জ পৃথিবীর কোনো ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারণ করছে।

বিশ্বকে নতুন মাত্রায় জানবার পদযাত্রা শুরু হলো আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কারের পর থেকে। দেখা গেল, বিশ্বকে জানা সম্ভব ; একে গণিতের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। প্রাচীন গ্রিক দেবতার মর্জিমাফিক চলে না বরঞ্চ ভৌত আইনের শৃঙ্খলাই প্রাধান্য পায়। ভাবতে অবাক লাগে আমাদের ল্যাবরেটরিতে আমরা যেসব ভৌত আইন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি সেই একই আইন অতিদূর নক্ষত্রের–ছায়াপথের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণাই কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার ছন্দে একইসুরে দুলছে। এক পা'ও এদিক-ওদিক হেলবার জো নেই। এই নিয়মতান্ত্রিকতাই বিশ্বের সৌন্দর্য।

বিশ্বের সমস্ত সাংগঠনিক স্তরেই রয়েছে কাঠামোর সুশৃংখল বিন্যাস। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে কাঠামোর বিন্যাসের এই প্রকৃতি আমাদের কাছে উন্মোচিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটি দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত প্রশ্ন করা যায় : The Universe is either a Chaos or a Cosmos। আসলে এটি একটি যৌক্তিক হেত্বাভাস (fallacy)। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর গ্রিক কবি হেসিওড লিখিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'থিওগোনী'তে প্রাচীন গ্রিসের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এর বর্ণনানুসারে জানা যায় প্রাচীন গ্রিকরা বিশ্বাস করতো যে সৃষ্টির প্রথম অবস্থা ছিল 'কেওস' (Chaos)। এটি সর্বপ্রথমে সৃষ্ট হয়। সৃষ্ট হওয়ার পর কেওস নাইট নামক দেবীর সাথে মিলিত হয়। অন্যান্য দেবতা ও মানুষ আসলে এদেরই সন্তান–সন্ততি। বিশৃঙ্খলা বা কেওস থেকে তৈরি বিশ্ব ছিল সেই গ্রিক বিশ্বাসের অনুসারী যে, অবোধ্য প্রকৃতি খেয়ালী দেবতাদের মর্জিমাফিক চলে। ষষ্ঠ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আয়োনিয়ায় মানবসভ্যতার প্রথম জ্ঞানের স্ফুরণ ঘটল। দেখা গেল, প্রকৃতিকে জানা সম্ভব। প্রকৃতির অন্তরালে রয়েছে নিয়মতান্ত্রিকতার এক সুদৃঢ় ভিত্তি। এমন কিছু বিধি আছে যা প্রকৃতিও অনুসরণ করতে বাধ্য। বিশ্বের এই নিয়মতান্ত্রিক আচরণকে বলা হলো 'কসমস' (Cosmos)। মহাবিস্ফোরণের প্রথম কয়েক মুহূর্তের সেই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা (কেওস) সময়ের বিবর্তনে বর্তমানের সুশৃঙ্খল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে (কসমস) পরিণত হয়েছে। কাজেই ব্রহ্মাণ্ড এককভাবে কেওসও নয় কসমসও নয়—দুয়ে মিলে এক অনন্য সত্তা। কেওস থেকে কসমসে বিশ্বের এই বিবর্তন একইসাথে অন্ধকার থেকে যুক্তির আলোয় জ্ঞানের উত্তরণও বটে। এই বিশেষ জ্ঞানই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কোনো প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান নয়। এটি অর্জিত জ্ঞান। প্রায় ছয় হাজার বছর আগে সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথ–পরিক্রমায় আমরা পেয়েছি পৃথিবী–কেন্দ্রিক অ্যারিস্টটল টলেমীয় বিশ্বচিত্র, পেয়েছি কোপার্নিকাস–গ্যালিলিয়ের বিশ্বচিত্র। যতোই আমরা অগ্রসর হয়েছি ততোই সৃষ্টির নতুন নতুন স্তর উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা

ভেবেছি এই বুঝি পরম সত্য। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র ভাষ্য অনুযায়ী :

> *The plan is intricate and subtle and each glimpse of another layer has led philosophers and scientists to a deeper mental image of the physical world. These images have surprising clarity and coherence from the view of the cosmos as geometry by the Greeks, to the mechanistic clockwork of the Newtonian universe, to the quirky subatomic 'dance' of quantum particles and fields, to a geometric worldview with a relativistic and quantum twist.*

আধুনিক তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্বসৃষ্টির যে চিত্রটি আমরা তৈরি করতে পেরেছি তা সংক্ষেপে এরকম : মহাবিস্ফোরণ বা বিগ-ব্যাঙের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির মৌলিক বলচতুষ্টয়, ভর-শক্তি, স্থান-কাল এবং দৃশ্যমান সবকিছুরই উৎপত্তি হয়েছে। সেই আদি আগুনের গোলকের প্রধান উপাদান ছিল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। বিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত ও শীতল হতে থাকলে পদার্থের উপর মহাকর্ষ বল প্রাধান্য বিস্তার করে এবং ফলত সৃষ্টি হয় ছায়াপথ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর। তারার ভেতরে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পুড়ে ভারি পদার্থের সৃষ্টি হয়। নাক্ষত্রিক তন্দুরিতে সৃষ্ট এই ভারি পদার্থ ঐ নক্ষত্রসমূহের মৃত্যুর সময়ে প্রবল বিস্ফোরণের ফলে ছড়িয়ে পড়ে আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে। আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘের গ্যাসের সাথে এটি মিশে যায়। এই মেঘের শীতল ঘন অংশ থেকে তৈরি হয় নতুন তারার। ঠিক একইরকম পদ্ধতিতে আমাদের ছায়াপথের বাইরের দিকের একটি আণবিক মেঘের থেকে সূর্যের জন্ম হয়েছে। এই ভ্রূণ-সূর্যের চারপাশের পাথুরে বস্তুকণা থেকে জন্ম নিয়েছে আমাদের পৃথিবী। আমাদের সৌভাগ্য যে এখানে পানির উপস্থিতি ছিল তিন দশাতেই (কঠিন, তরল ও বায়বীয়)। এই আদিম তরল সমুদ্রে কার্বনভিত্তিক রসায়নের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় প্রাণের। এভাবে এক সময়ে বুদ্ধিমান মানুষের আবির্ভাব ঘটে যারা আকাশের দিকে চাইল এবং ভাবতে শিখল। এই মানুষই এক সময়ে বিশ্বের সৃষ্টির রহস্যের জাল ছিঁড়তে আরম্ভ করে। প্রখ্যাত কবি জয় গোস্বামীর কাব্যময় ভাষায়ও ফুটে উঠেছে এই মহাজাগতিক ছন্দ। তিনি বলছেন :

> *রাত্রির নির্জনে, দিগন্তের ধারে, সমস্ত বিশ্বের স্তব্ধতায় ... আছে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ভাসমান পদার্থপুঞ্জ। এরাই নানা অনুপাতে মিলে গিয়ে তৈরি করেছে আমার শরীর। বিনাশহীন সেই প্রবহমান শক্তিধারার মধ্যে থেকেই আমার সৃষ্টি। জন্ম। আবার বিনাশহীন এই শক্তিধারা, এই আগুন জল বাতাস এবং বাতাসহীন শূন্যের মধ্যেই একদিন মিশে যাবো আমি। সেও আর এক জন্ম। তখন আমি আদি অন্তহারা মহাদেশ। আমি অমৃতের সন্তান। কিন্তু বহমান শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে নিজের এই সম্পর্কের ধারণা আমি বুঝতে পারি কিভাবে? বুঝতে পারি রাত্রিবেলায়। দাঁড়াই যখন ছাতে, খোলা মাঠে। তাকাই যখন আকাশে, মাথার উপর আকাশ জোড়া অন্ধকার থেকে যখন ফুটে ওঠে নক্ষত্রপুঞ্জ। জানি, ওরা কেউ কেউ সূর্যের চেয়েও কয়েক গুণ, কয়েকশো গুণ বড়। অতিকায় শক্তির আধার। কোটি কোটি মাইল দূরে, তবু খালি চোখে তাকানো মাত্র দেখতে পাই। যেই দেখতে পেলাম অমনি এক যোগ ঘটল। যুক্ত হলাম আমি তারাজগতের সঙ্গে। কিভাবে? আলোর মধ্য দিয়ে। একবার তাকিয়েই। অত দূরের ওইসব নক্ষত্র, যারা প্রতি মুহূর্তে শক্তি*

বিকিরণ করছে. ওরা যেমন সত্যি, এই জনহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র এক মানবশরীর এই আমিও তেমন সত্যি। একটি আলো আমাদের যুক্ত করছে। ওই সব নক্ষত্র, এমন কি না-দেখা সব তারা, যে-উপাদানে তৈরি। সেই উপাদান, অনাভাবে মিশে তৈরি করেছে আমাকেও। আর তখনই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী উপাদানগুলির আত্মীয়তায়, শক্তি পুঞ্জের টানে, আমার শরীর। ... বাস্তবের সব চাপ, সভ্যতার সব আঘাত, এবং ব্যক্তির খণ্ডিত সীমা ছাড়িয়ে, যেন প্রায় এক স্বপ্নে, বহমান সৃষ্টিধারার মূল শক্তির মধ্যে সে মুক্তি পায়। অতিকায় রূপ ধরে। আকাশ ভেদ করে যায় তার মাথা এবং শেষে, মানবশরীরও তার থাকে না। শরীর তখন মিলিয়ে যায়।"

('মৃত্যুর পর মৃত্যু পেরিয়ে'; পাক্ষিক দেশ; ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৮)

রাতের আকাশের ঝলমলে তারার মেলা আমাদেরকে আকর্ষণ করে। মন হারিয়ে যায় এক সুবিশাল ব্যাপ্তিতে। ব্যাপ্তির এই এক মিস্টিক আকর্ষণ রয়েছে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ভাষায় : "রহস্যই সর্বাতীত সৌন্দর্যের প্রতীক, এই অনুভূতির সাথে যার পরিচয় ঘটেনি, অনন্ত রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যার মন অপার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয় না— ধরতে হবে তার মৃত্যু হয়েছে, মন আর চোখ দুয়েরই।" আসলে বৃহতের কাছে মানবমন সবসময়েই কেন জানি পরাস্ত হয়। কিন্তু একই সাথে কার্য-কারণ সম্পর্কও মানুষ ঠিক খুঁজে বের করে। এটাই ক্রিটিকাল থিঙ্কিংয়ের ফল। মিস্টিক ও ক্রিটিকাল—চিন্তার এই দুই পদ্ধতি মানুষকে দ্বন্দ্বের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রশ্ন করা এবং সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা-- জ্ঞানের এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে পাথেয় করে মানবসভ্যতা এগিয়ে চলেছে। মানুষ তার চিন্তা-বুদ্ধি জ্ঞান মনীষা দিয়ে জ্ঞানসমুদ্রের বালুকাবেলায় দীপ্ত পদচারণা শুরু করেছে।

বিশ্ব দিকনিরপেক্ষ ও সমসত্ত্ব। এই সুসামঞ্জস্যতাই বিশ্বকে অপরূপ করে তুলেছে। এর সৌন্দর্য যেমন আবহমানকাল থেকে ব্রাত্য মানুষের চোখে ধরা পড়েছে, তেমনি ধরা পড়েছে বিজ্ঞানীর কাছে গণিতের সূত্রে, কবির কবিতায়, দার্শনিকের চিন্তায়, ভাবুকের ভাবনায়, লেখকের লেখনীতে। সেই অসীম নান্দনিক বিশ্বচিত্র বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন উপমায়, বিভিন্ন চিত্রকল্প, রূপক কিংবা বিমূর্ত প্রত্যয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে আমাদের চিন্তায়-চেতনায়-মননে-কর্মে বিশ্বাসে এবং উপলব্ধিতে আর অনুভবে। বিশ্ব কেন এতো সুন্দর? কিংবা কার জন্যে এই অপরূপ অপার্থিব মহাজাগতিক সাজ? এ প্রশ্নের উত্তর অনাদিকাল থেকে আজো রয়ে গেছে কুহকী, যাদুগাঁথার কোনো মহাকাব্যের মতোন। বিশ্ব সুন্দর কারণ তা সুন্দর। এই সৌন্দর্যের কোনো তুলনা যেমন নেই তেমনি কোনো কারণও নেই। এটাই অনন্ত বিশ্বের মহাবৈশ্বিক নন্দনতত্ত্ব। কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর অননুকরণীয় গদ্যে অনন্ত মহাবিশ্বের কালিক বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি চমৎকার স্বপ্নের উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

অনন্ত জগতের কথা চিন্তা করিতে গেলে বুদ্ধি কেন, কল্পনাও আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। স্বপ্নরাজ্যও এই বিশাল, ভয়াবহ, মহান অনন্তকে ধারণা করিতে অক্ষম। এ বিষয়ে জ্যা পল রিশটারের লিখিত একটি চমৎকার স্বপ্নবৃত্তান্ত আছে। কোন ব্যক্তিকে আকাশের ঘেরাটোপের ভিতর লইয়া গিয়া অনন্ত স্থান-সমুদ্রের ভিতর দিয়া জগতের পর জগৎ দেখানো হইল। অবশেষে সম্মুখবর্তী অসীমের দিকে দৃষ্টিপাত

করিয়া তাহার চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন সে অন্যমনস্কে অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে বলিল "স্বর্গীয়দূত ক্ষান্ত হও। আমি আর অগ্রসর হইতে পারি না —এই 'অনন্তের' সম্মুখে আমার চিত্ত ব্যথিত, পীড়িত। বিশ্বাসীদের অপার মহিমা অসহনীয়। আমাকে এখন অনন্ত, উন্মুক্ত, বায়ুর নিম্নাঞ্চল হইতে রক্ষা কর— আমি যে ইহার কোন শেষ দেখিতেছি না"। তখন স্বর্গীয়দূত অতিশয় চঞ্চল হস্তের সঙ্কেতে ঐ আকাশের মহাকাশের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, "নিম্ন সম্বন্ধে অনন্তের অন্ত কোথাও নাই; আর এ দিকে দেখ ইহার আদিও নাই"।

(অসীমের সন্ধানে)

অতলান্তিক স্বপ্নঘোরের অপার এই যে মহাবিশ্ব, তার গাঢ় ও গহীন সৌন্দর্যের কথা পবিত্র কোরআন শরীফের একটি আয়াতে এক অনন্তর ব্যঞ্জনায় প্রতিফলিত হয়েছে :

তুমি ... সৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি দেখতে পাবে না। তুমি আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমার দৃষ্টি তোমারই কাছে ফিরে আসবে ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে। (৬৭ : ৩৪)

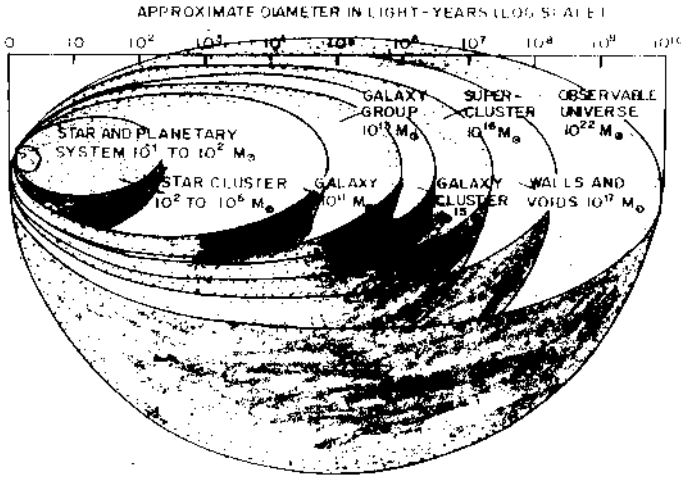

চিত্র ৮.১ : মহাবিশ্বের কাঠামো পরম্পরা। মহাকর্ষীয় অবস্থায় আকৃষ্ট বস্তুর সংগঠন ইলো ও উপস্তবক (ভর সূর্যের 10^{-1} গুণ)। স্তবকের চেয়ে বড় কাঠামো আছে (যেমন মহাস্তবক ও great walls ইত্যাদি); কিন্তু এরা মহাকর্ষীয় বাঁধনে বাঁধা নয়। এদের চেয়েও বৃহত্তর স্কেলে বিশ্ব কাঠামো হীন বলে ধরে নেয়া হয়।

৩. স্বর্গদূত সম্পূর্ণ সঠিক কথা বলেছেন এমন বাক্যে কথা সঙ্গত হবে না। যেমন মহাবিশ্ব স্থানিক ভাবে সীমিত (spatially finite) হলেও এর কোনো কিনারা (edge) নেই। সে হিসেবে "অনন্তের অন্ত কোথাও নাই" কথাটি সঠিক। কিন্তু হকিং ও পেনরোজের উপপাদ্য অনুযায়ী আদি বীজকণা বিন্দুর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী হলে "ইহার আদিও নাই" কথাটি ঠিক হবে না। বাস্তবিকপক্ষে স্বপ্নরাজ্যের বর্ণনা কিছুটা স্বাপ্নিক হয় বৈকি।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১
বস্তুকণার গভীরে

বলা হচ্ছে, বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এক অতি ক্ষুদ্র, অত্যুত্তপ্ত, অতিঘন বিন্দুর এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এবং বর্তমানে সুপ্রচলিত মহাবিস্ফোরণ মডেলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এটাই। ব্যাপক পটভূমিতে বিশ্বের প্রসারণ এবং বিশ্বমঞ্চে পটভূমি বিকিরণের অস্তিত্ব এই ধারণার সমর্থন দিচ্ছে। অতীতে যখন বিশ্বের পরিধি কম ছিল তখন বিশ্ব ছিল অত্যুত্তপ্ত। অতীত বলতে এখানে সৃষ্টির পরম ক্ষণের প্রথম তিন মিনিটের কথা বুঝানো হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই অতি ক্ষুদ্র, অতিঘন পরিবেশে চিরায়ত জগৎ অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ সময়কার ভৌত ঘটনার বর্ণনায় চিরায়ত জগৎ সম্পর্কিত নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞান তো প্রয়োজনই পড়ে না, এমনকি আপেক্ষিকতত্ত্বও ভেঙে পড়ে। কারণ অতি ক্ষুদ্রের জগতে ধ্রুপদী বা চিরায়ত বিজ্ঞান অকেজো। তাই দরকার হয় কণা পদার্থবিজ্ঞান (particle physics) এবং কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান (quantum mechanics)। ঐ সময়কার কয়েক হাজার লক্ষ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কোনো পদার্থের সংশ্লেষণ সম্ভব হয়নি। ফলে ঐ সময়ে বিশ্বে বিরাজমান ছিল অসংখ্য অবপরমাণবিক কণা (subatomic particles)। তাই সৃষ্টির পরম পবিত্র মাহেন্দ্র ক্ষণের যথোপযুক্ত বর্ণনা দিতে কণাজগতের সম্যক ধারণা বাঞ্ছনীয়।

"কণাজগতের মায়া ও বাস্তবতা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক নান্দনিক সমস্যার।" পদার্থ কি? বস্তু কি? এর মৌলিক গঠন জানার প্রচেষ্টা শুরু হয় সভ্যতার সেই উষালগ্ন থেকে। আমরা যতোই আমাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর দিকে দিচ্ছি ততোই কাঠামোর নতুন নতুন স্তর উন্মোচিত হচ্ছে। সৃষ্টির এ এক রহস্যময় লীলা। কণাজগতের জয়যাত্রা শুরু হয় উনবিংশ শতকে জন ডাল্টনের তত্ত্ব দিয়ে। তিনি বলেছেন, যেকোনো মৌলই 'পরমাণু' নামক অবিভাজ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি। ১৮৯৭ সালে জে. জে. টমসন পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র এবং এর গঠনোপাদান ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন। ১৯১৯ সালে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড দেখান যে, পরমাণুর সমস্ত ভর এর একটি ক্ষুদ্র অংশ— কেন্দ্রীনে (nucleus) ঘনীভূত থাকে ($১০^{-১৪}$ মি.)। তিনি সৌরজগতের আদলে পরমাণুর একটি মডেল দেন যাতে কেন্দ্রীনকে ঘিরে ইলেকট্রন ঘূর্ণ্যমান। পরবর্তীকালে ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন ও নিরপেক্ষ নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়। ১৯১৩ সালে নীলস্ বোর বলেন যে, ইলেকট্রনসমূহ শক্তির ভিত্তিতে কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট অনুমোদিত কক্ষপথে ঘুরতে পারে। ১৯১৫ সালে আর্নল্ড সমারফেল্ড কোয়ান্টাম শর্ত ব্যবহার করে দেখান যে, ইলেকট্রনের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। ইতোমধ্যে ম্যাক্স প্ল্যাংকের বিকিরণের কোয়ান্টাম তত্ত্ব ব্যবহারোপযোগিতা পেয়েছে। সে সময়ে ১৯২৩ এর দিকে

৩ টিংগেনে সমাগত একদল সংখ্যাবিদের উদ্দেশ্যে ম্যাক্স বর্ন বলেন, "পদার্থবিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি তা ছমাসেই পূর্ণ হবে।" কারণ এর কিছুদিন আগে ইলেকট্রনের আচরণ ব্যাখ্যাকারী ডিরাক সমীকরণ (পি. এ. এম. ডিরাক কর্তৃক) আবিষ্কৃত হয়। ধারণা করা হয়, তখন পর্যন্ত জানা অপর একটিমাত্র মৌলিক কণা প্রোটনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারক সমীকরণও শীঘ্রই পাওয়া যাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে আরো অসংখ্য অবপারমাণবিক কণিকা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ধারণা অঙ্কুরেই নস্যাৎ হয়ে যায়। বস্তুর অভ্যন্তরীণ কাঠামো ক্রমেই জটিলতর হচ্ছে। আজ আমরা জানি যে অবপারমাণবিক কণিকা রয়েছে ২০০'রও বেশি।

কণিকাদের শ্রেণীবিভাগের কথায় আসা যাক। ঘূর্ণন বা স্পিনের উপর নির্ভর করে এদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়—বোসন ও ফার্মিয়ন। যে সমস্ত কণার ঘূর্ণন পূর্ণসংখ্যক (০, ১, ২, ...) তারা বোসন (যেমন ফোটন) ; যাদের ঘূর্ণন অর্ধপূর্ণসংখ্যক ($^1/_2$, $^3/_2$, $^5/_2$...) তারা ফার্মিয়ন (যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন)। অবশ্য ঘূর্ণন শব্দটি লাটিমের মতো বন্‌বন্ করে ঘোরা বুঝায় না। কারণ অতি ক্ষুদ্রের জগতে এর কোনো তাৎপর্য নেই। এটি আসলে কণার অভ্যন্তরীণ কৌণিক ভরবেগ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইলেকট্রনের আচরণ ঘূর্ণ্যমান বৈদ্যুতিক আধানের মতো। ফলে একটি চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হয় যার নিজস্ব চৌম্বক ভ্রামক থাকে। পরমাণুস্থ ইলেকট্রন তার অভ্যন্তরস্থ চুম্বককে অবশিষ্ট পরমাণুর চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে হয় সমান্তরাল অথবা লম্বালম্বিভাবে স্থাপন করে। কাজেই ঘূর্ণনের দুটি সম্ভাব্য কোয়ান্টায়িত দশা আছে (হয় $+^1/_2$ বা $-^1/_2$)। ফার্মি কণারা **পাউলি'র বর্জন নীতি** নামে একটি বিধি মেনে চলে। কিন্তু বোসন কণাগুলি তা মানে না। পাউলি'র বর্জন নীতি হলো যে কোনো দুটি ফার্মিয়নের ৪টি অভিন্ন মানের কোয়ান্টাম সংখ্যা (মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা n, দিগংশ কোয়ান্টাম সংখ্যা l, ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা m, স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা s) থাকতে বাধা দেয়। বোসন কণা বসু–আইনস্টাইন সংখ্যায়ন, এবং ফার্মিয়ন কণা ফার্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন মেনে চলে।

আমরা জানি, প্রকৃতিতে চারটি মৌলিক বল আছে। সবল বল, দুর্বল (বা ক্ষীণ) বল, বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল ও মহাকর্ষ বল। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ক্ষেত্র (ফিল্ড) রয়েছে। কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্ব অনুযায়ী বলা যায় প্রত্যেক বলের নিজস্ব ক্ষেত্রের দরুন ঐ বল বহনকারী বা ক্ষেত্রের পরিচায়ক অবপারমাণবিক কণিকা থাকবে। সাধারণভাবে বস্তুবিশ্বের জড় অংশ ফার্মিয়ন দ্বারা গঠিত এবং সমস্ত সবল বা মিথস্ক্রিয়া বোসন দ্বারা বাহিত হয়। মিথস্ক্রিয়াগতভাবে মৌলিক বস্তুকণা দু'রকমের—হ্যাড্রন ও লেপটন।

হ্যাড্রন (Hadrons) : এটি সকল বলের সাথেই মিথস্ক্রিয়া করে। প্রোটন, নিউট্রন হলো হ্যাড্রন। হ্যাড্রন যে গ্রিক শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে তার অর্থ 'সবল'। কিছু হ্যাড্রন আছে যারা $১০^{-১৫}$ থেকে $১০^{-৮}$ সেকেন্ড সময়ের জন্য অস্তিত্ববান হয়। এরা স্থায়ী হ্যাড্রন। এরা উচ্চশক্তিতে সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হ্যাড্রন হলো প্রোটন যার জীবনকাল $১০^{৩২}$ বছরের মতো। স্থায়ী হ্যাড্রনরা আবার দুর্বল বলের প্রভাবে ভেঙে যেতে পারে। যখন কণিকাদের

সংঘর্ষের নিট শক্তি নতুন কণার ভর সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট হয় তখন নতুন ধরনের কণার উদ্ভব হয়, এদের বলে অনুরণন কণা (resonance particles)। এরা ক্ষণস্থায়ী। সবল বল $১০^{-২৩}$ সেকেন্ডের মধ্যে একেও ভেঙ্গে ফেলে। স্থায়ী হোক বা না হোক, হ্যাড্রন পরিবারকে দুভাগে ভাগ করা যায় —ব্যারিয়ন বা ভারি কণা এবং মেসন বা হাল্কা কণা। ব্যারিয়নদের মধ্যে আছে প্রোটন, নিউট্রন, ল্যাম্বডা, সিগমা, ক্যাসকেড, ওমেগা ইত্যাদি। মেসনের উদাহরণ হলো পাই ($\pi^{\pm}$, π°) বা পায়ন, কে ($K^{\pm}$, K°) বা কেয়ন ইত্যাদি। হ্যাড্রনদের জন্য একটি সংরক্ষিত কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে, একে বলে ব্যারিয়ন বা ভারিত্বের সংখ্যা। ব্যারিয়নদের জন্য B = ১, মেসনদের জন্য শূন্য (লেপটন, পরিমাপ বোসনদের জন্যও এটি শূন্য)।

লেপটন (Leptons) : এরা সবল বল ভিন্ন অন্য যেকোনো বলের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। লেপটনের সুপরিচিত সদস্য ইলেকট্রন —যার ভর 0.511 MeV (মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট)। আধান ১.৬×১০^{-১৯} কুলম্ব। এটাই সবচেয়ে হাল্কা লেপটন। এর চেয়ে ভারি লেপটন সদস্য হলো 105 MeV ভরের মিউয়ন (muon)। ২.২ মাইক্রোসেকেন্ডে এটি ভেঙে যায় (e-ν_{μ} anti-ν_e)। এই ভাঙন ঘটে দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার জন্য। আরো ভারি লেপটন হলো টাও লেপটন। এটি অস্বাভাবিক ভারি—প্রায় 1784 Mev, এটি ক্ষণস্থায়ীও বটে ($১০^{-১৩}$ সেকেন্ড সময়কাল)। এই তিন ধরনের লেপটনই আধানযুক্ত। আরেক ধরনের লেপটন হলো আধানহীন নিউট্রিনো। অধিকাংশ পদার্থের সাথে নিউট্রিনো কোনো বিক্রিয়া করে না। তাত্ত্বিকভাবে এর ভর শূন্য, যদিও এটি বিতর্কিত। প্রতিটি লেপটনের সাথে সংশ্লিষ্ট নিউট্রিনো থাকে। যেমন ইলেকট্রন সংশ্লিষ্ট নিউট্রিনো (ν_e)। লেপটন পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছয়। স্মর্তব্য যে, প্রতিটি কণিকারই প্রতিকণিকা রয়েছে।

সারণি ১ : স্থায়ী হ্যাড্রন :

প্রতীক	স্পিন	ভর (MeV)	গড় আয়ুষ্কাল (s)	সাধারণ ক্ষয়	নাম
মেসন					
(Baryon number B = 0)					
$\pi^{\pm}$	0	140	3×10^{-8}	$\rightarrow\mu^{\pm}\nu_{\mu}$	pion
π°	0	135	1×10^{-16}	$\rightarrow\gamma\gamma$	"
$K^{\pm}$	0	494	1×10^{-8}	$\rightarrow\mu^{\pm}\nu_{\mu}$	kaon
	0		1×10^{-10}	$K_S\rightarrow2\pi^*$	
K°	0	498	5×10^{-8}	$K_L\rightarrow3\pi^*$	
$D^{\pm}$	0	1,869	1×10^{-12}	$\rightarrow K^{\circ}+...$	D
D°	0	1,865	4×10^{-13}	$\rightarrow K^{\circ}+...$	
D_S^{+}	0	1,969	4×10^{-13}	$\rightarrow\varphi_{\pi}$	D_S

$B^{\pm}$	0	5,278	1×10^{-12}	$\rightarrow D^{\circ}\pi^{+}$	B
B°	0	5,279	1×10^{-12}	$\rightarrow D^{\circ}\pi^{+}\pi$	
বারিয়ন (Baryon number B = 1)					
p	$^{1}/_{2}$	938	স্থায়ী[১]		proton
n	$^{1}/_{2}$	940	9×10^{2}	$\rightarrow pe^{-}$ antiv$_e$	neutron
Λ	$^{1}/_{2}$	1,116	3×10^{-10}	$\rightarrow p\pi^{-}$	lambda
Σ^{+}	$^{1}/_{2}$	1,189	8×10^{-11}	$\rightarrow p\pi^{\circ}$	sigma
Σ°	$^{1}/_{2}$	1,193	7×10^{-20}	$\rightarrow \Lambda\gamma$	"
Σ^{-}	$^{1}/_{2}$	1,197	1×10^{-10}	$\rightarrow n\pi^{-}$	"
Ξ	$^{1}/_{2}$	1,315	3×10^{-10}	$\rightarrow \Lambda\pi^{\circ}$	xi or cascade
Ξ^{-}	$^{1}/_{2}$	1,321	2×10^{-10}	$\rightarrow \Lambda\pi^{-}$	"
Ω^{-}	$^{3}/_{2}$	1,672	1×10^{-10}	$\rightarrow \Lambda K^{-}$	omega-minus
Λ_c^{+}	$^{1}/_{2}$	2,285	2×10^{-13}	$\rightarrow \Lambda+\ldots$	lambda-c

* k° ও এর প্রতিকণিকা $\bar{k}^{\circ}$ কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি যুক্ত হয়ে k_L ও k_S দুটি ভৌত দশার (physical states) সৃষ্টি করে।

কণা পদার্থবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে হ্যাড্রনদের মৌলিক বস্তুকণা বলা হলেও এরা আদৌ মৌলিক নয়। এরা আরো মৌলিক কিছুর সমন্বয়ে গঠিত। বলা হয়, হ্যাড্রনরা কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। ব্যারিয়নরা তিনটি কোয়ার্ক ও মেসনরা কোয়ার্ক–প্রতিকোয়ার্ক সমাবেশে গঠিত।

কুহকিনী কোয়ার্ক : আমরা দেখেছি লেপ্টন পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছয়। অথচ সবল কণা হ্যাড্রনের সদস্য সংখ্যা প্রচুর। এতে মনে হয় এরা হয়ত ঠিক মৌলিক নয়। কিন্তু লেপটনরা সে অর্থে মৌলিক—এদের কোনো অভ্যন্তরীণ গঠন নেই, এরা মাত্রাহীন বিন্দু। সবল কণার এই বিপুল সংখ্যাই কোয়ার্ক মডেলের জন্ম দিয়েছে। কারণ কোনো সমন্বয়ী নীতি

[১] GUT অনুসারে অস্থায়ী হতে পারে তবে এর আয়ুষ্কাল অন্তত 10^{32} বছর।

সবল কণাদের এতোসব কোয়ান্টাম গুণাবলি পাওয়ায় এদের শ্রেণীবিভাগে সুবিধে হলো। বিদ্যুৎ আধান, ঘূর্ণন, সমঘূর্ণন, ভর, অপরিচিতির সংখ্যার মাধ্যমে এদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন সহজতর হয়। ১৯৬২ সালে গেলমান ও ইউভাল নীমান গাণিতিক প্রতিসাম্য ব্যবহার

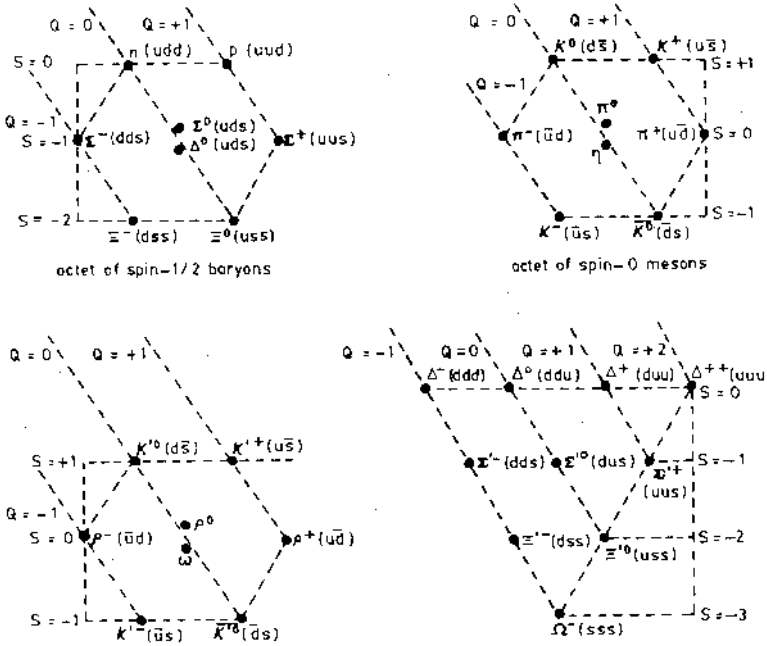

চিত্র প-১ : u, d এবং s কোয়ার্ক সমন্বয়ে উদ্ভূত হ্যাড্রন পরিবার

করে হ্যাড্রনদের শ্রেণীবদ্ধ করেন। একাজে তাঁরা এস. ইউ.(৩) [SU(3)] প্রতিসাম্য ব্যবহার করেন। এটি তিনমাত্রার বিশেষ ইউনিটারি দল। এর কয়েকটি উপদল আছে যারা পরস্পরের সাথে প্রতিসম রূপান্তরণের (symmetric transformation) মাধ্যমে যুক্ত। এস.ইউ.(৩)-এর উপদলসমূহ কেবল ৮ বা ১০ সদস্যের হতে পারে। এভাবে একটি জ্যামিতিক ছক পাওয়া যায়। ছক গঠনের নিয়ম অবশ্য গণিতের বলতত্ত্ব থেকে পাওয়া যায়। ছকভুক্ত পরিবারের সব সদস্যের ঘূর্ণনসংখ্যা আছে। এভাবে প্রোটন, নিউট্রন ও যাদের ঘূর্ণন ১/২ তারা একটি অষ্টপদীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ০, ১, ³/₂ ঘূর্ণন বিশিষ্ট কণাদেরও নির্দিষ্ট দল আছে (চিত্র প-১)। ১৯৬৪ সালে ব্রুকহ্যাভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে (নিউইয়র্ক) এই প্রতিসাম্যের

সত্যতা প্রমাণিত হলেও প্রতিসাম্যের কারণটি জানা ছিল না। পরবর্তীকালে গেলমান ও জর্জ সোয়াইগ প্রস্তাব করলেন যে, হ্যাড্রনের গঠন জটিল এবং এটি কোয়ার্ক সমাবেশ দ্বারা গঠিত। একটি ত্রিভুজ দিয়ে এই সমাবেশের ত্রিমাত্রিক প্রতিকৃতি দেখানো যায়। ত্রিভুজের তিন শীর্ষে তিনটি বস্তুকণা বসিয়ে গেলমান তার নাম দিলেন কোয়ার্ক। জেম্‌স্ জয়েসের উক্তি "থ্রি কোয়ার্কস্ ফর মাস্টার মার্ক" থেকে নামটি চয়ন করা হয়েছে। এদের নাম দেওয়া হলো আপ, ডাউন ও সাইড (ইউ,ডি,এস)। এবং এভাবে হ্যাড্রনদের অন্তর্নিহিত এস.ইউ.(৩) প্রতিসাম্যকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। আজ আমরা জানি সমস্ত সবল কণা কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। যেকোনো ব্যারিয়ন তিনটি করে কোয়ার্ক এবং যেকোনো মেসন একটি কোয়ার্ক ও একটি প্রতিকোয়ার্ক দিয়ে গঠিত। ইউ-কোয়ার্কের আধান $+^{২}/_{৩}$ এবং ডি কোয়ার্কের আধান $-^{১}/_{৩}$। এখানে আধান ভগ্নাংশ, তবে এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ ইলেকট্রনের আধানই যে ন্যূনতম এমন কোনো কথা নেই। পরীক্ষাগারে এদের অপ্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেছে। এছাড়া আরো তিনটি কোয়ার্কের কল্পনা করা হচ্ছে—চার্ম, বটম (বা বিউটি), টপ (বা ট্রুথ) কোয়ার্ক। প্রথমদিকে টপ কোয়ার্ক সম্পর্কে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রতিসাম্যের খাতিরে এর দরকার ছিল। কারণ লেপটন ছয়টি—তাই কোয়ার্ককেও ছয় সদস্যের হতে হবে, অন্তত প্রতিসাম্যের খাতিরে। অতি সম্প্রতি টপ কোয়ার্ক আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে ব্যারিয়নদের কিছু গঠন দেখান হলো : প্রোটন, $p = uud$; নিউট্রন, $n = udd$; ল্যাম্বডা $\Lambda^{\circ} = uds$; পায়ন$^{+}$, $\pi^{+} = ud^{-}$; কেয়ন, $k = u^{-}s$। কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলো সংরক্ষিত হয় কিনা (সারণি-২ এ দেওয়া হলো ; সেখান থেকে) পাঠকরা দেখে নিতে পারেন।

সারণি ২ : কোয়ার্ক পরিবার। প্রত্যেক 'গন্ধের' কোয়ার্কের প্রতিকোয়ার্ক আছে যাদের কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলোর চিহ্ন বিপরীত। ভরের আগে চারটি ধর্মের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা আসলে কোয়ার্কের মধ্যে 'গন্ধের' পার্থক্য সূচিত করে। যেহেতু ব্যারিয়নের ভারিত্বের সংখ্যা +১, তাই প্রত্যেকটি কোয়ার্কের ভারিত্বের সংখ্যা $+^{১}/_{৩}$ এবং হ্যাড্রন গঠনে কোয়ার্কের স্পিনসংখ্যার যোগ হবে ভেক্টর নিয়মে এবং প্রতিটি কোয়ার্কের স্পিন $^{১}/_{২}$।

কোয়ার্ক	ভারিত্বের সংখ্যা	আধান	অপরিচিতির সংখ্যা	চার্ম (charm)	বটম	টপ	ভর (এম.ই.ভি.)
ডাউন (d)	$^{১}/_{৩}$	$^{১}/_{৩}$ e	০	০	০	০	৭
আপ (u)	$^{১}/_{৩}$	$+^{২}/_{৩}$ e	০	০	০	০	৫
স্ট্রেঞ্জ (s)	$^{১}/_{৩}$	$-^{১}/_{৩}$ e	−১	০	০	০	১৫০
চার্ম (c)	$^{১}/_{৩}$	$+^{২}/_{৩}$ e	০	১	০	০	১৪০০
বটম (b)	$^{১}/_{৩}$	$-^{১}/_{৩}$ e	০	০	−১	০	৪৮০০
টপ (t)	$^{১}/_{৩}$	$+^{২}/_{৩}$ e	০	০	০	১	১৭৪ জি.ই.ভি.

কোয়ার্ক মডেলের কিছু অসঙ্গতি ছিল যা দূর করা হয়েছে নতুন মডেলে। এস.ইউ.(৩) মডেলে একটি নতুন ধর্ম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যাকে বলা হয় 'গন্ধ' (flavour)। যদিও এর সাথে দৈনন্দিন গন্ধের কোনো সম্পর্ক নেই। বলা হয়, বিভিন্ন 'গন্ধের' কোয়ার্ক আছে। সবল মিথস্ক্রিয়ায় 'গন্ধ' সংরক্ষিত থাকে। কোয়ার্ক 'গন্ধ' বদলাতে পারে দুর্বল বলের অধীনে। পুরনো কোয়ার্ক মডেলে একটি ত্রুটি ছিল যে ব্যারিয়নসমূহ তিনটি কোয়ার্ক নিয়ে গঠিত। যেমন ওমেগা মাইনাস ($\Omega^- = sss$)। এখানে একই কোয়ান্টাম দশায় তিনটি অভিন্ন 'গন্ধের' কোয়ার্ক আছে। কিন্তু পাউলির বর্জন নীতি এটি অনুমোদন করে না। এটা আমরা আগেই জেনেছি। অস্কার গ্রীনবার্গ ও ইয়োচিরো নাম্বু এই হেয়ালির উত্তরে তিনটি সম্ভাব্য দশাসম্পন্ন নতুন ধর্মের কথা বলেন। এটি 'রঙ' (color)। একটি কোয়ার্ক তিনটি রঙের হতে পারে। লাল, সবুজ, নীল। স্মর্তব্য যে, এরা কেবল নামকরণমাত্র। এখন হ্যাড্রন সমাবেশ এমনভাবে হবে যাতে নিট বর্ণ শূন্য হয়, অর্থাৎ বর্ণহীন হয়। এই নতুন 'রঙিন' মডেল দুকূলই রক্ষা করেছে। কোয়ার্ক মডেলে প্রথম এস.ইউ(৩) দল সমঘূর্ণন ও অতিরিক্ত আধান নিয়ে তৈরি এবং নির্ধারিত ধর্ম 'গন্ধ'। দ্বিতীয় এস.ইউ(৩) দল রঙিন সমঘূর্ণন ও অতিরিক্ত আধান অন্তর্ভুক্ত করে এবং নির্ধারিত ধর্ম 'রঙ'। 'গন্ধ' হলো ভাঙা প্রতিসাম্য কারণ বিভিন্ন 'গন্ধের' জন্য ভর ও আধান ভিন্ন। কিন্তু 'রঙ' হলো পূর্ণপ্রতিসাম্য, কেননা একই 'গন্ধের' জন্য 'রঙ' ভিন্ন হতে পারে। সবল কণার ভেতরে যে প্রচণ্ড শক্তি কোয়ার্ককে বেঁধে রেখেছে তার জন্য দায়ী এই 'রঙ'। কিন্তু দুর্বল কণার কোনো 'রঙ' নেই, তাই শক্ত বাঁধুনিও সম্ভব নয়। কোয়ার্কের সবল বাঁধুনির অনুরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় সুপরিচিত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব থেকে। ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তি কুলম্বের বর্গ-বর্গ আইন মেনে চলে। এই শক্তি দূরত্ব অনুযায়ী কমে। এই শক্তি পরিচালিত হয় একটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে। ক্ষেত্র হচ্ছে এমন কিছু যা স্থানকাল ব্যাপী নিয়ত পরিবর্তনশীল। ক্ষেত্রকে কোয়ান্টায়িত করা যায় এবং ফলত এর ক্ষেত্রবাহী কণা আছে। এটি ফোটন। কিন্তু কোয়ার্কের বেলায় পরিস্থিতি জটিলতর। একটির বদলে এখানে আছে দুটি কোয়ান্টাম সংখ্যা : রঙিন সমঘূর্ণন ও রঙিন অতিরিক্ত আধান।

ষাটের দশকের শেষে ও সত্তরের দশকের প্রথমে রঙিন কোয়ার্কের জন্য একটি তত্ত্ব প্রবর্তিত হয়—কিউ.সি.ডি ; কোয়ান্টাম রঙিন গতিবিদ্যা (Quantum Chromo Dynamics)। কিউ.সি.ডি. তত্ত্বের ধারণা অনুযায়ী যেহেতু সকল বস্তুকণা 'সাদা' (বর্ণহীন) তাই কোয়ার্ক সমাবেশের তিনসদস্যকেই তিনটি ভিন্ন রঙের হতে হবে। মেসনের ক্ষেত্রে রঙ ও প্রতিরঙ (anti-color) মিলে শূন্য হয়ে যায়। ১৯৬০ এর শেষদিকে চেন নিঙ ইয়াং ও রবার্ট মিলস্ এই তত্ত্ব দেন। বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এর ক্ষেত্রবাহী (গেজ) কণা অবেনাইন ফোটন। কিন্তু সবল শক্তিক্ষেত্রের রঙ-রাখি স্বয়ং রঙিন। অর্থাৎ ইয়াং-মিলস্ ক্ষেত্র নিজেই কোয়ান্টামে সংখ্যা বহন করে। যেমন—আইনস্টাইনের মহাকর্ষ ক্ষেত্র। রঙিন কোয়ার্কদের মধ্যের ক্ষেত্রকোয়ান্টা হলো গ্লুয়ন (gluon) এবং তত্ত্বের খাতিরে এদের সংখ্যা আটটি। গ্লুয়ন ১ : এস.ইউ(৩) দল তত্ত্ব অনুসারে এরকম নয়টি সমাবেশ সম্ভব, কিন্তু একটি সাদা অর্থাৎ রঙহীন। কোয়ার্কসমূহ পরস্পরের সঙ্গে এই রঙিন গ্লুয়ন বা রঙ-রাখি

বিনিময় করে। ফলে এদের 'রঙ' বদলায়, কিন্তু 'গন্ধ' একই থাকে। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি অনুযায়ী কোয়ার্কের 'রঙের' নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব নয়—বলা যায় না কোন কোয়ার্কের রঙ কি। যেহেতু সবল বস্তুকণা সাদা তাই তিন রঙের কোয়ার্ক সমান সম্ভাবনায় উপস্থিত হয়। গ্লুয়নরা ভরশূন্য। ফোটনদের সাথে এদের মূল পার্থক্য হলো এরা নিজেদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে না, কিন্তু গ্লুয়নরা করে। কারণ এরা নিজেরাই রঙিন। এভাবে গ্লুয়নদের সীমা সুদূরতর হয় এবং কোয়ার্কদের বন্দিত্ব সূচিত হয়। আজকাল বলা হচ্ছে যে কোয়ার্করা চিরবন্দী। এই নেপথ্যবাসিনীদের হয়ত কোনোদিনই দেখা যাবে না। একভাবে বলা যায় যেহেতু সকল বস্তুকণা সাদা বা বর্ণহীন, তাই রঙিন কোনো কণা পৃথকভাবে 'দেখা' সম্ভব নয়। তাই চিররঙিন কোয়ার্কদেরও 'দেখা' যাবে না। কোয়ার্কদের সবল বল স্বল্প দূরত্বে কম কিন্তু দূরত্ব যতো বাড়ে বলও ততো বাড়ে। যেহেতু বল অসীমভাবে বাড়ানো যায় না তাই কোয়ার্ককে নিঃসঙ্গ দেখা যাবে না। এ যেন শিকলবদ্ধ বন্দী। তারা যখন খুব কাছাকাছি থাকে তখন মুক্তভাবে চলাচল করে এবং তারা তখন শিকলবদ্ধতা অনুভব করে না। কিন্তু যখনই কোনো বন্দী কোয়ার্ক মুক্ত হতে চায় তখনই শিকলের টান অনুভূত হয় এবং চিরবন্দী করে রাখে। এ ধরনের প্রতিভাস অসীমতট স্বাধীনতার অনুরূপ। কোয়ার্কদের মধ্যে বিনিময়কারী ভার্চুয়াল গ্লুয়নগুলো নিরপেক্ষ নয়- এরা রঙ ও প্রতিরঙের মিশ্রণ বহন করে। কোয়ার্ক যতোদূরে যায় ততোই বেশি গ্লুয়ন আবির্ভূত হয়, কারণ তখন নিট বল বেড়ে যায়। কিন্তু যখন কোয়ার্করা কাছাকাছি থাকে তখন নিট বল ক্ষীণতর থাকে, ফলে কম গ্লুয়নের শক্তিশালী যুগলায়ন কিউ.সি.ডি.কে জটিল করে তোলে।

চিরবন্দিনী কোয়ার্ককে কি কখনোই 'দেখা' যাবে না? অদূর ভবিষ্যতে এর সম্ভাবনা কম। কারণ কোয়ার্ক ও গ্লুয়নকে মুক্তবস্থায় দেখার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চশক্তি বর্তমানে আমাদের করায়ত্ত নয়। হয়ত দূরভবিষ্যতে কুহকিনী কোয়ার্ক তার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ যেহেতু সম্ভাবনার ব্যাপার তাই আমাদের কেবল সতর্ক আশাবাদই ব্যক্ত করা চলে।

পরিশিষ্ট ২

পরম ঐক্যের সন্ধানে

পদার্থবিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন হচ্ছে প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলকে একীভূত করা। অর্থাৎ তাঁরা এই দেখাতে চাচ্ছেন যে, আসলে চারটি বলই একটিমাত্র একক বলের বহিঃপ্রকাশ। বিশ্বের জন্মলগ্নের আদি মুহূর্তের আইন আমাদের জানা। বিশ্বসৃষ্টির $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পরের ঘটনাবলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান মোটামুটি স্বচ্ছ। এ কাজে দলতত্ত্বের ব্যবহার হচ্ছে। ফলে আদি বিশ্ব জটিল সব তত্ত্বের অপূর্ব লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকের পরিবারে আছে দু'টি করে সদস্য এবং এদের সম্পর্কে মোটামুটি সঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্ব আমাদের জানা। জটিল গঠন তৈরি করতে হলে এই কণাদের আটকে রাখার বাঁধুনি দরকার। প্রকৃতির চারটি বল এই বাঁধুনি সরবরাহ করে। বল থাকলে বলের ক্ষেত্রও অনিবার্য এবং কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্ব অনুযায়ী যেকোনো ক্ষেত্রের (ফিল্ড) সাথে সংশ্লিষ্ট কণা রয়েছে। ১৯৩০ সালে পদার্থবিদরা চারটি বলের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রতত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। ক্ষেত্রের সংজ্ঞা আমরা আগেই দিয়েছি। বলা হচ্ছে, চারটি বলই গেজ (gauge) বা মাপ প্রতিসাম্য প্রদর্শন করে। তার মানে ফিল্ডের কোনো পরিবর্তন না করেও এতে কিছু অপারেশন করা যায়। এর তাৎপর্য এই যে বলের ক্রিয়াকে অবপারমাণবিক কণিকার বিনিময় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ সমস্ত কণাদের বলা হয় গেজ-বোসন বা মাপ-বোসন কণা। কোয়ার্ক-লেপটনরা ফার্মিয়ন। কিন্তু গেজ-কণারা বোসন। সবচেয়ে পরিচিত গেজ-কণা হলো ফোটন বা আলোক-কণা। বৈদ্যুতিকভাবে আহিত দুটি বস্তুর মধ্যে ফোটন বিনিময় হয় এবং আমরা বলি বস্তু দুটো বিদ্যুৎ-চৌম্বক মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে। দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার গেজতত্ত্ব প্রবর্তন করতে গিয়ে এর সাথে বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলকেও একীভূত করে দেওয়া হয়। ষাটের দশকের এই একীভবন পরম একীকরণের পথে প্রথম মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। চারটি বল সম্পর্কে এবারে একটু বিস্তারিত জানা যেতে পারে।

মহাকর্ষ : বল চতুষ্টয়ের মধ্যে মহাকর্ষ বল সবচেয়ে দুর্বল এবং দূরপাল্লার। সপ্তদশ শতকে আইজাক নিউটন মহাকর্ষ তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। ব্যাপক পটভূমিতে (large scale) এই তত্ত্ব ভাল কাজে দেয়। নিউটনের এই আইনের সমীকরণরূপ হচ্ছে, $F = Gm_1m_2/r^2$, m_1 ও m_2 দুটি বস্তুর ভর, r এদের দূরত্ব। G মহাকর্ষীয় ধ্রুবক যার মান 6.67×10^{-11} Newton m^2-kg^2। G মহাকর্ষীয় আকর্ষণের শক্তি প্রকাশ করে। এ কাজে পদার্থবিদরা অবশ্য এমন এক পরিমাপ চান যা মাত্রাহীন। এ ধরনের শক্তির পরিমাপকে বলে যুগলায়ন ধ্রুবক (coupling constant)। এভাবে G এর সাথে প্রোটনের ভরের বর্গ গুণ দিয়ে আলোর বেগ ও প্লাংকের ধ্রুবক দিয়ে ভাগ দিলে যুগলায়ন ধ্রুবকের মান হয় ৫×১০^{-৩৯}। এই মানটি

খুবই ছোট এবং এর অর্থ মহাকর্ষ সবচেয়ে দুর্বল। ১৯১৫ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নিউটনীয় তত্ত্বকে পরিমার্জিত করে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব দেন। এতে গেজ-প্রতিসাম্য অন্তর্ভুক্ত হয়। মহাকর্ষকে এখনো কোয়ান্টায়িত করা যায়নি।[১] তবে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বানুযায়ী এর গেজ-কণাটির স্পিন ২ নির্ধারিত হয়েছে। এর নাম গ্রাভিটোন। এর ভর নেই, তবে শক্তি আছে।

বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিজ্ঞানী চার্লস কুলম্ব দেখান যে মহাকর্ষের মতো এটিও একটি ব্যস্ত-বর্গ আইন মেনে চলে : $F = \frac{q_1 q_2}{r^2}$. r দূরত্বের দুটি চার্জ q_1 ও q_2 হলে F এদের মধ্যে আকর্ষণী বা বিকর্ষণী শক্তি প্রকাশ করে। দুটি চুম্বক মেরুর জন্যও এই নিয়ম খাটে। আসলে চৌম্বকত্ব ও বৈদ্যুতিক শক্তি আলাদা কিছু নয়। এই সত্যটাই ১৮৫০ সালে জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল একটি তত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত করেন। এটি বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব। ১৯০০ সালের পর থেকে প্লাংকের কোয়ান্টাম তত্ত্বের উন্নতি ঘটে। এ তত্ত্ব মতে যেকোনো বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ দ্বৈত প্রকৃতির—তরঙ্গ ও কণা উভয়ই। বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের কোয়ান্টাম প্রকৃতি কোয়ান্টাম বিদ্যুৎগতিবিজ্ঞানের (QED) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি আসলে একটি কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্ব। ম্যাক্সওয়েলের চিরায়ত তত্ত্ব এবং এর কোয়ান্টাম ভাষ্য দুটোই গেজ প্রতিসাম্য প্রদর্শন করে। এই বলের শক্তি-ধ্রুবকটি হলো $e^2/\hbar c$। e ইলেকট্রনের চার্জ, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, h প্লাংকের ধ্রুবক। এই শক্তি ধ্রুবকের মান প্রায় $১/১৩৭$। অর্থাৎ বিদ্যুৎ-চৌম্বক মিথস্ক্রিয়া মহাকর্ষ বলের চেয়ে $১০^{৩৬}$ গুণ শক্তিশালী। এই মিথস্ক্রিয়ার গেজ বোসনটি সুপরিচিত আলোক-কণা ফোটন। এর ভর শূন্য এবং ঘূর্ণন সংখ্যা ১। আহিত কণিকারা যখন মিথস্ক্রিয়া করে তখন ফোটন বিক্রিয়া হয়। তবে ফোটনরা নিজেদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে না।

দুর্বল বল : ১৯৩০ সাল থেকেই বস্তুর তেজস্ক্রিয় ভাঙনের জন্য দুর্বল বলকে দায়ী করা হয়। এ ধরনের তেজস্ক্রিয় ভাঙনের বিশেষ উদাহরণ হলো বিটা ভাঙন (বা ক্ষয়)। যেমন নিউট্রন ভেঙে প্রোটন, ইলেকট্রন এবং ইলেকট্রন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিউট্রিনো তৈরি হয় ($n^0 = p^+ + e^- + \text{anti-}\nu_e$)। দেখা গেল, দুর্বল বলের জন্য সঠিক পরিমাপ-তত্ত্ব (গেজ থিওরি) বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ফলশ্রুতিতে পাওয়া যায় বৈপ্লবিক বিদ্যুৎ-ক্ষীণ (electro-weak) একীভূত তত্ত্ব। 'বৈপ্লবিক' এ কারণে যে পরম ঐক্যের পথে এটি প্রথম মাইলফলক। এখন বিদ্যুৎ-ক্ষীণ একীভূত ক্ষেত্রের জন্য দরকার ৪টি গেজ-কণার। এদের মধ্যে দুটি আধানযুক্ত ও দুটি নিরপেক্ষ। এরা হলো W^+, W^-, Z^0, γ। এদের সবার ঘূর্ণনের কোয়ান্টাম সংখ্যা ১। ফোটন ছাড়া অন্য তিনটি অত্যন্ত ভারি। $W^\pm$ কণাদের ভর ৮১.৮

---

১. মহাকর্ষের সম্ভাব্য কোয়ান্টামতত্ত্বের উপর ভাল সাধারণ আলোচনার জন্য হারুন-অর-রশীদ (১৯৯৯) ও DeWitt (1983) দ্রষ্টব্য।

জি.ই.ভি. এবং Z^0 কণার ভর ৯২.৬ জি.ই.ভি.। অথচ ফোটনের ভর জেড কণার ১০০ ভাগ। বিটা ভাঙনের জন্য W কণা দায়ী। নিউট্রনের পূর্বোক্ত বিটা–ভাঙনকে এখন এভাবে লেখা হয় :

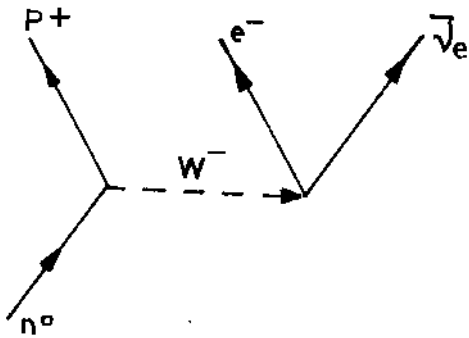

চিত্র ৭.২ : দুর্বল বলের অধীনে নিউট্রনের ভাঙন।

এ ধরনের বিক্রিয়ায় $W^{\pm}$ ভার্চুয়াল কণা হিসেবে ক্রিয়া করে। লক্ষণীয় যে W^- এর ভর নিউট্রনের চেয়ে অনেক বেশি। প্রশ্ন হলো, এই অতিরিক্ত ভর (বা অনিশ্চিত শক্তি) এলো কোত্থেকে? কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা অতি ক্ষুদ্র সময়ের জন্য এই অতিরিক্ত ভর অনুমোদন করে। অতি ক্ষুদ্রের জগতে অতি ক্ষুদ্র সময় Δt এর জন্য ΔE পরিমাণ শক্তির অনিশ্চয়তা অনুমোদিত যদি এবং কেবল যদি $\Delta E.\ \Delta t \geq h$ হয়। যখন দুটি কণা মিথস্ক্রিয়া করে তখন গেজ কণা বিনিময় হয়। ঐ সমস্ত বিনিময় গেজ কণারা Δt সময়ের জন্য আবির্ভূত হয় এবং এদের জন্য শক্তি সংরক্ষিত হয় না। বাহক কণা ΔE পরিমাণ শক্তি Δt পরিমাণ সময়ের জন্য 'ধার' করতে পারে এবং এটা অনিশ্চয়তা নীতি কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে হতে হবে। এ ধরনের কণাই ভার্চুয়াল কণা ('ধারের' পরিমাণ যতো বেশি হয় ততো কম সময়ের মধ্যে তা শোধ করতে হয়)। নিউট্রনের বিটা-ভাঙনে (ΔE পরিমাণ শক্তির অনিশ্চয়তাসহ) নির্গত W^-, Δt সময়ের মধ্যেই ইলেকট্রন ও ইলেকট্রন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিউট্রিনোতে পরিণত হয়। চিরায়ত জগতে দুর্বল বল বিদ্যুৎ–চৌম্বক বল থেকে ক্ষীণতর, এর পাল্লাও মাত্র $১০^{-১৭}$ মিটার। এর কারণ হলো ভারি $W^{\pm}$, Z^0দের উদ্ভব খুবই ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে হতে হবে। তাই পাল্লা এর ছোট। দুর্বল বল প্রোটনের সাথে যুগলায়িত হওয়ার শক্তি ধ্রুবক $১০^{-৫}$। সালাম-ভাইনবার্গ-গ্লাশোর একীভূত বিদ্যুৎ–ক্ষীণ তত্ত্ব অনুযায়ী দুর্বল বল শক্তিবৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে। প্রায় ১০০ জি.ই.ভি.তে দুর্বল বল যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। ফলে এর শক্তি–ধ্রুবক এবং বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় মিথস্ক্রিয়ার শক্তি–ধ্রুবক এক হয়ে যায়। উচ্চশক্তিতে বিনিময়কৃত Z^0 নিম্নশক্তিতে γ (ফোটন)। $W^{\pm}$, Z দের শুধু উচ্চশক্তিতে পাওয়া যায় এবং জীবনকাল মাত্র $১০^{-২৪}$ সেকেন্ড। এই একীভবনে পছন্দীকৃত দলটি হলো এস.ইউ.(২) × ইউ(১)।

সবল বল : প্রকৃতির বল চতুষ্টয়ের মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। যদিও এর পাল্লা ক্ষুদ্র প্রায় $১০^{-১৫}$ মিটারের মতো। এটি শুধু কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত বস্তুকণাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের তুলনায় ১০০ গুণ শক্তিমান এর শক্তি-ধ্রুবককে পূর্ণ সংখ্যা ১ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। (কোয়ান্টাম বিদ্যুৎ-গতিবিজ্ঞানের অনুরূপ) সবল মিথস্ক্রিয়ার একটি তত্ত্ব ১৯৭০ এ পাওয়া যায়। এই তত্ত্বমতে সবল ক্ষেত্রের মাপ বোস কণা বা ক্ষেত্র কোয়ান্টা হলো গ্লুয়ন (g)। এরা ভরশূন্য এবং স্পিন ১। কোয়ার্কবৃন্দ নিজেদের মধ্যে গ্লুয়ন বিনিময় করে এবং গ্লুয়নরা নিজেদের সাথেও বিক্রিয়া করে। কারণ এরা স্বয়ং রঙিন। অর্থাৎ 'রঙ' নামের আবদ্ধ চার্জ বহন করে। মনে করা হয়, এদের জন্যই কুহকিনী, অবগুণ্ঠনবতী কোয়ার্ক কোনোদিনই তাঁর অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করে পরমাণু কেন্দ্রীনের অন্দরমহল থেকে মুক্ত হতে পারবে না। 'রঙে ঝলোমলো পরমাণু কেন্দ্রীনের' এই "রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের" বিচিত্র অন্দরমহলের জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্বটি হলো কোয়ান্টাম রঙিন গতিবিজ্ঞান (কিউ.সি.ডি.)। প্রতিটি কোয়ার্ক যে কোনো একটি 'রঙ' ধারণ করতে পারে, কিন্তু গ্লুয়ন একই সাথে একটি 'রঙ' ও একটি 'প্রতিরঙ' বহন করে। একই 'রঙের' কোয়ার্করা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, কিন্তু বিভিন্ন রঙের কোয়ার্ক পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিউ.সি.ডি'-র জন্য পছন্দনীয় দলটি হলো এস.ইউ.(৩)।

সারণি ৩ : প্রকৃতির মৌলিক বল চতুষ্টয় এবং তাদের বাহক গেজ-বোসন।

মিথস্ক্রিয়া	যাদের উপর ক্রিয়া করে	বিনিময় কণা	চিহ্ন	স্পিন	ভর এম.ই.ভি	গড় আয়ু (সে.)	সীমা	শক্তি ধ্রুবক
মহাকর্ষ	সমস্ত কণা, (কারণ এদের সবারই ভর ও শক্তি আছে)	প্রস্তাবিত গ্রাভিটোন	g	২	০	স্থায়ী	দীর্ঘ ; $F \propto 1/r^2$	$\sim ১০^{-৩৯}$
দুর্বল নিউক্লীয় বল	ফোটন(γ) ছাড়া আর সমস্ত	দুর্বল বোসন (ডব্লিউ ও জেড)	$W^{\pm}$ Z^{0}	১ ১	৮১,৮৩০ ৯২,৪৩০	$১০^{-২৫}$	$<১০^{-১৭}$ মি.	$১০^{-৫}$
বিদ্যুৎ-চৌম্বকত্ব	বৈদ্যুতিকভাবে আহিত কণা	ফোটন	γ	১	০	স্থায়ী	দীর্ঘ ; $F \propto 1/r^2$	$\frac{১}{১৩৭}$
সবল নিউক্লীয় বল	কোয়ার্ক ও গ্লুয়ন	গ্লুয়ন	g	১	০	স্থায়ী	$১০^{-১৫}$ মি.	১

আমরা দেখেছি যে, বিদ্যুৎ-ক্ষীণ একীভূত তত্ত্বের জন্য পছন্দনীয় দলটি এস.ইউ(২) × ইউ(১)। প্রয়োজনীয় দলের এই কম্বিনেশন নিয়ে কাজ করছিলেন একদিকে (আমেরিকায়) শেল্ডন গ্ল্যাশো এবং অন্যদিকে (বিলেতে) আবদুস সালাম ও জন ওয়ার্ড। ওঁরা বলেন যে, একীভূত ক্ষেত্রের জন্য দরকার ৪টি কণার দুটি আধানযুক্ত, দুটি আধানহীন। আধানহীন একটি আমাদের পরিচিত ফোটন আধানযুক্ত কণাদুটি বিটা ভাঙনের জন্য দায়ী। আধানহীন অন্যটি (Z°) নিরপেক্ষ কারেন্ট মিথস্ক্রিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করে। অবশ্য পরবর্তীকালে এসবই গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৭৯ সালে সালাম ভাইনবার্গ-গ্ল্যাশোকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তার পূর্বে ১৯৭১ সালে এট্-হুফট তত্ত্বকে পুনঃস্বাভাবিকীকরণ করেন। এ ব্যাপারে সন্ধান চলছে 'বিশেষ একটি কণা—হিগস্ কণার। উচ্চশক্তিতে একীভূত বিদ্যুৎ-ক্ষীণ বলের মধ্যে যে প্রতিসাম্য থাকে নিম্নশক্তিতে সেটার ভাঙন ঘটে (ভাঙা প্রতিসাম্য না বলে বলা উচিত লুকানো প্রতিসাম্য)। প্রতিসাম্যের এই ভাঙন ঘটাতে দরকার হিগস্ ক্ষেত্রের এবং ক্ষেত্রবাহী হিগস্ কণা। এটি ভারী ও ঘূর্ণন শূন্য। হিগস্ কণার তাত্ত্বিক তাৎপর্য অনেক।[১] বলা হয়, অন্যান্য কণা হিগস্ কণা খেয়ে ফেলে ভরযুক্ত হয়. এই কণা একটি না একাধিক তাও বলা যাচ্ছে না। লেডারম্যানের ভাষায় এটি 'ঈশ্বরীয় কণা' (গড পার্টিকল)। অন্যদিকে সবল বলের তত্ত্ব হচ্ছে কিউ.সি.ডি. এবং প্রয়োজনীয় দল এস.ইউ.(৩)। প্রবল বিক্রিয়ার জন্য পরিমাপতত্ত্বভিত্তিক এই মডেল অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। দুর্বল বিক্রিয়ার মাধ্যমে কোয়ার্কের 'গন্ধ' বদলানো হয়। নিউট্রনের বিটা-ভাঙনে ডাউন-কোয়ার্ক আপ কোয়ার্কে পরিণত হয় এখানে ডাউন কোয়ার্ক একটি W^- নির্গত করে আপ-কোয়ার্কে পরিণত হচ্ছে। এই W^- ইলেকট্রন ও ইলেকট্রন-প্রতিনিউট্রিনো তৈরি করে। একইভাবে ডাউন-কোয়ার্ক ও ইলেকট্রন-নিউট্রিনোর মধ্যে W^- বিনিময় হতে পারে। এক্ষেত্রে কোয়ার্ক থেকে W^- বেরিয়ে লেপটন চলে যায়। ফলে আপ-কোয়ার্কও ইলেকট্রন তৈরি হয়। দেখা যাচ্ছে যে শুধু 'গন্ধই' পরিবর্তিত হচ্ছে না, বরঞ্চ লেপটনের প্রকৃতিও বদলাচ্ছে। অর্থাৎ ইলেকট্রন ও ইলেকট্রন নিউট্রিনোকে একটি লেপটন দ্বিপদী (ডাবলেট) হিসেবে মনে করা যায় যাদের 'গন্ধ' এক। যেহেতু লেপটন পরিবারে ৩টি 'গন্ধ দ্বিপদী' থাকে সেহেতু কোয়ার্ক পরিবারেও ছয়টি সদস্য থাকবে।

যেহেতু সালাম-ভাইনবার্গ-গ্ল্যাশোর এস.ইউ(২) × ইউ(১) এবং গ্ল্যাশো ও অন্যান্যের এস.ইউ(৩) পৃথকভাবে নিম্নশক্তির ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করে সার্থকভাবে ; তাই মনে হয় বৃহৎ কোনো প্রতিসাম্য দল হয়ত আছে যা দিয়ে তিনটি বলই একটি নীতির অধীনে একীভূত করা যাবে। তখন শুধু একটি সংযোজন-ধ্রুবক থাকবে। কিন্তু সারণি ৩ এ দেখা যায় সংযোজন-ধ্রুবক ১ থেকে 10^{-2} পর্যন্ত, তাই এদের একীভবন যথেষ্ট জটিল। এরকম প্রতিসাম্যে থাকবে এস.ইউ.(৩) × এস.ইউ(২) × ইউ(১)। একে **প্রমাণ মডেল** বলে। ১৯৭৪ সালে জর্জি ও গ্ল্যাশো প্রমাণ করেন যে সবচেয়ে ছোট উপযুক্ত দলটি হলো এস.ইউ(৫)। এস.ও.(১) সম্ভাব্য

---

১. হিগস্ কণার উপর ভক্ত সাধারণ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সদ্য নোবেল বিজয়ী ভেল্টম্যানের লেখা প্রবন্ধ Veltman (1986)।

আরেকটি দল। এ ধরনের একীভূত তত্ত্বকে বলে মহা একীভূত তত্ত্ব (Grand Unified Theories, GUT)। বলা হচ্ছে, বিদ্যুৎ–ক্ষীণ ও সবল বলের একীভবন ঘটবে $১০^{১৫}$ জি.ই.ভি'তে। কিন্তু বর্তমানে (বা অনতিদূর ভবিষ্যতেও) কণা ত্বরকযন্ত্রগুলো এই বিপুল

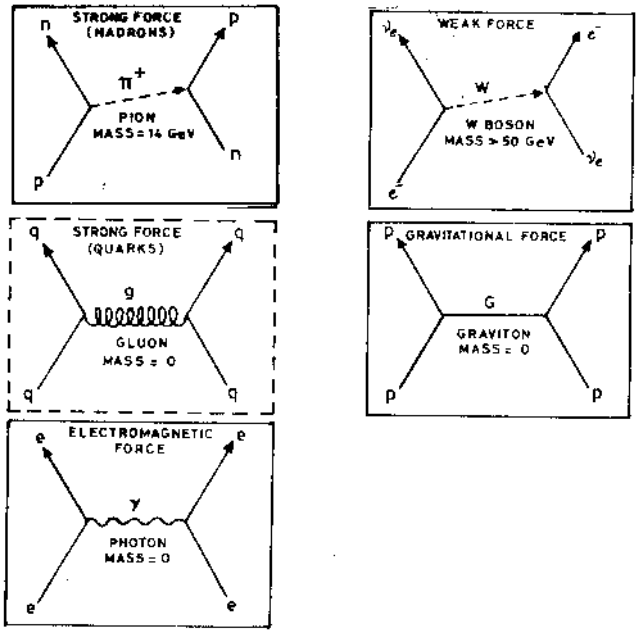

চিত্র পৃ.৩ : প্রকৃতির মৌলিক বল চতুষ্টয়ের কোয়ান্টাম ভাষ্য

শক্তি তৈরি করতে অক্ষম। তিনটি মিথস্ক্রিয়াকে এক করতে চাইলে কোয়ার্ক ও লেপটনকেও একীভূত করতে হবে। অর্থাৎ যখন GUT ভেঙে সবল বল বিদ্যুৎ ক্ষীণ বল থেকে পৃথক হয় তখনই কোয়ার্ক–লেপটন বিযুক্ত হয়। এবং বিশ্বের ইতিহাসে এটি ঘটে সম্ভবত প্রথম $১০^{-৩৬}$ সেকেন্ডে। এর পূর্বে কোয়ার্ক লেপটনকে এক করার জন্য দরকার ছিল নতুন একটি গেজ কণার: এক্স বোসন। এক্স বোসন লেপটন ও কোয়ার্কের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া করে। এরা খুব ভারি—ভর $১০^{১৫}$ জি.ই.ভি. প্রায়। এর তাৎপর্য এই যে প্রোটনের ভাঙন অত্যন্ত বিরল এবং এর জীবনকাল $১০^{৩০}$ বছর।[৩] GUT পরম একীভূত তত্ত্বের অনেক সমস্যার সমাধান

৩. সুপার কামিওকান্দে এক্সপেরিমেন্টের একদল গবেষক ঘোষণা দিয়েছেন যে প্রোটনের ক্ষয়ই শুধু নয় উপরন্তু কণাটির আয়ুর নিম্নসীমাও জানা গেছে। শতকরা নব্বইভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে তাঁরা জানিয়েছেন

করে দেয়। এই মডেল থেকে জানা যায় কোয়ার্ক ও লেপটনের আধান কতো হবে। কিন্তু এক্স–বোসন ও দুবল বোসনদের ($W^{\pm}$, Z^{0}) মধ্যেকার বিশাল শক্তির ব্যবধানের কোনো ব্যাখ্যা নেই। বড় সমস্যা হলো মহাকর্ষ অন্তর্ভুক্ত নেই। পদার্থবিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন হলো 'সব কিছুর তত্ত্ব' (থিওরি অব এভরিথিঙ, TOE) পাওয়া। এতে মহাকর্ষও অন্তর্ভুক্ত হবে। আশির দশকে এরকম একটি তত্ত্ব পাওয়া যায় যার নাম এম – ৮ সুপারগ্রাভিটি। এতে আছে ১টি গ্রাভিটোন, ৮টি স্পিন ৩/২ গ্রাভিটিনো, ২৮টি স্পিন ১ কণা, ৫৬টি স্পিন ১/২ কণা ও ৭০টি স্পিন ০ কণা। এতে অধিকাংশ পর্যবেক্ষিত কণা (গ্লুয়ন, কোয়ার্ক) আর মৌলিক থাকে না, বরঞ্চ প্রাথমিক এম – ৮ কণিকাদের অবদ্ধ অবস্থা বলে ধরা হয়। এটি চতুর্মাত্রিক ও পুনঃপ্রাভাবিকীকরণযোগ্য। ১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাইকেল গ্রীন ও জন শোয়ার্জ একটি সম্ভাবনাময় তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এটি সুপারস্ট্রিং তত্ত্ব। এর মাধ্যমেই হয়ত পরম ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। এর প্রধান স্বীকার্য হলো : অপরমাণবিক কণিকারা বিন্দুবৎ কণিকা নয় বরঞ্চ যাকে বলে এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট। অর্থাৎ সুতা বা সুতার লুপ। এরা সতত কম্পমান। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়োচিরো নাম্বু সত্তরের দশকে সূত্রতত্ত্বের (string theory) প্রস্তাব করেন। কিন্তু ১৯৭৬ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী জোয়েল শের্ক ও তাঁর সহকর্মীরা এই তত্ত্বের সাথে 'পরম প্রতিসাম্যের' যোগসাজশে সূত্রতত্ত্বকে সঙ্গতিপূর্ণ করে নতুন তত্ত্বের নাম দেন 'পরমসূত্রতত্ত্ব' বা সুপারস্ট্রিং থিওরি। পরম প্রতিসাম্যের সাহায্যে বোসন ও ফার্মিয়নদের অভিন্ন কল্পনা করা হয়। এতে হিগস্ কণাও একীভূত হয়ে যায়। পরমসূত্রতত্ত্বের প্রতিনিধি হচ্ছে একটি ছোট দল ই(৮) × ই(৮) বা এস.ও(৩২)। ই(৮) প্রতিসাম্যের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে একটি ছোট দল ই(৬)। মনে করা হয় ই(৬)তেই GUT অন্তর্ভুক্ত হয় (কিউ.সি.ডি. ও বিদ্যুৎ ক্ষীণ তত্ত্ব) (ছক-২)। পরমসূত্রতত্ত্বের একটি সম্প্রসারণ কোয়ান্টায়িত মহাকর্ষকেও অন্তর্ভুক্ত করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই তত্ত্ব দশমাত্রিক স্থানকালে কাজ করে। কণিকাদের সূতাকৃতি দেখা যায় প্ল্যাংকের দৈর্ঘ্যে অর্থাৎ $(Gh/c^3)^{1/2} = 10^{-33}$cm ($10^{-35}$m.) এ। যে সময় ব্যবধানে এই সূতাকৃতি সম্ভব তা হচ্ছে (প্ল্যাংকের দৈর্ঘ্য) ÷ (আলোর বেগ)[২] বা $(Gh/c^5)^{1/2} = ১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড সময়ে। বিশ্ব সৃষ্টির $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পরের ঘটনাবলি আমরা মোটামুটি বলতে পারি, কিন্তু তার পূর্বে কিছু বলা যায় না যতোক্ষণ না আমরা মহাকর্ষের কোয়ান্টায়িত তত্ত্ব পাচ্ছি। পরমসূত্রের ভর হচ্ছে প্ল্যাংকের ভরের সমান, $(hc/G)^{1/2} = ১০^{-৫}$ গ্রাম। ঘনত্ব $(c^5/hG^2) = 10^{93}$ gm/cc।

যে প্রোটনের আয়ু ১.৬×১০[illegible] বছরের বেশি শতকরা ৯৯.৯ ভাগ সূক্ষ্মতা নিয়ে কামিওকার পরীক্ষাগারে এ যাবৎ ৩৫২৬টি সম্পূর্ণ ক্ষয়ের স্বাক্ষর ধরা গেছে। ১৯৯৮ সালের জুন মাসে এম. সিজওয়া ও তাঁর শতাধিক সহকর্মী এ ঘোষণা দিয়েছেন। অনু ৭.৫–এর ৫নং পাদটীকা, দ্রষ্টব্য।

প্ল্যাংকের কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্যারামিটারের সংজ্ঞা হলো : প্ল্যাংকের ভর, $m_{pl} = (\hbar c/G)^{1/2} = ২.১৮ \times ১০^{-৫}$ গ্রাম ; প্ল্যাংকের শক্তি, $m_{pl}c^2 = ১.২২ \times ১০^{১৯}$ ই.ভি. ; প্ল্যাংকের সময়, $t_{pl} = (G\hbar/c^5)^{1/2} = ৫.৩৮ \times ১০^{-৪৪}$ সেকেন্ড। যদি $c = ১$, $\hbar = ১$ ও $k = ১$ ধরা হয় তবে সহজ করে লেখা যায়, $m_{pl} = G^{-1/2}$। বর্তমানে পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা যেহেতু $T_0 = ২.৭$ কেলভিন, সেহেতু দেখানো যায় $T = m_{pl}$ -এ রক্তিমসরণ হবে $z_{pl} = ৩ \times ১০^{৩২} g^{১/২}$। এই রক্তিমসরণে হাবল দূরত্বের পরিমাণ ছিল : $H_0^{-1} z_{pl}^{-1} = ৩ \times ১০^{৪} h^{-1} g^{-1/২}$ সে.মি.। এই সময়ে হাবল দৈর্ঘ্য প্ল্যাংকের দৈর্ঘ্যের সমান ছিল (দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৬৮-৩৭৩, Peebles (1993))। স্থানকালের এ ধরনের চরম ও পরম পরিবেশেই পরমসূত্রের অবস্থিতি। এবং ফার্মিয়ন ও বোসনদের জন্য তাই যথাক্রমে দশ (বা ছাব্বিশ) মাত্রার প্রয়োজন। কিন্তু চারমাত্রা ছাড়া বাকি মাত্রাগুলো দেখি না কেন? কারণ চিরায়ত জগতে বাকি মাত্রাগুলো ঘনসংবদ্ধ হয়ে যায়। এই ঘনসংবদ্ধকরণের ধারণা আগেই (১৯১৯) থিয়োডোর কালুজা দিয়েছিলেন। কালুজা অভিকর্ষের সাথে বিদ্যুৎ চৌম্বকত্ব একত্র করে পঞ্চমমাত্রার আমদানি করেন। তাঁর তত্ত্বে ঘূর্ণন ২ গ্রাভিটোন, ঘূর্ণন ১ ভেক্টর মেসন, ঘূর্ণনহীন দিকহীন কণার আবির্ভাব হয়। এখানে গ্রাভিটোন মহাকর্ষবাহী, ভেক্টর মেসন ম্যাক্সওয়েল তত্ত্বের ফোটন, কিন্তু দিকহীন কণাটি সম্পূর্ণ অপরিচিত। এটি আসলে পঞ্চমমাত্রার আকার নির্ধারণ করে। ১৯২৬ সালে অস্কার ক্লাইন দেখান যে, পঞ্চমমাত্রার টপোলজি চতুর্থ মাত্রার থেকে ভিন্ন একে একটি অতি ক্ষুদ্র বৃত্তে সংবদ্ধ করে দেওয়া যায়। কালুজা-ক্লাইন তত্ত্বের নিম্নশক্তির রূপটি হলো বিদ্যুৎ-চৌম্বকত্ব। এই তত্ত্বের তাৎপর্য এই যে, বহুমাত্রা নিয়ে আসলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। প্ল্যাংকের স্কেলে যে বহুমাত্রার উদ্ভব ঘটে চিরায়ত জগতে তার ঘনসংবদ্ধকরণ ঘটে। ফলে দশটির মধ্যে ছয়টি মাত্রা বক্রীভূত হয়ে যায়, থাকে শুধু দৃশ্যমান চারমাত্রা। অনেকটা কমলালেবুর মতো, দূর থেকে মসৃণ দেখালেও এর পৃষ্ঠ অসংখ্য ভাঁজযুক্ত। সম্প্রতি এডোয়ার্ড উইটেন ১৯৯৫ সালে স্ট্রিংতত্ত্বের একটি নতুনতর সংস্করণ আবিষ্কার করেছেন। এর নাম এম-তত্ত্ব (M-theory)। এগারো মাত্রার জগতে কার্যকর এই এম-তত্ত্ব দশমাত্রায় স্ট্রিংতত্ত্বের অন্যান্য সংস্করণে (version) রূপান্তরিত হয়। যখন অতিরিক্ত মাত্রাগুলো একটা বৃত্তে ঘনসংবদ্ধ হয় তখন এম-তত্ত্ব থেকে দশমাত্রার type IIA সুপারস্ট্রিং এবং ডুয়ালিটির (duality) সাহায্যে এর থেকে আবার type IIB সুপারস্ট্রিং পাওয়া যায়। কিন্তু যদি অতিরিক্ত মাত্রাগুলো ঘনসংবদ্ধ হয়ে একটি রেখায় পরিণত হয়, তাহলে এম-তত্ত্ব থেকে $E_8 \times E_8$ দশমাত্রায় হেটেরোটিক স্ট্রিং পাওয়া যায়। এটি আবার ডুয়ালিটির মাধ্যমে SO(32) এর সাথে সম্পর্কিত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : "The Theory Formerly known as String" by M.J. Duff, *Scientific American*, Feb. 1998। পরমসূত্রতত্ত্ব অবশ্য 'ছায়াজগৎ' (shadow world) এর ধারণাও সমর্থন করে। এ ধরনের জগতের বস্তুনিচয় চিরপরিচিত জগতের সাথে কোনো মিথস্ক্রিয়া

করে না, শুধু মহাকর্ষের মাধ্যমে মিথস্ক্রিয়া করে। অনেকটা dark matter এর মতো। এভাবে হয়ত বিশ্বের লুকানো ভরের সমস্যার সমাধান হবে। এ তত্ত্বের অনুকল্পিত কণা axion। ফলে কণাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। বোসনদের পরম প্রতিসম প্রতিকৃতি হলো ফোটিনো, গ্লুয়িনো, জিনো, উইনো (wino), গ্রাভিটিনো এবং ফার্মিয়নদের জন্য স্লেপ্টন ও স্কোয়ার্ক। তবে পরমসূত্রতত্ত্বই যে পরম ঐক্যের সন্ধান দেবে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এখনো অনেক অসমাহিত প্রশ্ন আছে :

হিগস্ কণা পাওয়া যাচ্ছে না কেন?
অভিকর্ষ কেমন করে অন্তর্ভুক্ত করা যায়?
বিশ্বের সমুদয় বস্তুনিচয় কি নাস্তি থেকে উদ্ভূত?
মহাকর্ষীয় তরঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

এতোসব অসমাহিত প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও পদার্থবিজ্ঞানীদের একটি স্বপ্ন পরম ঐক্য একদিন সম্ভব হবে হয়ত। এতে করে $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড সময়ের পূর্বের ঘটনাবলি সম্পর্কে মোটামুটি রূপরেখা আমরা পাবো। কিন্তু 'পরম ঐক্য' নামের সোনার হরিণ সভ্যতার কোনো এক পরম পবিত্র ক্ষণে পদার্থবিজ্ঞানীদের তত্ত্বে ধরা দেবে কিনা সেটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় অসমাহিত প্রশ্ন। নাকি আমরা সংগঠনের অসীম অনুক্রমের (বাক্সের ভেতর বাক্স, তার ভেতরেও বাক্স) এমন এক স্তরে আছি (অবশ্য মনে হয় এটিই সবচেয়ে সম্ভাব্য স্তর) যেটা আমরা সুনিশ্চিতভাবে কোনোদিনই জানতে পারব না। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে এ এক 'সোনার হরিণ' যাকে ধরেও ধরা যাচ্ছে না, নাগালের মাঝে পেয়েও সে নাগালহীন।

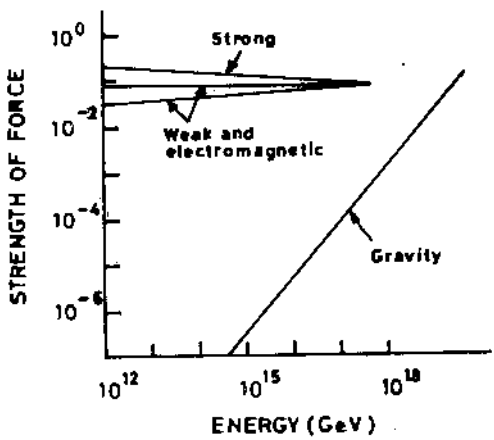

চিত্র ৭.৪ : তিনটি মৌলিক বলের একীভবন এবং মহাকর্ষ

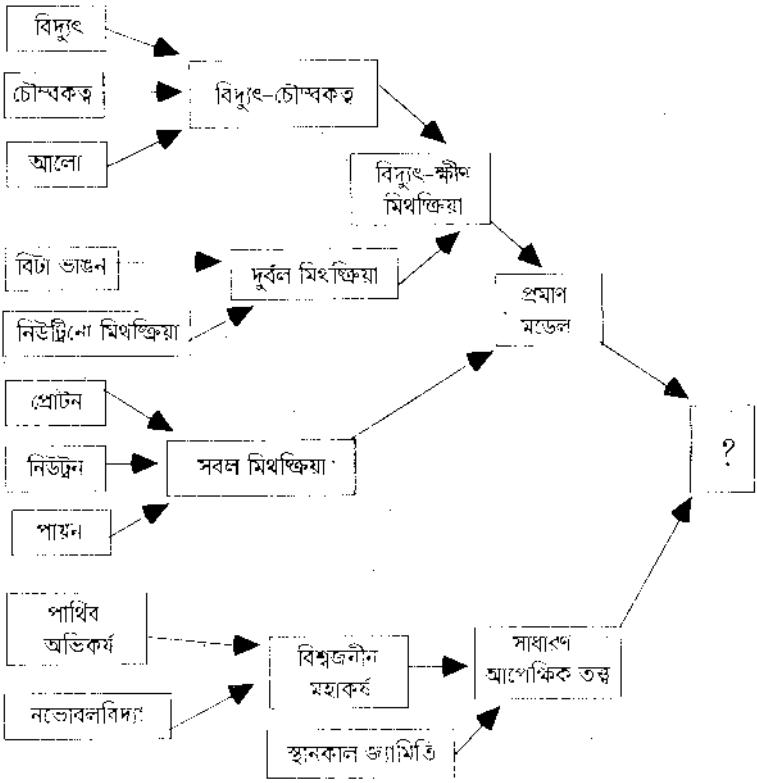

ছক ১ : বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক একীভবন ও মহা একীভবন।

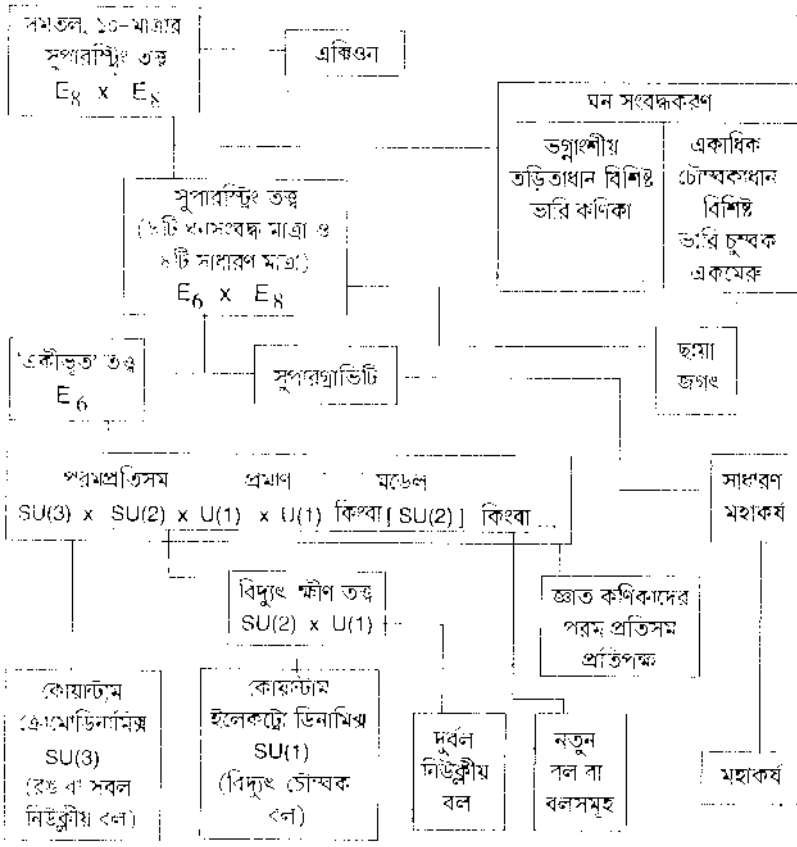

ছক ২ : $E_8 \times E_8$ ভিত্তিক সুপারস্ট্রিং তত্ত্বের সাথে অন্যান্য মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যাকারী গুণের সম্ভাব্য সম্পর্ক।

বইপত্র

বাংলায় মৌলিক কণা এবং একীভূত তত্ত্বের উপর ভাল সাধারণ আলোচনার জন্য হারুন-অর রশীদ (১৯৮৭ ও ১৯৮৮খ) দুটো সংগ্রহে রাখার মতো বই নিঃসন্দেহে। Close (1992) কোয়ার্কের উপর একটি অসাধারণ বই যা সাধারণ পাঠকদের ভাল লাগবে। অগ্রসর পাঠকের জন্য Georgi (1981), Weinberg (1972), 't Hooft (1980) এবং নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রফেসর সালাম প্রদত্ত ভাষণ (যা Lai & kidwai (ed.) (1989)এ সংকলিত হয়েছে) এবং ঐ একই অনুষ্ঠানে ভাইনবার্গ ও গ্ল্যাশোর প্রদত্ত ভাষণ (Reprint No. 158

from *Reviews of Modern Physics*, Vol. 52, No. 3, July 1980) দেখা যেতে পারে। এছাড়া একীভূত তত্ত্বের উপর এবং এসব তত্ত্বের বিবিধ সামাজিক–সাংস্কৃতিক–দার্শনিক প্রভাবের উপর একটি অনবদ্য বই হলো Weinberg (1992)। একীভূত তত্ত্বের সাম্প্রতিক আলোচনার জন্য Weinberg (1999) দেখা যেতে পারে। স্ট্রিং থিওরির উপর ভাল সাধারণ আলোচনার জন্য Green (1986), Kaku & Thompson (1995) এবং Peat (1988) দেখা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট ৩

জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের ধ্রুবরাশিসমূহ

রাশি ও চিহ্ন	মান
আলোর দ্রুতি, c	২৯৯৭৯২৪৫৮ মি. সে.$^{-১}$
প্লাংকের ধ্রুবক, h	৬.৬২৬০৭৫৫(৪০)×১০$^{-৩৪}$ জুল সে.
(নিউটনীয়) মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, G_N	৬.৬৭২৫৯(১৫)×১০$^{-১১}$ মি.^{৩} কিগ্রা.$^{-১}$ সে.$^{-২}$
জানস্কি, J_y	১০$^{-২৬}$ ওয়াট মি.$^{-২}$ হার্জ$^{-১}$
জ্যোতির্বিদ্যার একক, A.U.	১.৪৯৫৯৭৮৭০৬৬(২)×১০^{১১} মি.
ক্রান্তীয় বছর (গ্রহণ বিন্দু থেকে অয়ন বিন্দু), yr. (১৯৯৪)	৩১৫৫৬৯২৫.১ সে.
নাক্ষত্র বছর (স্থির তারা থেকে স্থির তারা) (১৯৯৪)	৩১৫৫৮১৪৯.৮ সে.
গড় নাক্ষত্র দিন (mean sidereal day)	১৩ঘ. ৫৬মি. ৪.০৯০৫৩ সে.
পারসেক (1 AU/1 arc sec.), pc	৩.২৬২...আ.বর্ষ = ৩.০৮৫৬৭৭৫৮০৭(৪)×১০^{১৬} মি.
আলোকবর্ষ, ly	০.৩০৬৬...pc = ০.৯৪৬১...×১০^{১৬} মি.
সূর্যের শ্বেয়াজশিল্ড ব্যাসার্ধ, $2G_N M_\odot/c^2$	২.৯৫৩২৫০৫৮ কি.মি.
সূর্যের ভর, $M_\odot$	১.৯৮৮৯২(২৫)×১০^{৩০} কি.গ্রা.
সূর্যের (নিরক্ষীয়) ব্যাসার্ধ, $R_\odot$	৬.৯৬×১০^{৮} মি.
সূর্যের উজ্জ্বলতা, $L_\odot$	(৩.৮৪৬±০.০০৮) × ১০^{২৬} ওয়াট
পৃথিবীর ভর, $M_\oplus$	৫.৯৭৩৭৫(৬৬)×১০^{২৪} কি.গ্রা.
পৃথিবীর (নিরক্ষীয়) ব্যাসার্ধ, $R_\oplus$	৬.৩৭৮১৪০×১০^{৬} মি.
হাবলের ধ্রুবক, H_0	১০০h_0 কি.মি. সে.$^{-১}$ মেগাপারসেক$^{-১}$
	= h_0(৯.৭৭৮১৩ বিলিয়ন বছর)$^{-১}$
স্বাভাবিকীকৃত (normalized) হাবল ধ্রুবক, h_0	০.৬ < h_0 <০.৯
বিশ্বের ক্রান্তি ঘনত্ব (critical density), $\rho_c = 3H^2/8\pi G_N$	১.৮৭৮৮২(২৪)×১০$^{-২৯}$ h_0^2 গ্রাম সে.মি.$^{-৩}$
বিশ্বের ঘনত্ব প্যারামিটার, $\Omega_0 = \rho_U/\rho_c$	০.১ <Ω_0 <২
বিশ্বের বয়স, t_0	১১.৫+১±১.৫ বিলিয়ন বছর
$\Omega_0 h_0^2$ for $\Lambda = 0$	≤১.৫, t_0 ≥১০ বিলিয়ন বছর হলে
	≤১, t_0 >১০ বিলিয়ন বছর, η_0>০.৪
পটভূমি বিকিরণ, T_0	২.৭২৬±০.০০২ কেলভিন
পটভূমি বিকিরণস্থ ফোটনের সংখ্যা ঘনত্ব, n_γ	৪১১.৫৬ (১/১.০৯৬)^{৩} সে.মি.$^{-৩}$

বন্ধনীস্থ সংখ্যা শেষ সংখ্যায় ১ পরিমিত বিচ্যুতি (1 standard deviation) অনিশ্চয়তা নির্দেশ করে

পরিশিষ্ট ৪

সৌরজগতের তথ্যাবলি

	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস	নেপচুন	প্লুটো
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (মিলিয়ন কি.মি.)	৫৭.৯০৯	১০৮.২	১৪৯.৬	২২৭.৯৪	৭৭৮.৪	১৪২৩.৬	২৮৬৭.০	৪৪৮৮.৪	৫৯০৯.৬
বৃহস্পতির নক্ষত্রিক পর্যায় (দিনে) (sidereal period)	৮৭.৯৬৯	২২৪.৭০১	৩৬৫.২৫৬	৬৮৬.৯৮	৪৩৩২.৫৯	১০৭৫৯.২	৩০৬৮৮.৪	৬০১৮১.৩	৯০৪৬৯.৭
(ক্রান্তীয় বছরে)	০.২৪	০.৬১৫	১.০০০০৪	১.৮৮	১১.৮৬	২৯.৪৬	৮৪.০২	১৬৪.৭৭	২৪৭.৭
বৃহস্পতির যুতিকাল (synodic period) (দিনে)	১১৫.৮৮	৫৮৩.৯২	—	৭৭৯.৯৪	৩৯৮.৮৮	৩৭৮.০৯	৩৬৯.৬৫	৩৬৭.৪৯	৩৬৬.৭৩
ভর (কিলোগ্রাম)	৩.৩×10^{২৩}	৪৮.৭×10^{২৪}	৫৯.৭৪×10^{২৪}	৬.৪১৯×10^{২৩}	১৮৯.৯×10^{২৭}	৫৬.৮৬×10^{২৬}	৮.৬৬×10^{২৫}	১০.৩×10^{২৫}	৬.৬×10^{২১} থেকে ১.৬×10^{২২}
গড় ঘনত্ব (গ্রাম/সে.মি.^{৩})	৫.৪৩	৫.২৪	৫.৫১	৩.৯৪	১.৩১৪	০.৬৯	(১.৩)	১.৭৬	(০.৬–১.৭)
অক্ষীয় ঘূর্ণনের পর্যায় (d=দিন, h=ঘণ্টা)	৫৮.৬৫ d	২৪৩.০১ d	২৩.৯৩ h	২৪.৬২২৯ h	৯.৮৪১ h	১০.১৩৩ h	১৭.৯ h	১৪.২ h	৬.৩৮ h
কক্ষীয় তলের সাথে বিষুবরেখার আনতি	৩°	১৭৭.৩°	২৩.৪৪°	২৫.১৯°	৩.০৮°	২৬.৭৩°	৯৭.৯২°	২৮.৮°	১১১.৪৬°
বিষুবীয় অঞ্চলে g-এর মান (মি./সে.^{২})	৩.৭৯	৮.৮৬৯	৯.৭৯৮	৩.৭২	২২.৮৮	১০.৫৯	৭.৭৭	১১.৬১	(৪.৩)
বিষুবীয় অঞ্চলে মুক্তিবেগ (কি./সে.)	৪.৩	১০.৪	১১.২	৫.০	৫৯.৫	৩৫.৬	২১.২২	২৩.৩	(৭.৩)
গড় কক্ষীয় গতিবেগ (কি.মি./সে.)	৪৭.৮৯	৩৫.০৩	২৯.৭৯	২৪.১৩	১৩.০৬	৯.৬৪	৬.৮১	৫.৪৩	৪.৭৪
উৎকেন্দ্রিকতা	০.২০৫	০.০০৬	০.০১৬	০.০৯৩	০.০৪৮	০.০৫৫	০.০৪৭	০.০০৯	০.২৪৯
উপগ্রহ	—	—	১	২	১৬	২১	১৭	৮	১

এখানেতে লেখা তথ্যে ভুলের সম্ভাবনা ১০%।

পরিশিষ্ট ৫
বিশটি উজ্জ্বল তারা

তারা	পাশ্চাত্য নাম	বাংলা নাম	আপাত উজ্জ্বলতা (V)	পরম উজ্জ্বলতা (M_V)	বর্ণালি	দূরত্ব (আঃবর্ষ)	দীপ্তি (সূর্য=১)	মণ্ডলী	মন্তব্য
αCMa	Sirius	লুব্ধক	১,৪৩,৭,২৩	−১,৪	A1v+dA1	৮,৬	২৫,০+০,০০০১	Canis Major, বৃহৎকুকুর	জোড়া তারা
αCar	Canopus	অগস্ত্য	০,৭৩	৪,৫	F0Ib	৯৮,০	১৪৫০,০	Carina	
αCen	Rigel kent	জঙ্ঘা	−০,২৭,১,৫	−৪,৩	G2v+K5v	৪,৩	১,৩০+০,৩৪০০	Centaurus, মহিষাসুর	জোড়া তারা
αBoo	Arcturus	স্বাতী	−০,০৬	−০,১	K2IIIp	৩৬,০	১১০,০০	Boötes, ভূতেশ	
αLyr	Vega	অভিজিৎ	+০,০৪	−০,৫	A0v	২৬,০	৫২,০০	Lyra, বীণা	
αAur	Capella	ব্রহ্মহৃদয়	+০,০৪	−০,৬	G0 IIIp	৪৪,০	১৬০,০০	Auriga, ব্রহ্মা, প্রজাপতি	বর্ণালি জোড়া
βOri	Rigel	রণেরাজ	+০,১৫	−৭,০	B8Ia	৬০০,০	২১,০০০,০০	Orion, কালপুরুষ	
αCMi	Procyon	সরমা, প্রভস	+০,৩৭	+২,৭	F5 IV V+d	১১,৪	৭,৬+০,০০৩৫	Canis Minor, শ্বানমণ্ডল	
αEri	Acherner	নদীশীর্ষ	+০,৪৬	৫,৯	B5IV-V	৬৫,০	৯১০,০	Eridanus, যমী	
αOri	Betelgeuse	কুর্দ	+০,৪ থেকে −১,৩	৫,০	M2 Iab	৬০০,০	২১,০০০,০০	Orion, কালপুরুষ	বিষমতারা
βCen	Agena	বিজঙ্ঘ	+০,৬৬	৪,০	B0.5 V+B2	৩০০,০	৫,৬০০,০+(?)	Centaurus, মহিষাসুর	জোড়াতারা
αAql	Altair	শ্রবণা	+০,৭৭	+২,২	A7 IV-V	১৬,৬	১০,০	Aquila, ঈগল, গরুড়	
αTau	Aldebaran	রোহিণী	+০,৮৫,১৩,০	০,০৭	K5III+M2v	৫২,০	১০০,০+০,০০১৩	Taurus, বৃষ	বিষম, জোড়া
αCru	Acrux	বিশ্বামিত্র	+০,৮৭,+২,০৯	৪,০	B1 IV-V+B3v	৩৯০,০	২,৭৬০+১,৬০০	Crux, ত্রিশঙ্কু	জোড়াতারা
αSco	Antares	জ্যেষ্ঠা	+০,৯৬,+৫,১	−৫,০	M1 Ib + B4ev	৪২০,০	৬,০০০,০+১১৫,০	Scorpion, বৃশ্চিক	বিষম, জোড়
αVir	Spica	চিত্রা	+১,০,+০,১০	−০,৩	B1.5 v+B3v	২৭৪,০	২,০০০,০+৩৩০,০	Virgo, কন্যা	বর্ণালি জোড়া
αPsA	Fomalhaut	মৎস্যমুখ	−১,১৬,+৬,৫	+১,৯	A3v+K4v	২২,৬	১৩,০+০,১০	Pisces Austrinus, দক্ষিণ মীন	
βGem	Pollux	কেমতরা, পুনর্বসু	−১,১৬	+১,০	K0III	৩৭০	১৭০,০	Gemini, মিথুন	
αCyg	Deneb	ছয়াগ্নি, পুচ্ছ	+১,২৬	−৭,০	A2Ia	১,৪০০,০	৪৭,০০০,০	Cygnus, বক	
βCru	Mimosa		+১,২৬	−৪,৬	B0.5 IV-V.	৩০০,০	৫,৭০০,০	Crux, ত্রিশঙ্কু	

পরিশিষ্ট ৬

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি ওয়েবসাইট

NASA: http://www.nasa.gov

JPL: http://www.jpl.nasa.gov

Cambridge University Cosmology :
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/index.html

Scientific American : http://www.sciam.com

Nature : http://www.nature.com

Astronomy : http://www.kalmbach.com/astro/astronomy.html

Usenet Relativity FAQs :
http://www.math.ucr.edu/home/baez/physics/gravity.html

General Relativity by John Baez:
http://www.math.ucr.edu/home/baez/gr/outline1.html

FAQs on Black Hole : http://cfpa.berkeley.edu/BHfaq.html

Cosmology Tutorial :
http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmology_faq.html

American Astronomical Society : http://www.aas.org/

Latest HST picture : http://www.oposite.stsci.edu/pubinfo/latest.html

Views of the Solar System :
http://bang/lanl.gov.solarsys/eng/host.html

Spacelink : http://nyquist.ee.ualberta.ca/~wanigan/spacelink/space_link.html

Yahoo Astronomy Site : http://dir.yahoo.com/Science/Astronomy &
http://dir.yahoo.com/Science/Astronomy/Web_directories/

Links to Astronomy : http://www.cvc.org/astronomy/index.htm

Pulsar's Astronomy Links-a huge list :
http://www.users.dircon.co.uk/~jmwebb/links.html

Pulsar Site : http://www.jb.man.ac.uk/~pulsar or
http://pulsar.princeton.edu/rpr.shtml

Expanding Universe :
http://www.tpl.toronto.on.ca/TRL/astronomy/TERMS.HTM

N. B. The addresses of the websites mentioned above are subject to change. It is advised in any case to connect to the Yahoo Astronomy Site, which contains a large list of many interesting astronomy sites.

গ্রন্থপঞ্জি

আইনস্টাইন, এ. (১৯১৬)। *আপেক্ষিকতা* (অনু.–নুরুল হুদা)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ (১৯৮৫)।

ইসলাম, জামাল নজরুল (১৯৮৫)। *কৃষ্ণবিবর*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

খান, এ. আর. (১৯৯২)। "মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য"। *মহাকাশ বার্তা*, ১ম বর্ষ, ৯–১০ সংখ্যা।

খান, মোঃ মাজহারুল ইসলাম (১৯৮৯)। "পালসার"। *বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা*, ১৫শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা, ৪৩ খণ্ড।

গ্যামো, জর্জ (অনু. ১৯৮৩)। *সূর্যের জন্ম ও মৃত্যু* (অনু.–আলী আসগর)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

গ্যামো, জর্জ (অনু. ১৯৮৬)। *বিশ্বজগতের সৃষ্টি* (অনু.–হাসমত আলী)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

গ্যামো, জর্জ (অনু. ১৯৮৮)। *অভিকর্ষ* (অনু.–মোঃ তোফাজ্জল হোসেন সরকার)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

জব্বার, মোঃ আঃ (১৯৮৬)। *বিশ্ব ও সৌরজগত*। তথ্য ও প্রকাশনা অফিস। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাম্মদী, ফা. মা. (১৯৯৪)। "নক্ষত্রের গর্ভ থেকে"। *বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা*, ২০শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা, ৫৩ খণ্ড।

মোহাম্মদী, ফা. মা. (১৯৯৭)। "সৃষ্টির মাহেন্দ্র ক্ষণে"। *বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা*, ২৩ বর্ষ : ২য় সংখ্যা, ৫৮ খণ্ড।

মোহাম্মদী, ফা. মা. (১৯৯৮ক)। "বিশ্বের অন্তিম নিয়তি"। *বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা*, ২৪শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা, ৬০ খণ্ড।

মোহাম্মদী, ফা. মা. (১৯৯৮খ)। "মহাবিশ্বে ব্যাপক কাঠামোর উদ্ভব"। *বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা*, ২৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৬১ খণ্ড।

মোহাম্মদী, ফা. মা. (১৯৯৮গ)। *জ্যোতির্বিজ্ঞান শব্দকোষ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সফিউল্লাহ, সৈয়দ (১৯৯২)। *অস্তিত্বের অতলান্তে*। বাংলাদেশ রিসার্চ ব্যুরো।

সমরোদিনস্কি, ইয়া.আ. (অনু. ১৯৮৪)। *কণা কোয়ান্টাম ও তরঙ্গ* (অনু.–সুব্রত বড়ুয়া)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হকিং, স্টিফেন (১৯৮০)। "তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের সমাপ্তি কি গোচরীভূত?" (অনু.–ফা.মা. মোহাম্মদী)। *বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা*, ২০ বর্ষ : ১ম সংখ্যা, ৫২ খণ্ড।

হারুন-অর-রশীদ, এ. এম. (১৯৮৪)। *আইনস্টাইন ও আপেক্ষিকতত্ত্ব*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হারুন-অর-রশীদ, এ. এম. (১৯৮৭)। *পদার্থবিজ্ঞানে বিপ্লব*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হারুন-অর-রশীদ, এ. এম. (১৯৮৮ক)। *আকাশ-ভরা সূর্য-তারা*। আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

হারুন অর-রশীদ, এ. এম. (১৯৮৮খ)। *মৌলিক কণা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ।

হারুন-অর-রশীদ, এ. এম. ও মোঃ নূরুল ইসলাম (১৯৯৬)। *সাধারণ আপেক্ষিকতা ও বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হারুন-অর-রশীদ, এ. এম. (১৯৯৮)। "আধুনিক বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব"। *শিল্পী*, ৪থ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা।

হারুন-অর-রশীদ, এ. এম. (১৯৯৯)। "কোয়ান্টাম মহাকর্ষ"। *বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা*, ২৫ বর্ষ : ২য় সংখ্যা।

Abell, George O. (1975). *Exploration of the Universe*. Holt, Rinehart and Winston, N.Y. 3rd edition.

Abhyankar, K.D. (1992). *Astrophysics*. Tata-McGraw-Hill, New Delhi.

Basu, Biman (1992). *Inside Stars*. Publication & Information Directorate, CSIR,New Delhi.

Beiser, A. (1995). *Concepts of Modern Physics*. McGraw-Hill Book Co., New York, 5th edition.

Bennet, J.G. (1956). *The Dramatic Universe*. Vol-I. Hodder & Stoughton, London.

Bergmann, P.G. (1976). *Introduction to the Theory of Relativity*. Dover Publications, Inc. New York.

Bernstein, J. (1991). *Einstein*. Fontana Press, 2nd ed.

Berry, M. (1989). *Principles of Cosmology & Gravitation*. Adam Hilger, Bristol & Philadelphia.

Bethe, H. A. & G. Brown (1985). "How a Supernova Explodes". *Scientific American*. May.

Bok, Bart J. (1981). "The Milky Way Galaxy". *Scientific American*. Vol. 244, No. 3, March

Boslough, John (1989). *Stephen Hawking's Universe*. Avon Books, New York.

Bothun, G. D. (1997). "The Ghostliest Galaxies". *Scientific American*. February.

Bouchet, F. *et al* (1988). "Patterns of Cosmic Microwave Background from Evolving String Networks". *Nature*, **335** (September 29).

Brinton, Crane (1950). *Ideas & Men—The Story of Western Thought*. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, N.J.

Buchdahl, H. A. (1981). *Seventeen Simple Lectures on General Relativity Theory*. John Wiley & Sons Inc.

Burns, J. O. (1986). "Very Large Scale Structure of The Universe". Scientific American, Vol. 246, July.

Cambridge Atlas of Astronomy (1994). Edited by J. Audouze & G. Israel. Cambridge University Press, Cambridge 3rd edition.

Chandrasekhar, S. (1973). "A chapter in the astrophysicist's view of the universe". In *Physicist's Conception of Nature*, (ed. J. Mehra). D. Reidel

Publishing co., Boston, USA.

Chandrasekhar, S. (1987). *Truth and Beauty*. Penguin Books, India (P) Ltd.

Close, Frank (1992). *The Cosmic Onion*. American Institute of Physics.

Cole, P. & F. Lucchin (1995). *Cosmology : The Origin and Evolution of Cosmic Structure*. John Wiley & Sons.

Deutsch, D. & M. Lockwood (1994). "The Quantum Physics of Time Travel". *Scientific American*. Vol. 270, No. 3, March

de Vaucouleurs, G.J (1987). "Superclusters". In Moore (1987).

DeWitt, B. S. (1983). "Quantum Gravity". *Scientific American*. Vol. 249, No. 6, December.

Dictionary of Physics. McGraw-Hill (1986). Editor in chief- S. B. Parker.

Dicus, D. A., J. R. Letaw, D. C. Teplitz, V. L. Teplitz (1983). "The Future of The Universe". *Scientific American*, vol. 248, No. 3, March.

Dirac, P. A. M. (1973). "Fundamental Constants and their Development in Time". in *Physicist's Conception of Nature*, (ed. J. Mehra). D. Reidel Publishing Co., Boston, USA.

Disney, M. (1998). "A New Look at the Quasars". *Scientific American*. Vol. 278, No. 6, June.

Duncan, R. C. (1998). *Magnetars, Soft Gamma Repeaters and Very Strong Magnetic Fields*. Available at the URL : http://solomon.as.utexas.edu/~duncan/magnetar.html

Einstein, A. (1956). *The Meaning of Relativity*. Princeton University Press, Princeton.

Einstein, A. & L. Infeld (1960). *The Evolution of Physics*. Cambridge University Press.

Emiliani, C. (1992). *Planet Earth*. Cambridge University Press, Cambridge.

Encyclopaedia Brittanica, The New (1992). Articles on the Cosmos, Sub-atomic Particles, The Galaxies, Nebulae.

Encyclopedia of Science and Technology, The McGraw-Hill (1994). McGraw-Hill Book Co., New York, 7th edition.

Ferguson, K. (1991). *Stephen Hawking : Quest for a Theory of Everything*. Bantam Books, New York.

Ferguson, K. (1996). *Prisons of Light - Black holes*. Cambridge University Press.

Feynman, R. P., F. B. Morinigo & W. G. Wagnar (1995). *Feynman Lectures on Gravitation*. Addison-Wesley Publishing Co.

French, A. P. (1968). *Special Relativity*. Chapman & Hall.

Freedman, W. L. (1998). "The Expansion Rate and Size of the Universe". *Scientific American*. Special issue : *the Magnificent Cosmos*, quarterly. Also available at the URL: www.sciam.com/specialissues/0398cosmos/0398freedman.html.

Georgi, H. (1981). "A Unified Theory of Elementary Particles and Forces".

Scientific American. Vol. 244, April.

Gott, R., J. E. Gunn, D. N. Schramm and B. M. Tinsley (1976). "Will the Universe expand forever?" *Scientific American*. Vol. 234, March.

Gregory, S. A. & L. A. Thompson (1982). "Superclusters and Voids in the Distribution of Galaxies". *Scientific American*. Vol.246, March.

Green, M. B. (1986). "Superstrings". *Scientific American*. Vol. 255, No. 5, September.

Gribbin, John (1986). *In the Search of Big Bang*. Corgi Books,UK.

Gribbin, John (1998). *Watching the Universe*. Universities Press, India.

Gurevich, L. E. & A.D. Chernin (1987). *The Magic of Galaxies and Stars*. Mir Publishers, Moscow.

Guth, A. H. & Paul J. Steinhardt (1984). "The Inflationary Universe". *Scientific American*. Vol. 250, No. 5, May.

Halliwell, Jonathan J. (1991). "Quantum Cosmology and the Creation of the Universe". *Scientific American*. December.

Hawking, S. W. & G. F. R. Ellis (1973). *The Large Scale Structure of Space-Time*. Cambridge University Press, Cambridge.

Hawking, S. W. (1977). "The Quantum Mechanics of Black Holes". *Scientific American*. Vol. 236, January.

Hawking, S. W. & W. Israel (edited) (1987). *300 years of Gravitation*. Cambridge University Press, Cambridge.

Hawking, S. W. (1988). *A Brief History of Time*. Bantam Books, New York.

Hawking, S. W. (1993). *Black Holes, Baby Universes and Other Essays*. Bantam Books, New York.

Hawking, S. W. & R. Penrose (1996). *The Nature of Space and Time*. Oxford University Press.

Henbest, Nigel & Michael Marten (1996). *The New Astronomy*. Cambridge University Press, 2nd edition.

Henry, J. P., U. G. Briel & Hans Böhringer (1998). "The Evolution of Galaxy Clusters". *Scientific American*. Vol. 279, No. 6, December.

Hewish, A. (1987). "Pulsars". In Moore (1987).

Hogan, C. J., R. P. Kirshner, N. B. Suntzeff (1999). "Surveying Space-time with Supernovae". *Scientific American*. Vol. 280, No. 1, January.

Islam, J. N. (1983). *The Ultimate Fate of The Universe*. Cambridge University Press, Cambridge.

Islam, J. N. (1992). *An Introduction to Mathematical Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge.

Kaku, M. & J. Thompson (1995). *Beyond Einstein*. Anchor Books, Revised editon.

Krauss, L. M. (1986). "Dark Matter In The Universe". *Scientific American*. Vol. 280, No. 1, January.

Krauss, L. M. & G. D. Starkman (1999). "The Fate of Life in the Universe". *Scientific American*, Nov., vol. 281, No. 5.

Lai, C. H. & A. Kidwai (ed.) (1989). *Ideals and Realities: Selected Essays of Abdus Salam*. World Scientific.

Lasota, J. P. (1999). "Unmasking Black Holes". *Scientific American*. Vol. 280, No. 5, May.

Linde, A. (1990). *Inflation and Quantum Cosmology*. Academic Press, Inc.

Linde, A. (1998). "The Self-Reproducing Inflationary Universe". *Scientific American*. Special issue: *The Magnificent Cosmos*, quarterly. Also available at the URL: http://sciam.com/specialissues/0398cosmos/0398linde.html.

Lyne, A. G. & F. Graham-Smith (1998). *Pulsar Astronomy*. Cambridge University Press. 2nd Edition.

Mair, John (ed.) (1989). *The Illustrated Encyclopedia of Astronomy*. Gallery Books, N.Y.

Mehra, J. (ed.) (1973). *Physicist's Conception of Nature*. D. Reidel Publishing Co., Boston, USA.

Misner, C. W., K. S. Thorne & J. A. Wheeler (1973). *Gravitation*. W.H. Freeman, San Francisco, California.

Mitton, J. (1992). *The Penguin Dictionary of Astronomy*. Penguin Books. 2nd ed.

Mofiz, U. A. (1998). "Pulsars and the physics of rotating neutron stars". *The Bangladesh Journal of Astronomical Research*, Vol.1, no.1.

Morse, P. M. & H. Feshbach (1953). *Methods of Theoretical Physics*. Vol. I & II, McGraw-Hill Book Co. N.Y.

Moor, Patrick (ed.) (1987). *The International Encyclopedia of Astronomy*. Orion Books, N.Y.

Narlikar, J.V. (1993a). *Introduction to Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge. 2nd edition.

Narlikar, J.V. (1993b). *Structure of the Universe*. Oxford University Press, Oxford.

Narlikar, J.V. (1996). *Elements of Cosmology*. University Press, India.

Nemiroff, Robert J. (1993). "Visual Distrotions near a Neutron Star and Black Hole". *The American Journal of Physics*, **61**, 619. Also available at the URL: http://antwarp.gsfc.nasa.gov/htmltest/gifcity/nslens-intro.html.

Novikov, I. D. (1979). *Evolution of the Universe*. Cambridge University Press. Cambridge.

Novikov, I. D. (1990). *Black Holes & the Universe*. Cambridge University Press, Cambridge.

Olive, K. A. (1994). "Big Bang Cosmology". *Phys. Rev.*, **D50**, pp. 1236-37.

Page, L. 1952. *Introduction to Theoretical Physics* (3rd edition). D. Van Nostrand Co., Inc. N.Y.

Parnov, E. I. (1971). *At The Crossroads of Infinities*. Mir Publishers, Moscow.

Pasachoff, J. M. (1981). *Contemporary Astronomy*. Sanders College Publishing.

Peat, F. David (1988). *Superstrings*. Abacus Books.

Peebles, P. J. E. & J. Silk (1988). "A Cosmic Book". *Nature*, **335** (October 13).

Peebles, P. J. E. (1993). *Principles of Physical Cosmology*. Princeton University Press, Princeton.

Peebles, P. J. E.; D. N. Schramm, E. L. Turner & R. G. Kron (1998). "The Evolution of the Universe". In *Scientific American*. Special issue: *the Magnificent Cosmos*, quarterly. Also available at the URL: www.sciam.com/specialissues/0398cosmos/0398peebles.html.

Penrose, Roger (1989). *The Emperor's New Mind*. Vintage.

Penrose, Roger (1994). *Shadows of The Mind*. Vintage.

Price, Huw (1996). *Time's Arrow and Archimedes' Point*. Oxford University Press, New York.

Rees, M. (1999). "Exploring Our universe and Others", *Scientific American*, Nov., Vol. 281, No. 5.

Ronan, C. (editor) (1988). *Encyclopedia of Astronomy*. Chartwell Books Inc. (Articles on Extragalactic Astronomy, Milky Way, Quasers etc.)

Rosenfeld, B.A. (1988). *A History of Non-Euclidean Geometry: Evolution of the Concept of a Geometric Space* (translated from Russian by Abe Shenitzer). Springer-Verlag, New York.

Rubin, Vera C. (1983). "Dark Matter in Spiral Galaxies". *Scientific American*, June.

Rubin, Vera C. (1998). "Dark Matter in the Universe". *Scientific American. Special issue: the Magnificent Cosmos*, quarterly. Also available at the URL: www.sciam.com/specialissues/0398cosmos/0398rubin.html.

Sagan, Carl (1992). *Cosmos*. Ballantine Books, N.Y.

Sciama, D.W. (1973). "The Universe as a Whole". In *Physicists' Conception of Nature*, (ed. J. Mehra). D. Reidel Publishing Co., Boston, USA.

Silk, J., A.S. Szalay & Y. B. Zel'dovich (1983). "The Large-scale Structure of the Universe". *Scientific American*, Vol. 249, October.

Simon, J. Z. (1994). "The physics of time travel". *Physics World*, December.

Singh, Jagjit (1992). *Abdus Salam—A Biography*. Penguin Books.

Shapiro, S. L. & S. A. Teukolsky (1983). *Black Holes, White Dwarfs and Neutron Stars: Physics of Compact Objects*. John Wiley & Sons.

Smith, R. W. (1982). *The Expanding Universe*. Cambridge University Press.

Snow, T. P. (1983) *The Dynamic Universe*. West Publishing Co., Minnesota.

Sokolnikoff, I. S. (1964). *Tensor Analysis*. John Wiley & Sons, Inc. New York.

Takeda, G. (1992). "The Rise & Fall of Elementary Particle Physics". *AAPPS Bulletin*, Vol. 2, no. 2, June.

Taylor, E. F. & J. A. Wheeler (1966). *Spacetime Physics*. W. H. Freeman and Company, San Francisco.

't Hooft, G. (1980). "Gauge Theories of the Forces between Elementary Particles". *Scientific American*, Vol. 242, No. 6, June.

Thorne, Kip S. (1994). *Black Holes & Time Warps*. W.W. Norton & Co.; N.Y..

Tolman, R. C. (1934). *Relativity, Thermodynamics and Cosmology*. Clarendon Press, Oxford, pp. 244, 333-335, 339-341.

Trefil, J. S. (1984). "The Quest for Order". In *Dialogue*, No. 63, January.

Veilleux, S. *et al.* (1996). "Colossal Galactic Explosions". Scientific American, Vol. 274, February.

Veltman, M. J. G. (1986). "The Higgs Boson". *Scientific American*, Vol. 255, No. 5, November.

Venkataraman, G. (1992). *Chandrasekhar and his Limit*. University Press, India.

Vorontsov-Vel'yaminov, B. A. (1985). *Essays About the Universe*. Mir Publishers, Moscow.

Wagoner, R. V. & D. W. Goldsmith (1982). *Cosmic Horizons*. California.

Wali, K. (1990). *Chandra*. Penguin Books.

Wang, R. P., N. Y. Lu, D. H. Feng & F. K. Thielemann (1992). "Interplay between Nuclear Physics and Astrophysics: Nuclear Astrophysics". *AAPPS Bulletin*, vol. 2, No.2, June.

Weinberg, S. (1972). *Gravitation and Cosmology*. John Wiley & Sons.

Weinberg, S. (1974). "Unified Theories of Elementary-Particle Interaction". *Scientific American*, Vol. 231, No. 1, July.

Weinberg, S. (1976). *The First Three Minutes*. Flamingo, Fontana Paperbacks.

Weinberg, S. (1992). *Dreams of a Final Theory*. Pantheon Books, New York.

Weinberg, S. (1999). "A Unified Physics by 2050?" *Scientific American*, Nov., Vol. 281, No. 5.

Weyl, H. (1952). *Space Time Matter*. Dover Publications, Inc. N.Y.

Wheeler, A. J. (1973). "From relativity to mutability". In *Physicist's Conception of Nature*, (ed. J. Mehra). D. Reidel Publishing Co., Boston, USA.

Wilczek, F. (1980). "The Cosmic Asymmetry between Matter and Antimatter". *Scientific American*, Vol. 243, No. 6, December.

Zeilik, M. & J. Gaustad (1990). *Astronomy: The Cosmic Perspective*. John Wiley & Sons, 2nd edition.

নির্ঘণ্ট

অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ১১, ২২
অদৃশ্য বস্তু (Dark matter) ৬, ২৫–২৭৫
অনিয়মিত ছায়াপথ ১১৫
অনুরণন কণা ২৮৭
অপজাত চাপ ২২৫, ২২৭
অপরিচিতির সংখ্যা (দ্রষ্টব্য স্ট্রেঞ্জনেস) ২৮৯
অভিকর্ষ ১১
অয়নচলন ২৭৮
অলবার্সের হেঁয়ালি ৫৫–৫৬
অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথ ১০৬–১০৭
আইনস্টাইন-ডিসিটার মডেল ৩১, [illegible]
আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণ ২৩, ২৪, ৩২–৩৩
আইনস্টাইনের বিশ্বতত্ত্ব ৩৩–৩৬
আইসোস্পিন ২৮৯
আকাশগঙ্গা ছায়াপথ ১৬৪–১৭৬
আধুনিক বিশ্বচিত্র ৪
আদিম কেন্দ্রীন সংশ্লেষণ ৫৩, ৬১–৬৪
আধুনিক বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব ১, ৩৫
আপেক্ষিকতার নীতি ১০
আলোকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ১৮৩
ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ১১
ইউক্লিডীয় মেট্রিক ৯৩
ইয়ৎভসের পরীক্ষা ১৯
উপদ্বীপাকার ছায়াপথ ১১৬–১১৭
উষ্ণমহাবিস্ফোরণ মডেল ৩১, ৩২, ৬৩
এইচ টু অঞ্চল ১৬৭, ১৭৩, ১৩৫
এক্স-রে টুমোগ্রাফি ২৭২
এক্সিওন ২৭৩, ৩৫২
এনট্রপি বিচলন ১৫৩, ১৫৪
এম-৩২ ৩১১
এরগোস্ফিয়ার ২৩৬
এস.জি.আর ২৩৪
ওপেনহাইমার–ভলকফ সীমা ২২৬
কণিকা-প্রতিকণিকা অপ্রতিসাম্য ৬৫–৬৭
কণাবাহী ৪৬, ১৪৩
কসমিক স্ক্রিনিং ২৪৩
কাকড়া নীহারিকা ১২০, ২৯২
কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন চক্র ২১১, ২১২
কালপুরুষ নীহারিকা ২৩৬, ২৩৭
কাল শব্দ ২১, ২৩২
কৃষ্ণ কুহর ৩৯, ৩১১
কিউ.এস.ও. ২৯৩
কিউ.সি.ডি. ২৯১
কুণ্ডলিত ছায়াপথ ১১৩–১১৫
কুণ্ডলিত বাহুসৃষ্টি, ছায়াপথের ১৭৫
কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডলী ১৮২
কৃষ্ণবিবর ২৩৬, ২৭১
~ কের–নিউম্যান ২৩৬
~ ঘূর্ণ্যমান ২৩৯
~ ছায়াপথীয় ২৬২, ২৬৪
~ শোয়ার্জশিল্ড ২৩৬
কোয়ান্টাম ভর ২২৩
কোয়ান্টাম সৃষ্টিতত্ত্ব ৮৫–৯৭
কোয়াক ২৮৮–২৯৩
কোয়াসার ১৩৩–১৩৬
ক্ষুদ্রাবর ৮৮, ২৫৫
গুচ্ছস্তবক, (বস্তুলোকের স্তবক দ্রষ্টব্য)
গেজ থিওরি ২৯৪, ২৯৭
গোলক বিশ্ব ৩৩
গ্রহ নীহারিকা ২১৭
গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্স [illegible]
গ্লুয়ন ২৯৩

BANGDOG LIBRARY

গ্লোবাল মেথড ৯০
ঘটনা দিগন্ত ২৩৬
ঘনত্ব প্যারামিটার ৪০, ২৬৮
ঘনত্ব বিচলন ১৪৯, ২৭১
ঘন-সংবদ্ধ বস্তু ২২৫
চন্দ্রশেখরের সীমা ২২৭
চৌম্বক একমেরু ৭২, ৭৪
ছায়াপথ ১০১
ছায়াপথ স্তবক ১৩৯-১৪৭
ছায়াপথের উদ্ভব ১৭৪-১৭৭
~ ভর ১১৯, ১২৩, ১৬৫
~ দূরত্ব ১২৪
~ মহাস্তবক ১৪২
জি.আর.বি ২৩৪
জিনসের দৈর্ঘ্য ১৫০, ২০৩
জিনসের ভর ১৪২, ২০৩
জোড়াতারা ১৮৮-১৯০
জোয়ার বল, মহাকর্ষীয় ১১, ১২
টেলার ক্যালকুলাস ১৩
ডপ্লার ক্রিয়া ৪৩
ডি-ভেকোলোর শ্রেণীবিভাগ ১১৫
ডিরাকের অনুকল্প ৮৩-৮৩
ডি স্টিটার বিশ্ব ৩৬
তারা ১৮০
তারাবর্ণালি ১৯৫-২০০
দিকনিরপেক্ষতা ৩
দিগন্তের দূরত্ব ৬৭
দিগন্তের সমস্যা ৬৭
দুর্বল বল ১৯৫
নক্ষত্র ১৮০
নক্ষত্রে মৌলিক পদার্থের সংশ্লেষণ ২৫৩
নক্ষত্রের অন্তিম দশা ২২৫
নক্ষত্রের অন্তিম নিয়তি ২১৩
নক্ষত্রের জন্ম ২০১
নক্ষত্রের শক্তি উৎস ২০৮
নবতারা ১৯৪
নিউট্রন ২১৫
নিউট্রন অপজাত চাপ ২২৫
নিউট্রন তারা ২২৮
নীহারিকা ১০২, ১৭৩
পদার্থ-প্রতিপদার্থ অপ্রতিসাম্য ৬৫ ৬৭
পপুলেশন ওয়ান ১৬৭, ১৭০
পপুলেশন টু ১৬৬
পর্যায়-প্রভা সম্পর্ক ১৮৭, ১৮৮
পারসেক ১৮৬
পালসার ২২৯
প্যানকেক ১৫৫
প্রধানধারা ২০০
প্রমাণ মডেল ৪২
প্রসারমান বিশ্ব ৪৩
প্রোটন-প্রোটন চক্র ২০৯
প্ল্যাঙ্কের সময় ৩১১
ফার্মিয়ন ২৮৬
ফ্রিডম্যান মডেল ৩৭, ২৫৬
ফ্র্যাকটাল বিশ্ব ৮৪
বকের বর্তুল ২০৭
বন্ধনশক্তি,নিউক্লীয় ২২৩
বর্ণালি, (তারাবর্ণালি দ্রষ্টব্য)
বর্তুলাকার স্তবক ১৭২
বিগ-ক্রাঞ্চ ২৬৫
বিগ-ব্যাঙ ৪২
বিচিত্র গতিবেগ ৪৪
বিনাশ বিকিরণ ৬৫
বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব ২
বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বসমূহ ৩২-৪৩
বিশ্বের নিয়তি ২৫৬-২৭১
বিশ্বের বয়স ৫২-৫৪
বিষমতারা ১৯০-১৯৩
বুধগ্রহের অনুসূর বিন্দুর অগ্রগমন ১৩
বোসন ২৮৬
ব্যতিক্রমী বিন্দু ৫
ব্যারিয়ন ২৮৭
ব্যারিয়ন অপ্রতিসাম্য ৬৬
ভারিত্বের সংখ্যা ২৮৭

ভিরিয়াল উপপাদ্য ১২৩
ভ্রূণতারা ২৫২
মন্দন প্যারামিটার ২৬৬
মহা আকর্ষক (গ্রেট অ্যাট্রাকটর) ১৪১
মহাকর্ষ ১৪৮
~ অস্থিতি ১৪৮, ২০৪
~ তরঙ্গ ২৮
~ পতন ২০১
~ রক্তিমসরণ ২৫
~ লেন্স প্রক্রিয়া ২৭
মহাজাগতিক ধ্রুবপদ ৯৭-১০০, ২৭৪
~ মাপ-উৎপাদক ৩৭
~ সমীকরণ ৩৯
মহাপ্রাচীর (গ্রেট ওয়াল) ১৪৪, ১৪৬
মহাবিশ্ব ২
মহাবিশ্বের কাঠামো ৩, ১৪৭, ২৮২
মহাবিষুব ২৭৯
মাইক্রোতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ ৫৬-৬১
মাপ-উৎপাদক ৩৮
মিল্নে বিশ্ব ৮০
মিনকোওস্কি জগৎ ১৫
মেট্রিক টেন্সর ২৩, ২৪
মেসন ২৮৭
ম্যাগনেটার ২৩৪
ম্যাজেলানীয় ছায়াপথ ১০৫
ম্যালিন-১ ছায়াপথ ১২২
রক্তিমসরণ ৪৪
রবার্টসন-ওয়াকার লাইন-এলিমেন্ট ৩৬
রিকি টেন্সর ৩২
রিমানীয় জ্যামিতি ২১
রিমানীয় টেন্সর ২৪
রুদ্ধতাপীয় বিচলন ১৫১
রেডিও ছায়াপথ ১২৯-১৩২
লম্বন ১৮৬
লেপটন ২৮৭
শিশুবিশ্ব ৮৮
শোয়ার্জশিল্ড মেট্রিক ২৩৭
সক্রিয় ছায়াপথ কেন্দ্রীন ১২৬-১২৮
সবল বল ২৯৭
সমতুলতার নীতি ১৮
সরলগতি, ছায়াপথস্থিত নক্ষত্রের ১৬৯
সাদা বামনতারা ২২৬-২২৮
সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব ৯-২৯
সাধারণ সহভেদিতার নীতি ১৬
সালাম ভাইনবার্গ-গ্ল্যাশো তত্ত্ব ২৯৮
সিংগুলারিটি থিওরেম ৪১
সিগনাস-এ ১৩১, ১৩২
সুপারনোভা ২২৩
সুপারনোভা ১৯৮৭-এ ১২১
সেফার্ট ছায়াপথ ১১৮, ১৩৩
সৃষ্টিতত্ত্বের নীতি ৩, ৪১
সৃষ্টির মহেন্দ্র ক্ষণ ৭৪-৮০
স্ট্রিংতত্ত্ব ৩০০
স্পেঞ্জনেস ২৮৯
স্থানীয় ছায়াপথগুচ্ছ ১৪০
স্থানের জ্যামিতি ২৫৬
স্থিতাবস্থার তত্ত্ব ৮২-৮৩
স্ফীতিশীল বিশ্বচিত্র ৬৭-৭৪
স্যাজিটারিয়াস-এ ১৩১
হকিং উপপাদ্য ৪১, ২৬২
হকিং বিকিরণ ২৩৮, ২৪৫, ২৬১
হকিং-এর সীমানাহীনতার শর্ত ৯১
হাইপারচার্জ ২৮৯
হাবল বিধি ৪৫
~ দৈর্ঘ্য ৪
~ ধ্রুবক ৪, ৪৫-৪৭
হাবলের শ্রেণীবিভাগ ১০১
হারশি পথ ২৫৬
হালস্-টেইলর পালসারজোড়া ২১, ২৩২
হিগস ক্ষেত্র ৩৬
হিলিয়াম বন্ধক ২১৫
হুইলার ডিউইট সমীকরণ ৮৬
হেজপ্রুঙ-রাসেল চিত্র ২০৫
হ্যাবুন ২৮৬

ফারসীম মান্নান মোহাম্মদীর জন্ম ঢাকায় **১৯৭৫ সালে**। পেশায় তিনি প্রকৌশলী। বর্তমানে **বাংলাদেশ** প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স কৌশল বিভাগের প্রভাষক। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে লেখালেখি করে আসছেন। বর্তমান সময়ে বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা এবং পুরোপুরি বিজ্ঞানে এর বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া মহাকাশ বার্তা, বিজ্ঞানের সময়ান্তর, বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক ভোরের কাগজ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তার অনেক জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে বেশ কয়েকটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৯৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৭ম সার্ক ভারত জাতীয় জ্যোতির্বিদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়া ১৯৯৪ সালে তিনি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত 'পুস্তক রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা পদ্ধতি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। তার প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো জ্যোতির্বিজ্ঞান শব্দকোষ (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮) ও জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান পরিচিতি গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। তিনি বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান বিশ্বকোষের অন্যতম সম্পাদক।